সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত।

ষোড়শ বর্ষ।

১৩১২।

কলিকাতা:

১০৩ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

২১০।৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত প্রেসে,

শ্রীভুজঙ্গনাথ পালিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী

অ

আ

ই

ক

ফ

ব

ভ

ম

য

র

শ

স

লেখকগণের বর্ণানুক্রমিক সূচী

অ

আ

ই

খ

গ

চ

জ

দ

ম

দোলনচাঁপা ।

১

হে চির সুন্দর হরি ! উন্মীলি' নয়ন
বন্দি' তব রাতুল চরণ,
বালকে পশিনু বনে আনন্দে মগন,
হেরিলাম সকলই মোহন !
যে ধারে ফিরাই আঁখি,—অমিয়ার ধারা,
বক্ষের বেদীর মাঝে শোভার ফোয়ারা !

২

কুন্তলে মোহন চাঁপা, সিঁথিতে রঙ্গন,
মুচকিয়া হাসে উষা রাণী ;
পাণিতলে ফুটন্ত গোলাপ অতুলন,
আহা ! রাঙ্গা চরণ দুখানি
পূজিতে শিউলি আর কামিনী ঝরিছে,
কি সৌরভ ! যেন ধূপ গুগ্‌গুল জ্বলিছে !

৩

হেরিলাম এক ধারে হাসিছে ডালিয়া,
সোহাগিনী সিন্দূরী কুসুম ;
প্রজাপতি-পাখা সম চারু সর্ব্বজয়া !
গৌরীপ্রেমে আনন্দ বিধুর
হাসে শত রক্তজবা,—মৃদুল সৌরভ,
শোভা পায় ম্লান, শিমুলিয়া উদ্যানগৌরব !

৪

নারী মাঝে বন্ধ্যা যেন ফুটিছে চামেলী,
নিজ গন্ধে নিজেই আকুল ।
প্রগল্‌ভা ঝুমকা হাসে করি' রঙ্গকেলি,
ঊষা যেন পরিয়াছে দুল !
সারা রাত্রি যামিনীরে প্রদানি' আসব
শিশিরকা স্নাতা এবে, তবু কি বৈভব !

৫

নব দুর্ব্বাদল'পরি ল্যাভেণ্ডার চাঁপা
প্রোচ্ছা সব অবাধে হাসিছে !
তীব্র গন্ধে অলিবৃন্দ আলাভোলা, ক্ষ্যাপা
গুঞ্জরিয়া আনন্দে বসিছে ;
ঝাঁকে ঝাঁকে মধুপানে ; হরির চরণে
ভক্ত-ভৃঙ্গ লিপ্ত যথা ক্ষিপ্ত গুঞ্জরণে !

৬

মোহিনী অপরাজিতা হাসিছে সুহাসি,
চারিধারে নীলিমা প্রকাশি' ;
রূপ-গরিমায় তোর ফুল রাশি রাশি
ঢলে পড়ে লাবণ্য বিকাশি' ;
এক পাশে তুই শুধু,—গন্ধ অতি মৃদু,
রে দোলন চাঁপা ! কেন লুকাস ও মধু

৭

শুভ্র বাস, শুভ্র দেহ, ও রূপের তুল
কোথা পাব আহরি' উপমা ?
বঙ্গ-গৃহে যেন বাল-বিধবা অতুল
তপস্বিনী দেবী নিরুপমা
চাপা হাসি, কষ্ট যেন নয়নের কোণে
বহে যায় দিবানিশি গোপনে গোপনে !

৮

নিশাশেষে তুই যেন পাণ্ডুর চন্দ্রমা,
সীতা যেন অশোকের বনে !
গোবিন্দ-বিরহ-ব্রত পালে যেন রমা,
মহাদুখে বারুণী-ভবনে !
ম্লানপ্রদীপের জ্যোতি সমাধি উপরে,
তুই ফুল ! হেরি তোরে অশ্রুবারি ঝরে !

[illegible] মাণিক তুই, যেন অলকার
বিরহিণী যক্ষবিমোহিনী,
যোগাসনে তুই যেন মগ্ন তপস্যায়,
উমারাণী হিমাদ্রি-নন্দিনী!
[illegible] আশা-জ্যোতি সম ঘোর নিরাশায়
রে সোনারচাঁপা! তোর ও মূরতি ভায়!

১০

[illegible] কলুষিত চিত্তে অনুতাপ আসি'
হয় যথা ঈষৎ উদয়,
শ্মশানবৈরাগ্য যেন—মুহূর্ত্তেক হাসি'
ভক্তি যথা হৃদি উজলয়,
সীতারে [illegible] যেন সোনার প্রতিমা,
শেষ [illegible] মিটি মিটি দেয়ালি-গরিমা।

১১

কিকরে কর্ণকরে [illegible] বিশায়
যে [illegible] অঁধার [illegible]।
চিরবিরহিণী নাকে [illegible] বিভায়
আনন্দে পোহায় [illegible] রাতি;
সারা দিন [illegible] কাটে [illegible] জীবন,
দিনান্তে মুহূর্ত্তকাল [illegible]।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা।

ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান ও অতি সাধারণ অভিযোগ—তাঁহার রচনা অশ্লীল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই অভিযোগের বিষয় আলোচিত হইবে।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র লেখক ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ অত্যন্ত সম্প্রতি ও অনাবশ্যক কঠোরতার সহিত আনয়ন করিয়াছেন। "যে নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণ এক সময়ে মেঘদর্শনে কৃষ্ণভ্রম করিয়া প্রেমাবেশে পাগল হইতেন, সেই স্থানে ভারতচন্দ্রের শিষ্যগণ [illegible]রিত [illegible] ও দাড়িম্ব দর্শনে কুভাবনায় কণ্টকিত হইয়া রাত্রিজাগরণ করিতে লাগিলেন। * * * * এই সময় দ্বিজ ভারতচন্দ্র, স্বীয় প্রভু—'সদাজ্যোৎস্নাময় দুই পক্ষ' সেবী নৃপনন্দনের জন্য কামোদ্দীপক বটিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন।" এ স্থলে ভারতচন্দ্র যে অশ্লীলতার প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়া শিষ্যসংগ্রহে ব্যস্ত হয়েন নাই, পরন্তু তিনিই সমাজের প্রভাবে প্রভাবিত, সে কথা পরে বুঝাইব। কিন্তু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র লেখক মহাশয় পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্তব্যের পরই যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে উভয় মন্তব্যের সমন্বয় করিতে কষ্ট পাইতে হয়। "কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বিশ্রাম খাঁ [illegible]য়েনের ওস্তাদি গানের মূর্চ্ছনা, গদাধর তর্কালঙ্কারের পুরাণপাঠ ও [illegible] কবিতা দেশময় যে মধুর ভাব বিকীরণ করিতে লাগিল, [illegible]

এই রাজনৈতিক বাদলের মধ্যে মনোরম রৌদ্রের মত মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।" তিনি বলিয়াছেন, "অন্নদামঙ্গলরূপ ধর্ম্মগুপে তিনি (ভারতচন্দ্র) বাই-নাচ দেখাইয়াছেন;" আবার, "বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্য নৈতিক-জীবনের ভগ্ন-পতাকা, বিকৃত আদর্শ ও কুরুচি-কলুষিত; কাচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য, কিন্তু ইহাদের ছাঁচে ঢালা সুন্দর মার্জ্জিত ভাষার জ্যোতিতে আদর্শের হীনত্ব পাঠকগণের উপলব্ধি হয় নাই, এক যুগ ভরিয়া এই কাব্যগুলি পাকা সোনার মূল্যে বিকাইয়াছে," তিনি হীন আদর্শে রচিত, কুরুচি-কলুষিত, কাচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য এই সকল কামোদ্দীপক বটিকায় মধুর ভাব পাইয়াছেন! তিনি এই সকল নিন্দিত কবিতাকে "রাজনৈতিক বাদলের মধ্যে মনোরম রৌদ্রের মত মৃদু হাস্য করিতে" দেখিয়াছেন। নৈতিক জীবনের ভগ্নপতাকাতলে সমবেত সমাজস্থ ব্যতীত অপরের নিকট এইরূপ বোধ হইবার কারণ কি?

যাহা হউক, অশ্লীলতার অভিযোগে "বিদ্যাসুন্দর"ই ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রধান প্রমাণরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই অশ্লীলতার অভি-যোগের আলোচনা করিবার জন্য আমরা স্বতন্ত্রভাবে "বিদ্যাসুন্দরে"র আলো-চনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

"বিদ্যাসুন্দরে"র গল্পাংশ সংক্ষিপ্ত ও সামান্য। —পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে বীরসিংহ নামধারী নৃপতি ছিলেন।

> "বিদ্যা নামে তা'র কন্যা আছিল পরম ধন্যা
> রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।"

বিদ্যার প্রতিজ্ঞা, যে তাহাকে বিচারে পরাজিত করিবে, "পতি হবে সেই সে তাহার।" অনেক রাজপুত্র আসিলেন; কেহই বিচারে জয়ী হইতে পারিলেন না। কাঞ্চীর রাজপুত্র সুন্দরের অনন্যসাধারণ রূপগুণের কথা শুনিয়া বীরসিংহ তাঁহার নিকট ভাট প্রেরণ করিলেন।

ভাটের নিকট সকল কথা শুনিয়া "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"— স্থির করিয়া, বিদ্যালাভ জন্য সুন্দর বর্দ্ধমানে যাত্রা করিলেন।

সুন্দর মনোরম বর্দ্ধমানে উপনীত হইলেন। বিদ্যাশিক্ষার্থীর বেশে সুন্দর পুরে প্রবেশ করিলেন। পুরমধ্যে সরোবর দেখিয়া রাজপুত্র সরোবরকূলে "আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে"। পুরনারীরা সরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিল; তাহারা সুন্দরকে দেখিয়া মুগ্ধা হইল। যখন "সূর্য্য যায় অস্ত

গিরি আইলে যামিনী", সেই সময় মালিনী সেই স্থানে উপনীতা হইল। "কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম"। সে নিজপরিচয়ে বলিল,—

"বাড়ী মোর যেয়া বটে থাকি একাকিনী॥
নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে যোগাই।
ভালবাসে রাজারাণী সদা আসি যাই॥"

হীরার নিকট রাজবাড়ীর সকল সংবাদ পাওয়া যাইবে বুঝিয়া ও কার্য্যসিদ্ধির আশায়, সুন্দর তাহাকে মাসী বলিয়া তাহার গৃহে বাসা লইলেন। সে অর্থ সম্বন্ধে সুন্দরকে যথাসম্ভব প্রতারিত করিল। শেষে তাঁহার পরিচয় পাইয়া সে বলিল,—

"বাপধন বাছা রে বালাই যাক্ দূর।
দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর॥
কৃপা করি মোর ঘরে যত দিন রবে।
এই ভিক্ষা দেহ কোন দোষ নাহি লবে॥"

হীরার নিকট সুন্দর রাজবাড়ীর সংবাদ লইলেন। শেষে এক দিন তিনি স্বয়ং মাল্য রচনা করিলেন। তিনি পুষ্পময় রতিমদন রচনা করিয়া কৌটা মধ্যে এমনই কৌশলে মদনের হস্তে ধনুর্ব্বাণ রক্ষা করিলেন যে, কৌটার আবরণমোচনমাত্রে শর মোচনকারীর বক্ষে আসিয়া পতিত হইবে। সুন্দর একটি শ্লোকে নিজ পরিচয় লিখিয়া দিলেন।

এ কার্য্য সময়সাপেক্ষ। সুতরাং সে দিন ফুল লইয়া যাইতে মালিনীর বিলম্ব হইল। বিদ্যা বড় অসন্তুষ্টা হইলেন। কিন্তু এই অভিনব উপহারে তাঁহার অসন্তোষ রবিকরে স্বচ্ছ কুজ্ঝটিকার মত অপসৃত হইয়া গেল। বিদ্যা মালিনীর নিকট সুন্দরের পরিচয় জানিয়া ভাবিলেন, পূর্ব্বে যে সকল রাজপুত্র আসিয়াছিল,—

"সে সব লোকেতে মন মজে কি বিদ্যার।
বিদ্যাপতি এই, তারা দাস অবিদ্যার॥
জিনিবেক যে জন সে জন বুঝি এই।
বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই॥"

বিদ্যাও প্রতিদানে পুষ্পপ্রতিমা প্রেরণ করিলেন,—চিত্রকাব্যে সংস্কৃত শ্লোকে নিজনাম লিখিয়া দিলেন।

পূজায় প্রীতা হইয়া ইষ্টদেবী সুন্দরের সহিত বিদ্যার মিলনে সম্মতি জানা-

লেন। মালিনী সুন্দরকে রথের পার্শ্বে আনিল। বিদ্যা সুন্দরকে ও সুন্দর বিদ্যাকে দেখিলেন;—"শুভক্ষণে দরশন হইল দুজনে"। (১) কিন্তু কি উপায়ে উভয়ের মিলন হইবে? বিদ্যা দেবকৃপার নির্ভর করিলেন। "রুক্মিণীর কৃষ্ণে মন", সেই জন্য "শূন্য হৈতে নারায়ণ" তাঁহাকে হরণ করিয়াছিলেন। এ দিকে সুন্দরও দেবীর পূজা আরম্ভ করিলেন। দেবী—

"সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া॥
তাম্র পত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া।
শূন্য হৈতে সিঁদকাটি দিলা ফেলাইয়া॥"

দেবীর কৃপায় "মালিনী বিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ"। সুড়ঙ্গপথে সুন্দর বিরহতাপতপ্তা, বাঞ্ছিতমিলনপ্রয়াসিনী, অধীরা বিদ্যার মন্দিরে উপনীত হইলেন; সহসা যেন "ভূমিতে চাঁদ উদয়"। সখীগণ বিস্ময়-বিহ্বলা,— "হংসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল রাজহংস দেখি হয়"।

উভয়ে সাক্ষাৎ চলিতে লাগিল। বিদ্যা বিচারে পরাজিতা হইলেন। গান্ধর্ব্ববিবাহ নিষ্পন্ন হইল। বিরহে উভয়েরই "পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান।" এ দিকে সুন্দর সন্ন্যাসিবেশে রাজসভায় যাইয়া বিদ্যার সহিত বিচার প্রার্থনা করিলেন। রাজা বিপদ গণিলেন। যদি বিদ্যা বিচারে পরাজিতা হয়েন, তবে ত কন্যাকে এই সন্ন্যাসীর করে অর্পণ করিতেই হইবে! হায়! "গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।" সন্ন্যাসী বলিলেন, এখন আর ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না; কারণ, "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" রাজা "আজি নহে কালি" বলিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। সুন্দরও এই কথা লইয়া বিদ্যাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু "লোকে বলে পাপ কাব ক' দিন লুকায়?" বিদ্যার কলঙ্ককথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। রাণী যথেষ্ট আক্ষেপ করিলেন; শেষে সতী হিন্দু গৃহিণীরই মত কন্যাকে বলিলেন,—এ কলঙ্কে কলঙ্কিতা হইবার পূর্ব্বে "না মিলিল দড়ী না মিলিল কড়ি কলসী কিনিতে তোরে?" বিদ্যা যত মিথ্যায় সত্যগোপন করিতে চেষ্টা করিলেন, রাণীর ক্রোধ ততই ঘৃতাহুতিপুষ্ট পাবকের মত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

তাহার পর রাণী শয়নমন্দিরে যথায় রাজা বৈকালিক নিদ্রাসুখভোগ

(১) পাঠক মার্লোর কথা স্মরণ করিবেন।—"Whoever loved that loved not at first sight?"

করিয়াছিলেন, তথায় উপনীতা হইলেন। রাণীর অতিকঠোর কাণ্ড, বিদ্রূপে ও তিরস্কারে রাজার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল। কর্ত্তব্যহেলনদোষে দোষী কোটালকে "জান বাচ্চা এক খাদে" প্রোথিত করিবার আদেশ হইল। কোটাল অপরাধী যুক্ত করিবার জন্ম সাত দিন সময় লইল।

কোটাল বিদ্যার মন্দিরে সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইল। কিন্তু কে সাহস করিয়া সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিবে? অপরাধী নিশ্চয়ই নাগ। কোটালের বড়ই বিপদ,—

"না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥"

কোটাল ও তাহার সহচরগণ নারীবেশে সেই কক্ষে অপেক্ষা করিতে লাগিল। সুন্দর সুড়ঙ্গপথে উপনীত হইলেন; তিনি বিদ্যার চিন্তায় এমনই তন্ময় যে, চতুরের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। এ দিকে কোটাল দেখিল,

"চক্ষুর নিমিষ আছে দেহে আছে ছায়া।
বুঝিল মানুষ বটে নহে কোন মায়া॥"

তখন তাহারা সুন্দরকে ধরিল।

কোটাল ও তাহার সহকারীরা সুড়ঙ্গপথে মালিনীর গৃহে উপনীত হইল। নিগৃহীতা মালিনী আপনাকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইল; কিন্তু "যার ঘরে সিঁদ সে কি যায় নিদ, ইহা কব কার কাছে।"

এ দিকে সুন্দর ধরা পড়িয়াছেন শুনিয়া বিদ্যা ধরাতলশায়িনী হইলেন। রাণী সৌধচূড়া হইতে অপরাধীর মুখ দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেন; কাহার এমন সুন্দর পুত্র? হায়!

"কি কহিব বিদ্যার কপাল পেয়েছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে
তবে কেন হইবে জঞ্জাল॥"

পুরনারীরা কোটালের হস্তে সুন্দরের নিগ্রহ দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল;—"হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার?"

সুন্দর রাজসভায় নীত হইলেন। রাজা সুন্দরকে দেখিয়া ভাবিলেন,— "কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব?"

মালিনী বলিল,—

"সত্য মিথ্যা কে জানে দিয়াছে পরিচয়।
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজার তনয়॥"

রাজা সুন্দরকে বলিলেন, তোমার সত্য পরিচয় দান কর, তোমাকে "কাটিতে বাসনা নাহি দেখেছি যাহায়।" সুন্দর পরিচয় দিলেন,

"বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ।
তপ জপ যজ্ঞ যাগ মন ধ্যান জ্ঞান ॥

* * * * * *

আমি বিদ্যার লাগিয়া আমি বিদ্যার লাগিয়া
আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া ॥"

আমি বিচারে বিদ্যাকে জয় করিয়াছি—ত্যাগ করিব না। রাজা ক্রোধে আদেশ দিলেন,—"নাহি দিল পরিচয় কাট রে কোটাল"; কিন্তু ইঙ্গিত করিয়া জানাইলেন, সহসা আদেশ পালিত না হয়,—অপরাধী ভয়ে শ্মশানে আত্ম-পরিচয় দিতে পারে।

এই সময় সুন্দরের পালিত, মালিনীগৃহ হইতে সভায় আনীত শুক, সুন্দরের পরিচয়দান করিল। মালিনীও সেই পরিচয় দিয়াছিল। গঙ্গা ভাট কাঞ্চীপুরে গিয়াছিল; তাহাকে আনিবার আদেশ হইল।

এ দিকে শ্মশানে সুন্দর কালীস্তুতি করিলেন। দেবী স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়া সুন্দরকে অভয় দিলেন। তখন—

"কোটালে সৈন্যের সনে বান্ধিলেক ক্রমে আনি
ডাকিনী-যোগিনী-ভূতগণ।"

ভাট সুন্দরকে কাঞ্চীপুরের রাজকুমার বলিয়া চিনিল। রাজা স্বয়ং শ্মশানে গমন করিলেন। সেই স্থানে সুন্দরের অনুগ্রহে বীরসিংহ দেবীদর্শন করিলেন। রাজা সুন্দরকে—

"সিংহাসনে বসাইয়া বসনভূষণ দিয়া
বিদ্যা আনি কৈল সমর্পণ।"

যথাকালে বিদ্যা পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্র লইয়া বিদ্যাসুন্দর কাঞ্চীপুরে গমন করিলেন।

বিদ্যা ও সুন্দর কালীর দাসদাসী,—"শাপেতে ভূতলে আসি" দেবীর পূজার প্রচার করিলেন। শেষে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া উভয়ে "আনন্দে দেবীর সঙ্গে স্বর্গেতে চলিলা রঙ্গে।"

খৃষ্ট-ধর্ম-যাজক ওয়েব্জার বলেন, এই আখ্যানবস্তু নাটকোপযোগী। ইটালীয়ান গীতিনাট্যের সহিত ইহার সাদৃশ্যও আছে। (২)

কোনও বিজ্ঞ সমালোচক বলিয়াছেন,—"বিদ্যাসুন্দর আদিরসপ্রধান। ইহার কয়েক স্থলে কতকগুলি অশ্লীল বর্ণনা আছে, তাহা অবশ্য এখনকার বিজ্ঞদিগের রুচিতে নিন্দনীয় হইবে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিয়া ধরিলে ইহার অপর সমুদয় অংশ আগাগোড়া মধুর ও মনোহর।" (৩) পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ সমালোচকও এই ভাবে বলিয়াছেন,—অপক্ষপাত হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ভাষার মাধুর্য্যে ও বর্ণনার ঐশ্বর্য্যে এই 'রোমাণ্টিক' গল্পের রচনা প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহার গতি কুনীতিমূলক,—এবং বাঙ্গালী মহিলা পাঠিকাদিগের পক্ষে ইহার পাঠ অনিষ্টকর। (৪) আর এক জন সমালোচক, "বিদ্যাসুন্দরে"র মেরুদণ্ড ধর্ম্ম, ইহা স্বীকার করিয়াও, "বিদ্যাসুন্দর"কে "অশ্লীলতার চারুশিল্প" বলিয়াছেন। (৫)

সুখের বিষয়, "বিদ্যাসুন্দর" যে কেবল অশ্লীলতার প্রচারকল্পে অশ্লীল পাঠের পাঠ্যপুস্তকরূপে রচিত নাও হইতে পারে, এরূপ মতের পোষকও বিদ্যমান। আমরা এক জন লেখকের মত উদ্ধৃত করিলাম;—"বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানটী রূপক বলিয়া মনে হয়। বর্দ্ধমান-রাজ-সরকারের উপর জাতক্রোধ হইয়া তিনি (ভারতচন্দ্র) বিদ্যাকে বর্দ্ধমানরাজদুহিতা সাজাইয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বিদ্যা জ্ঞানরূপা প্রকৃতির অন্য রূপ। তৎকালে নবদ্বীপে প্রগাঢ় বিদ্যানুশীলন হইত, এবং দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে বিদ্যোৎসাহী যুবকবৃন্দ নদীয়ায় ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনার জন্য আগমন করিত। ন্যায়শাস্ত্ররূপ বিদ্যার কূটতর্কের মীমাংসা শাস্ত্রাধ্যায়ী সুন্দর-রূপ যুবকের আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। সুন্দর বিদ্যালাভের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সুদূর কাঞ্চীপুর হইতে নবদ্বীপে আগমন করেন। বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে তাহাই সুন্দরের মশানরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মালিনীর সাহায্য ব্যতীত সুন্দরের বিদ্যালাভ যেরূপ অসম্ভব ছিল, অধ্যাপকের নির্দ্দেশ ব্যতীত

---

(২) The Calcutta Review, vol. XIII., 1850.

(৩) রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।

(৪) The Calcutta Review, vol. XIII., 1850.

(৫) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

[illegible] ভাস্কর-কার্য্যে [illegible] মনে করেন। [illegible] প্রভাব সংস্থাপিত হইল। (১৩) [illegible] সময়ে মন্দিরাভ্যন্তরে যে অভিনয় হয়, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। তাঁহার কথাতেও এই ইতিহাসকার স্পষ্ট বলিয়াছেন,— [illegible] বিচারকের ভাবানুসারে, হয় একান্ত অশ্লীল, নয় ত [illegible] বলিতে হয়। (১৪)

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ে এইরূপ ভাস্কর-কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার অধিকাংশ মন্দির চারি অংশে বিভক্ত; যথা, (১) ভোগ-মন্দির, (২) নাটমন্দির, (৩) মোহন, (৪) দেউল। (১৬) এই সকল অশ্লীল চিত্র প্রধানতঃ দেউলে ও মোহনে ক্ষোদিত। রাজেন্দ্রলাল মনে করেন, এই সকল ভাস্কর-কার্য্য যে অশ্লীল রুচির অশ্লীল বিকাশমাত্র নহে, ইহাই তাহার প্রধান প্রমাণ। সকল ধর্ম্মেই দুর্নীতি নিষিদ্ধ। দুর্নীতি যে দেব-মন্দিরে অশ্লীল চিত্রে আত্মবিকাশ করিয়াছে,—এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। দুর্নীতির এইরূপ আত্মবিকাশে ধর্ম্মশাস্ত্রের ও পুরোহিতগণের সম্মতিদান অসম্ভব। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনার জন্য এ সকল চিত্র ক্ষোদিত হয় নাই। এই সকল চিত্র কোন ধর্ম্মভাবের নিদর্শনমাত্র। (১৭) সে রহস্য বহুশতাব্দীর কুজ্ঝটিকায় ও সর্ব্ববিধ পবিত্র স্মৃতির ও সংস্কারের আবরণে আবৃত। সে কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিবার শক্তি আমাদিগের নাই,—সে আবরণ মুক্ত করিবার যোগ্যতার অভাব আমরা অবশ্যই অনুভব করিয়া থাকি — না করিয়া পারি না।

জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" নব্য রুচিতে "অশ্লীল"। কিন্তু তাহা বৈষ্ণব-দিগের আদরের বস্তু। কথিত আছে, দেবতা স্বয়ং কবিকে এই পুস্তক-রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং পুস্তক সমাপ্ত হইলে তাহা তাঁহার ভক্তের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। "গীতগোবিন্দে"র যশের কথা শুনিয়া

---

(১৪) Hunter—Orissa. কিন্তু শিবমন্দিরেও এইরূপ ভাস্করকার্য্য বিদ্যমান।—লেখক

(১৫) Hunter—Orissa.

(১৬) এই চারি অংশ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে যে তর্ক হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।—লেখক।

(১৭) Rajendra Lala Mittra—Orissa.

"[illegible]
গোকুলে নন্দকিশোর ॥"

"কোটাল[illegible]"—

[illegible] চোর [illegible]।

*   *   *

"যে [illegible]   তাহারে [illegible],
[illegible] ॥"

"নারীগণের পতিনিন্দায়"—

"বাঁধা আছি কুল ফাঁদে,   পরাণ সতত কাঁদে,
না দেখিয়া শ্যাম চাঁদে দিবসে আঁধার ॥
ঘরে গুরু দুরাশয়,   সদা কলঙ্কিনী কয়,
পাপ ননদিনী ভয় কত সব আর ॥ (২১)
শ্যাম অখিলের পতি—"

এই স্থানেই কবি বিদ্যার কলঙ্কভঞ্জন করিয়াছেন। "শ্যাম অখিলের পতি"; তাঁহার প্রেমে কলঙ্ক কোথায়?

ইহার পর "রাজসভায় চোর আনয়নে"—

"কি শোভা কংসের সভায়।
আইলা নাগর শ্যাম রায় ॥
কংসের গায়ন যাঁরা   যে বীণা বাজায় তাঁরা
বীণা সে গোবিন্দগুণ গায় ॥"

বীরসিংহ সুন্দরের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দান করিয়া তাঁহার কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই কবি বলিয়াছেন,—

"ভারত কহিছে কংস   কৃষ্ণের প্রধান অংশ
শত্রু ভাবে নিত্য পদ পায় ॥"

"চোরের পরিচয়জিজ্ঞাসায়"—

"লোকে মোরে বলে বিদ্যাচোর"

*   *   *

দেখিয়া কঠোর   প্রাণ কাঁদে মোর   [illegible] ॥
সবে কয় পাপ   বুঝিবারে তাপ   [illegible] চোর ॥"

(২১) বৈষ্ণব কবিগণ ননদিনীর প্রতি কখনই [illegible]।

"রাজার নিকট তোমার [illegible]"—

"[illegible] পূর্ণিত রাধা।
[illegible] তনুর আধা॥
দেখিতে রাধার মন সদা ধায় নাহি মানে কোন বাধা॥
রাধা সে আমার আমি সে রাধার আর যত সব ধাঁধা॥
রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান রাধা সে মনের সাধা॥"

এই তন্ময়তার পরিচয় আমাদের আছে। ভাট মুখে বিদ্যার কথা শুনিয়া সুন্দরের—

"বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যা নাম জপ।
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ॥
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।"

তখন সুন্দর বিদ্যাকে দেখেন নাই। সুতরাং এই ব্যাকুলতা কলুষিত কামনা-প্রসূত এমন মনে করিবার কারণ কোথায়? জন্মান্তরে বিশ্বাস ব বিদেশীয় আত্মার দ্বিভাগ (dichotomy) মত পোষণ না করিলে ইহার সদু মীমাংসা হয় না। সমালোচকগণ ইহা বিবেচনা করেন নাই।

বিদ্যাও সুন্দরকে দর্শনের পূর্ব্বেই তাঁহাকে মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছিলেন অন্যান্য রাজকুমারগণের সহিত সুন্দরের তুলনা করিয়া তিনি বলিলেন,—

"বিদ্যাপতি এই, তার দাস অবিদ্যার।" "অবিদ্যা" হিন্দুদর্শনে অপরিচিত নহে

সুন্দরবিরহে বিদ্যার "পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান।" সুন্দরও বিদ্যাকে বলিয়াছেন,—

"এখনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল।
ধুইলে না যাবে মোর জীব যত কাল॥"

আবার বিদ্যাই তাঁহার "তপ যপ যাগ যোগ ধন ধান্য ভজন।"

"সুন্দর সমাগমের পরামর্শে "হীরা যখন সুন্দরকে গোপনে আনিবার পর বহু বিধ বিপদের সম্ভাবনার কথা বলিল, তখন বিদ্যা সে সকল বি অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিলেন। বিপদের কথা তিনি মনে স্থান দিলেন না উপায় অবশ্যই হইবে। সুন্দরের পক্ষে কি অসম্ভব? কৃষ্ণ কিরূপে রুক্মিণী হরণ করিয়াছিলেন?—

"বেষ্টিত ভূপতি জাল বর আইল শিশুপাল
পিতা ভ্রাতা তাহে পুষ্ট ছিল।

কর্ম্ম।

আমি দুঃখশ্রম-মূল—আমিই জীবন;
আমার অভাব মৃত্যু—মৃত্যু নাহি আর;
বিশ্বের বৈচিত্র্য আমি নূতন নূতন
সৃজনরূপে গাঁথি নিত্য সৌন্দর্য্যের হার।
মোর ঘাত-প্রতিঘাতে বিচিত্র স্পন্দনে
এ বিশ্ব-বীণায় উঠে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার,
কভু তীব্র হুঙ্কারে—কভু মৃদুস্বনে
দগ্ধ করি স্নিগ্ধ করি নিখিল সংসার!
চির-উপেক্ষিত হীন ভিখারীর ভালে
পরাই অম্লানজ্যোতি মহিমা-মুকুট,
ধনগর্ব্বদৃপ্ত জনে ঢাকি ধূলিজালে
ভরিয়া গৌরবভস্মে তার করপুট।
অন্তরের তৃষ্ণা ত্যজি' যে পূজে আমারে,
অনন্ত সম্পদ আমি দান করি তারে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

যুদ্ধ ও সন্ধি।

১

বিনোদচন্দ্র নয়নাসুন্দরীকে লইয়া নির্ব্বিরোধে দিনযাপন করিতেছিলেন হঠাৎ অগ্রজ অতুলচন্দ্র সস্ত্রীক পৈত্রিক ভিটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতুলচন্দ্রের স্ত্রী সুবালা বড় বৌ। বিনোদচন্দ্রের স্ত্রী নয়না মেজ বৌ। ঈশ্বরের কৃপায় বিনোদচন্দ্রের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল, এবং সেই কৃপা ঘনীভূত হইয়া উত্তরোত্তর বিনোদের সুখবৃদ্ধি করিতেছিল। বিনোদের পুত্র অজয় এইবার এণ্ট্রান্স পাশ করিবে।

অতুলচন্দ্রের উপর ঈশ্বরের কৃপা কন্যারূপে বর্ষিত হইয়াছিল। অতুলচন্দ্রের গতিক দেখিয়া ভয় হইয়াছিল যে, এবংবিধ কৃপাবারি-বর্ষণ স্থগিত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইবে। গগনে মেঘের পুনর্সেকার দেখিয়া অতুলচন্দ্র স্থির করিয়াছিলেন যে, পৈত্রিক-ভদ্রাসন সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইয়া প্রথম কন্যার বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহ করিবেন।

অতুলচন্দ্র উত্তর-পশ্চিমে একটা ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করিতেন। বিনোদচন্দ্র গুড়ের ব্যবসায় করিতেন।

বড় বৌ কখন মেজ বৌকে দেখেন নাই। সরমা অতি সমাদরে বড়বৌ ঠাকুরাণীর অভ্যর্থনা করিল। বড় বৌ অতি সাবধানে তাহা গ্রহণ করিয়া মেজ বৌকে বাধিত করিলেন। অতুলচন্দ্র বিনোদের গুড়ের ব্যবসায়ের উন্নতির উপর লক্ষ্য করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন, এবং বিনোদচন্দ্র অগ্রজের ক্ষীণ শরীর লক্ষ্য করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিল।

বিনোদচন্দ্রের পুত্র অধর সকলকে যথাবিহিত প্রণামপুরঃসর আপ্যায়িত [illegible] সেবায় নিযুক্ত হইল। অতুলচন্দ্রের কন্যা পুঁটী পিতৃব্যের গুড়ের কারখানা দেখিবার নিমিত্ত বহির্ব্বাটীতে [illegible]।

একটু অবসর পাইলে বিনোদ রন্ধনশালায় পত্নীর নিকট গিয়া বলিল "দাদা কেন আসিয়াছেন, জান?"

সরমা একটু হাসিয়া বলিল, "পৈত্রিক ভদ্রাসন বিভাগ করিতে।" বিনোদ ভাবিল, "সরমা কি বুদ্ধিমতী"!

সরমা ভাবিল, "বিনোদ কি বোকা!"

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর উভয় পক্ষ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

২

পরদিন প্রভাতে অতুলচন্দ্র তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কামরায় সহধর্ম্মিণী সুবালার সহিত পরামর্শ নামক মানবধর্ম্মে রত হইলেন।

সেই সুন্দর ভদ্রাসন, বড় বড় কামরা, সুসজ্জিত শয্যা, বৃহৎ উদ্যান, বিস্তীর্ণ জলাশয়, গরুবাছুরের পাল, সুবালা সমস্ত লক্ষ্য করিয়াছিল। ইহার মধ্যে কতটা পৈত্রিক সম্পত্তি, এবং কতটা বিনোদের নিজের অর্জ্জিত, তাহা অতুলচন্দ্র জ্ঞাত ছিলেন না। বহুবৎসর পূর্ব্বে পিতার মৃত্যুর পরে অতুলচন্দ্র একবার মাত্র বাড়ী আসিয়াছিলেন, তখন কাঁচা বিনোদ স্কুলে পড়িত। পিতৃহীন সহোদরকে মাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া অতুলচন্দ্র কর্ম্মস্থলে চলিয়া গিয়া-

[illegible] । [illegible] ছিল, [illegible] পুষ্করিণীটা কত বড় ছিল;" এবং আম [illegible] ছিল, কিম্বা বহির্বাটীতে কয়টা কামরা ছি[ল] [illegible] জন্মাইয়াছিল কি না, তাহা তিনি [illegible] কাশীতে দেহত্যাগ করেন, তখন সেখানে বিনোদের [illegible] হয়। বিনোদ বলিয়াছিল, "দাদা, এবার [illegible] কি হবে?" অতুলচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"ও সব ভাবনা তোমায় করিতে হইবে না।"

সুরবালা বলিল, "তুমি এত দিন উপার্জ্জন করিয়া কি ছাই করিয়াছ? তুমি কাঙ্গাল, আর এরা [illegible] সমস্ত বিষয়টা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।"

অতুলচন্দ্র। "এখন উপায়? ইহার মধ্যে আমার কতখানি ভাগ, তাহা [নি]র্দ্ধারণ করা শক্ত। উপরন্তু একটা গুড়ের কারখানা করিয়া বিষয়টা জটিল করিয়া ফেলিয়াছে।"

সুরবালা। "তুমি চিরকালই হতভাগা থাকিয়া যাইবে। এ বিষয় সমস্ত তোমার। তুমি চুল চিরিয়া হিসাব করিয়া লও, নচেৎ তোমার সহিত আমার ইহজন্মে সম্বন্ধ নাই।"

৩

অতুলচন্দ্র গৃহিণীর ন্যায়সঙ্গত বিচারে উহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, পৈত্রিক ভদ্রাসন ও স্থাবর সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে দৃঢ়ভাবে কনিষ্ঠের হস্তগত হইয়াছে। তাহার উদ্ধার করা সহজ কথা নয়। তজ্জন্য কাঠখড় চাহি, উকীলের পরামর্শ চাহি, এবং একবার সাহস করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া চাহি। অতুলচন্দ্র একবার ভাবিলেন যে, "ইহাতে বিনোদের দোষ কি?" হয়ত পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিলে বিনোদ অর্দ্ধেকটা অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারে। কিন্তু তাহা ছাড়া সম্ভব নহে, কেন না, বিনোদ নিজে পরিশ্রম করিয়া সম্পত্তিটা বর্দ্ধিত করিয়াছে। ইহাই তাহার সম্পূর্ণ চালাকী।

ক্রমেই অতুলচন্দ্র ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুভব করিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। [illegible] ক্রমে [illegible] মস্তকে বহিতে লাগিল। সহজ কথায়, অতুলচন্দ্র [illegible], এবং ক্রোধান্ধ হইয়া হিতাহিত-জ্ঞান হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন।

ক্রমে গৃহিণী ও কর্ত্তা উভয়ে যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। যেমন গুপ্ত

উকীলেরা বলিল, "ঠিক। আপনিই এ জমির সম্পূর্ণ মালিক। আমরা জানি, বিনোদ বাবু গুড়ের কারবার হইতে দশ হাজার লাভ করিয়াছেন, এবং তৎসমস্ত তাঁহার স্ত্রীধনে পরিণত করিয়াছেন।"

বড়বৌ শাশুড়ীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে পৈত্রিক সম্পত্তি বিনোদ কিছুই পাইতে পারে না, কেন না, তাহার অর্দ্ধাংশের দাম প্রায় দশ হাজার টাকা। এখনই গুড়ের কারখানা দখল কর ও বাড়ী হইতে উহাদের তাড়াইয়া দাও।"

৬

বাড়ী হইতে তাড়াইবার কথা সরমার কানে গেল। সরমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাক্স গুছাইল, এবং অধরকে ডাকিয়া হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অধর বলিল, "মা, আমরা যাব কোথা? উনি কি ইচ্ছা করিলে আমাদের বাড়ী হইতে তাড়াইতে পারেন?"

সরমা বলিল, "বাবা, উঁহারা গুরুজন, পিতার সমান। আমাদের আত্ম-ভাবে চলিয়া যাওয়া ভাল।"

অধর পুরাতন ও নূতন বইগুলি, পুরাতন ও নূতন কাপড়গুলি একে একে গুছাইতে লাগিল। পদার মা ছুটিয়া গ্রামে গেল, এবং তাহার আত্মীয় স্বজনকে ডাকিয়া বাগানের পাকা আম ও বাড়ীর পুরাতন বাসনগুলি সুবিধা বুঝিয়া একে একে সরাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরে বিনোদ কলিকাতা হইতে ফিরিল। তখন সরমা খাটে বসিয়া।

বিনোদ ধীরে ধীরে সরমার নিকট গিয়া বসিল। বিনোদ বলিল, "সরম' আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

সরমা বলিল, "কিসের সর্ব্বনাশ?"

বিনোদ। গুড়ের কারবারে আমার পাঁচ হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে, এবং আরও পাঁচ হাজার টাকার দাবী করিয়া পাওনাদারগণ আমার ও দাদার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করাইবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছে। তাহারা দাদাকেও জড়াইয়াছে। দাদাকে না জড়াইলে তাহারা জমাজমি বেচিতে পারিবে না।

সরমা আকাশের দিকে চাহিল, এবং পুনর্ব্বার স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "এখন উপায়?"

বিনোদ। উপায় কেবল এই যে, দাদাকে প্রমাণ করিতে হইবে, তাঁহার সহিত গুড়ের কারবারের কোনও সম্বন্ধ ছিল না, এবং তত্রাসনে আমার কোনও অধিকার নাই। আমি এখন তোমাকে ও অধরকে লইয়া পথের ভিখারী। বাকি কেবল দাদার অনুগ্রহ।

৭

সন্ধ্যা গিয়া যেমন প্রভাত হয়, তাহাই হইল। সরমার চক্ষুর জল শিশিরের সহিত শুকাইল। বিনোদ গ্রামের মান্য গণ্য জমীদার জ্ঞানদাবাবুর বাটীতে স্ত্রীপুত্রকে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে গেলেন।

বেলা দশটার সময় গুড়ের কারখানায় তালা পড়িয়া গেল, এবং বড়বাবুর তরফে লোক খাড়া হইল। তাহার দাপটে কারখানার কর্ম্মচারিগণ ভাগিয়া গেল।

অপরাহ্ণে সদরালার আদালত হইতে নাজীর সাহেব ক্রোকী পরওয়ানা লইয়া রঙ্গস্থলে উপনীত হইলেন। অতুলচন্দ্র ক্রোধে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "ও সব চালাকী আমি জানি। ঐ গুড়ের কারখানা আমার, কেবল আমার, ইহাতে বিনোদের কোনও অংশ নাই। গ্রামস্থ লোক সকলে সাক্ষী।"

সকলে বলিল, "হাঁ, ইহা ঠিক।"

নাজীর সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সেই কথাই ঠিক। তবে প্রমাণের প্রয়োজন নাই।"

বিনোদ দূর হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া আসিল, এবং বলিল, "নাজীর সাহেব! ইহাতে দাদার কোনও অংশ নাই। আমি প্রমাণ করিব। আমার দায়ে দাদার সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে না।"

গ্রামের ভক্তহরি মোক্তার কথাটা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কিসের ক্রোক?"

নাজীর পরওয়ানা পাঠ করিয়া শুনাইলেন যে, ইহাতে বিনোদ ও অতুলচন্দ্রের বিরুদ্ধে পাচ হাজার টাকার দাবী দিয়া বিনোদের পাওনাদারগণ উভয়ের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করাইতেছেন।

তাহার পর মুচী ঢাকে কাঠি দিল। গ্রামস্থ লোক কাণ্ডটা বুঝিল। অতুলচন্দ্র হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সকলে বলিল, "উঁহাকে তুলিয়া লইয়া যাও। উনি নিজের জালে নিজেই পড়িয়া গিয়াছেন।"

৮

ধীর নিস্তব্ধ নিশি। অতুলচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদ। এখন উপায়? আমার হাতে এক হাজার টাকাও যে নাই।"

বিনোদ সরমার নিকট গেল। সরমার মুখের জ্যোতি আবার মুখে আসিয়াছিল। সরমার সম্মুখে আবার কত শান্তির আশা, কত সুখের ছবি একে একে নৃত্য করিতেছিল।

সরমা নিজের পুরাণ বাক্স হইতে গহনাগুলি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর হস্তে দিল, এবং স্বামীর মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "এগুলি বড়ঠাকুরের পায়ে রাখিয়া দাও।"

সেই আত্মত্যাগ বড় বৌর হৃদয়ে ছুরিকার ন্যায় বিঁধিল। বড়বৌ আসিয়া সরমাকে কোলে লইলেন, এবং না জানি কোন সনাতন স্বর্গীয় বিধানানুসারে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বর্ষিত হইল।

পরদিন প্রত্যূষে উভয় ভ্রাতা গহনার পুঁটুলিটি লইয়া জ্ঞানদা বাবুর নিকট গিয়া গহনাগুলি বন্ধক রাখিয়া পাঁচ হাজার টাকা লইয়া আসিলেন, এবং পাওনাদারগণকে সন্তুষ্ট করিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিষয় ভাগ হইল না। গুড়ের কারবারও বন্ধ হইল না; বরং তিন বৎসরের মধ্যে উভয়ের দশ হাজার টাকা লাভ হইল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুঁটীর বিবাহ জ্ঞানদা বাবুর পুত্রের সহিত ঘটা করিয়া হইয়া গেল। বিবাহসভায় জ্ঞানদা বাবু সরমা দেবীর গহনাগুলি অতি আদরে পুত্রবধূকে পরাইয়া দিলেন, এবং সকলকে বলিলেন, "এ যাঁহার গহনা, আমার পুত্রবধূ যেন তাঁহারই মত হয়।"

তিব্বতের ষোড়শ-মহাস্থবির।

বিগত তিব্বত-অভিযানের সময়ে প্রত্নতত্ত্ববিদগণের কৌতূহলোদ্দীপক কতিপয় দুর্লভ বস্তু তিব্বতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল বস্তুর অধিকাংশই লণ্ডন ও কলিকাতা মিউজিয়মে সুরক্ষিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের শিরোদেশে যে ষোড়শ-মহাস্থবিরের উল্লেখ হইয়াছে, উহার প্রতিমূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত কোনও মিউজিয়মে রক্ষিত হয় নাই

গত জানুয়ারী মাসে হোম ডিপার্টমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী মিঃ বাক একটি চন্দনকাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাহার কয়েক দিন পরেই লর্ড কিচেনারের আসিষ্টাণ্ট মিলিটারি সেক্রেটারী কর্ণেল বেনন ঐরূপ আর চারিটি মূর্ত্তি আমাকে দেখিতে দেন। কর্ণেল বেননের মুখে শুনিলাম, ঐরূপ আর এগারটি মূর্ত্তি লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ওয়াডেল ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছেন। এই যোলটি মূর্ত্তি গ্যাংচির (Gyantse) সন্নিধানে ঞেণ্ডিং বিহারে বিদ্যমান ছিল। ইংরেজ সৈন্য গ্যাংচি দুর্গ বিধ্বস্ত করিলে, ঐ দুর্গ ও তৎসন্নিহিত স্থানের দ্রব্যসমূহ বিজেতৃগণের হস্তগত হয়।

মিঃ বাক ও কর্ণেল বেনন যে পাঁচটি মূর্ত্তি আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন, তাহা আমি গত ফেব্রুয়ারী মাসে এসিয়াটিক সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশনে প্রদর্শন করি, এবং সেই সঙ্গে ষোড়শ-মহাস্থবির শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। নিম্নে ষোড়শ-স্থবিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

স্থবির শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। মনু বলেন, যাহার কেশ পক্ক হইয়াছে, তাহাকেই স্থবির বলে না। যিনি যুবক হইয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, দেবগণ তাঁহাকেই স্থবির বলিয়া জানেন।* অতএব মহাস্থবির শব্দের অর্থ,—পরমশাস্ত্রজ্ঞ। পালি ভাষায় স্থবিরকে থের্ বলে। থের্ বৌদ্ধ ভিক্ষুর এক সম্মানসূচক উপাধি। যে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ করিবার পর অন্ততঃ দশ বৎসর কাল নিষ্কলঙ্কে জীবনযাপন করিয়াছেন, তিনি থের্-পদবাচ্য। এইরূপ যে ভিক্ষু অন্ততঃ বিশ বৎসর কাল পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিয়াছেন, তাঁহাকে মহাথের্ বলে। তিব্বতীয় ভাষায় মহাস্থবির বা মহাথের্কে নে-তন-চেন্-পো বলে। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ,—মহা-আসন-স্থির।

আমি যে পাঁচটি মহাস্থবিরের মূর্ত্তি সোসাইটীতে প্রদর্শন করি, উহার প্রত্যেকটিই ৯½ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৭ ইঞ্চি বিস্তৃত। মূর্ত্তিগুলি রক্তচন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত। চীন-দেশীয় শিল্পের অনুকরণে ঐ সকল মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ মূর্ত্তিগুলির উপরে চন্দন ও সিন্দূরের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা বোধ হয়, গ্যাংচি বিহারের লামাগণ উহা পূজা করিতেন। প্রত্যেক মূর্ত্তির পাদদেশে স্বর্ণ অক্ষরে তিব্বতীয় ভাষায় এক একটি বচন উৎকীর্ণ আছে। মিঃ বাকের প্রদত্ত মূর্ত্তির পাদদেশে যে বচন উৎকীর্ণ ছিল, তাহা এই :—

* ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ ॥—মনু ২। ১৫৬।

"ফাগ্‌—পা—নে—ত্তেন—ছেম্‌—পো—যোগ—পু—হ—ন—য়ে।"

উল্লিখিত বচনের সংস্কৃতানুবাদ এইরূপ :—

"আর্য্য মহাস্থবির-বজ্রায়ণীপুত্রায় নমঃ।"

অন্যান্য মূর্ত্তির পাদদেশেও ঐরূপ বচন উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন মহাস্থবিরের নাম দৃষ্ট হয়। ষোলটি মূর্ত্তিতে সর্ব্বশুদ্ধ ষোলটি মহাস্থবিরের নাম উৎকীর্ণ আছে। উক্ত ষোড়শ নাম * নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) বিশুদ্ধ, (২) অক্ষশিক, (৩) অজিত, (৪) বনবাসী, (৫) কালিক, (৬) বজ্রাযণীপুত্র, (৭) ভদ্রিক, (৮) কনকবৎস, (৯) ভরদ্বাজ, (১০) বাকুল, (১১) ধৃতবর্ম্ম, (১২) পিণ্ডোল ভরদ্বাজ, (১৩) নাগসেন, (১৪) ভবিক বা সিবক, (১৫) ধর্ম্মত্রাত বা ধর্ম্মাত, এবং (১৬) রাহুল।

বজ্রায়ণীপুত্র সিংহলের লোক। তাঁহার দুই হস্তে চামর, এবং তিনি ১০৭০ অর্হৎ কর্ত্তৃক পরিবৃত। বাকুল উত্তর-কুরুর লোক। তাঁহার দুই হস্তে নকুল, এবং তিনি ৯০০ অর্হৎ কর্ত্তৃক পরিবৃত। বনবাসী নামক স্থবির সপ্তপর্ণী গুহায় অবস্থান করেন। তাঁহার মধ্যমাঙ্গুলিতে চামর বিদ্যমান, এবং তিনি ১৪০০ অর্হৎ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। সিবকের হস্তে প্রজ্ঞাপারমিতা নামক সুবিখ্যাত মহাযান গ্রন্থ। তিনি ১৪০০ অর্হৎ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া গিরিরাজ বিহুলে বাস করেন। এইরূপ অন্যান্য স্থবিরেরও বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই বজ্রাসনের উপর আসীন। যে স্থবির যে দেশের লোক, প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

---

* জাপানদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত তিব্বত-পরিব্রাজক কাওয়া-গুচি একটি চীন-জাপানী বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে ষোড়শ-স্থবিরের যে নামতালিকা বাহির করিয়াছেন, তাহা এই :—

(১) সুপিণ্ড, (২) তক্ষক, (৩) অসিত, (৪) উজ্জাত, (৫) কালিক, (৬) বজ্রায়ণী পুত্র, (৭) ভদ্রিক, (৮) কনকবৎস, (৯) ভরদ্বাজ, (১০) নকুল, (১১) পুনবসু, (১২) পিণ্ডোল, (১৩) নাগসেন, (১৪) সিবক, (১৫) চুডহন্তক, (১৬) রাহুল।

তিব্বতীয় 'নে—তেন—চু—ড়ুক' নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত নাম দৃষ্ট হয় :—

(১) কাগ্‌—ক্রি (২) যন্‌—লগ্‌—চুঙ্‌, (৩) ম—ফম—প, (৪) নগ্‌—ন নে (৫) দুস—দেন, (৬) দো—র্জে—মো—য়ি—বু, (৭) জং—পো, (৮) সের—বেউ, (৯) ভরদ্বাজ, (১০) বাকুল, (১১) লাম—ত্রাম্‌—তেন্‌, (১২) পিণ্ডোল ভরদ্বাজ, (১৩) লু—য়ি—ডে, (১৪) শ্রিন্‌—বো—প, (১৫) ধর্ম্মাত, (১৬) ড—চেন—জিন্‌।

তদ্ভিন্ন তিব্বতীয় ভাষায় নেতেন্ চুরুক বা ষোড়শ-স্থবির স্তোত্র নামক এক গ্রন্থ আছে, উহাতে প্রত্যেক স্থবিরের জন্মস্থান ইত্যাদি স্পষ্টতঃ বর্ণিত আছে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, ষোল জন স্থবির এক সময়ে বা এক দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। অঙ্গণিকের জন্মস্থান কৈলাস পর্ব্বত। বনবাসী মগধের সপ্তপর্ণী গুহায় জন্মগ্রহণ করেন। বজ্রীপুত্র লঙ্কা হইতে আগমন করিয়াছিলেন। কনকবৎসের নিবাস কাশ্মীর। বাকুল উত্তর কুরুতে (Eastern Turkestan) সম্ভূত হইয়াছিলেন। কালিক তাম্রলিপ্তের লোক। নাগ সেন বাহ্লীক দেশ সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এইরূপ অন্যান্য স্থবিরের জন্মস্থান অন্যান্য দেশ।

অঙ্গণিক, অজিত, পিণ্ডোল, বাকুল, ভদ্রিক, রাহুল ও সিবকের নাম পালিত্রিপিটকের অন্তর্গত থেরগাথা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। অতএব, এই সাত জন স্থবির খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বা তৎপূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, ষোড়শ-স্থবিরের মধ্যে নাগ সেন অন্যতম। মিলিন্দ-পঞ্‌হ নামক পালি গ্রন্থে নাগ সেনের বিবরণ পাওয়া যায়। নাগ সেন বক্তির গ্রীকরাজ মিলিন্দ বা মিনান্দের সমসাময়িক, অতএব খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। ধর্ম্মত্রাত নামক অপর এক জন স্থবিরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি বসু মিত্রের মাতুল, অতএব রাজা কনিষ্কের সমসাময়িক।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, উল্লিখিত ষোল জন স্থবির খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত সাত শত বৎসর মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যদিও তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ ও পরোপকারিতায় বিস্মিত হইয়া পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ এই ষোলটি নাম এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া ধরায় ধর্ম্মালোক বিতরণ করাই ইঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল।

যদিও ভারতে সহস্র সহস্র স্থবির প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তথাপি বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাসে অপর কোন স্থবিরই উল্লিখিত ষোড়শ-স্থবিরের ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতীয় বৌদ্ধবিহারে প্রতিদিন উক্ত ষোড়শ স্থবিরের পূজা হইত। মহাযান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থবির-পূজার প্রথম সূত্রপাত হয়। তদনন্তর ভারতীয় শ্রমণগণ খোটান দেশে এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেন খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে

পোটান দেশ হইতে এই প্রথা চীনে আনীত হয়। চীন হইতে উহা ঐ সময়ে তিব্বতে প্রবর্ত্তিত হয়। পাগ্‌সাম জোন্‌জাঙ্‌ নামক সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় ইতিহাসের ৩২৭-৩৩০ পৃষ্ঠায় স্থবির-পূজার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে জানা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পোটানের এক জন নরপতি চীনসম্রাট থেজুঙ্‌ কর্ত্তৃক আহূত হন। তিনি চীন রাজধানীতে এক প্রকার নৃত্যাভিনয় দেখাইয়াছিলেন। উহাতে ষোড়শ-স্থবিরের অভিনয় হইত। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীজ্ঞান অতীশ বাঙ্গলা দেশ (বিক্রমপুর) হইতে তিব্বতে গমন করেন। তিনি ঞ্‌য়ে একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই স্থানে পরবর্ত্তী কালে ঙেঙিং বিহার প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং উহাতে ষোড়শ-স্থবিরের পূজা হইবে। আমি দিব্য চক্ষুতে এই স্থানে ষোড়শ স্থবিরের মূর্ত্তি দেখিতেছি।"

তিব্বতীয় ভাষায় ষোড়শ-স্থবিরকে নেতেন চুরুক বলে। তিব্বতের সর্ব্বোত্তম বিহারসমূহে অদ্যাপি মহা আড়ম্বরে নেতেন চুরুকের পূজা হয়। তথাপি নেতেন্ চুরুকের প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। দার্জ্জিলিঙ্, কাটামুণ্ডু, এমন কি, হ্লাসা নগরীতেও নেতেন্ চুরুকের মূর্ত্তি দুর্লভ। গ্যাংচি ও ঙেঙিং বিহার অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। এই হেতু গ্যাংচিতে নেতেন চুরুকের (ষোড়শ স্থবিরের) উৎকৃষ্ট প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। কর্ণেল য়েনন যে কয়েকটি মূর্ত্তি পাইয়াছেন, তাহা তিনি হস্তান্তরিত করিবেন না। তিনি ইংলণ্ডে নিজের গৃহে উহা সযত্নে রক্ষা করিবেন,—এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

৪। রথযাত্রা।

কা! কা! একটা কাক উষাকে অভিবাদন করিয়া, এবং আমার চতুর্দ্দিকে নিদ্রিত গলিত-দ্রব্যভোজী শত-সহস্র কাককে প্রথম সঙ্কেত জ্ঞাপন করিয়া, আমাকে জাগাইয়া দিল। এই গভীর খিলান-মণ্ডপের প্রতিধ্বনিকারী প্রস্তরবারণা,—ঐ অদ্ভুত বায়স-সঙ্গীতকে আরও যেন বাড়াইয়া তুলিল।

এই বায়সেরা মন্দিরেরই কুলঙ্গিতে বাস করে। কেন না, ইহারাও একটু পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। এই প্রতিধ্বনির বিরাম নাই—চতুর্দ্দিকেই উহার পুনরাবৃত্তি হইতেছে। মন্দিরের প্রস্তরময় বীথিগুলির শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং উচ্চ নিম্ন সমস্ত দালানে আমার চতুর্দ্দিকে, পাকচক্রাকারে ঐ শব্দ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অথচ কাকগুলা আমার নিকট অদৃশ্য। সমস্ত মন্দির এই কা-কা-রবে অনুরণিত। মন্দিরের পবিত্র ছায়াতলে যে সকল দেবতা বাস করেন—এই প্রাভাতিক অভ্যর্থনা-গীতি তাঁহাদের চিরপ্রাপ্য।

শেষ দীপটি পর্য্যন্ত নিভিয়া গিয়াছে। চন্দ্রমা আর কিরণ বর্ষণ করিতেছেন না। গতকল্য অপেক্ষা আজিকার রাত্রি এই মন্দিরে যেন আরও ঘনীভূত। শীঘ্রই প্রভাত হইবে—ইহা বুঝিবার জন্য বিহঙ্গ-সুলভ তীক্ষ্ণদৃষ্টির প্রয়োজন। মন্দিরের সানগুলি গোরস্থানের ন্যায় আর্দ্র, সেই জন্য শৈত্য-বিভ্রম উপস্থিত হইতেছে। কিছুই দেখা যায় না। কদাচিৎ এই একটি অপরিস্ফুট আলোকচ্ছটা,—যে অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন, তাহা অপেক্ষা কিছু কম অন্ধকার, এইমাত্র—এই এইটি ক্ষীণ রশ্মি, খিলান-মণ্ডলের বায়ুরন্ধ্র দিয়া ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিতেছে। [illegible] বিভিন্ন দিক্ হইতে, এই কা-কা-রবের সহিত পালকের 'ফরফর' শব্দ, ডানার 'ঝটাপট' শব্দ সংযোজিত হইল। এইবার কৃষ্ণবর্ণের পিণ্ডগুলি উড়িয়া যাইবে।

এইবার আলোক আসিয়াছে। এ দেশে আলোক যেমন শীঘ্র চলিয়া যায়, তেমনই আবার শীঘ্র আইসে; এত শীঘ্র যে নাট্যবিভ্রম বলিয়া মনে হয়। সুদূরপ্রসারিত স্তম্ভশ্রেণী পাণ্ডুর সজ্জায় অনুরঞ্জিত হইল;—উহা এত স্বচ্ছ যে মনে হয়, বুঝি দূরস্থ বস্তুর ছায়াপাত হইয়াছে। ধূসরবর্ণ পাতলা রেশমী কাপড়ের অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া, অ-করস্পৃশ্য বিবিধ শোভন ছবির ছায়াবাজি যেন দৃষ্ট হইতেছে! মন্দির-দালানের বিভিন্ন প্রকাণ্ড বিভাগগুলি নেত্রসমক্ষে প্রকাশিত হইল, দালানের চতুষ্পথগুলি শেষ প্রান্তে মিলাইয়া গেল। আমার পশ্চাদ্ভাগে, যেখানে গতকল্য সায়াহ্নে এক জন পুরোহিতের নিকট রথযাত্রা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম, সেই রোষদীপ্ত-বিকটাকার-জন্তু-চিত্রময় বীথিটিতে সেই জন্তুদের ছায়া-ছবি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। যে সকল নরমূর্ত্তি ভূতলে শুইয়া ছিল, সেই সকল মলমল-বস্ত্র-পরিহিত মূর্ত্তিগুলি খাড়া হইয়া উঠিল,—বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া, পশ্চাতে শরীর হেলাইয়া, যাতায়াত করিতে লাগিল। এই অবাস্তব, বর্ণহীন, ঐন্দ্রজালিক

দূরত্বের মধ্যে, এই [illegible] বদ্ধ মূর্ত্তিগুলির পক্ষসঞ্চারশব্দ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।

গতকল্য যে সারের উপর আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম, তাহার নিকটে একটা পাথরের সিঁড়ি মন্দিরের ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। একটু হাতড়াইয়া—ঠাণ্ডা দেওয়ালের উপর হাত বুলাইয়া সেই সিঁড়িটা খুঁজিয়া বাহির করিলাম।

ছাদের উপরে উঠিলাম। আমি এখন একাকী। গুরুভার, সমতল, খিলান-মণ্ডলের উপর এই ছাদ মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে। ইহা বড় বড় পাথরের চাকলা দিয়া বাঁধান। উহার দুই ধার প্রসারিত হইয়া দূরবর্ত্তী আকাশের জলদচূড়ায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। নিম্নতলের ন্যায় এখানেও ছায়াবাজির দৃশ্য;—আর একটি পাণ্ডুবর্ণের চিত্রাবলী। এখানে একটু ফরসা হইয়াছে, কিন্তু এখনও দিন হয় নাই। মন্দিরের অভ্যন্তরে যেরূপ সমস্তই অবাস্তব বলিয়া মনে হইতেছিল, এখানেও সেইরূপ মনে হইতেছে। এই বিস্তীর্ণ ময়দানের চতুর্দ্দিকে যে জলদ-চূড়াগুলি দেখা যাইতেছে, উহা বাষ্পরাশি বই আর কিছুই নহে;—রাত্রিকালে এই বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়াছে মাত্র। এই বাষ্পরাশি ঈষৎ নীল রঙের তুলা-ভরা গদীর ন্যায় এরূপ স্থূল যে মনে হয়, আর একটু নিকটে গেলেই উহাকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করা যাইতে পারে। সমস্ত ভূমি ঐ তুলারাশির মধ্যে এরূপ মগ্ন হইয়া আছে যে, কালো কালো কতকগুলা তালপত্রপুঞ্জ অথবা তালপত্রগুচ্ছ উহার মধ্য হইতে শুধু মাথা বাহির করিয়া আছে। ঐগুলি উচ্চতম তালবৃক্ষের চূড়াদেশ।

'সমুদ্রাভ মণি'র ন্যায় শঙ্খ—ঝিবা শোভন-স্বচ্ছ এক প্রকার হরিৎ আলোকে উদয়গিরির দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল; যেন তৈলের একটি ফোঁটা নৈশ-গগন-তটে মণ্ডলাকারে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইল। ও দিকে অস্তাচলদিগন্তে একটি স্থূল লোহিত গোলক অবসাদে ম্রিয়মাণ—একটি পুরাতন গ্রহ শ্রান্ত ক্লান্ত—একটি প্রাচীন জীবলোক পৃথিবীর অতিসান্নিধ্যবশতঃ ভয়ে আকুল;—ইনি অস্তমান চন্দ্রমা। এক্ষণে মন্দিরের সমস্ত কাকগুলা জাগ্রত হইয়া কা-কা রব করিতেছে। নিম্নদেশ হইতে আকাশের সর্ব্বদিক হইতে, যেখান দিয়াই উহারা চলিয়া যাইতেছে—ঐ কা-কা-ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে।

প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্যোদয়ের আর বড় বিলম্ব নাই। রথের চারিটা প্রকাণ্ড চাকা। টানিবার রশিগুলি ভূতলে বিছাইয়া রাখা হইয়াছে।

এইবার পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা—যে মশালধারাক্রান্ত ক্ষুদ্র গৃহে পূজা-অর্চনা করিয়া তাহারা রাত্রিযাপন করিয়াছিল, সেখান হইতে নামিয়া আসিল। তাহাদের সম্মুখে, অগ্রগামী এক দল বালক, ত্রিশিখা-বিশিষ্ট মশাল ধরিয়া আছে; এবং বাহিরে আসিয়া, উদীয়মান দিবালোক যেমন-যেমন বর্দ্ধিত হইতেছে, অমনই এক একটা করিয়া মশাল উহারা নিভাইয়া দিতেছে। এই বৃদ্ধ পুরোহিতেরা, এক এক জন করিয়া ক্রমান্বয়ে সেই বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ সোপানের উচ্চতম ধাপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল; এবং ধাপ হইতে ধাপান্তরে ক্রমশঃ যেমন নামিতে লাগিল, ঐ গূঢ়ধর্ম্মচারীদিগের শুক্লকেশ মুণ্ডিগুলি প্রভাতের তরুণ আলোকে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। যাহাতে স্বকীয় ইষ্টদেবের ত্রিশূল-চিহ্নটি আরও বিস্তৃতভাবে অঙ্কিত হইতে পারে, এই জন্য উহাদের ললাটের উপরিভাগ হইতে মস্তকের চূড়াদেশ পর্য্যন্ত মুণ্ডিত। পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে এমনই উদাসীন যে, উহারা প্রায় উলঙ্গ—একখণ্ড বস্ত্রমাত্র উহাদের গায়ে জড়ানো রহিয়াছে। বর্ণভেদের চিহ্ন-স্বরূপ, শোণের শুভ্র সূক্ষ্ম সূত্রগুচ্ছ জটা পাকাইয়া তির্য্যকভাবে বক্ষের উপর লম্বমান। মন্দিরাকৃতি সেই শোভা গৃহের জানলা ও রথ এই উভয়ের মধ্যে রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি পদ-সেতু—যাহার উপর দিয়া কিছু পূর্ব্বে স্বর্ণবিগ্রহটিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল—সেই সেতুটি এক্ষণে উঠাইয়া লওয়া হইল। এইবার এক দল কৃষ্ণকায় বাদক এরূপ সজোরে বাদ্য বাজাইতে লাগিল যে, কর্ণ বধির হইয়া যায়, এবং এই বাদ্য এরূপ বন্য-ভীষণ ও শোকভারাক্রান্ত যে, শুনিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। এক দল লোক ঢাক পিটিতেছে, অপর এক দল বিরাটাকার তুরী-সমূহ—সেই প্রচ্ছন্ন দেবতার অভিমুখে উত্তোলন করিয়া, উন্মত্ত প্রাণপণে ফুৎকার করিয়া অপার্থিব ধ্বনি বাহির করিতেছে।

রথ সাজানো হইয়াছে। চৌঘুড়ি গাড়ীর অশ্বচতুষ্টয়ের অনুকরণ করিয়া চারিটা বড় বড় কাঠের ঘোড়া রথের সম্মুখভাগে স্থাপিত হইয়াছে। এই তেজীয়ান যোবনীল পক্ষিরাজ ঘোড়াগুলি পা ও ডানার আস্ফালনে আকাশকে তাড়না করিতেছে। লাল রেশমের ছত্রযুক্ত যবনিকার মধ্যে বিগ্রহটি প্রচ্ছন্ন। বিগ্রহ-সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে 'ঝুলানো বাগিচা'র ন্যায় কতকগুলি পুষ্পিত কদলীবৃক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। রথের আড়ায়ে দুই তিন গজ লম্বা বৃহদাকার দোলক-সমূহ ঝুলিতেছে। স্বাভাবিক পুষ্প ও জরী জড়ানো পুষ্পমালা দিয়া এই দোলকগুলি রচিত। এই চক্রবিশিষ্ট অট্টালিকার সকল তলার উপরেই

এ সমস্ত ঢাকিয়া রাখিতে হইলে, হয় নিশার আবরণ আবশ্যক, নয় সুনিরীক্ষ্য মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দীপ্তপ্রভার প্রয়োজন। রথের বিলাস-সজ্জা নিতান্তই স্থূল ও নিতান্তই সেকেলে। হস্তীদের পরিচ্ছদ জীর্ণ ও বহু-ব্যবহৃত। যুবতী নর্ত্তকীদের মুখমণ্ডল ও কণ্ঠদেশের বিশুদ্ধ তাম্র-কান্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, উহাদের দীনহীন মলিন চীরবস্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ-ভারতের বার্দ্ধক্য ও অবনতি, এই সব অমানুষিক মূর্ত্তিশিল্পের অবসন্নতা, উহাদের উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ধূলিধূসর জীর্ণতা—এমন কি, এই মহাজাতির বর্ত্তমান জীবনটা—সমস্তই, এই ছলনাময় মুহূর্ত্তে, আমার নিকট অপ্রাতিবিম্বের বলিয়া মনে হইতেছে। অতীতের লোক—অতীতের ধর্ম্ম—এই উভয়েরই যুগান্ত যেন ঘুরিয়া গিয়াছে, উহারা শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

তথাপি এখানে বিদেশীয় ভাবের গন্ধমাত্র নাই। এই প্রাচীন সাজসজ্জার মধ্যে, আধুনিক কালের ছোটখাটো খুঁটি নাটি সামগ্রী প্রবেশ করিয়া ইহা বেসুরো বেখাপ্পা করিয়া তুলে নাই। বিধর্ম্মী একমাত্র আমিই এই উৎসব-অনুষ্ঠানের সহকারী। … … …

ফলতঃ এই সূর্য্যই এ দেশের মহা-ঐন্দ্রজালিক। সূর্য্যই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত পদার্থকে রূপান্তরিত করিয়া তুলে। সূর্য্যের এই আকস্মিক উদয়ে কি জানি কি একটু কারুণ্য-রস আছে, যাহা মন্দিরের সহিত—আজ যে দেবতার পূজা হইবে, সেই দেবতার সহিত—একতানে মিলিয়া যায়। দিগন্তে একটি-মাত্র মেঘখণ্ড। আমরা যে ধরণীর ধূলিকণাস্বরূপ—আমাদের দৃষ্টি হইতে এই মেঘখণ্ডটি সূর্য্যকে এখন পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছে। একটি ঘোর তাম্রবর্ণ কটিবন্ধের উপরিভাগে সূর্য্যদেব অগ্নিশিখা বিকীর্ণ করিতেছেন। বিষ্ণু দেবের ত্রিশূলচিহ্নের ন্যায় তিনটি অগ্নিশিখা প্রদীপ্ত। ইহারই মধ্যে এই প্রকাণ্ড অভ্রচূড়াগুলি সূর্য্যদেবের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। এই রক্তিমাভ পাষাণস্তূপগুলি—গগনচুম্বী মন্দিরগুলি দেব-মাহাত্ম্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল খোদিত প্রস্তরময় মূর্ত্তি-অরণ্যের মধ্যে, শুকপক্ষিগণের শত সহস্র নীড় রহিয়াছে। বিবিধ মুখভঙ্গি-অঙ্গভঙ্গি-বিশিষ্ট খোদিত মূর্ত্তির মস্তক ও বাহু জঙ্ঘার জটিল মিশ্রণের মধ্যে—সেই উচ্চ শূন্য দেশে উহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে—চীৎকার করিতেছে।

রথের শীর্ষদেশে, গিল্টিকরা কাজগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। এইবার যাত্রাকাল উপস্থিত। তূরীধ্বনি করিয়া যেই সঙ্কেত করা হইল, অমনই

পেশী-স্ফীত-বাহু শত-সহস্র লোক রজ্জুর নিকটে সার দিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত সুবর্ণ-শ্রেণী—এমন কি, উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও ভক্তি ও প্রীতি-সহকারে এই সাধারণ কার্য্যে যোগ দিল। এইবার রথ টানিবার উদ্যোগ হইতেছে। লোকেরা রমণী-সুলভ বিবিধ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতেছে। এই সকল ভাবভঙ্গীর সহিত উহাদের সেই সুদৃঢ় পৌরুষিক তেজ ও অঙ্গদেশের বিশালতা মিশ খাইতেছে না। উহারা স্কন্ধকেশভার উত্তোলন করিয়া, এবং বলয়-ভূষিত বাহু উত্তোলন করিয়া, কেশে দৃঢ় গ্রন্থি বন্ধন করিল।

পূর্ব্বকার সঙ্কেত। ঢাক ঢোল সঘোষে বাজিয়া উঠিল; সজোরে তূরীনাদ হইতে লাগিল; তাহার সহিত মানব-কণ্ঠ-নিঃসৃত মহা নিনাদ সম্মিলিত হইল; বাহুর পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইল;—রজ্জুগুলিতে টান পড়িল। কিন্তু এই বিরাটযন্ত্রটি একটুও নড়িল না। গতবর্ষের রথযাত্রার পর হইতে, উহা মূল মৃত্তিকার মধ্যে আবদ্ধ।

এক জন প্রধানের আজ্ঞাক্রমে, আরও ভাল করিয়া সমবেত চেষ্টা আরম্ভ হইল। এইবার বোধ হয়, আর কোন বাধা হইবে না। আরও অনেক লোক দৌড়িয়া আসিল; বক্ষোদেশে তুষার-শুভ্র-যজ্ঞসূত্রধারী বৃদ্ধগণ, তাহাদের শুভ্র হস্ত, এই রুক্ষ রজ্জুর সহিত সম্মিলিত করিল; জনতা হইতে একটা মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল; বাহু ও প্রকোষ্ঠের মাংসপেশী আরও দৃঢ় কঠিন হইয়া উঠিল। তবু কিছুই হইল না! রজ্জুগুলি সুদীর্ঘ মৃত ভুজঙ্গবৎ হতাশ হইয়া হস্ত হইতে ভূতলে স্খলিত হইল।

তথাপি উহারা বেশ জানে,—দেবতার রথ নিশ্চয়ই চলিবে। সহস্র বৎসর হইতে আবহমানকাল পর্য্যন্ত রথ অবাধে চলিয়াছে। যাহাদের বাহু এক্ষণে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, যাহাদিগের আত্মা বহুকাল-যাবৎ জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া, অথবা মায়াময় ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, বিশ্বাত্মার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে—সেই সব পূর্ব্বপুরুষের উত্তম চেষ্টায় রথ এতকাল চলিয়াছে!

রথ অবশ্যই চলিবে। রথ চলিবে বলিয়া বৃদ্ধ পুরোহিতদিগের ধ্রুব বিশ্বাস। সেই জন্য উহারা অবিচলিতভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদের সেই শান্তভাব; তাহাদের আত্মা ইহারই মধ্যে যেন [illegible] দেহ হইতে বিমুক্ত। এমন কি, হস্তীরা পর্য্যন্ত জানে যে, রথ চলিবে; তাই তাহারাও অতীব প্রশান্তভাবে অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের মনে যে চিন্তাপ্রবাহ চলিতেছে, আমাদের নিকট তাহা দুরবগাহ হইলেও, এই সব চিন্তায় তাহাদের

বৃহৎ অভিজ্ঞ পূর্ণ। তাহাদের মধ্যে যে হস্তী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সে বিলক্ষণ জানে, রথ এক সময়ে চলিবেই চলিবে। কেন না, তিন চারি পুরুষ হইতে বংশানুক্রমে, মানববাহকে রজ্জু ধরিয়া রথ টানিতে তাহারা দেখিয়াছে;—শত বৎসর হইতে এইরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

চলে এসো! আনো ফিক্না, আনো কপিকলের রসারসি; উঠাও চাড়া দিয়া! এক দল মুটিয়ার কাঁধে কতকগুলা কাষ্ঠের গুঁড়ি আসিয়া পৌঁছিল। একটা গুঁড়ির প্রান্তদেশে একটু ছিলকা উঠান; আবদ্ধ চাকাটির নীচে সেই প্রান্তভাগ স্থাপিত হইল; এবং গুঁড়ির উচ্ছ্রিত অপর প্রান্তের উপর অশ্বারোহীর ধরণে দশ জন লোক বসিয়া ঝাঁকারি দিতে লাগিল; ও-দিকে, কপিকলের রসারসি ও রজ্জুগুলিতেও এক সঙ্গে টান পড়িল। এইবার সেই পর্ব্বত-শিখর একটু নড়িল! একটা আনন্দের কোলাহল সমুত্থিত হইল;—রথ চলিল!

ভূমিতে চারিটা গভীর খাত খনন করিয়া রথচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে চলিল। অক্ষদণ্ডের আর্তনাদ, নিষ্পেষিত কাষ্ঠের কাতরধ্বনি, মনুষ্যকণ্ঠের কোলাহল ও পবিত্র তূরীর ঘোর নিনাদ যুগপৎ সমুত্থিত হইল। শিশু-সুলভ আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইল; সমস্ত আস্ত-বিবর উদ্ঘাটিত হইল; জয়ধ্বনি করিবার জন্য সমস্ত অশুভ্র দন্তপাতি বিকশিত হইল; সমস্ত বাহু শূন্যদেশে উৎক্ষিপ্ত হইল; এই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া লোকেরা রজ্জুতে টান্ দিতে বিস্মৃত হইল;—রথ থামিল! সমবেত আকর্ষণের প্রথম আবেগে, প্রায় ত্রিশপদ অগ্রসর হইয়াছিল, আবার রথ ভূমিতে অনড় হইয়া পড়িল। হস্তীরা রথের পিছনে পিছনে আসিতেছিল, রথ সহসা থামিয়া যাওয়ায়, উহাদের পরস্পরের মধ্যে ঠেকাঠেকি হইতে লাগিল। আবার সমস্ত গোড়া হইতে আরম্ভ হইল।

কিন্তু এবার শৃঙ্খলার সহিত আরম্ভ হইল। লোকেরা কপিকলের রসারসি, ফিক্না-আদি আনিতে গেল। এই অবসরে, রমণীগণ পুরোহিত-জনতার মধ্যে তাড়াতাড়ি আসিয়া—এমন কি, নিরীহ হস্তিগণের প্রায় পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্ণবিগ্রহের গুরুভারে, ভূতলে যে রথ্যা খনিত হইয়াছে, তাহা চুম্বন করিবার জন্য তাহাদের এই উৎসুক আগ্রহ। এই সময়ে সৌর-কর মন্দির-চূড়া হইতে নামিয়া আসিয়া জনতার উপর পতিত হইল, এবং উহাদিগকে নবতর শোভায় সজ্জিত করিল। অনাবৃত বাহুতে ধাতব বলয় ঝক্মক্ করিতেছে; রমণীগণের মুখমণ্ডলে, শলাকা-বিদ্ধ নাসিকাপুটে, হীরা-

মাণিক্যের ভূষণ ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে, অতিসূক্ষ্ম রঙ্গিন্ মল্‌মল্ অথবা জরীর পাড়-বিশিষ্ট মল্‌মলের ভিতর দিয়া মীনাক্ষী শিবানীর বক্ষের ন্যায় নির্ম্মল কণ্ঠদেশ দেখা যাইতেছে।

এইবার এই বিরাট যন্ত্রটি দমকে-দমকে ভীষণ বেগে চলিতেছে। মাধ্যে-মধ্যে থামিতেছে—আবার চলিতেছে।

এই গতিক্রিয়া ও পৈশিক বলের উদ্দাম বিলাস-লীলা দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া চলিবে। এই যাত্রাপথের পশ্চাদ্‌ভাগে, ভূমি যেন শত শত হলের দ্বারা কর্ষিত হইয়াছে—সেই ভূমি, যাহা প্রাতঃকালে যেন 'রোলার' যন্ত্রে সমীকৃত হইয়াছিল, এবং শুভ্র নক্‌সা-চিত্রে ও সুষমান্বিত কুসুমসমূহে বিভূষিত হইয়াছিল।

যেখানে বীথির বাঁক ফিরিয়াছে, এবং সে দিকে রথটিকেও ফিরাইতে হইবে, সেই মন্দিরের কোণে রথ আসিয়া যখন অনেকক্ষণ থামিল, সেই অবসরে এক জন প্রদর্শক ও এক জন ব্রাহ্মণকে লইয়া, একটু নিস্তব্ধতা ও মুক্ত বায়ুর অন্বেষণে—সেই বৃহৎ দালানের জটিল অরণ্য- সেই সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপ-শালা—সেই তমসাচ্ছন্ন অসংখ্য পার্শ্ব-দালানের উদ্দেশে—মন্দিরের সেই বিশাল বিস্তীর্ণ ছাদের উপর আবার আরোহণ করিলাম। প্রভাতে যেরূপ মরুবৎ শূন্য দেখিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ। কিন্তু সন্ধ্যা নাটিকার সূর্য্যালোকে এই স্থানটি আরও ভগ্নপ্রায়—আরও দীনভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। রক্তিম-ধূসরবর্ণ;—কালোৎপন্ন বলি-রেখার ন্যায় সর্ব্বত্র ফাট ধরিয়াছে—চীড় পড়িয়াছে। এখনও যথেষ্ট প্রভাত, সূর্য্য এখনও যথেষ্ট নিম্নে; এই ছাতের উপর এখনও বেশ বসা যায়, এমন কি, এই সব অমসৃণ মন্দির-চূড়ার দীর্ঘ-প্রক্ষিপ্ত ছায়াতলে দিবা আরামে শয়ন করাও যায়।

এই ছাদ, 'ষ্টেপ' নামক রুশিয়ার অধিত্যকা ভূমির ন্যায় সুবিস্তীর্ণ। কিনারায়, বাদুড়ের ডানা-যুক্ত কতকগুলি পুরাতন ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি স্বকীয় চরণযুগল দর্শন করিবার জন্যই যেন বহির্দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই,—সমস্তই সমতল। জীর্ণ শীর্ণ সুধা-প্রলেপ দেবমূর্ত্তি-সমন্বিত মন্দিরচূড়া ভিন্ন এখানে আর কিছুই নাই;—চূড়াদিগের মধ্যে এক একটা বিস্তৃত ব্যবধান-পরিসর। সমতল ছাদ হইতেও চূড়াগুলি সুদূরে অবস্থিত;—মন্দিরের আয়তন এতই বৃহৎ।

ইতস্ততঃ, খাতের আকারে কতকগুলি বিচরণভূমি, এখান হইতে দৃষ্টি-

গোচর হইতেছে। জনসাধারণ মণ্ডপশালা-সমূহের মধ্যে—কোনরূপ প্রকারে যেন জাদুবলে বাজাইয়া এই চিত্রলভূমি রচিত হইয়াছে। উহার মধ্যে যেটি সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, তাহাতে বটবৃক্ষ রোপিত;—সেই বটবৃক্ষের সবুজ শাখাগুলি ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, এবং তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। মন্দিরের যে কালটি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র—সেই ভীষণ গুপ্তস্থান—সেই দুরধিগম্য তমসাচ্ছন্ন সকেত-গুপ্ত-স্থানকে বেষ্টন করিয়া এই চিত্রলভূমিটি অধিষ্ঠিত।

প্রাচীরের মাথায় যে সকল ছোট-ছোট দেবমূর্ত্তি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, তাহারা বোধ হয় এই রথযাত্রা দেখিবার জন্য সমুৎসুক। কিন্তু আমি এখান হইতে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না—কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। নিম্নদেশের চটুল গতিবিধি আমার নিকট প্রচ্ছন্ন; এমন কি, নিকটস্থ নগর, গৃহ, মার্গ, সমস্তই আমার নিকট প্রচ্ছন্ন। আমার এই শূন্য মরুক্ষেত্র—সেই তাল-অরণ্যের সংলগ্ন বলিয়া মনে হইতেছে, যাহার চূড়াগ্রভাগ দিগন্তকে নীলিম করিয়া তুলিয়াছে।

আমার এই দুর্নিরীক্ষ্য প্রজ্বলন্ত আকাশ-খণ্ডে, কাক চীল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে সবুজ টিয়া-পাখীগুলা উড়িয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্র টিকটিকি গিরগিটি বিচরণ করিতেছে। যে কাঠবিড়ালী ভারতের সমস্ত ভগ্ন মন্দির—সমস্ত বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে—তাহারা পরস্পরের অনুধাবন করিতেছে; পবিত্র প্রস্তররাশির মধ্যে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। এখানে নিঝুম নিস্তব্ধতা। এই দেবমূর্ত্তি-সমন্বিত অদ্ভুতাকৃতি চূড়াগুলি আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে,—চূড়াগুলি এত অদ্ভুত ও এত উচ্চ যে, ইহা বাস্তুনির্ম্মাণ-পদ্ধতি-বিষয়ক য়ুরোপীয় সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধ। এই চূড়াগুলি ব্যতীত এখানে এমন আর কিছুই নাই, যাহা আমার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে। কিন্তু এই চূড়াগুলির নিস্তব্ধতা অনন্ত অসীম!

এই গগন-বিহারী মরুদেশের ছায়াতলে, শান্তি-আরামে এক ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। আমার প্রদর্শক ও ব্রাহ্মণ এই কবোষ্ণ পাষাণের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ....

নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টিবিভ্রম বা ঘূর্ণি-রোগ উপস্থিত! ...... ঐ অদূরে একটা চূড়া...... ...... এইমাত্র নড়িয়া উঠিল...... ......ঐ যে, আবার চলিতেছে!

মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইলাম, পরে দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্ত বুঝিলাম। ওহো! রথের চূড়াটিও মন্দির-চূড়ার অনুকরণে নির্ম্মিত। আমা হইতে

মহাপুরুষ, মন্দিরের সম্মুখ দিয়া রথটাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি যেখানে আছি, তাহারই নীচে, অসংখ্য মনুষ্য, উন্মত্ত জনতা, হস্তিযূথ, মহাধ্বনি— সমস্তই যেন একটা স্রোতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। যে সিংহাসনের উপর অদ্ভুত বিগ্রহটি আসীন, তাহারই উপরিস্থ চূড়াশিখর আমি দেখিতে পাইতেছি। কোনও জয়ধ্বনি কিংবা কোনও বাদ্যনির্ঘোষ শুনা যাইতেছে না। বিশ্বরথের এই শেষ প্রতিবিম্ব আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। [illegible] পার দিয়া, প্রস্তররাশির মধ্যে যেন একটি মন্দির-চূড়া একাকী নিঃশব্দভাবে আপনা-আপনি চলিতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভবভূতি ও কালিদাস।

এক জন ভাবুক ইংরেজ সমালোচক শেক্সপীয়র ও মিল্টনকে অচলপ্রতিম ইংরাজী-সাহিত্যের যুগল স্বর্ণচূড়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিকবিগণের কথা ছাড়িয়া দিলে, কালিদাস ও ভবভূতিকেও সেইরূপ মহাগিরিসন্নিভ সংস্কৃত লৌকিক সাহিত্যের যুগল স্বর্ণচূড়া বেশ বলা চলে।

আমাদের দেশের পণ্ডিতসম্প্রদায়ের অবশ্য ধারণা অন্যরূপ। তাঁহারাও কালিদাসকে শ্রেষ্ঠ কবি বলেন; কিন্তু তাঁহারা ভবভূতিকে কালিদাসের সমান আসনে না বসাইয়া ভারবি, মাঘ ও নৈষধকার শ্রীহর্ষকে ঐরূপ সম্মান দেখাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরম্পরাগত যে শ্লোকত্রয় * প্রচলিত আছে, তাহা বোধ হয় অনেক পাঠকেরই পরিচিত। ভবভূতি শুধু নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোনও কারণেই হউক, 'পণ্ডিত'-সম্প্রদায় তাঁহাকে বড় আমলে আনেন নাই। কিন্তু রুচিপ্রকৃতি ও বিচার-

* (১) কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ।

(২) উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ।

(৩) তাবদ্ভা ভারবের্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ।

পরিচয় ইয়োরোপীয়লিখিত আখ্যানের ও এই পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ একটা প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। এ অবস্থায় তাঁহাদের বিবেচনার সহিত আমাদের বিবেচনা মিলিবে না, ইহাতে কিছুই বৈচিত্র্য নাই। আমরা কালিদাস ও ভবভূতিকেই সংস্কৃতসাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিব। একের ভাষার অসাধারণ লালিত্য ও ভাবের অতুলনীয় মাধুর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে, অপরের ভাষার অসাধারণ গাম্ভীর্য্য ও ভাবের বিরাট্ উদাত্ত আমাদের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। উপরন্তু, ভবভূতির নাটকত্রয়ে যে 'করুণাদ্ভুতরস' দেখিতে পাই, তাহা কালিদাসাদির কাব্য নাটকেও নিতান্ত বিরল।

যাহা হউক, আজ আমরা উভয় কবির তুলনায় সমালোচনা করিতে বসি নাই। ভবভূতির নাটক যে মর্ম্মস্পর্শী করুণ রস ও বিস্ময় ভক্তির উদ্রেককারী উদাত্ত ভাবে (Sublimity) অতিষিক্ত আছে, তাহার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাই, এমন সামর্থ্য, এমন সাহস আমাদের নাই। কালিদাস ও ভবভূতির মধ্যে যে একটা চরিত্রগত প্রভেদ সকল পাঠকের চোখে পড়ে, তাহা লইয়া দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

রঘুবংশের প্রারম্ভে ও শকুন্তলা নাটকের প্রস্তাবনায় কালিদাস বিশেষ সৌজন্য ও বিনয়ের পরিচয় দিয়াছেন। পক্ষান্তরে, ভবভূতি তাঁহার নাটকত্রয়ের প্রস্তাবনায় একটা উৎকট দম্ভ ও অনধিকারী দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের প্রতি একটা প্রবল অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে ভবভূতির অহঙ্কার ও স্পর্দ্ধার বাক্যগুলি পড়িয়া তাঁহার উপর বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন, এবং কালিদাসের বিনয় ও সৌজন্যের সহিত তুলনা করিয়া বিরক্তি ও অশ্রদ্ধার মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলেন। হয় ত এই কারণেই 'পণ্ডিত'-সম্প্রদায় তাঁহার তাদৃশ আদর করেন নাই। কেন না, যে ব্যক্তি নিজের প্রতিভার, নিজের কৃত কর্ম্মের বড়াই করে, সংসারের দস্তুর তাহাকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য প্রশংসা দিতেও নারাজ হয়; তাহার অহঙ্কারের এইরূপ শাস্তি না দিয়া থাকিতে পারে না। বাস্তবিকই কালিদাস ও ভবভূতির মধ্যে এই প্রভেদটি বড়ই বিসদৃশ ঠেকে। কিন্তু, এই প্রভেদের প্রকৃত নিদান কি, ইহা একবার বিচার করিয়া দেখিলে হয় না?

ভবভূতির নাটকত্রয়ের প্রস্তাবনা কয়েকটি পড়িলে, প্রাচীন যুগের নিষ্ঠাবান্ জ্ঞানদৃপ্ত তেজস্বী 'ব্রাহ্মণপণ্ডিত'-চরিত্রের একটি পরিস্ফুট চিত্র সম্মুখে দেখিতে পাই। শকুন্তলায় দেখিয়াছি, যখন মহিলাযোগ্য নগরের অমরশক্তি

[illegible] রাজা [illegible] পুত্রগণের নীতিশিক্ষা ও চরিত্রসংশোধনের জন্য [illegible] কিছু [illegible] অনুরোধ করিলেন, এবং তাঁহাকে [illegible] প্রস্তাব করিলেন, তখন সেই [illegible] উত্তর করিলেন, 'আমি অর্থ লইয়া বিদ্যা বিক্রয় করিব না।' তিনি আরও আস্ফালন করিয়া বলিলেন, 'যদি ছয় মাসের মধ্যে আপনার পুত্রদিগকে নীতিশাস্ত্রপারগ না করিয়া দিতে পারি, তবে আমার নাম বদলাইয়া ফেলিব!' কি দারুণ তেজ! কি উৎকট দম্ভ! কি গভীর আত্মবিশ্বাস! ভবভূতিও এই জাতের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ নিভৃতে একাগ্রমনে অনন্যকর্ম্মা হইয়া অধ্যয়ন করিতেন, নিজের বিদ্যার ও প্রতিভার প্রভাবে নিজেকে [illegible] করিয়া তুলিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ মনে মনে নিজের গৌরব অনুভব করিতেন; কখনও সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিতেন না, কখনও অর্থের বা যশের প্রত্যাশায় লালায়িত হইয়া ধনীর তোষামোদে রত হইতেন না। এই জন্য তাঁহার চরিত্রে একটা তেজস্বিতা ও কঠোরতা দেখিতে পাই।

পক্ষান্তরে, কালিদাস স্ফূর্ত্তিশীল ও মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। সর্ব্বদা রাজন্যবর্গে ও অভিজাতবর্গের সংসর্গে থাকিয়া তাঁহার রীতিপ্রকৃতি ও চালচলন মার্জ্জিত ও সংযত হইয়াছিল। কালিদাসের চরিত্রে ও রচনায় যে বিনয় ও সৌজন্য দেখা যায়, বোধ হয়, আমরা এতক্ষণে তাহার কারণ স্থির করিতে পারিয়াছি। নিজের বিদ্যা জাহির করা যে একটা রুচিবিগর্হিত ব্যাপার, ইহা কালিদাস মার্জ্জিতরুচি অভিজাতবর্গের সংসর্গে বসবাস করিয়া বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহার ভাষায় কোথাও বাহাদুরীর চেষ্টা বা জাঁকের চিহ্ন দেখা যায় না। আরও এক কথা, কালিদাসের কবিত্বশক্তিলাভ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাতে অন্ততঃ এটুকু সত্য থাকিতে পারে যে, তিনি অবিরত অধ্যয়ন করিয়া কঠোর সাধনার বলে পণ্ডিত ও কবি হইয়া পড়েন নাই; দৈবশক্তিতে, সরস্বতীর বরে, অর্থাৎ নৈসর্গিক প্রতিভার বিকাশে, তিনি ভাবুক ও কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। এরূপ লোকের মনে ও মুখে অহঙ্কার স্থান পাইতে পারে না।

সেক্ষপীয়রের সঙ্গে কালিদাসের তুলনা করা একটা 'ফ্যাশান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যদি সেই তুলনার অবতারণা করি, তবে সেটা বোধ হয় [illegible] অসঙ্গত হইবে না। সেক্ষপীয়রেরও [illegible], সৌতাম্পটন্ প্রভৃতি

অভিজ্ঞজনসমূহের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহাদের সংস্পর্শে শেক্ষপীয়রের রুচি মার্জ্জিত হওয়াতে তাঁহারও নাটকসমূহে কোনওরূপ অহঙ্কারের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনিও অবিরত অধ্যয়ন করিয়া অগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন নাই; নৈসর্গিক প্রতিভার বিকাশেই শ্রেষ্ঠ কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাই তাঁহার রচনার কোথাও জাঁকের চিহ্ন দেখা যায় না। তাঁহার সমসাময়িক নাটককার বেন্ জনসনের সহিত তাঁহার তুলনা করিলেই, আত্মাভিমান ও বিনয়ের এই প্রভেদ বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

কালিদাস নিজের অনন্যসাধারণ প্রতিভার অস্তিত্ব যে একেবারেই জানিতেন না, বা বুঝিতেন না, এমন নহে। তবে তিনি শিক্ষা ও সহবতের গুণে সেই ভাবটা চাপিয়া রাখিতে পারিতেন। তাই সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, নিজের চেষ্টাকে বামন হইয়া চাঁদে হাত, খুঁড়িয়ে বড় গাঁতে যাওয়া, ভেলায় চড়িয়া সমুদ্র পার, ইত্যাদি ভাবে খাটো করিয়া দেখাইয়াছেন, সূত্রধারের মুখ দিয়া 'আপরিতোষাদ্ বিদুষাম্' বলিয়া সভা মাৎ করিয়াছেন। কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, কালিদাসও যে নিজের আদর বুঝিতেন না, এমন নহে, তাহার প্রমাণ ঐ শ্লোকেই রহিয়াছে,—'বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ'। অথচ এমন কায়দা করিয়া কথাটা বলিয়াছেন যে, উহা সহজে ধরা পড়ে না, এবং উহাতে কাহারও মনে তাঁহার অহঙ্কারের জন্য বিরক্তির উদ্রেক হয় না।

কিন্তু ভবভূতি রাজসভাসুলভ ভব্যতার ধার ধারিতেন না, সভাসমাজের আদব কায়দা জানিতেন না, শিষ্টতার কেরকার বুঝিতেন না, তাই মনের অহঙ্কার মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন। সেই অধ্যয়নরত 'ব্রাহ্মণপণ্ডিত' সমাজে সাধারণ লোকের সঙ্গে বড় একটা মিশিতে পারিতেন না, সাধারণ লোকের সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধিতে, জ্ঞানে ও প্রতিভায়, তাঁহার কতটা তফাৎ, তাহা বেশ পদে পদে অনুভব করিতেন, সুতরাং একটা উৎকট অহঙ্কারের ভাব মনে মনে পোষণ করিতেন। সংসারে এক এক জন নিভৃতবাসী recluse প্রকৃতির লোক আছেন, তাঁহারা মিশুক বা সামাজিক প্রকৃতির নহেন। তাঁহারা সংসারের লোকের সঙ্গে বনিবনাও করিয়া থাকিতে জানেন না। ইঁহারা প্রায়ই সাধারণের প্রিয় পাত্র হইতে পারেন না। সংসার ইঁহাদিগকে আগু বাড়াইয়া গিয়া আদর অভ্যর্থনা করে না। কাজেই ইঁহাদিগের আত্মাভিমানে ঘা লাগে। ইঁহারা যে নিজের চরিত্রের বিশেষত্বের দরুণ লোকসমাজে পূর্ণমাত্রায় আদর

পান না, এ কথা ভুলিয়া যান, এবং কতক রাগে, কতক দুঃখে, কতক অভিমানে বলিয়া ফেলেন, আমাকে কেহ চিনিল না। ভবভূতির কথায় ও কার্য্যে আমরা এই ভাবটা বেশ দেখিতে পাই। তিনি স্বীয় বিদ্যাবত্তার প্রতি হতাদর সংসারের লোকের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে রচনায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞান, অতুল শব্দৈশ্বর্য্য ও প্রকৃত কলাকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। পাছে কেহ তাঁহার রচনার এই সকল গুণ ধরিতে না পারে, সেই আশঙ্কায় প্রস্তাবনায় সেগুলির প্রতি দর্শক ও পাঠকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।* তিনি ভরতমুনির আমল হইতে প্রচলিত বাঁধাধরা নাট্যকৌশলের উপর নির্ভর না করিয়া নিজে একটা নূতন পথ ধরিয়াছেন, নাট্যসাহিত্যে নূতন ও শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রবর্তন করিয়াছেন,† তজ্জন্য সমগ্র জগৎ তাঁহার স্তুতিবাদ করুক, এরূপ একটা আশা তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। আপনারা হয় ত এ সব দেখিয়া শুনিয়া হাসিবেন, কবির জাঁকের কথা পড়িয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়িবেন, তাঁহার ন্যায্য

---

* বীরচরিতের প্রস্তাবনায় :-

বপ্ৰারম্ভঃ কবেঃ কাব্যং সা চ রামাশ্রয়া কথা।
...
মহাপুরুষসংরম্ভো যত্র গম্ভীরভীষণঃ
প্রসন্নকর্কশা যত্র বিপুলার্থা চ ভারতী॥
অপ্রাকৃতেষু পাত্রেষু যত্র বীরঃ স্থিতো রসঃ।
ভেদৈঃ সূক্ষ্মৈরভিব্যক্তৈঃ প্রত্যাধারং বিভজ্যতে॥

* মালতীমাধবের প্রস্তাবনায় :—

যদ্বেদাধ্যয়নং তথোপনিষদাং সাংখ্যস্য যোগস্য চ
জ্ঞানং তৎকথনেন কিং নহি ততঃ কশ্চিদ্গুণো নাটকে।
যৎ প্রৌঢ়ত্বমুদারতা চ বচসাং যচ্চার্থতো গৌরবং
তচ্চেদস্তি ততস্তদেব গমকং পাণ্ডিত্যবৈদগ্ধ্যয়োঃ॥

ভূম্না রসানাং গহনাঃ প্রয়োগাঃ
সৌহার্দহৃদ্যানি বিচেষ্টিতানি
ঔদ্ধত্যমায়োজিতকামসূত্রং
চিত্রা কথা বাচি বিদগ্ধতা চ॥

উত্তরচরিতের প্রস্তাবনায় :—

যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্বশ্যেবানুবর্ত্ততে।
উত্তরং রামচরিতং তৎপ্রণীতং প্রযুজ্যতে॥

† স্থানান্তরে ভবভূতির কলাকৌশল ও নাটকীয় আদর্শের আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

নাই। এখানে সুরটা একটু নরম; কিন্তু এখানেও চাপা গলার [illegible] কাতরোক্তি ফুটিতেছে। এখানেও সেই 'অলৌকিক মহত্ত্বাভিব্যক্তে'র কথা; এখানেও সেই [illegible] মৃদু [illegible],—

[illegible]।
[illegible] ॥

এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী শ্লোকে সীতাদেবীর অকলঙ্ক চরিত্রের সঙ্গে কবির অতুলনীয় প্রতিভার যে একটা তুলনা ধ্বনিত হইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায়, কবির আত্মপ্রতিভার উপর বিশ্বাস কত দৃঢ় ও গভীর। ইহা ঐশ্বর্য্যগর্ব্বস্ফীত রাজকবি শ্রীহর্ষ ও শূদ্রকের শূন্যগর্ভ আত্মশ্লাঘা নহে, ইহা বংশগৌরব ও আর্য্যমর্য্যাদারূপ পাষাণস্তম্ভদ্বয়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের এই সামাজিক অধঃপতনের দিনেও আধুনিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজ হইতে এই মর্য্যাদা ও আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান আজও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিল্পী।

১

বহু শিল্পী বহু-যত্নে রাজার আদেশে
বিরচিল প্রাসাদ নূতন ;
মর্ম্মরপ্রাচীর 'পরে ফুল ফুটে, ফল ধরে,
কত চিত্র, কত মূর্ত্তি বাস্তবের বেশে
শোভা পায়—নয়নরঞ্জন !
অলিন্দে স্তম্ভের সারি চিত্রবেশ নরনারী—
নয়নে করুণা, ঈর্ষ্যা, প্রণয় চঞ্চল,
শিলায় রেখেছে ধরি' স্থির—অবিচল।

২

পশ্চিমে চঞ্চল সিন্ধু মেঘে, রবিকরে
ধরে নিত্য বিচিত্র বরণ :
তরঙ্গকল্লোল-ছলে পুর-বাতায়নতলে
জাগাইতে পুরজনে তূর্য্যধ্বনি করে
নিশাশেষে—গম্ভীর গর্জ্জন।
দক্ষিণে প্রাসাদ-দ্বার আয়স কপাটে তার
তীক্ষ্ণধার শত শূল মৃত্যুবাণ প্রায়।
পূর্ব্ব দিক সুরক্ষিত সপ্ত পরিখায়।

৩

উত্তরে উন্নত শৈল এসেছে নির্ভয়
কল্লোলিত-সাগর-ভিতর ;
পাষাণ-চরণে তা'র ঊর্ম্মিঘাত অনিবার,
ফিরে ব্যর্থ-বেগ ঊর্ম্মি ক্রোধে ফেনময় ;
কলকল উঠে নিরন্তর।
তারি পার্শ্বে পথ কাটি', ভাঙ্গি' শিলা, খুঁড়ি' মাটি
আসিয়াছে বহুদূরে সাগরের জল—
স্বপ্নগত-ঊর্ম্মিবেগ—ঈষৎ চঞ্চল।

৪

অদূরে সমুদ্রগর্ভে অনন্ত প্রস্তর
ঊর্ম্মিঘাতে ডুবিয়াছে শির

১৯

গভীর রজনী যবে, সুপ্ত পুরজন,
শয্যা ত্যজি' উঠিল কুমারী :
নিম্নতলে অবতরি' বহু কক্ষ পরিহরি'
করিল গোপন দ্বারে অর্গল-মোচন ;—
পুরোভাগে শোভে সিন্ধুবারি।
চলিলা উত্তর মুখে যেথা স্থির বারি-বুকে
শোভে ক্ষুদ্র তরীখানি মরালীর প্রায়,—
পদতলে রক্ত ঝরে, ফিরিয়া না চায়।

২০

তরীতে উঠিলা বালা, খুলিলা শৃঙ্খল,—
তরী ভাসি' চলিল সাগরে।
তখন সাগর নীরে মেঘ উঠে ধীরে ধীরে,
ধীরে কাণাকাণি করে তরঙ্গ চঞ্চল,
হাসিয়া লুটায় বেলা 'পরে।
ভাসায়ে তরণীখানি উর্ম্মিদল দিল আনি
শিলাকূলে—কারাগার উর্দ্ধে শোভা পায়।
তরী বাঁধি' রাজবালা উঠিলা শিলায়

২১

প্রহরী নিদ্রিত দ্বারে ;—পশিলা কুমারী ;
রুদ্ধ দ্বার হেরিলা সম্মুখে ;—
মোচন-কুঞ্চিকা ধরি' ধীরে দ্বার মুক্ত করি
বিস্তৃত প্রাঙ্গন মাঝে প্রবেশিলা নারী ;
সুদৃঢ় সঙ্কল্প জাগে মুখে।
লৌহ-দণ্ড ব্যবধানে কক্ষে কক্ষে দৃষ্টি হানে,
দীপালোকে এক কক্ষে নেহারিলা শেষে,—
বসি' নিশি জাগে শিল্পী দীন বন্দিবেশে।

২২

কুমারী ডাকিলা তা'রে মুক্ত করি' দ্বার ;—
উঠিল সে মন্ত্র-মুগ্ধ প্রায় ;—
প্রাঙ্গন হইয়া পার, ছাড়ায়ে উত্তর দ্বার—
আসিলা শিলার কূলে, যেথা পারাবার
তরীখানি কৌতুকে নাচায়।
দৃঢ় পদে তরী'পরি দোঁহে আরোহণ করি
মুক্ত করি' দিলা তা'র শৃঙ্খল-বন্ধন।
নাহি লক্ষ্য কোথা তরী করিবে গমন।

২৩

তৎক্ষণে লুপ্তসুপ্তি রক্ষিগণ চায়,—
বন্দী লয়ে কে যায় রমণী !
যদি সে মানবী হ'বে কেমনে পশিল তবে
জলধি-রক্ষিত এই দুর্গম কারায়—
ধূলি সম প্রাণ তুচ্ছ গণি' ?
মুক্ত কারাগার দ্বার ! চাহে সবে বারবার ;
তরণী ভাসা'ল শেষে তরী লক্ষ্য করি' ;
তরীর পশ্চাতে ছুটে তীরবেগে তরী।

২৪

তখন উঠেছে জাগি' সুপ্ত পারাবার,
তরঙ্গে ফুটিছে ফেনরাশি ;
কুমারী তরীর 'পরে পরুষ-পবন-ভরে
চঞ্চল অঞ্চল উড়ে, কৃষ্ণ কেশ ভরি।
রক্ষিদল ধরে বুঝি আসি' !
জলদে ঢাকিল ইন্দু, গর্জ্জিয়া উঠিল সিন্ধু ;
ডুবে তরী ; এক সাথে ঢাকে সিন্ধুবারি
অতলে—তরুণ শিল্পী, রাজার কুমারী।

বর্ম্মা।

ইতিহাস ও সামাজিক রীতি নীতি।

ইতিহাস পড়িয়া দেখা যায়, প্রায় সকল পুরাতন দেশের অধিবাসীদেরই ধারণা যে, তাহারা দেবতা হইতে উৎপন্ন, আর সে দেশের রাজবংশ স্বয়ং ঈশ্বরের অংশ-সম্ভূত। জাপানের এইরূপ বিশ্বাস,—পুরাকালে দুই দেবযোনি—ভাই-ভগিনী—স্বর্গ হইতে সেতুপথে জলময়ী পৃথিবীর জলকল্লোল দেখিতে আসিয়াছিলেন। ভগিনীর মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া জলে পড়িল, আর জাপান দ্বীপ সৃষ্ট হইল। সেই দ্বীপে ভাই ভগিনী স্ত্রী-পুরুষ-ভাবে রহিয়া গেলেন। এই হইতেই জাপানের রাজবংশের আরম্ভ। চীনেদেরও কতকটা এইরূপ ধারণা। সে কথা চীন প্রবন্ধে পরে বলিব। কিন্তু বর্ম্মার রাজবংশের উৎপত্তি এরূপ দেবযোনি হইতে নহে। তাহাদের রাজবংশ ও শাক্যসিংহ একই জাতি সম্ভূত।

বুদ্ধদেবের অনেক শতাব্দী পূর্বে শাক্যবংশের কোনও রাজা আসিয়া বর্ম্মায় রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। আর বুদ্ধদেবের পাঁচগাছি চুল লইয়াই রেঙ্গুনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রের মতানুসারে, তাহারা ব্রহ্ম হইতে সকলের উৎপত্তির কথা বিশ্বাস করে। তাই তাহারা নিজেরা 'ব্রহ্মা' বা 'বর্ম্মা' নাম লইয়াছে।

বর্ম্মা দেশের লোক বুদ্ধগতপ্রাণ। হিন্দুস্থান তাহাদের চক্ষে বড়ই পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের দেবতার লীলাভূমি, তাহাদের বড় তীর্থ স্থান। অনেক বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করিতে আসে। রেঙ্গুনের যে বড় প্যাগোডার কথা বলিয়াছি, তাহা বুদ্ধদেবের পবিত্র পাঁচ গাছি চুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুই জন বণিক ভারতবর্ষ হইতে স্বয়ং বুদ্ধের নিকট হইতে ঐ পাঁচগাছি চুল চাহিয়া আনিয়াছিল। ঐ মন্দির স্থাপন হইতেই রেঙ্গুনের আদি উৎপত্তি। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'আলাম্প্রা' নামক এক জন রাজা রেঙ্গুনের আসল ভিত্তির স্থাপন করেন।

আলাম্প্রা এক জন সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। বনে বনে শিকার করিয়া জীবনযাপন করিতেন। পরে অনেক লোকের নেতা হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ করেন। যেখানে অভিযান করেন, সেইখানেই জয়ী হয়েন। তখন বর্ম্মা দেশ ছোট ছোট নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেখানকার রাজারা

রাজবংশের ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি অনেক আত্মীয় স্বজনকে গুপ্তভাবে হত্যা করেন। সকল অসভ্য দেশেই ওরূপ হয়—দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীবও ওরূপ করিয়াছিলেন। কিছু দিন রাজত্ব করিবার পর আবার আর এক গোল উঠিল যে, শেগুন-কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী 'বর্ম্মা-বম্বে ট্রেডিং কোম্পানী'র উপর থীব অত্যাচার করিয়াছেন। ট্রান্সভালে উইট্‌ল্যাণ্ডারদের উপর অযথা ব্যবহার উপলক্ষ করিয়াই বুয়র্ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। পরে আবার এক দোষা-রোপ হইল যে, থীব ফরাসী জাতির সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রুশিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে, এই অছিলাতেই তিব্বত অভিযানের আবশ্যক হইল। এইরূপ নিত্য নিত্যই ইংরেজের তরফ হইতে নূতন নূতন দোষারোপ হইতে লাগিল। তখন অপার-বর্ম্মায় নূতন হীরার খনির কথা শুনিয়া অনেক ইংরাজ বণিকই তাহা হস্তগত করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিম্বার্লির স্বর্ণ ও হীরকখনির লোভই দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ তন্ত্র আত্মসাৎ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সকল কারণে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ বর্ম্মা যুদ্ধ ঘটে। রেঙ্গুন দখল করিতে একটি তোপের আওয়াজ করিতে হইয়াছিল, ম্যাণ্ডালেতে তাহাও আবশ্যক হয় নাই। বাঙ্গালা জয় করিতে যেমন আঠার জন মাত্র পাঠান সৈন্যই পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ ইংরাজ সৈন্যের উপস্থিতিমাত্রই বর্ম্মা জয় সম্পন্ন হইল। থীব ও তাঁহার মহিষীকে বন্দী করিয়া মান্দ্রাজে পাঠান হইল। ইংরাজগণ সমস্ত বর্ম্মা অধিকার করিলেন। এখন এই রাজপরিবারের অর্থাভাবে দ্বার-পর-নাই দুরবস্থা হইতেছে।

তার পর হইতেই বর্ম্মার ভাগ্যচক্র ইংরাজের হস্তেই অবস্থিত। ক্রমেই দেশের উন্নতি, লোকবৃদ্ধি, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার হইতেছে। প্রথম প্রথম ভারতের রাজস্ব হইতে ব্রহ্মের শাসনব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অর্থ যোগাইতে হইত বটে, কিন্তু আজকাল বর্ম্মার আর্থিক উন্নতি হওয়াতে, তাহা দিতে হয় না, বরং কিছু উদ্বৃত্ত থাকে।

বর্ম্মা ইংরাজের হাতেই স্বাধীনতা হারাইয়াছে। মুসলমান জাতি কখনও বর্ম্মা জয় করেন নাই। তাহা হইলে বর্ম্মাতেও ভারতবর্ষের মত অবরোধ-প্রথা প্রচলিত হইত। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে এই মুসলমান-বিজয় বর্ম্মা ছাড়াইয়া 'ম্যালে' উপকূলে গিয়া পড়িয়াছিল। সেই কারণেই 'ম্যালে'র অধি-বাসীরা মুসলমান। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, যদিও বর্ম্মা যুদ্ধের সময়

বর্মাকে এত হীনবল দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বে বর্মা নিতান্ত হীনবল ছিল না।

বর্মাবাসীদের আদিম নিবাস মধ্য আসিয়াতেই ছিল। চীনের ভিতর দিয়া তাঁহারা বর্মায় আসিয়া বসবাস করিয়াছেন। যে সকল আদিমনিবাসী-দের পরাস্ত করিয়া তাঁহারা বর্মা দেশে বাস করেন, সেরূপ অনেক জাতি এখনও বর্মায় দেখা যায়। তাহার মধ্যে 'কারণ' জাতি একটি। ইঁহাদের অধিকাংশই খ্রীষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, এবং সেই কারণেই সকল বিষয়েই ইঁহারা উন্নত।

বর্মাবাসী পুরুষগণ অতিশয় আলস্য-পরবশ। কেবল চুরোট খাইয়া, গল্প গুজোব ও আমোদ আহ্লাদ করিয়াই সময় কাটান। ধানের চাষ বর্মার একটি প্রধান ব্যবসায়,—এত বড় ধানের আড়ৎ আর জগতে নাই। প্রতি বৎসর প্রায় ২০ কোটী টাকার ধান্ এখান হইতে রপ্তানী হয়। কিন্তু অনেক চাষা সুদখোর মাদ্রাজী চেটীদের হাতে উৎপীড়িত। বেশী সুদে অগ্রিম টাকা ধার করিয়া তাহারা বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্মায় প্রায় শতকরা ৩০ জন চীনে আসিয়া বাস করিয়াছে, এবং তাহারা বর্মা রমণী বিবাহ করিয়া এক প্রকার শঙ্কর জাতি উৎপন্ন করিয়াছে। ইহাতে শুনা যায়, বর্মার অনেক মঙ্গল ঘটিয়াছে। তাহাদের অপত্যগণ পিতার মত পরিশ্রমী—বর্মা দেশের লোকের মত অলস নহে। কিন্তু অনেক চীনেম্যান্ দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় ছেলেগুলিকে লইয়া যান—মেয়েদের রাখিয়া যান। মেয়েরা বর্মার মত স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ হইতে চীন দেশে গিয়া সুখী হয়েন না। তাহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে, এরূপ মেয়ের সংখ্যা এত বেশী যে, কোনও বিদেশী বর্মায় যাইলে তাহারা তাঁহাদের উপপত্নী হইয়া থাকিবার জন্য দলে দলে যাতায়াত করিতে থাকে। বিদেশী লোক একা বর্মা দেশে বেশী দিন থাকিলে তাহার আর নিস্তার নাই।

বর্মা দেশের লোক ভাল কারিগর। ঘরে ঘরে রেশমের কাপড় বোনা হয়—কিন্তু বাড়ীতে ছাড়া তাহারা সে মোটা রেশমের কাপড় ব্যবহার করে না। মিহি রেশমের কাপড় চীন হইতে আমদানী হয়—তার দামও অনেক। সাজ সজ্জায় বিষয়ে তাহাদের এত বাড়াবাড়ি যে, কাপড় একবার কাচাইলে আর সে কাপড় তাহারা বাহির হইবার কালে পরিবে না—কেবল বাড়ীতেই পরিবে।

বর্ম্মা দেশের কাঠের কাজ ও গালার কাজ অতি পরিপাটী হয়। আমি কতকগুলি গালা-পালিস-করা বড় বড় কাঠের ও ঝুড়ির থালা ও গেলাস আনিয়াছি। এক একখানির বারো আনা মাত্র দাম। যে দেখে, সেই সুখ্যাতি করে, এত সুন্দর।

বর্ম্মাবাসীর বিবাহপ্রথা আমাদের বিবাহপ্রথা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাল্যবিবাহের তো নামগন্ধও নাই। ও সব অঞ্চলের কোনও দেশেই সমাজের দারুণ অনিষ্টকর উক্ত প্রথা নাই। দিন ক্ষণ দেখিবার ভার সর্ব্বত্রই আমাদের দেশের মত দৈবজ্ঞের উপর ন্যস্ত; তবে বর কনের হাতেই পরস্পরে বাছিয়া লইবার ভার। চীন বা জাপানে কিন্তু এমন নহে। সে সকল দেশে আমাদের দেশের মত বাপ মা যাহাকে পছন্দ করিয়া দিবেন, তাহার উপর কাহারও কথা নাই। আমাদের দেশের মত বর্ম্মার বর কনের বাড়ী গিয়া বিবাহ করেন। চীনে ও জাপানে কনেকে বরের বাড়ী সমারোহের সহিত আনাইয়া বিবাহ হয়। বর্ম্মায় স্ত্রীলোকের ক্ষমতা এতই বেশী যে, বিবাহের পর জামাতাকে অন্ততঃ কিছুদিন শ্বশুরঘর করিতেই হয়। ধুলাপায়েই কেহ কেহ দুই তিন বৎসর থাকেন। কেহ কেহ বা শ্বশুর-বংশের নাম লইয়া চিরকালই পোষ্যপুত্রের মত শ্বশুর-ঘরে থাকিয়া যান। এক জন জাপানীর নিকট শুনিয়াছি, জাপানেও এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে। কিন্তু চীনে স্ত্রীই শ্বশুর-ঘরে ক্রীতদাসী হয়েন।

এ সকল দেশের মধ্যে কোনও দেশেই বিবাহ ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে। সামাজিক চুক্তিমাত্র। ইচ্ছা করিলেই ভাঙ্গিয়া যায়। স্ত্রীর এ বিষয়ে স্বাধীনতা বর্ম্মা দেশে অত্যন্ত অধিক। শুনিয়াছি, স্বামীর বালিসের নীচে পান সুপারি গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া যাইলেই হইল। পঞ্চায়ৎ বিবাহ-ভঙ্গ-বিরোধের মীমাংসা করিয়া দেয়। স্ত্রীলোকের এত স্বাধীনতাসত্বেও বহু-বিবাহ সে কিরূপে প্রচলিত হইল, বুঝা যায় না।

ভূতে পাওয়া, ভূত ঝাড়ানর বিশ্বাস ও সকল জাতিতেই আছে। প্রসব-কালে বর্ম্মা দেশের স্ত্রীলোকের যন্ত্রণার আর অবধি থাকে না। কুসংস্কারপূর্ণ সকল পুরাতন দেশেই যেমন হইয়া থাকে, নীচ শ্রেণীর দাইদের হাতে সে সব ভার ন্যস্ত। পুরুষদের সে বিষয়ে কথা কহিবার অধিকার নাই। এ বিষয়ে পরিবর্ত্তনের স্রোত পঁহুছিতে দেরি লাগে। প্রসূতিকে আঁতুড় ঘরের চতুর্দ্দিকে অগ্নিবেষ্টিত করিয়া রাখা হয়। উদ্দেশ্য, গরমে রাখাও বটে,

আবার ভূত তাড়ানর্ও বটে। সে অসহ্য তাপে কি যন্ত্রণায় যে সময় কাটে, তা বুঝান যায় না; সাত দিন এইরূপ থাকিবার পর অষ্টম দিবসে তাহাকে 'স্তেপার বাথ' অর্থাৎ গরম বাষ্পের 'ভাপরা' দিবার পরেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করান হয়। তাহাতে যে কত শিশু ও কত প্রসূতি মারা যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের মত এইরূপ প্রথা এখনও অন্ধভাবে অনুসৃত হইতেছে।

ও সকল দেশেই আহার, ভাত ও মাছ। বর্ম্মা দেশে পচা মাছ চাট্‌নির মত ব্যবহৃত হয়; তাহাকে 'ঙাপ্পি' বলে। নাপ্পি বর্ম্মানের জিহ্বায় উপাদেয় সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়। রাঁধা ভাত ও তরকারী ফেরি করিয়া বিক্রয় হয়। আমাদের দেশের মত ও সকল রাঁধা খাদ্যদ্রব্য অস্পৃশ্য 'সকড়ি' বলিয়া বিবেচিত হয় না। বর্ম্মাবাসী সচরাচর মাটিতে উপু হইয়া বসিয়া হাত দিয়া আহার করে। চীনের প্রথা,—টেবিলে বসিয়া চপ্‌ষ্টিক দিয়া আহার করা। আহারান্তে বর্ম্মিজরা আমাদের মত হস্ত মুখ প্রক্ষালন করে। আহারের সহিত পানীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা ও সব দেশের কোথাও নাই। সকলেই সময়ান্তরে চা খায়। দুগ্ধ-পান প্রচলিত নাই। চুরোট বা তদ্রূপ কোন না কোন দ্রব্য সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীপুরুষ উভয়ে ধূমপান করে। বর্ম্মা ও মালয়ে পান সুপারী খায়। আফিন-সেবন জাপান ছাড়া অল্পবিস্তর সকল দেশেই প্রচলিত আছে।

স্ত্রীলোকের চুল রাখা সকল দেশেরই প্রথা, তবে মঙ্গোলিয়ান জাতির মত অত চুলের আদর আর কোন জাতিই জানে না। তাদের যেমন গোঁফ দাড়ি প্রভৃতি অন্যত্র চুল বড় জন্মায় না, তেমনই মাথার চুল সোজা ও বড় লম্বা হয়। পৃথিবীর কোন জাতির লোক এই সকল জাতির মত কেশের এত পারিপাট্য করে না। তারা চুলের সজ্জা লইয়াই সারাদিন ব্যস্ত।

বর্ম্মাজাতির পুরুষরাও বড় বড় চুল রাখে। বর্ম্মান্ সব চুলগুলি রক্ষা করে। চীনে মাথার মাঝে লম্বা বিনানী রাখে মাত্র।

স্ত্রীলোকের পায়ে গহনা নাই, যা কিছু আছে কানে, হাতে ও মাথায়। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই চটি জুতা পায়ে দেয়। সকলেরই ঢলঢলে পোষাক পছন্দ। কাপড় চোপড়েই তাহাদের সজ্জায় বেশী ভাগ দৃষ্টি। স্তনের উপর অবধি আঁটিয়া লুঙ্গি পরার দরুণ, স্বাভাবিকভাবে চলা ফেরায় ব্যাঘাত হয়। সেই কারণেই বর্ম্মা জাতির স্ত্রীলোকদের চলন ও ধাঁচা এক রকম, দেখিতে আড়ষ্ট মত।

বর্ম্মা জাতি অলস, এবং আমোদ ও সজ্জাপ্রিয়। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে না। সেই জন্য অনেক সংসারেই লোকে ঋণগ্রস্ত। নাচ, গান, যাত্রা ইত্যাদি প্রায়ই হইয়া থাকে। ভেড়ার লড়াই, মুরগীর লড়াই, নৌকার বাচ খেলা সচরাচর দেখা যায়। তাহাদের দেশ ধনধান্যে পূর্ণ। আশ্রয়স্থান-নির্ম্মাণের জন্য শেগুন কাঠ ও আহারের জন্য চাউল অনায়াসে অপর্য্যাপ্ত জন্মায়। অন্ন ও আশ্রয়স্থান, এই দুইটি জীবনধারণের প্রধান আবশ্যক দ্রব্যের এত সহজে যোগাড় হয় বলিয়াই তাহারা এত অলস হইয়া পড়িয়াছে।

সকল দেশেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষেও এরূপ ঘটিয়াছে। তাই দেশ এত রত্নপ্রসূ হইলেও বর্ম্মাবাসী এখন আর তত লাভবান নয়। অধিকাংশ লাভই বিদেশী ব্যবসাদার ও সুদখোরের হাতে যায়।

বর্ম্মা দেশে সচরাচর শবদেহ গোর দেয়, এবং ফুঙ্গীদের শবদেহ দাহ করা হয়। আমাদের দেশে যেমন অশৌচ-পালন-রূপ একটি নিয়ম পালন করিতে সকলেই বাধ্য, ও সব দেশেও সেইরূপ। ঐ সময়ের জন্য আহার ও পরিধেয় সম্বন্ধে বাঁধা নিয়ম আছে। আত্মীয় বুঝিয়া অশৌচের দিন বাড়ে, কমে; সে সময়ে নিরামিষভোজনই কর্ত্তব্য। স্ত্রী মরিলে অশৌচ কম, স্বামী মরিলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বাপ মায়ের জন্য অশৌচ স্বামীর অশৌচের মত; তিন দিন নহে। আমাদের দেশে যেমন অশৌচ অবস্থায় সাদা ধুতি পরিধেয়, ও সকল অঞ্চলে সর্ব্বত্র সেইরূপ সাদা রঙই শোকপ্রকাশের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। ইউরোপে কিন্তু সাদা রঙ শোকব্যঞ্জক নহে।

বর্ম্মায় প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চাউল ও শেগুন কাঠ। তাহা ছাড়া হীরার খনি ও বর্ম্মা-অয়েল নামক কেরোসিন-জাতীয় এক প্রকার খনিজ তৈলও পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এত থাকিতেও বর্ম্মা জাতি অতি গরীব। আলস্য ও অবিবেচনাই তাহার প্রধান কারণ। বর্ম্মারা কিন্তু কাঠের কাজে ও গালার কাজে উৎকৃষ্ট কারিগর। রেশমের ও বর্ম্মা চুরোটের অল্প বিস্তর কারবার চলে। আমি এ সকল জিনিসের কিছু কিছু নমুনা আনিয়াছি।

বর্ম্মাবাসীরা তাড়ি খায়, এবং মাতলামি করে। কিন্তু চীন দেশের মত বেশি নাই। সকল দেশের সব পাপ-অভ্যাসগুলি বর্ম্মাবাসীরা আয়ত্তাধীন করিয়াছে। শুনিলাম, তাদের দেশে মদ বা আফিম কিছুই এক সময়ে ছিল না। এখন চীনেদের কাছ থেকে আফিম ও [illegible] আফিম ও [illegible]বাসীর নিকট মদ খাইতে শিখিয়াছে। একটা তাড়িখানার কাছে

দাঁড়াইয়া কতকগুলি লোকের কাণ্ডকারখানা দেখিতেছিলাম। তারা অতি অশ্লীল ভঙ্গী করিয়া আমায় ভেঙ্গচাইতে লাগিল। কিন্তু চীন দেশে কত আফিং খাবার আড্ডায় গিয়াছি, তারা কেহ কিছু বলে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষ বর্ম্মাবাসীর তীর্থস্থান। অনেক যাত্রী বুদ্ধগয়া রাজগৃহ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করিতে আসেন। আমি যখন দেশে ফিরিতেছি, তখন কতকগুলি ভদ্রবংশীয় স্ত্রী ও পুরুষ তীর্থ করিতে আসিতে-ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অনুসন্ধান করিতেন,—আমার কতগুলি ছেলে মেয়ে। ছেলে মেয়েতে আমাদের ঘর ভরা, এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা থাকিত না। আমি চীন দেশেও এই পরিচয় পাইয়া স্ত্রীলোকদিগকে অশেষ আনন্দ অনুভব করিতে দেখিতাম। বৃদ্ধারা স্পষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিতেন; তাঁহাদের প্রথম প্রশ্নই এই। অল্পবয়সীরা শুনিতে চান, অথচ মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না,—প্রশ্ন করিবার অবসরের জন্য অপেক্ষা করেন; অথবা অন্যের মুখ দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে চেষ্টা করেন। বিবাহিত ও ছেলেপুলে হইয়াছে জানিলে যেন একদল-ভুক্ত মনে করেন, এবং মিশিবার স্বাধীনতা আরও বাড়ে। ছেলেপুলের কথা শুনিলে সকল দেশের স্ত্রীলোকেরই আনন্দের সীমা থাকে না। পুরুষদের আনন্দ অতটা বেশী বলিয়া মনে হইত না। সকলেই ছোট ছেলে ভালবাসে। আমিও যখন অন্যের ছেলেকে আদর করিতাম, স্পষ্ট বুঝা যাইত, তাদের মা বাপের মনে আনন্দ উথলিয়া উঠিত।

জীর্ণ পর্ণকুটীর হইতে বাহির হইয়া এক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বর্ম্মা আমার নিকট ভিক্ষা চাহিল। তার ছেলেটিও বাপের দেখাদেখি এসে হাত পাতিল। তার শরীরে কোনও রোগলক্ষণ নাই। তার স্ত্রীকেও দেখিলাম। গরীব হইলেও বেশ ভূষা স্বামী অপেক্ষা অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার সঙ্গে রৌপ্য মুদ্রা ছাড়া আর কিছু ছিল না। দিতে ইতস্ততঃ করিয়া একটি ক্ষুদ্রতম রৌপ্যমুদ্রা কুষ্ঠীর হাতে দিলাম। হিন্দীতে বলিলাম, দু জনে ভাগ করে নিও। ছেলেটি হাতে না পেয়ে বড়ই বিষণ্ণ হইল। জাহাজে ফিরিয়া আসিয়াও মনে হইতে লাগিল, তার হাতে কিছু দিয়া আসি।

মন্দিরে এক জন স্ত্রীলোক তাঁর ছোট ছেলেটিকে জানু পাতিয়া বসিয়া উপাসনা করিতে শিখাইতেছিলেন। আমার সে দৃশ্য বড়ই ভাল লাগিয়া ছিল। ছেলেমানুষের ভাবে ও আধ-আধ কথার স্বরে যেমন এক স্বর্গীয়

ভাব প্রকাশ পায়, অন্যত্র প্রত্যেক অবয়বে প্রত্যেক কার্য্যে সেই ভাব পরিস্ফুট।

বর্ম্মার দোকানে জিনিস কিনিতে গিয়া অন্যত্র জিনিস কেনার মত অত বিরক্তি বোধ হয় না। বোধ হয়, তাহার একটি কারণ, স্ত্রীলোকেরা বেচে বলিয়া। চীনে দেখিতাম, এক জন পুরুষ দোকানী পাঁচ ডলার মূল্য বলিয়া দশ সেণ্টে জিনিস বেচে। এত ঠকাইবার প্রয়াস! কিন্তু বর্ম্মার দোকানে স্ত্রী-লোকেরা প্রায় ঠিক ঠিক দাম বলে। বেশী দর দস্তুর করিতে হয় না। অসহায় বিদেশী বলিয়া স্ত্রীলোকসুলভ করুণ ভাব তাদের ব্যবহারেও দেখা যায়।

একটি ছাউনিওয়ালা বাজারে কিছু জনতা দেখিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি লোক জড় হইয়া কিসের মীমাংসা করিতেছে। এত লোক, তবু গোল নাই। আমাদের দেশে নিশ্চয়ই আরও গোলমাল শুনা যাইত। একটি নম্রমুখী যুবতীর সম্মুখে অনেকগুলি স্ত্রীলোক ছিল। যুবতী নিজের দোকানে বসিয়াছিলেন, নীচের একটি দেবদারু কাঠের বাক্সের উপর একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ বর্ম্মণ যেন মর্ম্মাহতের মত বসিয়া ছিল তাঁর পাশেও অনেক লোক। একটি সুরাতী মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েছে? শুনিলাম,- এই যুবতীটি বৃদ্ধের স্ত্রী, হালে বিবাহিতা। রমণীটির সহিত দোকানে প্রত্যহ এক বর্ম্মা যুবক আসিয়া অনেকক্ষণ অবধি গল্প করে- রমণী তাহাকে চুরোট উপহার দেন। বৃদ্ধের প্রথম পক্ষের ছেলে দুপুরবেলা ভাত দিতে আসিয়া দেখিয়া গিয়া বাপকে বলিয়াছে। তাই বৃদ্ধ, ব্যাপার কি, ভাল করিয়া জানিবার জন্য, নিজে আসিয়াছে। তার মুখের ভাব বড়ই কষ্টব্যঞ্জক— প্রতি-শোধেচ্ছার মত প্রচণ্ড ভাব নহে। যেন সন্দিগ্ধ ও অনুতপ্ত হইয়া ভাবিতেছে, কেন এমন অসময়ে এমন হলাহল পান করিলাম। যুবতী নম্রমুখী, কিন্তু অনুতপ্তা বলিয়া মনে হইল না। তার যেন প্রধান ভয়, এ সব গোলমাল শুনিয়া যদি সে বর্ম্মা যুবক আর তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না আসে! নয় ত প্রণয় ক'রে পা বাড়াতে কাতর, এমন ভাব তাহার ছিল না। সে যেন মনে মনে সবাইকে মিনতি করছিল,— যে ছায়াতরু সে আশ্রয় করেছে, তাহা হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা না হয়। স্ত্রীলোকেরা তার দোষ ঢাকিয়া তার পক্ষ-সমর্থন করিতেছিল। সকল পুরুষদেরই বৃদ্ধের জন্য টান। কে জানে কেন, বৃদ্ধের জন্য আমার অণুমাত্রও সহানুভূতি হইল না। অবিবেচনার কার্য্যে, অসঙ্গত বিষয়ে সহানুভূতি কেমন করিয়া হইবে।

ফাঁকি দিবার [illegible] করি না। আমাদের খেয়ালে বেসুর বড় একটা দেখিতে পাইবেন [illegible] যে সুরের ঢং ওস্তাদি নাও হইতে পারে। কিন্তু কোনও ব্যক্তিকে যদি কখনও একটা নূতন খেয়াল আমাদের মস্তকে প্রবেশ করে, তাহা হইলে উহাকে আমরা সহজে মস্তিষ্ক হইতে তাড়াইতে পারি না। সুতরাং আমাদের সভার বিশেষ অধিবেশনে যে মন্তব্যটি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা মহাশয়কে জানাইতে ইচ্ছা করি।

আজকাল 'আত্ম-জীবনী' লিখিবার প্রবাহ বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। 'আত্মজীবনী' লিখিবার এতটা বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়ি দেখিয়া আমরা ভীত ও দুঃখিত হইয়াছি। কেন না আমাদের বিশ্বাস যে, আত্মজীবনী লেখা কেবল আমাদের মত খেয়ালী লোকদেরই উচিত। কারণ, আমরা লোকসমাজে বড় একটা বাহির হই না; লোকেও বড় একটা আমাদের চেনে না। অথচ আমাদের মত মূল্যবান ও আদর্শজীবনের ঘটনাগুলি না লিখিলে, সাধারণের শিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। তাই আমাদের ভয় হয় যে, অন্য সকলের 'আত্মজীবনী'তেই যদি মাসিকপত্রিকার সব প্যাতাগুলি পুরিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের 'জীবনী' প্রকাশ করিবার স্থান কোথায় রহিল।

আমাদের প্রথম আবেদন এই যে, প্রত্যেক মাসে আপনার পত্রিকার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা আমাদের 'আত্মজীবনী'র জন্য যদি ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আমরা মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে বাঁধা থাকিব, এবং সভা হইতে আপনি যাহাতে প্রত্যহ বিকালে নিয়মিতরূপে এক ভাঁড় করিয়া সিদ্ধি পাইতে পারেন, (অবশ্য যদি অনুমতি করেন) তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আমাদের ভয় হইতেছে যে, আপনি বোধ হয়, এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। আপনি ভাবিতে পারেন যে, আমাদের 'জীবনী' পড়িয়া জগতের এমন কি উপকারের সম্ভাবনা? কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিবেন, আপনি আমাদের যে চক্ষে দেখিতেছেন, আমরা কিন্তু নিজেদের ঠিক সেই চক্ষে দেখি না। যখন আয়নার সাহায্যে নিজে মুখ দেখা যায়, তখন কাহারও বোধ হয় খারাপ লাগে না। অন্যে যাহার নাককে 'খাঁদা' বা 'চ্যাপ্টা' বলে, সে নিজে আয়নায় মুখ দেখিয়া বলিবে, 'কৈ, এমন কি খাঁদা—নেহাৎ মন্দ ত নয়?"

যা হোক, যদি প্রথম আবেদনটি অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে আমাদের আর একটি প্রস্তাব আছে। আমরা আপনার 'সাহিত্যে'র পুরাতন গ্রাহক। আমরা যদি 'সাহিত্যে' আপনার বালক-জীবনের কতকটা পরিচয় পাই, তাহা

হইলে অত্যন্ত সুখী হইব। [illegible]ণ্ডবিল' বিতরণ করে, সেগুলি যদি একটু পরিশ্রম করিয়া যত্ন করিয়া রাখিয়া দেন, তাহা হইলে আপনার লিখিবার কাগজের অভাব না হইবারই কথা। 'আত্ম-জীবনী'টা ঐ কাগজগুলির পৃষ্ঠায় বেশ [illegible] করিতে পারেন। কালি কলমের যদি অভাব হয়,তাহা হইলে আমাদের সভা হইতে একটি কলম ও এক দোয়াত কালি কিছু দিনের জন্য ধার দিতে পারি। আর আবশ্যক হইলে চাঁদার খাতা আমরা খুলিতেও প্রস্তুত আছি। সুতরাং 'আত্মজীবনী'তে প্রত্যেক মাসে 'সাহিত্যে'র পাঁচ সাত পৃষ্ঠা পূরণ করা আপনার পক্ষে নিতান্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার না হইতে পারে। তবে আপনার 'বালকজীবনী' 'সাবানপিচ্ছিল' না হইয়া হয় ত 'তৈলপিচ্ছিল' হইতে পারে। নর্দ্দামার বর্ণনা হয় ত অতিরঞ্জিত ভাষায় না করিতে পারেন। শৈশবের দুই একটি 'লজ্জারাঙা' আচরণে (যথা গোয়ালঘরে লুকাইয়া তামাক খাইতে শেখা ইত্যাদি)* হয় ত আপনি লজ্জায় মাটি হইয়া যাইবেন। ঐ আচরণগুলি 'ছাঁকা' না দিয়া হয় ত দাগা দিয়া থাকিবে। যদিও ঐ আচরণগুলি কিসে অন্যায়, তাহা হয় ত অত অল্প বয়সে না 'তলাইবার'ই অধিক সম্ভাবনা ; যদিও শাস্ত্রের ব্যবস্থাটা স্বহস্তে না করিয়া পরবর্ত্তী লেখকদের হস্তে সমর্পণ করাই পরামর্শসিদ্ধ,— তবু 'আত্ম-জীবনী' লিখিবার সাধ ত মিটিবে। অপরে যাহা করে, করুক ; যাঁহা বোঝে বুঝুক, আমরা কিন্তু ময়রার দোকানের ভন্‌ভনে মাছির ন্যায় আপনার 'জীবনী'র রসাস্বাদ করিতে পারিব, এমন ভরসা করি। আমরা আপনার কোনও ছল ধরিব না। আপনি স্বচ্ছন্দচিত্তে সুস্থশরীরে, যাহা প্রাণে চায়, লিখিয়া যাইবেন। যাহাতে প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ চারি পাঁচ পৃষ্ঠা যোগাই হয়, সে দিকে নজর রাখিবেন। আপনার মত লোককে আর অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। তবে এত সুবিধা থাকিতেও যদি আপনি 'বালক-জীবনী' লিখিবার প্রলোভন যথার্থ বৈষ্ণবের মত ত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা জানিব যে, আপনি নেহাত বেরসিক— আপনার প্রাণে কোনও 'সখ' নাই।

খেয়ালী সভার সভ্যগণ।

* খেয়ালখি মাপ [illegible]।

হিন্দুদিগের পবিত্র পশু।

পি, ভি, ত্রিবিক্রম রাও কর্ণুরাজী নামের "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে হিন্দুদিগের পশুপূজা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

ফার্গাসন তাঁহার 'বৃক্ষ ও সর্পপূজা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন ভূখণ্ডের প্রত্যেক প্রদেশে পশুপূজার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। তদ্ব্যতীত নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের (আমেরিকার) নানা স্থানে আজিও নাগপূজার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। উত্তর ভূখণ্ডের সর্ব্বত্রই প্রাচীন পশুপূজার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক ভূখণ্ডের পুরাণ গ্রথিত প্রাচীন আখ্যায়িকাতেও উল্লিখিত পশুপূজার স্পষ্ট নিদর্শন আছে এবং নানা স্থানে পশুপূজার প্রকৃষ্ট-পরিচয়-প্রকাশক অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত প্রাচীন মন্দিরমালা বা স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি বিদ্যমান প্রাচীন প্রথা পদ্ধতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে. ষড়্‌দর্শনের উদ্ভাবক হিন্দুজাতি পৃথিবীর সভ্যেতর জাতিগণের মত আজিও পশুপূজার সাধারণ গণ্ডীসীমার অতিক্রম করিতে পারে নাই। ভারতে পশুপূজা ও বৃক্ষপূজা একত্র প্রচলিত।

পশুদিগের মধ্যে গাভীই হিন্দুর নিকট 'পবিত্রতম'। সুরাসুর-মথিত ক্ষীরোদসমুদ্রে যে চতুর্বিংশতি রত্নের উদ্ভব হইয়াছিল, তন্মধ্যে গোজাতির আদি মাতা কামধেনু অন্যতম। রামায়ণে লিখিত আছে যে, বিশ্বামিত্র সসৈন্য বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলে কামধেনুর প্রভাবেই, বশিষ্ঠ, আড়ম্বরের সহিত আতিথ্যসৎকারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গো-দর্শন ও গো-প্রদক্ষিণ করিলে পাপনাশ ও পুণ্যার্জ্জন হইয়া থাকে। কথিত আছে, গোদেহে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, সপ্তর্ষি, তীর্থ সকল, গঙ্গা ও অন্যান্য সমস্ত দেব দেবী অবস্থিতি করেন। মন্দিরমধ্যস্থ দেবতা সকলও যদি প্রাতঃকালে গাভীর পশ্চাদ্ভাগ অবলোকন করেন, তবে তাহাতে তাঁহাদের সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয়। ইহাকে বিশ্বরূপদর্শন কহে। গোপ্রদক্ষিণ ও গোজাতির পশ্চাদ্ভাগদর্শনের পবিত্রতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্প প্রচলিত আছে:—একদিন দৈবক্রমে একটি গাভী গোচারণভূমি হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে এক ব্যাঘ্রের কবলে পতিত হইয়াছিল। গাভী তাহার বৎসের সহিত সাক্ষাতের উপায়ান্তর না দেখিয়া বৎসের নিকট শেষবিদায়গ্রহণের জন্য ব্যাঘ্রের অনুমতি চাহিয়াছিল। ব্যাঘ্রও গাভীকে অনুমতি দিয়াছিল। গাভী অশ্রুপূর্ণনয়নে বৎসকে সদুপদেশ প্রদান ও নিজের বিপদের কথা জ্ঞাপন করিয়া কহিল,—'তুমি কদাচ গোপাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিও না।' গাভী স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার ব্যাঘ্রের সম্মুখে প্রত্যাগত হইলে ব্যাঘ্র গাভীকে সত্যপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া তাহার পদাগ্রে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিল। তদবধি গাভীগণের সম্মুখভাগ অপবিত্র। প্রসবোন্মুখী গাভীকে প্রদক্ষিণ করিলে পৃথিবী-প্রদক্ষিণের ফললাভ হয়। গৌতম ঋষি এই কৌশল অবগত থাকিয়া গোপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক ভূপ্রদক্ষিণজন্য ব্রহ্মার মানসী সৃষ্টি অহল্যাকে লাভ করিয়াছিলেন।

গাভীগণিকে 'মাতাতুল্য' ভক্তি করিয়া [illegible] হিন্দুর বিশ্বাস, মনুষ্যের আত্মা মনুষ্যত্বের পূর্ব্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গো-জন্ম গ্রহণ করিয়া [illegible] গোগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত জন্মের পাপক্ষয় হইয়া থাকে। [illegible] তীর্থ-সরিতের কূলে প্রস্তরময়ী পূজনার্থা গোপ্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে। [illegible] গোমুখে প্রবেশ পূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগ হইতে বহির্গত হইয়া পাপক্ষালন করিয়া থাকেন। অশুচি ও অপবিত্র স্থান সকল গোর আগমনে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। গোময়লেপনে হিন্দুর দেবগৃহ পবিত্র হইয়া থাকে। সপ্তবিধ পবিত্র স্নানের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে গোময়লেপনপূর্ব্বক স্নান অন্যতম। দগ্ধগোময়-ভস্মের বিভূতি রচিত ত্রিপুণ্ড্রক শুচিচিহ্ন করে। কারাগৃহ-প্রত্যাগত, অথবা কোনও পাপাচারী ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্তসাধনের পূর্ব্বে পঞ্চগব্য (গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি) ভক্ষণ করিতে হয়। পঞ্চগব্য ভক্ষণ না করিলে কোন ব্যক্তিই প্রায়শ্চিত্তের উপযোগী হয় না। চান্দ্রায়ণব্রত, চাতুর্ম্মাস্যাদিতে পঞ্চগব্যের ব্যবস্থা আছে। দুশ্চর চান্দ্রায়ণব্রতে পাপীকে গোময়-মধ্যস্থ অজীর্ণ [illegible] চাউলের অন্নভোজন করিয়া ব্রতাচরণ করিতে হয়।

দুগ্ধ, ঘৃত, দধি প্রভৃতি সমস্ত পূজোপকরণ গাভী হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংস্কৃত-সাহিত্যের নানা স্থানে গাভীর পবিত্রতা কীর্ত্তিত আছে। পবিত্রতম অগ্নিগৃহও গোসান্নিধ্যে পবিত্রতর হইয়া থাকে। গোপূজা সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। পূজান্তে গাভীকে গোগ্রাস দান করিতে হয়। শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পিণ্ড সকল গাভীকে প্রদত্ত হয়। গাভীর ললাটে ও পৃষ্ঠে পূজার চিহ্নস্বরূপ হরিদ্রা ও সিন্দূরবিন্দু লিপ্ত দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যের কল্যাণ জাতির মধ্যে অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত বার্ষিক গোপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপালরূপে গোচারণ করিতেন। তিনি গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রের সৃষ্ট ঝটিকাবৃষ্টি হইতে বান্ধবগণের গোকুল রক্ষা করেন।

বিবাহে ও শ্রাদ্ধকালে গোদান প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত। গরুড়পুরাণের বচনানুসারে মৃত্যাহের দ্বাদশ দিনে মৃতব্যক্তির উদ্দেশে গোদান করিলে মৃতব্যক্তি অনায়াসে 'মহাঘোরে যমদ্বারে তপ্তা বৈতরণী নদী' উত্তীর্ণ হইয়া যান।

জিল্লারগণ প্রতিবৎসর বৃষভযাত্রা নামক গোপূজার অনুষ্ঠান করে। হিন্দু বালিকাগণ মৃন্ময় বৃষ নির্ম্মাণ করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা বৃষের পূজা করিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে গোধনের সংখ্যানুসারে লোকের ঐশ্বর্য্য সূচিত হইত। বৃষোৎসর্গ গোজাতির বংশবৃদ্ধির একটি প্রকৃষ্ট উপায়। আজকালে ভারতের সর্ব্বত্র বৃষোৎসর্গ হইয়া থাকে।

লক্ষ্মীদেবী হস্তীতে বাস করেন। কৌরবজননী গান্ধারী একবার হস্তিপূজায় পাণ্ডব জননী কুন্তীকে নিমন্ত্রণ করেন নাই; তজ্জন্য কুন্তীর কনিষ্ঠ পুত্র অর্জ্জুন জননীর পূজার নিমিত্ত ইন্দ্রলোক হইতে ঐরাবত হস্তীকে আনয়ন করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে কার্ত্তিক মাসের কৌমুদী-উৎসবে পুত্রবধূ কর্ত্তৃক 'হস্ত্যালোক' নামক বৃহৎ দীপশিখা প্রজ্বলিত [illegible] পূজিত হয়। রামচন্দ্রের সৈন্য বানরগণ হিন্দুদিগের কর্ত্তৃক সম্মানিত ও পূজিত হইয়া থাকে। মারুত হনুমানের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত এই কারণে

বঙ্গদর্শন। চৈত্র। "[illegible]ছবি" চলিতেছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনূদিত "[illegible]" ক্রমশঃ। শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ রায়চৌধুরীর "জয়সঙ্গীত" কবিতায় গ্রথিত একটি বক্তৃতা। জাপানকে লক্ষ্য করিয়া উপসংহারে কবি যে উপদেশ দিয়াছেন,—

"এই ভালো, এই ভালো ! থাক্ যেন থাকে না পিপাসা !"

তাহা পৃথিবীর অকর্মণ্যদিগের তালিকায় অধিকারী বাঙ্গালী কবির যোগ্য হইয়াছে। হায় বাঙ্গালী! শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যরসমুগ্ধ ভাবুকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া, 'রঘুবংশে'র সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবারকার বিষয়—দিলীপের পুত্রলাভ। তাহার পরই শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় "দেশীয় মদ্য" লইয়া উপস্থিত। এই স্বদেশপ্রীতির যুগে "দেশীয় মদ্য" আদৃত হইবে, এমন আশা করা যায়। 'সিম্‌কিন'কে বর্জ্জন করিয়া—অসুস্থতায় খাঁটি 'কাঁজি'তে পান করিবার সৎসাহস, কি বাণিজ্যের দাঁড়াইতে বিলম্ব হইবে? আমাদের ত তাহা মনে হয় না। যাক,—"দেশীয় মদ্য" প্রবন্ধটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও উপাদেয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সফলতার সদুপায়" প্রবন্ধে বাঙ্গালা-ভাষা-বিভাগের প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে বিদেশী রাজার উপর একান্ত নির্ভর ত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বনের সাহায্যে উন্নত হইতে আহ্বান করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষদে ও অন্যত্র বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে প্রাদেশিক ভাষার অনেক ওকালতী করিয়াছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের রেজোলুউশন বজ্রে তাদের প্রাসাদ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গবাণীর বরপুত্র এখন ভাষার সার্ব্বভৌমিকতার পক্ষ গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। "সফলতার সদুপায়ে" রবীন্দ্র বাবু যেন 'থাক কাঁচিয়া' অপূর্ব্ব মুন্সীয়ানা, তীক্ষ্ণ শ্লেষ, প্রগাঢ় রস ও তীব্র ধিক্কার ঢালিয়া দিয়াছেন। বহুকাল তাঁহার গদ্য প্রবন্ধে এমনতর বৈদ্যুতী অনুভব করি নাই! "এপার—ওপার" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর রচিত একটি কবিতা—রূপক।

প্রবাসী। চৈত্র। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা" নামক সুচিন্তিত ও সুলিখিত সন্দর্ভটি এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। লেখক "সংস্কৃতভাষাজ্ঞানের অভাবে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি" সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুমোদন করি। যাঁহারা মাতৃভাষার সেবায় প্রবৃত্ত, এবং যাঁহাদের বাঙ্গলা লিখিবার প্রবৃত্তি আছে, তাঁহারা ললিত বাবুর উপদেশের আলোচনা করিলে উপকৃত হইবেন। ললিত বাবু যথার্থই বলিয়াছেন,—"ল্যাটিন বা Anglo-Saxon এর সহিত ইংরাজীর যেরূপ সম্বন্ধ, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার তদপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। * * একেবারে ল্যাটিন বা Anglo-Saxon না জানিলে ইংরাজী ভাষার রীতি ও প্রকৃতি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। একেবারে সংস্কৃত না জানিলে যে বাঙ্গলা ভাষায় সম্যক্ জ্ঞান আরও অসম্ভব, তাহা বলা বাহুল্য।" আমাদের মনে হয়, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ অসম্ভব। বাঙ্গলা ভাষার কর্ণধারগণের মধ্যে যাঁহারা দেবভাষার নাম শুনিলেও ধৈর্য্যচ্যুত হন, তাঁহারা ধীরভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করুন। ললিত বাবু 'টুলো পণ্ডিত' বা ইংরাজীর 'ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃতের ভিন' নহেন, তিনি ইংরাজী বিদ্যায় তাহার,—সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অনুরাগ থাকিলেও,

অনাথা।

রামকান্ত দরিদ্রের সন্তান হইলেও বাল্যকাল হইতেই বড় বুদ্ধিমান। সাত বৎসরের সময় তাহার পিতার মৃত্যু হইল। তখন রামকান্তের মা শান্তমণি জগৎ অন্ধকার দেখিল; একদিনের সম্বলও তাহার গৃহে নাই, স্বামীর কুলে এমন এক জনও নাই, যাহার গৃহে আশ্রয় লইয়া পাচিকাবৃত্তি দ্বারাও সে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে। তাহার শিশুপুত্রের মুখের দিকে চাহিতে সংসারে সে কাহাকেও দেখিল না। অগত্যা গ্রামের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, সুখ দুঃখের সহস্রস্মৃতিবিজড়িত জীর্ণ বাসগৃহখানির দিকে একবার কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, অভাগিনী পিত্রালয়ে যাত্রা করিল। রামকান্ত আর কখনও মামার বাড়ী যায় নাই। সে গরুর গাড়ী চড়িয়া একদিন সকালে পদ্মাতীরে এক নূতন গ্রামে উপস্থিত হইল। পদ্মাতীরবর্ত্তী রামজীবনপুরে তাহার মামার বাড়ী। রামের মামার নাম ভজগোবিন্দ প্রামাণিক।

রামজীবনপুর গ্রামখানি ক্ষুদ্র। এখানে ভদ্রলোকের বাস বড় অল্প। শিক্ষিত ও ভদ্রের মধ্যে থানার দারোগা কেরামতুল্লা মিঞা ও পোষ্টমাষ্টার পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গ্রামের ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দত্ত ডি, এল, এম, এস, মহাশয়ের নাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ-যোগ্য; কারণ, তিনি ভিন্ন দশ ক্রোশের মধ্যে আর ডাক্তার নাই।

এই তিন জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ভিন্ন গ্রামে আর যাহাদের বাস ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই দোকানদার ও কৃষক। এখানকার সামান্ত একটি পাঠশালায় গ্রাম্যবালকেরা দোকান করিবার মত বিদ্যা অর্জ্জন করিত, এবং স্বরূপচন্দ্র সাহার মদের দোকানে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণের ধর্ম্মকথার আলোচনা চলিত। কেবল শনিবারে শনিবারে অপরাহ্ন-কালে যখন ভজগোবিন্দ প্রামাণিকের কাপড়ের দোকানে "বঙ্গবাসীর গেজেট" পৃথিবীর সংবাদ বহন করিয়া আনিত, তখন তাহা পাঠ ও শ্রবণ করিবার জন্য বাজারের অধিকাংশ দোকানদার সেখানে সমাগত হইত, এবং "নমো গণেশায়" হইতে আরম্ভ করিয়া প্রিণ্টারের নামটি পর্য্যন্ত পড়া হইয়া না গেলে, সে স্থানে লোকের ভিড় কমিত না। শনিবার রাত্রে ভজগোবিন্দের কতখানি তামাক পুড়িত, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; তবে ভজ-

গোবিন্দ সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক, এবং তাহার নাম ছাপার হরফে কাগজের উপর লেখা থাকে, এই দুইটি সম্মানের প্রলোভন তাহাকে এমন নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়াছিল যে, প্রতি শনিবার রাত্রে অতিরিক্ত তাম্রকূটের ব্যয়ে তাহার চিত্তে অনুতাপানল প্রজ্বলিত হইলেও, সে কাগজ বন্ধ করিয়া অপব্যয়ের হাত হইতে অব্যাহতিলাভের চেষ্টা করে নাই ছিল।

ভজগোবিন্দ লোকটি কৃপণ হইলেও অনাথা ভগিনী ও অভিভাবকহীন ভাগিনেয়টিকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। কিন্তু ভজগোবিন্দের স্ত্রী কামিনীসুন্দরী এই দুইটি অনাহূত অতিথিকে তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত দেখিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। কামিনী বন্ধ্যা; তাই সে সকল সন্তানবতী নারীকেই ঈর্ষার চক্ষে দেখিত। শান্তমণি ও রামকান্তকে সে নূতন উপসর্গের মত দেখিতে লাগিল।

ভজগোবিন্দ পরম বৈষ্ণব; সেই দিন রাত্রে নামসংকীর্ত্তন শেষ করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক একটি সুমধুর পদ মৃদুস্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে সে গৃহে ফিরিয়া দেখিল, গৃহিণীর মুখ অন্ধকার; শয্যায় শয়ন করিয়া কামিনী ফোঁস ফোঁস করিয়া উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, এবং তাহার চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রু নির্গত হইয়া মলিন উপাধান সিক্ত করিতেছে। ঘরের মধ্যে মিট্ মিট্ করিয়া একটা মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছে, আর একটা ক্ষুধার্ত্ত বিড়াল আহারের সন্ধানে মিউ মিউ করিয়া চৌকীর নীচে কাঠের সিন্দুকের পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ভজগোবিন্দ গৃহে প্রবেশ করিয়া কিছু হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি কোনও অসুখ হয়েছে? ভাত রান্না হয় নি?"

গৃহিণী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা কহিল না, তাহার পর দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া যেন দেওয়ালকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ভাতের তোলো সিদ্ধ করিবার জন্ত সকলটে দাসী আছে কি না! জিনের ঢের পয়সা হয়েছে! যত রাজ্যের আপদ বালাই জুটিয়ে আনবে, আর আমাকে তাদের দানা সিদ্ধ করতে হবে! সুখের ত সীমা নেই।"

ভজগোবিন্দ বলিল, "ওহো, বোনটা এসে আশ্রয় নিয়েছে বটে! তা দুঃখ কি, তাকে আমি ব'সে খেতে দিচ্ছিনে; তোমারই একটু সুবিধে ক'রে দেব। রান্নাঘরের ভার তার হাতে ছেড়ে দাও।"

গৃহিণী এবার মাথা তুলিয়া নথ নাড়িয়া বলিল, "আহা কি কথাই বল্লেন!

...দের সব ভার ওঁর হাতে দিই, আর সময়ে এক বুড়ো আঁতের জন্যে ক্যা... করে বেড়াক, শাবী পুঁথি বয়কে দিয়ে দৈবজ্ঞি মেজোয়শায়ের হাত দিয়ে।”
ভজগোবিন্দ বলিল, “তা হ’লে আমিই উপোষ ক’রে মরি। আর তোমরা ...দিকে দু’ জন কোমরে কাপড় জড়িয়ে দু’পাছা ঝাঁটা নিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ...াও।”

ভজগোবিন্দকে হরিনামমাত্র সম্বল করিয়া সে রাত্রিটা অতিবাহিত ...তে হইল। হরিনামে প্রাণ রক্ষে, কিন্তু ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না। প্রভাতে ...আপনাকে বড় কাহিল বোধ করিতে লাগিল।

২

...বাড়ীতে একটি ঝি ছিল। সে দুবেলা দু’ পাথর ভাত ও পূজার সময় এক-... নূতন কাপড় পাইত। সংসারের কোন কোন কাজ মাত্র করিবার তার ...ভারের উপর ছিল। অর্থাৎ, অতিপ্রত্যুষে আসিয়া সে আইরি কাঠের প্রকাণ্ড ...মার্জনী পরিচালনা করিয়া গোয়ালঘরখানি পরিষ্কার করিত; কূপ হইতে ...জল তুলিয়া গাই গরুটার জাবনা রাখিয়া দিত; গোবর লইয়া ঘরের প্রাচীরে ...চাপড়ি দিত, বাজারে ভজগোবিন্দ মাছ তরকারী কিনিয়া রাখিত, সে তাহা ...বাড়ী লইয়া আসিত; এবং সময়ে সময়ে ধান ভানিয়া দিত। শান্তমণির ভ্রাতৃ-...গৃহে পদার্পণের দুই দিন পরে এই ঝিটির চাকরী গেল।

সুতরাং সংসারে ঝি যে যে কাজ করিত, সেই সকল কাজের ভার শান্ত-...মণির উপর নিক্ষিপ্ত হইল। কেবল বাজার হইতে মাছ তরকারী বহনের ...কাজটি তাহার পরিবর্তে তাহার পুত্র রামকান্তের উপর পড়িল।

রামকান্তকে তাহার পিতা গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল। সাত ...বৎসরের ছেলে রামকান্ত তিন চারিখানি বাঙ্গালা কেতাব শেষ করিয়াছিল। ...দের বাড়ীতে আসিয়া শান্তমণি একদিন ভজগোবিন্দকে বলিল, “দাদা! ...খানে ত পাঠশালা আছে—রামকে পাঠশালায় দিলে হয় না?” দাদা বলিল, ...পাঠশালায় দিলে ছোঁড়াগুলো বয়ে যায়, গুরুজনের কথা কানে তোলে না, ...খেয়ালী হয়। রামকে পাঠশালায় দিয়ে ওর পরকালটা নষ্ট করতে চাইনে, ...আমার দোকানে বেচাকেনা শিখুক।” কথাটা শান্তমণির বড় মনে ধরিল ...। সে সজলনেত্রে বলিল, “দাদা, তাঁর মতলব ছিল, রাম একটু লেখাপড়া ...শিখে ভদ্রলোক হয়।” ভজগোবিন্দ বলিল, “রামের বাবা আস্ত একটা গরু ...! ভদ্রলোক হ’লে একালে পেট চালান কঠিন। ভাগ্যি ভদ্রলোক হইনি,

[illegible] কোন রকমে পেটটা চালাচ্ছি।” কথাটা [illegible] [illegible]দের স্ত্রী কামিনীর [illegible] প্রবেশ করিয়াছিল; সে নাসিকার [illegible] কুঞ্চিত করিয়া প্রতিবেশিনী সৌরভী দিদিকে বলিল, “মাগীর আবার বায়না দেখ! ছেলের [illegible] সোনার সখ! উনি এখানে ভাত্ড়া ভেনে থাকেন, আর পুত্তুর থাকেন [illegible]। বিদ্যে শিখে ছেলে মাকে চাকরী করে খাওয়াবে, আশাও ত কম নয়!” সৌরভী দিদি কিঞ্চিৎ বাজার একখানি কস্তাপেড়ে শাড়ী কিনিবার উমেদার ছিল; দোকানদার-গৃহীর মনোরঞ্জনের এমন সহজ সুযোগটি উপেক্ষা করিতে পারিল না; বলিল, “তা তো বটেই; তেমন যদি অদৃষ্ট হ’বে তো ভায়ের দোরে ছুটি ভাতের জন্যে আসবে কেন? ভাগ্যে যে বোন তোরা ছিলি, দু’ মুঠো দিয়ে লজ্জানিবারণ করিছেন; তা নইলে যে পথে দাঁড়াতে হতো। তা বোন, তোর শরীরটাও ত ভাল নয়, আর সংসারের ভারও এমন তোয়াক্কা নয়, দুটো পেট বসিয়ে বসিয়ে কতদিন চালাবি? নিজের সুখ স্বস্তিও ত দেখ্‌তে হয়, রান্নার ভারটা ওর হাতে দে না কেন?”

কামিনী বলিল, “দিদি! আমি সে কথা ভেবে দেখেছি, কিন্তু বিশ্বাস পাইনে। চাল ডাল নুন তেল চুরী ক’রে যদি লুকিয়ে লুকিয়ে বিক্রী করে, তখন কি উপায় করবো?”

শুভাকাঙ্ক্ষিণী প্রতিবেশিনী বলিল, “ভাবনা কি লো বোন? জিনিস এমন কসাকসি ক’রে দিবি, যেন কিছু সরাবার সুবিধা না পায়। তেল নুন ডাল মেপে দিলে বাঁচলে ত চুরী করবে?”

কামিনী দেখিল, এ পরামর্শ মন্দ নয়। পরদিন তাহার অসুখ হইল; শান্তমণিকে ডাকিয়া বলিল, “ঠাকুরঝি, আমার আজ বড় অসুখ, তুমি আজ একবার হেঁসেলে যাবে? রান্নাবান্নার ত ঝঞ্ঝাট কিছু নেই।”

শান্তমণি বলিল, “এ আর শক্ত কথা কি! তোমার অসুখ বিসুখেও যদি তুমি পরিশ্রম করবে, তা হ’লে আমরা আছি কেন?”

কথাটার মধ্যে কিছুমাত্র অসরল ভাব ছিল না। কিন্তু অনুগ্রহপ্রত্যাশিনী বিধবা ননদের কথা বক্রভাবে গ্রহণ করিলে তেজস্বিতা-প্রদর্শনের বিশেষ সুবিধা; কামিনী সে সুবিধা ত্যাগ করিতে পারিল না। সে বলিল, “অসুখ বিসুখের খোঁটা দিচ্ছ, অসুখ কি আর কারও করে না? আমার যেমন পোড়া [illegible], পরের জন্যে দুবেলা সংসার ঠেলতে ঠেলতেই আমার জীবন গেল। [illegible] ভাই ভাইপোরা ক’রে রয়েছে কি না!”

কথাটা শান্তমণির হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। কিন্তু পরের আশ্রিতাকে অনেক সময় অন্যায় তিরস্কারও নীরবে সহ্য করিতে হয়। দুটি অন্নের জন্য একারণে এ প্রকার অপমান সর্ব্বদা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিলেও, মধ্যে মধ্যে তাহার চক্ষে জল আসিত। সে অপমান বা অভিমানের অশ্রু নহে, স্বামীর আদর ও যত্নের কথা মনে করিয়া ও সেই সঙ্গে বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের তুলনা করিয়া তাহার চক্ষু দুটি অশ্রুময় হইয়া উঠিত, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাহাকে আত্মসংবরণ করিতে হইত। আজও তাহার চক্ষু দুটি শুষ্ক ছিল না। শান্তমণি ধীরে ধীরে গৃহিণীর সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল। কামিনী ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া বলিল, "কি-ই বা বলেছি? আমাকে দিলেন গাল, আবার উল্টে কান্না! এত যদি মানের ভয় ত মরতে এসেছিলি কেন এখানে? কেউ ত সেধে আনতে যায়নি। গতর খাটাতে হ'লে মরে যান্ আর কি!"

এ সকল কথা শান্তমণি শুনিয়াও শুনিল না। বাহিরের সকল কাজ সারিয়া সকাল করিয়া সে নদী হইতে স্নান করিয়া আসিল; তাহার পর রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। কামিনী যথাসাধ্য অল্পপরিমাণ তেল লবণ চাল ডাল বাহির করিয়া দিল।

৩

শান্তমণি সেই যে পাচিকার কাজ গ্রহণ করিল, আজও করিল, কালও করিল। কামিনীর আজ জ্বর, কাল কাশী, পরশু মাথাধরা ও তাহার পরদিন বাতের বেদনা, এই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল; কিন্তু আহারে তাহার অরুচি নাই, আয়েসটাও অতিরিক্ত বাড়িয়া গেল। দেহ ক্ষীণ হওয়া দূরের কথা, হাতের অনন্ত জোড়াটা বাহুমূলে আরও আঁটিয়া বসিল। কিন্তু তথাপি পাড়ার দত্তগিন্নি শুধু হাতে কামিনীর নিকট দুই টাকা ধার করিতে আসিয়া, তাহার দেহ আধখানা হইয়া গিয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না!

শান্তমণিকে দাসীর অধিক খাটাইয়া লইয়াও কামিনী তাহাকে দুটি মিষ্ট কথা বলিবার অবসর পাইত না। মাছ রাঁধিবার জন্য কামিনী যে পরিমাণ তৈল বাহির করিয়া দিত, তাহাতে অতি বড় পাকা রাঁধুনীও মাছকে না পুড়াইয়া আস্ত রাখিতে পারে না, এবং ডালে যদি লবণের ভাগ কম হইত, তবে তাহাও কামিনীর অতিসাবধানতার ফলে; কিন্তু এ সমস্তই শান্তমণির অমনোযোগ ও ঔদাসীন্যের ফল মনে করিয়া কামিনী যখন তখন [illegible]

একবার পাপাইয়া লইত; এবং তাহার গৃহিণীগর্ব্ব ষোলআনা চরিতার্থ করিত। একদিন বিড়ালে মাছ খাইয়া গিয়াছিল, তাই সেদিন কামিনীর মামাতো ভাই, অর্থাৎ ভজগোবিন্দের দোকানের মুহুরী কেনারামের পাতে ঝোলের অনুপাতে মাছের সংখ্যা কিছু অল্প হইয়াছিল, এই অপরাধে শান্তমণিকে অনেক কটু কথা শুনিতে হইল; কামিনী স্পষ্টাক্ষরে এ কথাও বলিল যে, বিড়ালে মাছ খাইয়াছে, এ অপবাদটা নিতান্তই অমূলক; সে একরাশি মাছ ভাতের মধ্যে লুকাইয়া তাহার পুত্র রামকান্তকে খাইতে দিয়াছে, এই জন্যই যোগ্যপাত্রে মৎস্যাভাব। ভজগোবিন্দ কিন্তু কোন দিন দুই পয়সার অধিক মাছ কিনিত না।

'মাছ' 'মাছ' করিয়া বাড়ীতে সেদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মত কোলাহল উপস্থিত হইল। দোকানে সেদিন বিস্তর মফস্বলের পাইকেড় কাপড় কিনিতে আসিয়াছিল; তাহাদিগকে বিদায় করিতে কেনারামকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইতে হইয়াছিল। প্রভাত হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া গৃহে ফিরিয়া যখন সে দেখিল, ঝোলের মাঝে টাংরা মাছের সংখ্যা নিতান্ত পরিমিত, তখন সে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, কামিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'কোথা থেকে একটা আপদ এনে জুটিয়েছ—একে ত রান্নাবান্নার কিছু বোঝে না, তার উপর ভাতের সঙ্গে না আছে তরকারী, না আছে মাছ, বাপের জন্মে কখনও এমন খাঁমুপ খাওয়া খাইনি।" কথাটা কেনারাম কেবল তাহার অর্দ্ধাঙ্গীকে শুনাইবার জন্যই বলে নাই, সুতরাং শান্তমণিও তাহা শুনিতে পাইল; গৃহিণীর উত্তরও শুনিল; কামিনী বলিল, "ঘরকন্নার যা কিছু জিনিস ছেলেটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়াবে, তা মাছ তরকারী থাকবে কোথা থেকে? ছেলে ত নয় একটা রাক্ষস। দুবেলা দু' পাথর ভাত নৈলে পেট ভরে না। দুবেলা দু' মুঠো ভাতের যার সংস্থান নেই, সে কোন্ বিবেচনায় পুত্রকামনা করে?"

শান্তমণি এ কথায় কোনও উত্তর দিল না। ভাতের হাঁড়িগুলি তাহার রান্নাঘরে ঢাকিয়া রাখিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, এবং একখানি ছিন্ন মাদুরের উপর প্রসারিত মলিন শয্যায় পুত্রের পাশে শুইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। রামকান্ত তখনও ঘুমায় নাই, মা কাছে আসিয়া শয়ন না করিলে ঘুমাইতে পারিত না। সে তাহার মাতাকে শুষ্কমুখে [illegible] শয়ন করিতে দেখিয়া [illegible] হইতে ধীরে ধীরে তাহার মাতার গায়ে হাত বুলাইতে

[illegible]সিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "মা! জল খাবিনে?" মা অশ্রু সংযত করিয়া বলিল, "না বাবা! আমার খিদে নেই।" রামকান্ত ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিল, তাহার পর দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "মা! কাল থেকে আমি আর মাছ খাব না, তা হ'লে মামীমা তোকে বকবে না।" পুত্রের এই শিশুসুলভ সরল সান্ত্বনাবাক্যে শান্তমণির মনের কষ্ট যেন আত্মপ্রকাশের একটা পথ পাইল, অশ্রু-রাশি চক্ষু ছাপাইয়া তাহার গাল বহিয়া মলিন উপাধান সিক্ত করিল। রামকান্ত অঞ্চল দিয়া মায়ের চক্ষু মুছিয়া দিতে দিতে কাঁদিয়া ফেলিল, বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিল, "মা! তুই কাঁদিস্‌নে; আমি বড় হ'য়ে টাকা রোজগার করব, তখন তোকে কেউ গাল দিতে পারবে না।" শান্তমণি অনেকক্ষণ নীরবে ভগবানকে স্মরণ করিল, মনে মনে বলিল, "হে নারায়ণ মধুসূদন, অভাগীর ছেলেটিকে রক্ষা কর, তার মুখের দিকে চাও, তাকে যেন আমি মানুষ করিয়া রাখিয়া মরিতে পারি, দয়াময়, আমার আর কোনও প্রার্থনা নাই।" তৈলহীন প্রদীপের শিখা ক্রমে ম্লান হইয়া আসিল; তাহার পর খাবি খাইতে খাইতে দীপরশ্মি অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল। শান্তমণি যে ঘরটিতে থাকিত, সেটি সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর। সেই ঘরের পশ্চাতেই একটা ডোবা, এবং ডোবার ধারে কতকগুলি জঙ্গল। অন্ধকারের মধ্যে মশার দল সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া গুণগুণ শব্দে গান আরম্ভ করিল। রামকান্ত মশার দংশনে অস্থির হইয়া উঠিল। পুনঃপুনঃ কেবল পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে লাগিল, অথচ মা মনে কষ্ট পাইবেন ভাবিয়া কোন কথা বলিল না। শান্তমণি নিজের দেহ অনাবৃত করিয়া তাহার মলিন অঞ্চলে পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিল, এবং তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া, শ্রান্তিভরে শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

৪

মামার বাড়ী আসিয়া রামকান্ত বড় অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল। সাত বৎসর বয়সের মধ্যে সে কখন বিদেশে যায় নাই, ঘর বাড়ী ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন স্থানের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। এখানে আসিয়া সে দেখিল, পৃথিবী সম্পূর্ণ আর এক রকম। বাড়ী থাকিতে সে প্রত্যহ [illegible] জোড়া পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া দত্তদের হরির সঙ্গে বা[illegible] স্কুলে যাই[illegible] এখানে আসিয়া সে দেখিল, যে পরিবারে সে প্রতিপালিত [illegible] সেখানে জামা জুতার গতিবিধি নাই। তাহার মামা ভজগোবিন্দ [illegible] চটিপায়ে

দিয়া কখন কখন শ্রীচরণের সম্বর্দ্ধনা করিত, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তাহা চালের বাতার আশ্রয় লইয়া অবজ্ঞাভাবে বিরাজ করিত। তিন চারি মাসের ব্যবহারেও তাহা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ছিল। জামা গায়ে দিলে বাবুয়ানার প্রকাশ পায় বলিয়া, জয়গোবিন্দ জামা জিনিসটা দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। রামকান্ত একদিন জামা গায়ে দিয়া বাহির হইয়াছে দেখিয়া জয়গোবিন্দ ভগিনীকে ডাকিয়া বলিল, "ও শান্ত! তোর ছেলে যে জামা গায়ে দেয়, কোন্‌দিন দেখ্‌চি ও মোছলমানের ভাত খেয়ে আসবে। বাবুগিরি টিরি এখানে খাট্‌বে না। আমার কাছে দোকান পাট করা শিখ্‌তে হবে। দোকানদারের বাবুগিরি সয় না।" রামকান্ত ছলছলনেত্রে বলিল, "মা! আমি জামা গায়ে দেব না, মামা বারণ কচ্ছে।" জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া সে মুখখানি বিষন্ন করিয়া মামার দোকানে গিয়া বসিল।

সেখানকার বিচিত্র কোলাহল, কাপড়ের দর দস্তর ও ক্রেতা বিক্রেতার তর্ক বিতর্ক, তাম্রকূটের ধূমকুণ্ডলী তাহার অসহ্য বোধ হইত। মামা তাহাকে এক এক দিন বিলাতী থান হইতে বড় বড় ছবি তুলিয়া দিতেন,—কোনটা ময়ূরের ছবি, কোনটা কদম্বমূলে রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের ছবি। ছবি লইয়া রামকান্ত মায়ের নিকট আসিয়া বলিত, "মা! এ ছবি আমাদের ঘরে টাঙাব।" হঠাৎ তাহার বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া যাইত। সে মাকে জিজ্ঞাসা করিত, মা! বাড়ী যাব কবে?" মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন, "বড় হ, চাকরী ক'রে পয়সা আন্‌তে শেখ, তখন আমরা বাড়ী যাব।" "এখনই চ মা, আমার এখানে মন টিকচে না, ক্ষ্যাপলার জন্যে আমার বড় মন কেমন কচ্ছে।" ক্ষ্যাপলা রামকান্তের এক জ্ঞাতি কাকার নয় মাসের ছেলে। রাম তাহাকে বড় আদর করিত, ক্ষ্যাপলাও রামকে দেখিলেই কচি হাত দুখানি বাড়াইয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত, এবং পথে লইয়া যাইবার জন্য রামকে ঠেলিত; রাম তাহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করিয়া তুলিত, কখনও বা তাহাকে কাঁধে তুলিয়া নাচিত, সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিলে চাঁদকে ডাকিয়া খোকার কপালে টিক দিয়া যাইতে বলিত, এবং যেদিন আকাশে নিবিড় মেঘ করিয়া প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিত, সেদিন সে শিশুকে কোলে লইয়া দাওয়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, এবং আকাশে মেঘ বিদ্যুতের খেলা দেখাইত। সেই সকল কথা মনে করিয়া প্রবাসী বিরহী বালকের সুকোমল স্নেহসিক্ত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটা তীব্র হাহাকার নির্গত হইত। সে তাহার

অশ্রুসজল চক্ষু দুটি [illegible]য়ে অবনত করিয়া মাটির দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত।

কখন কখন তাহার উদাসীন চিত্ত তাহার মামার বাড়ীতে বা দোকানে কোথাও টিকিত না। সে পদ্মাতীরে বড় একটা বাবলা গাছের ছায়ায় আসিয়া বসিত, এবং নদীর দিকে উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। রামজীবনপুরের পদতল ধৌত করিয়া পদ্মা পূর্ব্বমুখে দামুকদিয়া ঘাটের দিকে গিয়াছে। বৈশাখ মাসের মধ্যাহ্নরৌদ্রে চারি দিক নিঝুম, বহুদূরে চরের উপর বালুকারাশি ঘূর্ণাবর্ত্তে কুণ্ডলী পাকাইয়া আকাশের দিকে উঠিতেছে। সেই চরের প্রান্ত-ভাগে কালো জল সূর্য্যকিরণে ঝকমক করিতেছে। তীরে সুবিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর। শ্যামলতৃণদলশোভিত প্রান্তরের মধ্যে কোথাও বন-ঝাউর গুল্ম, কোথাও আকন্দের জঙ্গল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাবলাগাছগুলি মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া আছে। নিকটে বা দূরে কোথাও ছাগল চরিতেছে, কোথাও রাখা-লেরা গরু চরাইতেছে। দুই একখানি পর্ণকুটীর মাঠের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত, তাহার চারি দিকে আম কাঁঠাল বা কলার গাছ,—ছায়ায় দুই একটি কুকুর শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে। একটা নিমগাছের গুচ্ছ গুচ্ছ মুকুল হইতে সৌরভসঞ্চয় করিয়া উদাস মধ্যাহ্নবায়ু হা হা করিয়া বহিয়া যাইতেছে। মাঝিরা নৌকা ঘাটে বাঁধিয়া আহারাদির পর নৌকার ছৈএর নীচে পাটাতনের উপর গামছা বিছাইয়া শয়ন করিয়াছে, কেহ জাল বুনি-তেছে। বড় বড় ঢাকাই নৌকা পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া ভিন্ন দেশে যাইতেছে, এবং অনেক দূরে রাজাপুরের কোলের কাছে পাটনা-গামী ষ্টীমারের কৃষ্ণবর্ণ ধূম চিমনীর ঊর্দ্ধ হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া ষ্টীমার-ঘাটের আরোহিগণকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। বালক এই সকল দৃশ্যবৈচিত্র্যে আত্মহারা হইয়া পড়িত, কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে পড়িত, মা এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া হয় ত বড় কাতর হইয়াছেন; তখন সে তাড়াতাড়ি আলের উপর দিয়া আমবাগানের পাশ দিয়া ঘোষেদের বাতাভের ধার দিয়া মামার বাড়ী ফিরিয়া আসিত।

৫

মামা একদিন বৈকালে বলিলেন, "যা রে রামা! রাখালীদের সঙ্গে বাগানে আম কুড়িয়ে আন। ঝড়ে অনেক আম পড়েছে।" সেইদিন মধ্যাহ্নে খুব ঝড় হইয়া গিয়াছে। 'কালবৈশাখী'তে এ সকল-ঝড় প্রায়ই উঠে, আর

... ... সর্ব্বনাশ হয়। বাগানের আমগুলি যে পাড়া কুড়াইয়া লইয়া যাইবে, ভজগোবিন্দ তাহা সহ্য করিতে পারিল না। বাড়ীর নিকটেই বাগান।

রাম বলিল, "মামী কাঁদছেন, আম কুড়োতে যাব না ?" শান্তমণি বলিল, "আর বেলা নেই, আকাশে মেঘ রয়েছে, এমন সময়ে কি বাগানে আম কুড়োতে যেতে আছে ?"

কথাটা কামিনীর কানে গেল। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ ঊর্দ্ধে তুলিয়া নথটা সবেগে আন্দোলিত করিয়া বলিল, "ঝড় জলে ত মানুষ গরু সব মরে গেল! এই ত বাড়ীর কানাচে আমবাগান, পাঁচ জন লোকে কুড়িয়ে নেবে,তাই মামা বলেছে—রাখালীদের সঙ্গে গিয়ে আম নিয়ে আসুগে। তা ছেলে ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস হচ্ছে না, ছেলে ত আর কারও হয় না! স্বর্গে বাতি দেবে আর কি ?"

কথাগুলি শুনিয়া শান্তমণির মনে বড় কষ্ট হইল। সে বলিল, "বৌ! তুমি অন্যায় রাগ কচ্চো। ওর শরীর একেই রোগা, তার উপর এই কালবৈশাখীর দিন, জোরে জোরে ঠাণ্ডা বাতাস বচ্ছে, মেঘও লেগেছে; অতটুকু ছেলে—বৃষ্টি বাদলে ভিজলে কি বাঁচবে ? আমার ত আর কিছু নেই, ঐটুকুই আমার সম্বল, মা ষষ্ঠী যদি তোমাকে একটি দিতেন, তা হ'লে তুমি ছেলের মর্ম্ম বুঝতে।"

এবার কামিনী ভীমনাদিনী ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিল; বলিল, "ঐ অহঙ্কারেই তুমি গেলে! নিজের অন্ন জোটে না, ছেলে কাঁকে নিয়ে আমার দোরে এসে পড়তে লজ্জা করে না ? যার খাবে, তারই বুকে বসে দাড়ি উপড়োবে ? কলির স্বধর্ম্ম!"

রাম সজলনয়নে বলিল, "মা যাই, মামীমা বড় রাগ করেছে।" রাম চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইল। অপরাহ্নের যাট-কার যে মেঘ কাটিয়া গিয়াছিল, তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া যেন একত্র জমাট বাঁধিল। প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। রাম একটা আমগাছের নীচে দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিল; ... বাহিরে যাওয়াও কঠিন, দাঁড়াইয়া ভিজাও কষ্টকর। ... বৃষ্টি থামিল না। সন্ধ্যার সময় ... রাখালদের সঙ্গে রাম ভিজিতে ... ...ল।

শান্তমণি এতক্ষণ ঘর ও [illegible] [illegible]তেছিল। সে পুত্রকে কোলে [illegible] তাহার মাথা মুছিয়া দিল। [illegible] রামের [illegible] থর থর কাঁপিয়া কাঁপিতেছিল, সর্ব্বশরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়াছিল। শান্তমণি নিজের ঘরের মধ্যে একখানি মাদুর বিছাইয়া তাহার উপর রামকে শোয়াইল ; একখানি ময়লা কাঁথা দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিল। কিন্তু রামের কাঁপুনি থামিল না। সেই রাত্রে তাহার বড়-জ্বর হইল।

পরদিন শান্তমণি দেখিল, রামের দুই চোখ জবাফুলের মত লাল, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে। ছেলেটিকে লইয়া সে কি করিবে, কোথায় যাইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না, নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আজ তাহার মনের কষ্ট বুঝিবার মানুষ কেহই নাই। শান্তমণি ছেলের কাছে বসিয়া থাকিল, তাহার মুখে জল দিতে লাগিল ; আজ সে সংসারের কোনও কাজে হাত দিতে পারিল না।

কামিনীর গর্জ্জন আজ তিন গুণ বাড়িয়া গেল। সে বকিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল, "ছেলে ত পৃথিবীতে আর কারও নেই! রোগ বালাই ত আর কারও হয় না! সব তাতেই বাড়াবাড়ি!"

শান্তমণি কোন কথা বলিল না। তখন কামিনী ক্রুদ্ধভাবে তাহার সম্মুখে আসিয়া দুই হাত নাড়িয়া কুৎসিত ভঙ্গী করিয়া বলিল, "বলি আজ কি সংসারের কাজ হ'বে না? দশটা দাসী বাঁদী আছে না কি? দুপুর পার না হ'তেই ত এক পাথর ভাত গিলতে বসবে, চাল সিদ্ধ করে দেবে কে?"

শান্তমণি এবার কাতরভাবে বলিল, "বৌ, তুমি যদি ছেলের মা হতে, তা হ'লে বুঝতে পারতে, আমার মনে কি কষ্ট। ছেলের এমন অসুখ, আর তুমি আমার খাবার কথা তুলে খোঁটা দিচ্ছ! দুঃখিনী আমি, অনাথা আমি, তাই ব'লে কি এত বাক্যযন্ত্রণা দিতে হয়?"

কামিনী সক্রোধে বলিল, "কি! আমাকে তুই আঁটকুড়ী বলি? এত বড় মুখ! যার খাবেন, তারই কুচ্ছো করবেন। [illegible] আগে মিন্‌সে, দুধ দিয়ে কালসাপ পুষচে! বাপে জমীদারী ক'রে [illegible] গিয়েছে কি না, ব'সে ব'সে যত আপদকে পুষবে, আর আমাকে গঞ্জনা [illegible] হবে। ছেলের মা হয়েছিস ব'লে বড় অহঙ্কার হয়েছে, [illegible] [illegible]ন, তেরাত্রিও যাবে না— [illegible]—যাবে না।"

[illegible] ঝড়ের মত বেগে [illegible] হইল।

কামিনী সেদিন ইচ্ছা করিয়াই ভাত রাঁধিতে গেল না। রান্নাঘরে শিকল দেওয়া রহিল। মধ্যাহ্নে ভজগোবিন্দ দোকান হইতে বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, রন্ধনের কোন আয়োজন নাই, পত্নীর মুখখানি শ্রাবণের মেঘের মত অন্ধকার, ধানসিদ্ধ করিবার ভোম্বো হাঁড়ির মত ভারি। ভজগোবিন্দ অচিরকালমধ্যেই জানিতে পারিল, ছেলের অসুখের একটা তুচ্ছ ছল ধরিয়া শান্ত ভাত রাঁধিতে যায় নাই, এবং কামিনীকে নানা রকম অকথ্য গালি দিয়াছে।

ভজগোবিন্দের মেজাজটা কিছু দমিয়া গেল। গুড় ও তেঁতুল দিয়া চিঁড়া ভিজাইয়া সে বেলা সে ভোজন শেষ করিল। কামিনী ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া কি খাইল, কেহ বলিতে পারে না। শান্তমণি মুখে জলবিন্দু দিল না। সে আশা করিয়াছিল, দাদা তাহার পুত্রের জরের সংবাদ পাইয়া একবার দেখিতে আসিবেন। কিন্তু ভজগোবিন্দ সে দিকে অগ্রসর হইল না; দাওয়ায় বসিয়া গম্ভীরভাবে হুঁকা টানিতে লাগিল।

শান্তমণির প্রাণের দায়,অভিমান করিয়া থাকা চলে না; সে ভজগোবিন্দের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "দাদা, রামের কাল রাত্রি থেকে বড় জর, একবার ডাক্তারকে ডাকালে হয় না?"

ভজগোবিন্দ হুঁকা হইতে মুখ নামাইয়া বলিল, "সামান্য জর হয়েছে, সেরে যাবে,তার জন্যে এত কুরুক্ষেত্র ব্যাপার করা কেন? ডাক্তার ডাকবারই বা কি আবশ্যক? পীতাম্বর ডাকমুন্সীর কাছ থেকে দু' পুরিয়ে কুনিয়ান কিনে পাঠিয়ে দেবো, গা জুড়োলে তাই খাইয়ে দিও।"

সমস্ত দিনের মধ্যে গা জুড়াইল না, কুইনাইনও খাওয়ান হইল না। দ্বিতীয় দিনও এই ভাবে গেল। শরীরে বিষম উত্তাপ, ভয়ানক পিপাসা, চক্ষু রক্তবর্ণ। দ্বিতীয় দিন রাত্রে রামকান্ত মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বকিতে লাগিল। একটি ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপের সম্মুখে বসিয়া অভাগিনী বিধবা নীরবে অশ্রু মুছিতে লাগিল। আজ তাহার দুঃখ ও বিপদ বুঝিবার লোক পৃথিবীতে এক জনও নাই।

হরিনামসংকীর্ত্তন শেষ করিয়া রাত্রি এগারটার সময় ভজগোবিন্দ বাড়ী আসিল। শান্তমণি বলিল,"দাদা! রাম আমার কেমন করচে,এ দুদিনে গা একটু জুড়োলো না, ধান দিলে খৈ হয়! আমার এই বালা দুগাছি ছিল, এই নাও, বিক্রী ক'রে ডাক্তার দেখাও দাদা, আমার আর কে আছে?" শান্ত আর কথা

কহিতে পারিল না, তাহার চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ভজগোবিন্দ প্রশান্তমনে সুবর্ণবলয় জোড়াটি গ্রহণ করিয়া বলিল, "আজ ত অনেক রাত্রি হয়ে গিয়েছে, কাল সকালে ডাক্তার ডাকা যাবে। জ্বর হয়েছে, বসন্তও নয়, ওলাউঠাও নয়, দু চার দিন লঙ্ঘন দিলেই সেরে যাবে, তার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? জ্বর না হয় কার?" কিন্তু মাতার মন ইহাতে প্রবোধ মানিল না। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শান্তমণি পুত্রের সেবা করিল।

পরদিন সকালে শ্রীনাথ ডাক্তার রামকে দেখিতে আসিল। রামের বগলে থর্ম্মামিটার দিল, বুকে পিঠে চোঙ্গ লাগাইয়া পরীক্ষা করিল, তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিল, "এ যে দেখছি বাতশ্লেষ্মার জ্বর হইয়াছে, একেবারে বিকার চাপিয়াছে। পরামাণিকের পো, তুমি ছেলেটির ভালরকম চিকিৎসা করাও, রোগ কঠিন।" ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেল।

কামিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "জ্বর আবার কঠিন! মিন্সের টাকা নেওয়ার ফন্দী!"

ঔষধে কোন ফল হইল না। বিকারের যন্ত্রণায় রোগী ছটফট্ করিতে লাগিল। বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল। কখন বলে, "মা! বাবার কাছে যাব;" কখন বলে, "মা! বাড়ী চল্।" আবার যখন জ্ঞান হয়, তখন বলে, "মা! তুই কাঁদিস্ কেন, আমি ভাল হ'ব।"

কিন্তু রোগ দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। দুই সপ্তাহ দেখিয়াও শ্রীনাথ ডাক্তার কিছুই করিতে পারিল না, চোদ্দ দিনের দিন ডাক্তার গম্ভীরমুখে বলিল, "পরামাণিকের পো! আমি ত বাপু! প্রাণ দিতে পারিনে, তোমার এই ভাগ্নেটির পরমায়ু বড় অল্প।" শান্তমণি ডাক্তারের পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িল, তাহার সংজ্ঞালোপ হইল।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে রাম রক্তবর্ণ চক্ষু ঊর্দ্ধে তুলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে যেন কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "মা, আমবাগানে বড় কাঁটা, আমি আর আম কুড়োতে যাব না মা!" মা পুত্রের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিল, "ওরে আমার অঞ্চলের নিধি, ওরে আমার সাগর-ছেঁচা ধন, আমাকে তুই ফাঁকি দিয়ে কোথা যাস্, আমি আর কি নিয়ে থাকব?" রাম কোন উত্তর দিল না। অন্তিম হিক্কায় তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইল, সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও কঠিন হইয়া গেল, জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব

[illegible]য়া গেল। [illegible]মণি আছড়াইয়া পড়িয়া ডাকিল, "রাম, বা[illegible]রে!" ভজগোবিন্দ বলিল, "হরি হে! তোমার ইচ্ছা! [illegible]গুলো মিছি মিছি ডাক্তারকে দিয়ে খাওয়াইলাম!"

কামিনী বলিল, "[illegible] পুড়িয়ে [illegible]লে গো! একে মাথার ব্যামো নিয়ে বাচিনে, আবার এই রাত্তিরকালে স্নান করালে!"

ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা 'বিদ্যাসুন্দর'কে গোবিন্দগীত বলিয়াছি। কিন্তু তাহাতেই ভারতচন্দ্রের কবিতার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ মিথ্যা হইয়া যায় না,—হীনপ্রভ-মাত্র হয়। সুতরাং এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এখানেই ক্ষান্ত হওয়া যায় না।

পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের মধ্যে কাহার রচনার বিরুদ্ধে এই অশ্লীলতার অভিযোগ নাই? অভিড, কেটুলাস, প্রোপারসিয়াস, জুবেনাস, বোকাচিও, আরিয়স্টো, ভলটেয়ার, লাফনটেন, সেক্সপীয়ার, স্পেন্সার, ড্রাইডেন, কালিদাস,—কাহার রচনা এই অপবাদমুক্ত? ইংরাজ কবিগণ বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে বিশেষ পরিচিত, তাঁহাদের দুই জনের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

ভারতচন্দ্রের রচনাকে অশ্লীল বলিতে যাইয়া বাঙ্গালী সমালোচক বলিয়াছেন,—"সেক্সপীয়রের অশ্লীলতা, আমরা ভাবিয়া পাই না।" (১) তিনি ভাবিয়া পান নাই সত্য; কিন্তু যুরোপেই কোন কোন চিন্তাশীল লেখক পাইয়াছেন। রুসিয়ার কাউন্ট টলষ্টয় সেক্সপীয়ারকে অশ্লীলেরও অধিক মনে করেন। তাঁহার মতে, সেক্সপীয়ার immoral,—তিনি পরিহাসে শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করেন। কাউন্ট এই লেখকের এত অধিক আদরের কারণ বুঝিতে পারেন না। (২)

---

(১) নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়; 'ভারতচন্দ্র' [illegible], ১২৯৯।

(২) Hugo Ganz,—*The Downfall of Russia.*

সেক্সপীয়রের রচনা হইতে অশ্লীল স্থল উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। স্বীয় পত্নীর চরিত্রে সন্দেহের কারণ পাইয়াছে ভাবিয়া পসথুমাস আপনার জননীর চরিত্রে যে সন্দেহের কথা বলিয়াছেন, তাহা পাপচিত্তের বিকাশ, অপাঠ্য। (৩) ইহার সমর্থনে সমালোচক বলিয়াছেন, নাটককার "হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাত দেখাইতে [illegible]ত্তর চিত্র বা কার্য্য দেখাইতে পারেন।" (৪) কিন্তু এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বৃটিশ দার্শনিক বলেন, সর্ব্বজনবিদিত গুপ্ত ব্যাপার কেহ আপনার নিকটও বলিবে না। (৫) আবার ফরাসী সমালোচক বলেন, উপন্যাসে যাহা অশোভন নহে, নাটকে তাহা একান্ত অশোভন। উপন্যাস মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ, তাহা যথাযথ হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ, তাহা বিজ্ঞান। তাহা পুস্তকাগারে পঠিত হইবে। কিন্তু নাটক রঙ্গালয়ে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারীর সমক্ষে অভিনীত হয়। দৃশ্যপটে ও আলোকে তাহা জীবন্ত হয়। শয্যা-কক্ষের দৃশ্য উপন্যাসে স্থান পাইতে পারে—নাটকে নহে। (৬) যদি সুরুচির আতিশয্য প্রকাশ করিতে হয়, তবে অশোভনকে সর্ব্বত্রই অশোভন বলা সঙ্গত।

প্রস্পেরোর নিকট কালিবানের মিরাণ্ডা-সম্বন্ধীয় কথা একান্ত অশ্লীল—শিষ্টসমাজে পঠিত বা রঙ্গমঞ্চে উচ্চারিত হইবার অযোগ্য। (৭) ম্যাকডাফের নিকট প্রতীহারের মদ্যপানের বিষময় ফলের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণকেও শ্লীল বলা যায় না। (৮) ইংরাজ সমালোচকগণ ইহা অশ্লীল মনে না করিলে বিদ্যালয়-পাঠ্য সংস্করণ হইতে ইহা নির্ব্বাসিত হইত না। তথাপি হয় ত কোন সমালোচক বলিবেন, প্রথমোক্ত পদ পশুর প্রবৃত্তি-প্রকাশক ও দ্বিতীয়োক্ত পদ মদ্যপের মত্তাবস্থায় মত-প্রকাশ। কিন্তু সেক্সপীয়রের অশ্লীলতা এইরূপ স্থলেই বদ্ধ নহে। "হ্যামলেটে" অভিনয়দৃশ্যে সুশিক্ষিত হ্যামলেট সরলা ওফিলিয়ার সহিত কথোপকথনে যে সকল অশ্লীল কথা কহিয়াছিলেন, তাহাতে লজ্জায় আরক্তা হইয়াও কুমারী কি প্রকারে স্বস্থানে উপবিষ্টা ছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। বিশেষতঃ তাঁহার জননী তাঁহাকে আপনার নিকট আসিয়া বসিতে

(৩) Cymbeline—Act II, Scene V.

(৪) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; 'কাব্যচন্দ্র' —সাহিত্য, ১২৯৯।

(৫) Carlyle.

(৬) Taine—History of English Literature.

(৭) The Tempest—Act I, Scene II

(৮) Macbeth—Act III., Scene II.

বলিলেন তিনি ম্লানবদনে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিতে এখনও বিদ্যালয়ে গুরুকে ও শিষ্যকে [illegible] হইতে হয়। (৯)

বলা বাহুল্য, এইরূপ অশ্লীলতায় সেক্ষপীয়ারের প্রতিভা কলঙ্কিত হয় নাই, হইবে না। প্রকৃত প্রতিভা অগ্নির মত যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই সমুজ্জ্বল ও মলিনতামুক্ত করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু সেক্ষপীয়ারের এই অশ্লীলতার কারণ কি? কারণ, তাঁহার সমসাময়িক সমাজের পরিচয়েই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সে সমাজ কিরূপ?

সেক্ষপীয়ার স্বয়ং রঙ্গালয়সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রঙ্গালয় টেম্স্ নদীর তীরে অপরিচ্ছন্ন স্থানে সংস্থাপিত ও কর্দ্দমাক্ত পয়ঃপ্রণালীতে বেষ্টিত ছিল। রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটাদি প্রায় ছিল না; লোকে সব কল্পনা করিয়া লইত। ছয় আনা, দুই আনা, এমন কি, এক আনাতেও প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যাইত। বৃষ্টি হইলে অনাবৃত স্থানে উপবিষ্ট দর্শকগণ বারিসিক্ত হইত। পথিপার্শ্বে মুক্ত পয়ঃপ্রণালীর দূষিত বায়ুতে তাহারা অভ্যস্ত ছিল;—তাহারা সহজে অসুস্থ হইত না। অভিনয়-আরম্ভের পূর্ব্বে দর্শকগণ মদ্যপান করিত, ফলাহার করিত; সময় সময় পরস্পরকে প্রহারও যে না করিত, এমন নহে। কখন কখন অভিনেতাকে প্রহৃত হইতে হইত; সময় সময় কবিকে কম্বলে তুলিয়া উৎক্ষিপ্ত ও পাতিত করাও হইত। মদ্যপানের পর মত্ততা গাঢ় হইলে দর্শকদিগের বমনাদির জন্য মুক্তমুখ পিপা আনয়ন করা হইত। দুর্গন্ধে লোক অস্থির হইলে রঙ্গমঞ্চে গন্ধকাষ্ঠ জ্বালাইয়া ধূমে দুর্গন্ধ দূর করা হইত। রাজা প্রজা সকলেই সমান। সকলেরই ব্যবহারে সংযমের অভাব স্বপ্রকাশ। ভদ্রসমাজের ভাষাও অশিষ্ট। সমাজের উচ্চতরবর্ণদিগের গৃহে যে সঙ্গীত গীত হইত, এখন তাহা কেবল মদ্যবিক্রয়বিপণীতে শ্রুত হয়। (১০) এই সমাজের জন্য, এই সব দর্শকের জন্য, সেক্ষপীয়ার তাঁহার নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

প্রাকৃতিক অবস্থার উপযোগী না হইলে বৃক্ষের বা জীবের অস্তিত্ব থাকে না। তাহার পুষ্টি হইলে বুঝিতে হইবে, সে অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী। সেক্ষপীয়ারের সমসাময়িক সমাজের অবস্থা আমরা অবগত হইয়াছি। সেক্ষপীয়ার এই সমাজে খ্যাতি ও উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি সেই

---

(৯) Hamlet—Act III., Scene II.

(১০) Taine—History of English Literature.

সমাজের উপযোগী ছিলেন। (১১) সমসাময়িক সমাজে সেক্সপীয়ারের অশ্লীলতার কারণ সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আর এক জন ইংরাজ কবির কথা বলিব। ড্রাইডেন অশ্লীল, কেবল নাটকে নহে—সর্ব্বত্র। ড্রাইডেনের অশ্লীলতার কারণও তাঁহার সমসাময়িক সমাজের ইতিহাসে প্রাপ্তব্য।

ইংলণ্ডে পুতাচার-যুগের অবসানে রাজা দ্বিতীয় চার্ল সের আগমনসময়ে ড্রাইডেনের প্রভাব ও প্রতাপ। তখন জনসাধারণের আনন্দসম্ভোগলালসার আতিশয্যে লজ্জা ভাসিয়া গিয়াছে। এই সময়ের কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তখন শিক্ষাভিমানী সাহিত্যসেবকদলেরও অধঃপতন শোচনীয়। এডমণ্ড ওয়ালার, ক্রমওয়েলের সময় তাঁহার ও পরে চার্ল সের সময় তাঁহার প্রশংসাকীর্ত্তন করিয়া কবিতা রচনা করেন। প্রথমোক্ত কবিতার উৎকর্ষ দ্বিতীয়োক্ত কবিতাকে ম্লান করে। তাই তিনি চতুর সভাসদের মত অম্লান-বদনে বলেন,—রাজন্, কবিরা সত্য অপেক্ষা কল্পিতের রচনায় অধিক সফল হইয়া থাকেন। যখন সাহিত্যসেবকদিগের এইরূপ দুর্ম্মতি, তখন সাধারণ জনগণের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে; অধিক বর্ণনা অনাবশ্যক।

এই সময়ের অশ্লীলতা কেবল সাহিত্যেই স্বপ্রকাশ নহে—পরন্তু শিল্পেও আপনাকে বিকশিত করিয়াছিল। প্রথম চার্ল সের সময়ের রাজসভার চিত্র-করের চিত্রিত চিত্রে ও দ্বিতীয় চার্ল সের সময়ের রাজসভার চিত্রকরের চিত্রে কি প্রভেদ! ফরাসী সমালোচক টেন বলেন, প্রথমোক্ত চিত্র দেখিয়া দ্বিতীয়োক্ত চিত্র দেখিলে মনে হয়, যেন প্রাসাদ হইতে বিলাসাগারে প্রবেশ করিলাম। নারীচিত্রে এই দুই সময়ের চিত্রের প্রভেদ সুস্পষ্ট। প্রথমোক্ত চিত্রকরের চিত্রে চিত্রিতা মহিলাগণের মুখভাবে লজ্জা, সম্ভ্রম ও গাম্ভীর্য্য বিক-শিত। দ্বিতীয়োক্ত চিত্রকর শ্লথবসনা, যৌবনসম্পদপ্রদর্শনব্যাকুলা, লজ্জাহীনা বিলাসিনীদিগের চিত্রমাত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ফরাসী সমালোচকের তীব্র সমালোচনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, ইহার অনুবাদ করিতে পারিলাম না।

"When we alternately look at the works of the court painters of Charles I. and Charles II., and pass from the noble portraits of

(১১) Dowden—Shakespeare—His Mind and Art.

Van Dyk to the figures of Lely the fall is sudden and great, we have left a palace, and we light on a bagnio.

"Instead of the proud and dignified lords, at once cavaliers and courtiers, instead of those fine yet simple ladies who look at the same time princesses and modest maidens, instead of that generous and heroic company, elegant and resplendent, in whom the spirit of the Renaissance yet survived, but who already displayed the refinements of the modern age, we are confronted by perilous and importunate courtesans, with an expression either vile or harsh, incapable of shame or of remorse. Their plump smooth hands toy fondly with their dimpled fingers; ringlets of heavy hair fall on their bare shoulders; their swimming eyes languish voluptuously; and insipid smile hovers on their sensual lips. One is lifting a mass of dishevelled hair which streams over the curves of her rosy flesh; another languidly and without constraint, uncloses a sleeve whose soft folds display the full whiteness of her arms. Nearly all are half-draped; many of them seem to be just rising from their beds; the rumpled dressing-gown clings to the neck, and looks as though it were soiled by the nights debauch; the tumbled undergarment slips down to the hips; their feet crumple the bright and glossy silk. Though shameless, with bosoms uncovered, they are decked out in all the luxurious extravagance of prostitutes; diamond girdles, puffs of lace, the vulgar splendour of gilt, a superfluity of embroidered and rustling fabrics, enormous head-dresses, the curls and fringes of which, rolled up and sticking out, compel notice by the very height of their shameless magnificences. Folding curtains hang round them in the shape of an alcone, and the eyes penetrate through a vista into the recesses of a wide park, whose solitude will not ill serve the purposes of their pleasures. (১২)

এই সময় রঙ্গালয়ে দর্শকদিগের নিকট সেক্সপীয়ারের নাটকও নীরস ও হাস্যোদ্দীপক। (১৩) এই সমাজের জন্য ড্রাইডেনের রচনা রচিত;—তাই ড্রাইডেন অশ্লীল।

ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার কারণও তাঁহার সমসাময়িক সমাজের রুচিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে সময়ের কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। মুক্তা

(১২) Taine—History of English Literature.

পাঠক Court Beauties of the Reign of Charles II. গ্রন্থে এই সকল চিত্রের প্রতিলিপি দেখিতে পাইবেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখিকা এই সময়ের বিবরণ সংক্ষেপে অসাধারণ দক্ষতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—লেখক।

(১৩) Pepys' Diary, ii. Sept. 29, 1662.

খাঁ রাজসভায় যে বিলাসবাহুল্য ও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তদীয় পুত্র সরফরাজ সে সকল পুষ্ট ও পূর্ণ করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর অতিরিক্ত স্নেহে নষ্ট সিরাজদ্দৌলা সেই যুগল প্রবাহে অমানুষী নিষ্ঠুরতার প্রবাহ যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট প্রজার মান সম্ভ্রম, রমণীর সতীত্ব যে মূল্যহীন ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি নিজ পরিবারে দুর্নীতির দূষিত বায়ুতে লালিত পালিত। আবার বর্ষাবারিপাতপুষ্টা তরঙ্গিণী যখন চঞ্চল আবর্ত্তে প্রবাহিত হইত, তখন বহুযাত্রিপূর্ণ পারাপারের খেয়ার নৌকা ডুবাইয়া মজ্জমান দুর্ভাগ্যদিগের জীবনরক্ষার্থ বিফল চেষ্টা দেখিয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন। (১৪) বহু নির্দ্দোষের মৃত্যুতে যে হৃদয় আনন্দলাভ করে, সে হৃদয় মানবের নহে,—পিশাচের।

রাজসভায় তখন বিলাসের সঙ্গে সঙ্গে পাপের পূর্ণ প্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত। তাহার তরঙ্গতাড়নে সুরক্ষিতপ্রাসাদবাসিনী রাণী ভবানী হইতে পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই বিব্রত। দেশের প্রধানগণও কেহ কেহ রাজার দৃষ্টান্তে খাল কাটিয়া এই প্রবাহবারি আনিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাসনা-বিনাশই যে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রশংসিত, নিবৃত্তি যে হিন্দুর নিকট মহাধন, কামনা-কল্মষ হইতে মুক্তিলাভ করাই যে হিন্দুর একান্ত প্রার্থিত, সেই হিন্দু, হিন্দু ভূম্যধিকারী, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণও মুসলমানের অনুকরণে, সভায় ও গৃহে, আহারে ও বিহারে, বিলাসের বাহুল্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সামাজিক আচারও যে সে বাহুল্যে কলুষিত হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। আদর্শ সংক্রামক। রোগ দেহে একবার প্রবেশ করিলে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রই তাহার ফলভোগ করে—না করিয়া পারে না।

তখন অবিচারীর অত্যাচারে জনসাধারণের মেরুদণ্ড নত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাণ ও মানরক্ষা করিতে তাহাদিগকে চাতুরীর ও অসত্যের আশ্রয়ও যে লইতে হইত না, এমন নহে। রাজনীতি তখন সূক্ষ্ম চাতুরীমাত্র। রাজসভায় ষড়যন্ত্র ও স্বার্থপরতা তখন সাহসের ও সরলতার স্থান অধিকার করিয়াছিল। সত্য বটে, মানবের অধিকাংশ কার্য্যে স্বার্থই সর্ব্বপ্রধান উত্তেজক। কিন্তু যে স্বার্থপরতা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অবলম্বিত উপায়ের

---

(১৪) Laid's Account—*vide*—Hill's *Three Frenchmen in Bengal*

ন্যায়ান্যায়-বিচার আবশ্যক বিবেচনা করে না, সে স্বার্থপরতা সমাজের পক্ষে ভীষণ ভীতির কারণ। সুজা যাঁর অনুগ্রহে নিরন্ন আলিবর্দ্দী একটি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যলাভলিপ্সার প্রবল উত্তেজনায় তিনি সে কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ, নির্ব্বোধ সরফরাজকে বুঝাইয়াছিলেন যে, তিনি কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন, রাজদ্রোহী হইবেন না; কিন্তু তিনি যাহাকে কোরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে আস্তরণাবৃত ইষ্টকখণ্ডমাত্র। (১৫) আলিবর্দ্দী যখন সরফরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তৎকালে তাঁহার সহায় জগৎশেঠ সরফরাজের কর্ম্মচারিবর্গকে উৎকোচদান করিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য,—তাহারা কামানে গোলাবারুদ না দিয়া মৃত্তিকামাত্র পূর্ণ করিবে। (১৬)

আলিবর্দ্দী উর্ব্বরক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বপন করিয়াছিলেন; অল্পদিনেই প্রচুর ফলভারে সে তরুর শত শাখা নত হইয়াছিল। তদীয় স্নেহপুত্তল সিরাজদ্দৌলা সেই বিষময় ফল আস্বাদন করিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতকদিগের ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে তিনি সিংহাসনচ্যুত হয়েন। দুর্ল্লভরাম, মাণিকচাঁদ, উমিচাঁদ, কৃষ্ণচন্দ্র, এমন কি, রাজবল্লভও সহসা সিরাজদ্দৌলার অনিষ্ট করিতে পারিতেন না। জগৎশেঠ বিমুখ হইলেও তিনি সহসা সিংহাসনচ্যুত হইতেন কি না সন্দেহ। সেনাপতি মীরজাফর বিমুখ হইয়াছিলেন বলিয়াই পলাশীক্ষেত্রে ইংরাজের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল। কবিকল্পিত সিরাজদ্দৌলার আক্ষেপ,—"অবিশ্বাসী - আততায়ী —বধিল জীবন"(১৭) সম্পূর্ণ সত্য। যাঁহারা অজ্ঞাতকুলশীল ইংরাজ বণিকের সহায়তায় অত্যাচারী সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নৈতিক আদর্শ বা দূরদর্শিতা কিছুরই প্রশংসা করা যায় না। রাজ্যলোভে, "আজন্ম যাহার অন্নে বর্দ্ধিত শরীর", সেই আলিবর্দ্দীর প্রিয় দৌহিত্র, স্বীয় প্রভু, শরণাগত সিরাজদ্দৌলাকে যে বিশ্বাসঘাতকতার বিষম ষড়যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট করিতে ইতস্ততঃ করে নাই, তাহার পক্ষে স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বনাশ করা কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না।

---

(১৫) Riyazu-s-Salatin

(১৬) মুতাক্ষরীণ টীকা।

(১৭) নবীনচন্দ্র সেন—"পলাশীর যুদ্ধ"।

তৎকালীন রাজনীতির আলোচনা করিলে ... ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হয়। সর্ব্বত্র ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র সংগঠিত হইয়াছিল। ষড়যন্ত্র গোপন করিবার জন্য ইংরাজ বণিক জাল দলীল লিখিয়া উমিচাঁদকে ... ছিলেন। তখন এই কলুষিত রাজনীতির এমনই প্রভাব যে, ... রাজ্যের ভিত্তিস্থাপক লর্ড ক্লাইভ এ কার্য্য দোষাবহ বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। (১৮)

সকল জাতির চরিত্র ও শক্তি সমাজের নিম্নস্তরে উৎপন্ন হয়, শিল্প উচ্চস্তরে আরব্ধ হয়। (১৯) আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বাঙ্গালার সমাজের নিম্ন স্তর উৎপীড়নের অত্যাচারে নিস্তেজ—পশুবৎ ব্যবহৃত, ক্ষমতা লেশহীন। রাজসভায় তাহাদের কণ্ঠস্বর উত্থিত হয় না, রাজকার্য্যে তাহাদের কোনরূপ অধিকার নাই, তাহারা কেবল রাজার ও প্রধানগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রম করে, আবশ্যক হইলে প্রাণ দেয়। উচ্চস্তরের দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই স্তরের অন্তর্গত শিল্পও কার্য্যোপযোগী। স্থপতিশিল্প সরলসৌন্দর্য্যহীন, গাম্ভীর্য্যবঞ্চিত, কেবল বিলাসিনীর মত অনাবশ্যক অলঙ্কারভারে পীড়িত, অলঙ্কারের বাহুল্যে প্রকৃত সৌন্দর্য্যহীনতা-গোপনে প্রয়াসী। মন্দিরে ও প্রাসাদে কেবল অলঙ্কারবাহুল্য—কেবল সম্পদ-প্রদর্শন-প্রয়াস। চিত্রে দেবমূর্ত্তিও দেবীমূর্ত্তির মত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত—কোন কোন দেবতা নারীজনের নাসাভরণের অত্যাচারও সহ্য করিয়াছেন। দেবী মূর্ত্তির ত কথাই নাই। কর, চরণ, কণ্ঠ, অলঙ্কারে আবৃত, মধ্যদেশও অলঙ্কারভারে ভারাক্রান্ত। অলঙ্কারের এই বাহুল্য দেবীপ্রতিমায় অদ্যও লক্ষিত হইবে। গণপতিও নারীঅলঙ্কারপরিধানের প্রলোভনমুক্ত হইতে পারেন নাই। যাঁহারা আপনাদের চিত্র অঙ্কিত করাইয়াছেন চিত্রকর তাঁহাদিগের চিত্রে করধৃত কুসুমের বর্ণ সম্বন্ধে যত মনোযোগ দান করিয়াছেন, নয়নদ্বয় স্বাভাবিক করিবার তত চেষ্টা করেন নাই।

ভারতচন্দ্র এই সমাজের কবি। তিনি নানা দিকে ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ও তিনি উভয়েই উদ্ধত অভিমানে ক্ষমতাশালীর অসম্মান করায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। শেষে তিনি সম্পদ ও সম্মান উভয়ই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—তখন তিনি সমাজের উপযোগী হইয়াছিলেন।

(১৮) Thornton—History of the British Empire in India.
(১৯) Conway—Domain of Art.

ভারতচন্দ্রের পিতা ভূমিগত তর্কে বর্দ্ধমান-রাজমাতাকে গালি দিয়াছিলেন। রমণীর অসম্মান করিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। যে সভায় তিনি কবিতা শুনাইতেন, সে সভায় পাত্রমিত্রাদিপরিবেষ্টিত সিংহাসনারূঢ় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়কবি "রায়গুণাকরে"র কবিতায় বংশপতি ভজানন্দ মজুমদারের "উভয়রাণীসম্ভোগ" শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। পুরুষের প্রেম যে অগ্নির মত স্বয়ং পবিত্র, এবং যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেও পবিত্র করে,—প্রাচ্যে মহিলাদিগের এই ধারণা ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শিথিল হইয়া গিয়াছিল। ভারতচন্দ্র "পতি লয়ে দুই সতানের ব্যঙ্গোক্তি"তে কৃষ্ণচন্দ্রের বংশপতির পত্নীদ্বয়কে পরস্পরের প্রতি একান্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণা ও স্বামীকে বশ করিবার জন্য মন্ত্রৌষধি পর্য্যন্ত ব্যবহারে ব্যাকুলা চিত্রিত করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সে চিত্র বিসদৃশ ও অশোভন বোধ হয় নাই।

ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কবি রামপ্রসাদও "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিয়াছিলেন। "অশ্লীলতা" বিষয়ে তাঁহার "বিদ্যাসুন্দর" ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" অপেক্ষা অনুজ্জ্বল নহে। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণও অতিরিক্ত সুরুচিপ্রিয় ছিলেন না। কবিকঙ্কণ, ঘনরাম, মাধব, রামেশ্বর, কে নব্যরুচিতে শ্লীল? ভারতচন্দ্রের আদর্শ সংস্কৃত কাব্যকারগণও নব্যরুচির বিচারে অশ্লীল। "মেঘদূতে"র ইংরাজী অনুবাদক সংস্কৃতকবিদিগের এই অশ্লীলতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ভারতীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কবিগণকে অশ্লীলতার অপরাধে অপরাধী মনে করা সঙ্গত নহে। ভারতীয় কবিদিগের রচনা পুরুষের জন্য, রমণীর জন্য নহে। য়ুরোপেও মহিলাবর্জ্জিত সুশিক্ষিত পুরুষসমাজে কথোপকথন হিন্দুকাব্য অপেক্ষা অশ্লীল হইয়া উঠে। রচনা মহিলাদিগের হস্তগত ও তাঁহাদিগের দ্বারা পঠিত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, রচনাও সম্ভবতঃ অশ্লীল হইত। বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় রচনায় অশ্লীলতা কেহ দোষের মনে করে না। গিবন ও হিউম, দুই জনের মতে, ইতিহাসেও অশ্লীলতা দোষের নহে। যে মহিলাগণের হৃদয়ের বিশুদ্ধি রক্ষা করা পুরুষ অত্যাবশ্যক বিবেচনা করেন, সেই মহিলাগণের পাঠসম্ভাবনা না থাকিলে, কল্পনাপ্রধান রচনাতেও শ্লীলতার আতিশয্য আবশ্যক বিবেচিত হইত না। তাহাতে যে জগতে পুণ্যের হ্রাস হইত, এমন মনে হয় না। যাহা স্বাভাবিক, তাহা পাপ হইতে পারে না; যাহা সর্ব্বজনবিদিত, তাহা সকলেই প্রকাশ করিতে পারে। যে হৃদয় অজ্ঞতাহেতু বা

বাহ্যিক সুরুচিতেই নিরাপদ, তাহার বিপদহীনতা বড়ই দুর্ব্বল—একান্ত ক্ষণভঙ্গুর। (২০)

এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, "বিদ্যাসুন্দর" মহিলাসমাজে পঠিত হইবার সম্ভাবনার কথা ভারতচন্দ্রের স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। রাজ-সভায় "বিদ্যাসুন্দর" গীত হইত। তাহার অতি ক্ষীণধ্বনিও যে পূতাচারের প্রিয়ভূমি রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিত না, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

এ স্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে উদ্ধৃত বৃটিশ দার্শনিক কার্লাইলের মত যেমন সর্ব্ববিধ অশোভন-ভাব-প্রকাশের বিরোধী, তেমনই অন্যপ্রকার মতও বিরল নহে। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক ও সমালোচক টেনের মত এই যে, সাধুতা ও সুনীতি সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক; কিন্তু সাহিত্যের সহিত তাহাদিগের সংস্রব নাই।

আমাদের বক্তব্য এই যে, এ সম্বন্ধে যখন যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে, তখন যথেষ্ট বিচার না করিয়া ভারতচন্দ্রকে দোষী স্থির করা অবিচার। যাঁহারা ভারতচন্দ্রের মত গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহারাও যেন মনে করেন, অনেক মনীষী তাঁহাদিগের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। ভারতচন্দ্র একক দোষী নহেন।

যাঁহারা ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনিয়াছেন, তাঁহারা এ সকল বিচার আবশ্যক মনে করেন নাই। অধিকাংশ সমালোচকই প্রচলিত মতের প্রবাহে তরণী ভাসাইয়াছেন, উজান বাহিয়া যাইয়া প্রকৃত অবস্থার নির্ণয় আবশ্যক মনে করেন নাই। প্রচলিত মত সহজেই গৃহীত হয়। কর্ষিত ভূমি যেমন বীজবপনের উপযোগী হইয়া থাকে, পাঠকগণের হৃদয় তেমনই প্রচলিত মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াই থাকে। ভারতচন্দ্রের কোনও সমালোচকই বলিয়াছেন,—"নূতনের প্রতিবাদ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে।" (২১) নূতন মত প্রচার করা কষ্টসাধ্য। আবার সুনীতির ও সুরুচির প্রচারক হইলে সহজেই একশ্রেণীর পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করা যায়। তাই অশ্লীলতা যাঁহাদিগের বেদ ও বাইবেল, কোরাণ ও জেন্দাবেস্তা, এমন অনেক লেখকও অশ্লীল বলিয়া ভারতচন্দ্রের নিন্দা না করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই।

---

(২০) H. H. Wilson. মিলটনও সযত্নে গোপন-রক্ষিত পবিত্রতাকে উচ্চস্থান দান [illegible]—Vide Areiopagitca.

(২১) [illegible] চট্টোপাধ্যায়—ভারতচন্দ্র।—সাহিত্য; ১২৯৯।

বহুদিন পূর্ব্বে কোনও শ্রদ্ধেয় লেখক ভারতচন্দ্রের কথায় বলিয়াছিলেন, "আমরা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে তাঁহার সৃষ্টা মালিনীর সহিত এক বলিয়া বিবেচনা করি। কবি ভারত ও হীরা মালিনী এক; বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়ন-কর্ত্তা ও বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কর্ত্রী এক।" (২২) তিনি যে হাসিতে হাসিতে এ কথা বলিয়াছিলেন, উদ্ধৃত অংশ হইতেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু এ দেশে বিশুদ্ধ হাস্যরস কবিত্ব অপেক্ষাও দুর্লভ। তাই এ কথাও কেহ কেহ গম্ভীর মতাভিব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন। এমন বিশুদ্ধ হাস্যরস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, তাঁহারা দুর্ভাগ্য,—ইহা ভিন্ন আর কিছু বলিবার নাই, বলাও একান্ত নিষ্প্রয়োজন। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্র হীরা মালিনীরই মত "চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায়।" তিনি বিশেষ অবগত আছেন, সেক্সপীয়ার হইতে কিপ্‌লিং পর্য্যন্ত সকলেই "চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায়।" বিশেষতঃ যাঁহাদিগকে লিখিয়া "খাইতে" হয়, তাঁহারা সাহিত্যের স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সমুন্নত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট না হইলেও, চেঙ্গড়াদিগকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পারেন না; অর্থাৎ, তাঁহারা যে সমাজস্থ, সে সমাজের প্রভাব মুক্ত হইতে পারেন না। জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তি-গণ পরবর্ত্তিগণের নিকট "চেঙ্গড়া"। "কৃষ্ণকান্তের উইল" "আলালের ঘরের দুলাল"কে নিষ্প্রভ করিয়াছিল। আবার বঙ্কিমচন্দ্র যখন "ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল" প্রকাশ করেন, তখন সকলেই মনে করিয়াছিলেন, বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে বিশুদ্ধ হাস্যরসের উৎস মুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহার কিছুকাল পরে ঐ রচনারই প্রণালীতে রচিত একটি রচনা সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ হইলে তিনি বলিয়াছিলেন,—এ রসিকতা এখন বস্তাপচা, বাতিলের বাণ্ডিলবন্দী হইবার উপযোগী। ইংরাজ কবি বড় দুঃখেই বলিয়াছেন,—

> নিজ মোরা, বোধহীন বলি যত পূর্ব্ববর্ত্তিগণে,
> মোদেরো বলিবে তাই বিজ্ঞতর পরবর্ত্তী জনে। (২৩)

সাহিত্য ও শিল্প, কবি ও শিল্পী, সমাজের প্রভাব সকলকেই স্পর্শ করে। তাহা দোষের নহে।

পাশ্চাত্য রুচির আদর্শে প্রাচ্য কবির বিচার করাও একান্ত অসঙ্গত।

---

(২২) "তুলনায় সমালোচনা'—বঙ্গদর্শন : ২য় খণ্ড। অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই প্রবন্ধের লেখক।—লেখক।

(২৩) Pope.

"যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরাজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল মনে করি, ইংরাজেরা করেন না। * * * আমাদের দেশের অনেক কবি * * বিলাতী রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মনুর জোলার নভেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাঁহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল। এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা!" (২৪)

সূক্ষ্ম বর্ণনা সম্বন্ধেও অনেক শিল্পীর মত, যাহা করিব, তাহা সম্পূর্ণই করিব। কোনও অংশ অযত্ন-সম্পন্ন করা অকর্ত্তব্য। ইংরাজী সাহিত্যে ডিকেন্সের এই মত ছিল। আমরা ইংরাজীতে এমন কবিতাও পাঠ করিয়াছি, যাহার আবিল অশ্লীলতার তুলনায় ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা নির্ম্মল প্রবাহ-বারি।

শ্রমানন্দের জন্য নৈপুণ্যচালনক্রীড়া, অপরের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য নৈপুণ্য-প্রকাশই ললিত শিল্প, বা কলা। সত্য বটে, কবিকল্পনা ভাস্করকে স্বরচিত নারীমূর্ত্তির প্রেমে মুগ্ধ, চিত্রিত করিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনও ভাস্কর স্বরচিত মূর্ত্তিমণ্ডলমধ্যে তন্ময় হইয়া বাস করিতে পারেন না; কোনও চিত্রকর স্বীয় সম্পূর্ণ চিত্রদর্শনে সদানন্দ থাকিতে পারেন না; কোনও কবি আপনার কাব্যপাঠই সর্ব্বোচ্চ সুখ মনে করেন না। ভাস্কর যখন মূর্ত্তিগঠন করেন, চিত্রকর যখন চিত্র-অঙ্কন করেন, কবি যখন কাব্যরচনা করেন,—তখন শিল্পী স্বয়ং যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া রচনা করেন, সেই ভাবে অনুপ্রাণিত ও সেই ভাবে রচনা বুঝিতে সক্ষম দর্শকের বা শ্রোতার কল্পনা না করিয়া পারেন না। সেই কল্পিত দর্শকের বা শ্রোতার কল্পিত প্রশংসা তাঁহাকে উৎসাহিত করে। সমসাময়িক শিল্পাদর্শ সকল শিল্পীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। সকল শিল্পী সমসাময়িক সমাজ হইতে সেই আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং সমসাময়িক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই আদর্শকে আপনার প্রতিভাবলে আপন রচনার

(২৪) বঙ্কিমচন্দ্র—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ববিষয়ক প্রবন্ধ।

উপযোগী করিয়া প্রকাশ করেন। বাহ্যাবরণ তাঁহার প্রতিভায় স্বরচিত। তাহার সাফল্যেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয়। তদনুসারেই তাঁহার বিচার করা কর্ত্তব্য।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ফিরিঙ্গি বণিক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভারত-যাত্রা।

The epic of Vasco Da Gama is an allegory of his nation's story in the East.—*Sir W. Hunter.*

ভারত-বাণিজ্যের অভিনব জলপথের সন্ধানলাভ করিয়াও পর্ত্তুগালের অধীশ্বর ভারত-যাত্রার আয়োজন করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহার শেষ জীবন নিরবচ্ছিন্ন রোগে শোকে অতিবাহিত হইয়া গেল।

সৌভাগ্যশালী ইমান্যুয়েল সিংহাসনে পদার্পণ করিয়াই ভারত-যাত্রার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সে সুদীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার সংকল্প তাঁহার প্রজাবর্গের হৃদয়ে নানারূপ অপূর্ব্ব আতঙ্ক উদ্বেলিত করিয়া তুলিল! তাহারা ইমান্যুয়েলের অক্লান্ত অধ্যবসায়কে অশান্ত উন্মত্ততা বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল।

জনসমাজ স্থিতিশীল। কখন কোন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জনসমাজকে সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহদান করিলেও, লোকে [illegible] আগ্রহ প্রকাশ করে না। রাজকুমার হেন্‌রী পর্ত্তুগালের [illegible] স্বদেশের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া বিদেশে বৃহৎ বিজয়গৌরবলাভের [illegible] পুনঃপুনঃ আহ্বান করিয়া গিয়াছিলেন। ইমান্যুয়েল তাহার জন্য সমুচিত আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, জনসমাজের নিকট উৎসাহলাভ করিতে পারিলেন না।

কোথায় ভারতবর্ষ, আর কোথায় পর্ত্তুগাল! ভারত-যাত্রাই যে সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির বিবিধ সমুন্নতিলাভের প্রধান কারণ বলিয়া ভবিষ্যতের

ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবে, পর্ত্তুগালের অশিক্ষিত জনসমাজ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহারা ইমান্যুয়েলের বাতুলতার কথাই চিন্তা করিতে লাগিল! এইরূপে ইমান্যুয়েলের রাজত্বের প্রথম বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।

আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া ভারত-বাণিজ্যের জলপথের আবিষ্কারসাধনের অধিকার একমাত্র পর্ত্তুগালের উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। তখনও পোপের পদমর্য্যাদা তিরোহিত হয় নাই। তাঁহার শাসন ধর্ম্মের শাসন বলিয়াও সুপরিচিত ছিল। তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য কোন খৃষ্টানসমাজের পক্ষে আফ্রিকার পথে ভারত-যাত্রায় প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহারা আটলাণ্টিক অতিক্রম করিয়া পৃথক পথের আবিষ্কারসাধনের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। কলম্বস্ তাহার পথ প্রদর্শন করায়, ইংলণ্ড সেই পথে ভারত-যাত্রা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অষ্টাদশ নাবিক সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডের ইতিহাসবিখ্যাত নাবিকরাজ জন ক্যাবট সেই পথে ভারতবর্ষের সন্ধানে বহির্গত হইলেন।

আধুনিক ইতিহাসলেখকগণ পর্ত্তুগালের জনসমাজকেই ভারত-যাত্রার প্রধান উত্তর-সাধক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। পর্ত্তুগালের মহাকাব্য—"লুসিয়াদ" পাঠ করিলে, তাহাতে আস্থাস্থাপন করা যায় না। "লুসিয়াদ" কাব্য হইলেও, সেকালের জনসাজের চিত্তবৃত্তির অকৃত্রিম ইতিহাস। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—পর্ত্তুগালের জনসমাজ যেন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ইমান্যুয়েলকে অভিশাপ দান করিয়াছিল!

তথাপি ইমান্যুয়েল অবিচলিত-হৃদয়ে সংকল্পসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে "স্যান্ গ্যাব্রিয়েল" এবং "সান্ রাফেল" নামক দুইখানি অর্ণব-পোত প্রস্তুত হইল। একালের তুলনায় তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও, সেকালের তুলনায় তাহাই সুবৃহৎ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাহার সহিত দ্রব্য-ভাণ্ডার বহন করিবার জন্য আর দুইখানি ক্ষুদ্র পোত সংযুক্ত হইল।

১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই শনিবার ইউরোপের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন টেগস্-নদীর তীরভূমি অপূর্ব্ব শোভায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সমবেত জনসমূহের সম্মুখে সমুচিত সমারোহে রাজাজ্ঞা বিঘোষিত হইল। স্বদেশের পবিত্র তটতল চুম্বন করিয়া ভাস্কো ডি গামা ১৭০ জন নাবিক লইয়া ভারত-যাত্রায় বহির্গত হইলেন।

সে দিন ধর্ম্মযুদ্ধোন্মত্ত অশান্ত বীরপুরুষের উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়বেগে অধীর হইয়াও, ভাস্কো ডি গামা কাতর-হৃদয়ে বিশ্ববিধাতার কৃপা ভিক্ষা করিয়া রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রাজকুমার হেন্‌রী টেগস্‌-তীরে যে ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মিত করিয়া নাগরিকগণকে অজ্ঞাতসমুদ্রযাত্রায় উৎসাহদান করিতেন, সে দিন সেই পবিত্র মন্দিরের ঘণ্টানিনাদে দিক্‌স্থল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহারা এইরূপে ভারত-যাত্রায় বহির্গত হইল, তাহারা পূর্ব্বেই পথের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা জানিত,—আফ্রিকার পশ্চিম তট আশ্রয় করিয়া দক্ষিণাভিমুখে পোতচালনা করিলে, স্থলভাগের শেষ সীমায় উপনীত হইবে। সেই সীমা পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ নামে সুপরিচিত হইয়াছিল। অন্তরীপ অতিক্রম করিলেই ভারত মহাসাগর। তাহাতে পতিত হইয়া, আফ্রিকার পূর্ব্বতট আশ্রয় করিয়া উত্তরাভিমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে পারিলেই, প্রাচ্য বাণিজ্য-পোতের চিরপরিচিত ভ্রমণপথ প্রকাশিত হইবে।' কলম্বসের সম্মুখে এরূপ আশার আলোক পথপ্রদর্শকরূপে অগ্রসর হয় নাই। তাঁহার সমুদ্রযাত্রা চিরযাত্রা বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। অশিক্ষিত জনসমাজ ভাস্কো ডি গামার সমুদ্র-যাত্রাকেও চিরযাত্রা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

বাণিজ্য-পোতের সমাগমের অভাবে আফ্রিকার পশ্চিম তট সভ্যসমাজে সুপরিচিত ছিল না। পূর্ব্বতটের অধিকাংশ বন্দরেই ভারতবাণিজ্যপোত গমনাগমন করিত। সুতরাং আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্বাংশের সমুদ্রকূলের জন-সমাজের নিকট ভারতবর্ষে গমনাগমন করিবার বাণিজ্যপথ সুপরিচিত ছিল। তাহারা স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে সেই পথে মালাবার উপকূলে গমনাগমন করিয়া ভারতবর্ষের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ, উত্তরে পারসীক রাজ্য, পশ্চিমে আরব, মিশর ও আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূল,—এই কূলবেষ্টিত লবণাম্বুরাশি নিয়ত পোতচালনকোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইত।

যাহারা বাণিজ্য-সূত্রে ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলের সহিত পরিচিত হইয়াছিল, তাহারা বাণিজ্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে বাস করিতেও ত্রুটি করে নাই। খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই য়িহুদীয় জাতির এক শাখা মালাবার উপকূলে বাস করিতে আরম্ভ করে। সূর্য্যোপাসক পারসীকগণ অদ্যাপি তদ্দেশে বাস করিতেছেন। আরব ও মিশর দেশের লোকেও বাণিজ্যসূত্রে মালাবার উপকূলের অধিবাসী হইয়াছিল।

ভাস্কো ডি গামা যখন ধীরে ধীরে আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তৎকালে এসিয়ার অবস্থা কিরূপ ছিল? ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়,—তখন মধ্যএসিয়া তৈমুরলঙ্গের অশান্ত অত্যাচারে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে! আর্য্যাবর্ত্তের পাঠান সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে! দিল্লীশ্বর নামসর্ব্বস্ব সম্রাট হইয়া, দিল্লীর নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র জনপদের অধীশ্বর হইয়াছেন! বঙ্গভূমি স্বাধীন পাঠান-শাসনে দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। দাক্ষিণাত্যেও হিন্দু মুসলমানের কলহ-কোলাহলে পুরাতন রাজশক্তি শিথিল হইয়া বিবিধ অভিনব ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত হইয়াছে।

এই সকল রাষ্ট্রবিপ্লবে ভারতবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। স্থলপথ ত্যাগ করিয়া জলপথে পণ্যদ্রব্য প্রেরিত হইত। তজ্জন্য বিপ্লব উপস্থিত হইলে, স্থলবাণিজ্য অপেক্ষা জলবাণিজ্য প্রবল হইয়া উঠিত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জলবাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পারস্য ও লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়া মিশর ও আরব দেশের বণিক্‌গণ দলে দলে মালাবার-উপকূলে উপনীত হইয়া ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেন। সমুদ্রপথে জলদস্যুর উপদ্রব ছিল না। এসিয়ার অধিবাসিগণ ধর্ম্মপথে থাকিয়াই অর্থোপার্জ্জন করিত। মালাবার-উপকূলের বাণিজ্যপ্রধান বন্দরগুলি এইরূপে বহু জাতির আশ্রয়স্থল বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা হিন্দু হইলেও, সর্ব্বধর্ম্মের সমাদর রক্ষা করিতেন। লোকে নিরুদ্বেগে জীবনযাপন করিত। ঘাটগিরি প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া উপকূলভাগকে মধ্য দেশের সমরকলহ হইতে রক্ষা করিত।

ভাস্কো ডি গামা এরূপ শান্ত সুশীল প্রাচ্য বণিকের ন্যায় ভারতযাত্রা করেন নাই। তিনি ফিরিঙ্গি বণিক। তাঁহার ধর্ম্মনীতি এসিয়ার ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা পৃথক্। সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার রাজ্য,—তিনি সে দেশের রাজার রাজা। তিনি অজ্ঞানান্ধ নরনারীর পরিত্রাণের মুক্তিমন্ত্রদাতা। একাধারে এত অধিকার গ্রহণ করিয়াই ফিরিঙ্গি বণিক্ ভারতযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন!

মুসলমানকে বাহুবলে পরাভূত করা সেকালের খৃষ্টান বীরপুরুষদিগের প্রধান কার্য্য বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিল। সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, তরবারিবলে ধর্ম্মপ্রচার করা তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

যে দেশে যে বিধান বর্ত্তমান আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া নববিধানের প্রচার করাই তাঁহাদের পুণ্যব্রত বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

যাঁহারা এইরূপে তরবারি-বলে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা উত্তরকালে মুসলমানের স্কন্ধে সেই দুরপনেয় কলঙ্ক ক্ষেপণ করিয়া সাধুপুরুষ বলিয়া আত্মপ্রচার করিতেছেন। তথাপি নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসলেখকগণ অদ্যাপি খৃষ্টধর্ম্মের শোণিত-পিপাসার উল্লেখ করিতে ইতস্ততঃ করেন না।

কোন্ শ্রেণীর লোক এই সময়ে ভারত-যাত্রায় বহির্গত হইত, তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত, লোকালয়ে লাঞ্ছিত, কুকার্য্যপরায়ণ বলিয়া স্বদেশে সর্ব্বত্র ধিকৃত, চরিত্রহীনতায় পশুর ন্যায় অবনতিপ্রাপ্ত,—সেই শ্রেণীর নামগোত্রহীন নরাকার রাক্ষসগণই ভারত-যাত্রায় বহির্গত হইত। * তাহাদের সম্মুখে কোনও বাধাই বাধা বলিয়া পরিগণিত হইত না। তাহারা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। একমাত্র অদম্য অধ্যবসায় না থাকিলে, এই শ্রেণীর চরিত্রহীন নরাধমগণ জগতের কোনরূপ বৃহদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইত না। অধ্যবসায়গুণে তাহাদের চরিত্রহীনতা সংকল্পসাধনের অন্তরায় হইতে পারে নাই। ইহাই তাহাদের সফলতালাভের প্রধান কারণ।

এই শ্রেণীর ফিরিঙ্গি বণিক্ যেদিন বাণিজ্যযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিল, সে দিন ইউরোপ তাহাদের সহিত কোনরূপ পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষে বিক্রীত হইতে পারে, এমন কোন্ পণ্য ইউরোপে উৎপন্ন হইত? সে দিন তাহারা ক্রয় করিতে, সুযোগ পাইলে,—লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। সে দিন তাহাদের অদম্য অধ্যবসায় কেবল বাহুবলকেই অদ্বিতীয় উপায় বলিয়া পূজা করিতে শিক্ষা করিয়াছিল।

ভাস্কো ডি গামা যাহাদের সহিত সমুদ্র-যাত্রা করেন, তাহারা নাবিক, সৈনিক, কর্ম্মচারী, বণিক্,—একেধারে সর্ব্বময়। তাঁহার সহোদরও তাঁহার সহিত পোতারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন আফ্রিকার পশ্চিমতটের

---

* At the time of embarkation at Lisbon selection was impossible; every one was enrolled who wished to go,—vagrants, lait-birds, debtors, criminals of every description, wretches, incapable by immorality and loss of character of obtaining employment at home,—whom Portugal was glad to banish to save the honor of their families.—Portuguese Discoveries by Rev. Alex. J. D. DORSEY.

শেষ সীমায় আসিয়া "উত্তমাশা অন্তরীপ" অতিক্রম করিলেন, সেদিন নি[illegible] উড়াইয়া, জয়ধ্বনি করিয়া, রণবাদ্যরবে বিজয়ঘোষণা করিলেন!

তাহার পর ভারতবর্ষের বাণিজ্যপথের সন্ধানলাভ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। আফ্রিকার পূর্ব্বতট আশ্রয় করিয়া উত্তরাস্তে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর জনসমাজের অস্তিত্বের পরিচয় প্রকাশিত হইতে লাগিল। ২৬শে এপ্রিল তারিখে গামা আফ্রিকার তটাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে পোতচালনা করিলেন। আ[illegible] হইতে যে পথপ্রদর্শক (আড়কাঠি) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিতক্রমেই পোত সকল পূর্ব্বাভিমুখে পরিচালিত হইতে লাগিল। সেকালে বাণিজ্যপোত-চালন করিবার জন্য সমুদ্রতীরের ধীবরগণকে আড়কাঠি নিযুক্ত করা হইত। তাহারা বায়ুপ্রবাহের উপর নির্ভর করিয়া নক্ষত্র-দর্শনের অভিজ্ঞতায় পোতচালনার পথ নির্দ্দেশ করিতে পারিত।

ভাস্কো ডি গামা এই উপায় প্রাপ্ত না হইলে, কালিকটের প্রসিদ্ধ বন্দরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। তাঁহার পথপ্রদর্শক নিপুণ নাবিক বলিয়াই প্রশংসালাভ করিতে লাগিল। তাহার নির্দ্দেশক্রমে ২৩ দিবস পোত-চালনা করিবার পর ভাস্কো ডি গামা পূর্ব্ব গগনে এক অপূর্ব্ব মেঘমালা দর্শন করিলেন। আড়কাঠি কহিল, যাহা মেঘমালারূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহাই ঘাটগিরির শিখরমালা!

১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে ভাস্কো ডি গামার বাণিজ্যপোত কালিকটের সম্মুখে ভারতভূমির "তালীবনরাজিনীলা" সমুদ্রবেলায় উপনীত হইল। ফিরিঙ্গি বণিকের ভারত-যাত্রা সফল হইল। প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সহিত প্রতীচ্য সাম্রাজ্যের পরিচয় সাধিত হইল। সমগ্র প্রাচ্য রাজ্যের ইতিহাস অভিনব ঘটনাস্রোতে বিপর্য্যস্ত হইবার সূত্রপাত হইল।

মাদুরায় ব্রাহ্মণদিগের গৃহে।

মাদুরা নগর পূর্ব্বে এক জন বিলাস-আড়ম্বর-প্রিয় রাজার রাজধানী ছিল। এখানে হরপার্ব্বতীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত একটি মন্দির আছে। "মীনাক্ষী" পার্ব্বতী শিবের গৃহিণী। মন্দিরটি আমাদের "লুভ্‌র্" প্রাসাদ অপেক্ষাও বৃহৎ, শিল্পকর্ম্মে ও খোদাই-কাজে অধিকতর ভূষিত, এবং তাহারই মত বিবিধ আশ্চর্য্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ।

দয়াশীল ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের প্রভাবে ও অনুগ্রহে আমি মন্দিরের অনেকটা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিব, অন্তর্ভৌম কক্ষের মধ্যে নামিতে পারিব, দেবীর ঐশ্বর্য্যবিভব ও সাজসজ্জা দেখিতে পাইব, সন্দেহ নাই।

নগরটি অতিমাত্র ভারতীয়-লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, বৈদেশিকদিগের প্রতি আদর-আহ্বান-বিতরণে বিমুখ নহে। মন্দিরদর্শনের জন্য অনেক বৈদেশিক এখানে আসিয়া থাকে। অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যে মন্দিরগুলিতে বৈদেশিকের প্রবেশ যেরূপ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, এখানে সেরূপ নহে। মাদুরায় গিয়া যাহাতে আমি তত্রত্য গৃহস্থ পরিবারবর্গের মধ্যে সাদরে গৃহীত হই, এই উদ্দেশে কতকগুলি অনুরোধপত্র ত্রিবঙ্কুরে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। প্রথমেই আমি ব্রাহ্মণদিগের গৃহে উপস্থিত হইলাম। ভারতে, ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ও পরিশুদ্ধ।

গুরুভার, পিণ্ডাকৃতি, উচ্চ-"ভিত"-বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র একতলা গৃহ। এই মাদুরা নগরে ব্রাহ্মণদিগের যত গৃহ, সমস্তই এই আদর্শের। একটা বারাণ্ডা;—বারাণ্ডার থামের মাথায় বিকটাকার জীবজন্তুর মস্তক। একটা পাথরের সিঁড়ি; সেই সিঁড়ি দিয়া গৃহের অভ্যর্থনাশালায় যাওয়া যায়। সেখান হইতে লতাপাতার কাজ-করা অতীব ক্ষুদ্র তিনটি গবাক্ষ দিয়া নীচের রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘরে গৃহস্বামী আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি পলিতকেশ বৃদ্ধ; চারিটি যুবক তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে;—ইহারা তাঁহার পুত্র। ইহাদের দীর্ঘ নেত্র নীলকৃষ্ণ অঞ্জনরেখায় অঙ্কিত। পরিচ্ছদের মধ্যে একটা ধুতি কোমরে জড়ানো; কিন্তু ইহাতে করিয়া তাহাদের উদাত্ত-ভাব, বিশিষ্টতা ও কুলগৌরবের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। ঘরটি চূনকাম্ করা, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কি একটা সুগন্ধি ধূপে আমোদিত; সাজসজ্জাও নিতান্ত অশোভন নহে। আরাম-কেদারাগুলি ক্ষোদিত আবলুস্ কাঠের। দেয়ালের উপর, গিল্টি করা "ফ্রেমে" পুরাতন জলরঙ্গের ছবি সংরক্ষিত;—ছবিগুলি বিষ্ণুর অবতার-মূর্ত্তি। কুট্টিমতলে সুন্দর ভারতীয় গালিচা, এবং ফুলকাটা কাপড়ে আচ্ছাদিত গদী। আমার আগমনে ইহারা একটু বিস্মিত হইল; কেন না, বৈদেশিকেরা এখানে বড় একটা আইসে না; তথাপি, ভদ্রতা ও আতিথ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক গৃহের সমস্ত অংশ আমাকে দেখাইতে চাহিল। প্রথমে একটি অন্তঃপ্রাঙ্গন—প্রাচীরবেষ্টিত ও বিষাদময়। একটা "ঝুরি-নামা" বটগাছের ছায়ায় মেষ ও ছাগল বিশ্রাম করিতেছে। তাহার পর,

গৃহের ছাদ ;—ছাদে পায়রারা বাস করে ও কাকেরা আসিয়া বসে। সেখান হইতে, মাদুরার প্রাচীন রাজাদিগের প্রাসাদ দেখা যায় ;—উহা সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দু-আরব-ধরণের বহুব্যয়সাধ্য প্রকাণ্ড স্মৃতিসামগ্রী ; তা ছাড়া পল্লী-প্রদেশের দূরস্থ তালকুঞ্জ পর্য্যন্ত মন্দিরাদি-সমেত সমস্ত নগরটি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। লাল রঙ্গের প্রকাণ্ড মন্দিরচূড়াগুলি চারি দিক হইতে বিহঙ্গ-সঙ্কুল গগনমণ্ডলে সমুত্থিত। অবশেষে উহারা আমাকে গৃহের পুস্তকাগার দেখাইল, —উহা দার্শনিক গ্রন্থে ও ধর্ম্মগ্রন্থে পরিপূর্ণ। ইহাতে সূচিত হইতেছে, আমার অভ্যর্থনাকারিগণ, অতীব বিশিষ্ট ও অতীব উচ্চ-অঙ্গের জ্ঞানানুশীলনে নিরত। উহাদিগকে নগ্নকায় দেখিয়া প্রথমে সহসা যেরূপ মনে হয়, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রস্থান- করিবার পূর্ব্বে আবার সেই অভ্যর্থনাশালায় আমাকে আসিতে হইল। সেখানে একটুখানি বসিলাম। সেই যুবকদিগের মধ্যে এক জন একটা দীর্ঘ, ঝিণ্টি কর সেতার লইয়া মৃদুস্বরে দুই চারিটা সুমধুর গৎ বাজাইল। মহিলাদিগকে যে উহারা আমার সম্মুখে আনিবে না,—ইহা জানা কথা। কিন্তু বিদায়গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, তিন চারি বৎসর বয়স্কা ছোট দুইটি বালিকাকে আমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। বালিকা দুটি অতি শিষ্ট শান্তভাবে আমার নিকটে আসিল,—আমাকে ভয় করিল না। উহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে,—শিকলে ঝোলানো, হৃৎপিণ্ডাকৃতি একটা সোনার তক্তি—এবং সেই শিকলটা কটিদেশে বেষ্টিত। তক্তিটা যথাযোগ্যরূপে নীচে নামিয়া আসিয়াছে। উহাদের হস্তপদ—গুরুভার বলয় নূপুরে ভূষিত। বালিকা দুটি যেন সৌন্দর্য্যের প্রতিমা ;—অনিন্দ্য-গঠন মনোমোহিনী যেন দুইটি ক্ষুদ্র দেবীমূর্ত্তি। রং উজ্জ্বল পিঙ্গলের ন্যায় ; দেহ সুনমা ও মাংসল ; হাসি-হাসি সুগম্ভীর কালো চোখ,—পক্ষ্মরাজি অতুলনীয় ; চারিধারে কজ্জলের রেখা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হস্ত ও পদ।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সকল ক্রমে আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিতে চলিল। হস্তের গূঢ়াঙ্গুলি (Metacarpus) ও পদের গূঢ়াঙ্গুলি (Metatarsus) যদিও অপেক্ষাকৃত অনেক সবল ও পূর্ণাবয়ব আছে, কিন্তু উহারাও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। আর প্রকৃত অঙ্গুলি সকল

ত ধ্বংসের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। শিরা ও পেশী সকল দুর্ব্বল হইয়াছে; এবং হস্তের ও পদের অগ্রভাগের সহিত তাহাদিগের সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। এক তর্জ্জনী ভিন্ন পদের অন্য কোনও অঙ্গুলি যে স্থায়ী হইবে, সে আশাও নাই। তর্জ্জনীর স্থায়িত্বেও সন্দেহ আছে। এক্ষণে হস্ত ও পদের অবস্থা কিরূপ হইল, দেখা যাউক।

হস্ত ও পদের অস্থি সকল একই প্রকার। হস্তাগ্রের * দুই অস্থি ও পদাগ্রের দুই অস্থি তুল্য; এবং বাহুর এক অস্থি ও উরুর এক অস্থি তুল্য। হস্তকে সম্মুখের পদ বলিলে কোনও দোষ হয় না। চতুষ্পদ অবস্থায় যাহা সম্মুখের পদ, দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহাই হস্ত। সুতরাং এই দুই বস্তু, হস্ত ও পদ, একই পদার্থ। কিন্তু কালক্রমে ইহাদিগের গঠন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; অবস্থান ত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। নিম্নশ্রেণীস্থ জীবগণের হস্ত ও পদের প্রভেদ মানুষের অপেক্ষা অনেক অল্প; মৎস্যদিগের এই প্রভেদ একবারেই নাই। তাহাদিগের সম্মুখের ডানা ও পশ্চাতের ডানার অবয়ব ও অবস্থান সম্পূর্ণ একরূপ।* বলা বাহুল্য যে, এই ডানাই প্রকৃত হস্ত ও পদের পূর্ব্বপুরুষ। হস্ত ও পদের পুরাতন ঐক্য সর্ব্বতোভাবে সমান নাই। পক্ষিগণের পশ্চাতের পদের উপর দেহের সমস্ত ভার ন্যস্ত; দেহভার-বহনার্থ সম্মুখের পদের আবশ্যক নাই। সম্মুখের পদ কালক্রমে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! তাহাদিগের পক্ষ আর কিছুই নহে, সম্মুখের পদের বিকৃতাবস্থা-মাত্র। তার পর মানুষ। মানুষকে আর পদ দ্বারা বস্তু গ্রহণ করিতে হয় না, এই জন্য ক্রমশঃ পদাঙ্গুলির অবস্থান্তর ঘটিতেছে। ইহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছি। হস্ত ও পদ যে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবশ্যক অনুসারে যে জীব যে ভাবে হস্ত ও পদের ব্যবহার করিয়াছে, হস্ত ও পদও সেই ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এক্ষণে হস্ত ও পদের অবস্থার একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাউক। সর্ব্বাগ্রে হস্তের দৈর্ঘ্যের বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে,

---

* কনুই হইতে কব্জি পর্য্যন্তকে হস্তাগ্র (forearm) এবং স্কন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্তকে বাহু বলিব। কুঁচকি হইতে হাঁটু পর্য্যন্তকে উরু, এবং হাঁটু হইতে পায়ের পাতার উপরকার গাঁঠ পর্য্যন্তকে (foreleg) পদাগ্র বলিব।

* Structure of Man, p. 76.

উহা ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতেছে। বানরাদির হস্তের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অসভ্য মানবের হস্তের দৈর্ঘ্য অল্প; এবং অসভ্য মানবের অপেক্ষা সভ্য মানবের হস্তের দৈর্ঘ্য আরও অল্প।* সুতরাং হস্তের অস্থি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া আসিতেছে। তবে মানব এক্ষণে নানা কার্য্যে হস্তের ব্যবহার করিতেছে, অতএব একবারে হস্তলোপের আশঙ্কা নাই। বরং কেবল এই কারণে লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে যে, হস্ত কালক্রমে আরও উন্নত হইবে। কিন্তু কেবল এই কারণে নির্ভর করাও অসম্ভব। অন্য কারণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হস্তের অবস্থান এখন পূর্ব্বের মত নাই। হস্ত পূর্ব্বে মস্তকের নিকটবর্ত্তী ছিল; এখন ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতেছে। কথাটা এইরূপ :—মেরুদণ্ড মস্তকের নিম্নদেশ হইতে গুহ্যের উর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত স্থিত। উহা ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডাস্থি সকলের সমষ্টিমাত্র। এখন মেরুদণ্ডের যে ভাগ বক্ষ ও পৃষ্ঠের সহিত সংযুক্ত, সেই ভাগ হইতে দক্ষিণে ও বামে কতকগুলি পঞ্জর (ribs) বাহির হইয়া বক্ষোগহ্বরকে (thorax) আবৃত করিয়াছে। এই পঞ্জর সকলের সংখ্যা পূর্ব্বে অধিক ছিল।† এক্ষণে স্কন্ধের উর্দ্ধভাগে আর পঞ্জর নাই। কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। মেরুদণ্ডের যে ভাগ স্কন্ধ হইতে মস্তকের অধোভাগ পর্য্যন্ত বিদ্যমান, তাহারও দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে পঞ্জরাস্থি বাহির হইত। সুতরাং গলা এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে ছোট ছিল; হস্তমূল উপরে ছিল; সুতরাং হস্তও এখন যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছে, তখন তাহার একটু উর্দ্ধ হইতে, অর্থাৎ মস্তকের নিকটবর্ত্তী দেশ হইতে, বাহির হইত। এক্ষণে আর মেরুদণ্ডের ঐ ভাগ হইতে পঞ্জর বাহির হয় না। স্কন্ধ ও মস্তকের মধ্যভাগে মেরুদণ্ডের যে সকল খণ্ডাস্থি আছে, তাহারা পঞ্জরশূন্য। সুতরাং স্কন্ধ নীচে নামিয়াছে, এবং গলা বড় হইয়াছে। হস্তও বাধ্য হইয়া নীচে নামিয়াছে।‡ পঞ্জরাস্থির ক্রমে আরও ধ্বংস হইবে। এখনকার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি পঞ্জরাস্থির যত ধ্বংস হইবে,§ স্কন্ধও তত নীচে নামিবে; হস্তও ততই নীচে হইতে বাহির হইবে। অবশেষে আর পঞ্জরাস্থিও থাকিবে না, স্কন্ধদেশও থাকিবে না, বুক পিঠও থাকিবে না, হস্তও থাকিবে না। কি

---

* Structure of Man.

† Structure of Man. p. 39, 41, 42.

‡ Structure of Man. p. 94.

§ Structure of Man. p. 43.

সর্ব্বনাশ! ... সুদূরতর ভবিষ্যতে লইয়া যাইবার ভার আমি সম্পাদক মহাশয়ের ... স্কন্ধে স্থাপন করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছা করি।

যাহা হউক, প্রকৃতপক্ষে পরিণামে এইরূপ দেহ-হীন অবস্থাই যে আমাদের ঘটিবে, তাহার বহু অন্তরায় আছে। তবে যদি এই জরা-ব্যাধি-মন্দির স্থূল-দেহ অতীব দূর ভবিষ্যতে লুপ্ত হয়, তাহা হইলেও কোনও দুঃখের কারণ নাই। কিন্তু সে বিষয়ে যেরূপ কল্পনাই সঙ্গত হউক না কেন, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, হস্ত পূর্ব্বে মানবদেহের যে স্থান হইতে বাহির হইত, তাহা মস্তকের নিকটবর্ত্তী ছিল; স্কন্ধ আর একটু উপরে ছিল। কালক্রমে হস্ত নীচে নামিয়া আসিয়া মস্তক হইতে একটু ব্যবধানে গিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, স্কন্ধের উপরকার পঞ্জরাস্থির লোপ।

তাহার পর হস্তাগ্রের দুই খণ্ড অস্থি কি ভাবে ছিল, এবং এখন কি ভাবে আছে, তাহা দেখা যাউক। উপরে বলিয়াছি যে, মৎস্যের ডানা আমাদিগের হস্ত ও পদের পূর্ব্ববর্ত্তী। ডানা-অবস্থায় উহারা শরীরের দৈর্ঘ্যের সহিত সমকোণে বাহির হইয়াছিল। ক্রমে যতই হস্ত ও পদের আকৃতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, ততই মস্তক হইতে দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল। পরে ঐ দৈর্ঘ্যের সহিত প্রায় সমান্তরাল-ভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহার ফলে যে দিক মস্তকের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহা দূরবর্ত্তী হইয়াছে। সুতরাং ডানা অবস্থা হইতে ক্রমে প্রায় একটি সমকোণপরিমাণে বাহিরের দিকে হস্ত ঘুরিয়া গিয়াছে। তবেই দেখা গেল যে, হস্ত দৈর্ঘ্যে বড় ছিল, ছোট হইয়াছে; দেহের সমকোণে বাহির হইত, সমান্তরালভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; মস্তকের নিকটবর্ত্তী ছিল, ক্রমে দূরে অর্থাৎ নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে; আর শিরা পেশী সকলও পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও অসংলগ্ন হইয়াছে। এই অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিলে, ইহার পরিণাম বুঝিতে বিশেষ কল্পনাশক্তির আবশ্যক হয় না।

এক্ষণে পদের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা দেখা যাউক। হস্ত দৈর্ঘ্যে খর্ব্ব হইলে অপেক্ষাকৃত সহজে ধরা পড়ে; পদের খর্ব্বতা তত সহজে ধরা পড়ে না। কিন্তু যখন মনে করি যে, হস্তাগ্রের ন্যায় পদাগ্রের দুইখণ্ড অস্থিও পাশাপাশি ছিল, এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় চতুষ্পদ-অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর দেহভার পদাগ্রের উপর পতিত হইয়াছে, তখন স্বভাবতঃই মনে হয় যে, পদাগ্রের অস্থিদ্বয় অবশ্যই অনেক পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ আছে। প্রকৃত-পক্ষেও, এই দুই খণ্ড অস্থির এক খণ্ড (tibia) যত অধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে

দেহের আর কোনও অস্থিই তদ্রূপ হয় নাই। উক্ত অস্থিখণ্ড উরু-অস্থির (femur) ঠিক নীচে ছিল না; একটু পার্শ্বে সরিয়া ছিল। কিন্তু দেহের দিকে আসায় এক্ষণে ঠিক উরু-অস্থির নীচে আসিয়াছে, এবং দেহের প্রায় সমস্ত ভার এই অস্থিকেই বহন করিতে হইতেছে। তাহার পর অপর অস্থিটির কার্য্য অনেক কমিয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফলে ক্রমে উক্ত অস্থি দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, এবং প্রথমোক্ত অস্থি (tibia) দেহের চাপে অধিকতর খর্ব্ব ও চাপা-লাগা-মত (compressed) হইয়া যাইতেছে। তবেই পদও ক্ষুদ্র ও পিষ্ট-বৎ হইল, উহার অস্থির আভ্যন্তরিক গঠনও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কতিপয় শিরা ও পেশী সকল নীচের সংযোগস্থান ছাড়িয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে, এবং অকর্ম্মা হইতেছে, ইহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি। এখন ইহার ভবিষ্যৎচিন্তা কঠিন হইবে না।

তাহার উপর আর এক বিষম সমস্যা উপস্থিত! পদের অবস্থান এখন পূর্ব্বের মত নাই। যেমন হস্ত ক্রমে নীচের দিকে নামিতেছে, তেমনই পদও উপরের দিকে উঠিতেছে। পদের দুরাকাঙ্ক্ষা মস্তকের দিকে উঠা।* হস্তের নিম্নগতি ও পদের উর্দ্ধগতি। † সুতরাং তৎসম্পর্কীয় শিরা, স্নায়ু ও পেশী সকলেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই সকল কারণে কালক্রমে গুরুতর ফলের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। যাহা হউক, এই দ্বিবিধ গতিরই আর অগ্রসর হইবার এখনও অনেক বিঘ্ন আছে। নতুবা কালক্রমে আমরা কি আকার প্রাপ্ত হইব, তাহা চিন্তা করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! কিন্তু এ কথা ধ্রুব সত্য যে, পদও পূর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্ব হইয়াছে, এবং মস্তকের দিকে উঠিয়াছে। যাহা হউক, হস্ত, পদ ও তৎসংলগ্ন অঙ্গুলি সকলের দুরবস্থা একরূপ বুঝিতে পারা যাইতেছে। এক্ষণে মানবদেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে, এবং পরিণামে সমগ্র দেহেরই বা কিরূপ অবস্থান্তর সম্ভব, তাহা ক্রমে দেখিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীশশধর রায়।

---

* Structure of Man, p. 94, 95.

† যেন ঠিক আমাদের বর্ত্তমান সমাজ!—লেখক।

"রমণীর প্রেম শুধু কি স্বপন,
মৃত্যু কি তার শেষ ?'—
অশ্রু-সলিল-মগন নয়ন,
আননে অরুণাবেশ।

কাঁপিছে অলক অশোক-কপোলে,
পিছে কুন্তলভার,
শিরীষ-উরস-কম্পনে দোলে
স্বর্ণের মতিহার।

মণিবন্ধনে বাজিছে বলয়,
মঞ্জীর চারু চরণে,
উন্নত তনু অতি আভাময়
ব্যর্থ-প্রণয়-স্মরণে।

মত্ত আবেগে তুলিয়া সহসা
পুষ্পপেলব পাণি,
বাহু-বন্ধনে বেদনা-বিবশা
বাঁধিল হৃদয়খানি!

অনলোজ্জ্বল দৃপ্ত মুরতি,
বঙ্কিম গ্রীবাদেশ,
নিরতিরে যেন সুধা'ল যুবতী,
—"মৃত্যু কি তার শেষ?"

"আপন গর্ব্বে আপনি উচ্চ,
কঠিন অনবনত,
পুরুষেরে আমি ভেবেছি তুচ্ছ
দলিত তৃণের মত।

"শত হৃদয়ের প্রণয় অর্ঘ্য
লুক চরণতলে,
ব্যর্থসাধন প্রণয়িবর্গ
ফিরেছে নয়ন-জলে।

'সবার কামনা বাসনার 'পরে
সুদূর সূর্য্য সম,
তরুণ রূপের উদয়শিখরে
হৃদয় জাগিত মম।

"আজি সে হৃদয়ে—হায় মূঢ় নারী!
রচি ভিখারীর পাত্র,
যাচিতেছি,—দীন অধম ভিখারী—
প্রণয়কণিকামাত্র!

রূঢ় পরশনে বীণা গীতহীনা,
ছিন্ন কনক-তার,
স্তিমিত নয়ন, স্তব্ধ নবীনা,
বাতায়নে দেহভার!

বাহিরে আলোকমগনা মেদিনী
পাষাণ প্রসূন গর্ব্বে,
শ্যামা মনোরমা হৃদি-আমোদিনী
বহু বিচিত্র বর্ণে!

শ্যামপ্রান্তরে শ্বেত পথরেখা,
জনহীন সুখসুপ্ত,
ক্রমে ক্ষীণতর—নাহি যায় দেখা—
তৃণ-তরঙ্গে লুপ্ত!

প্রান্তরপারে পুরাতন পুরী,
চিত্র-জনক-রম্য,
মর্ম্মরময় শুভ্র মাধুরী
মন্দির মঠ হর্ম্ম্য!

মণিময় শিখী ফিরিছে [illegible]
পথে প্রান্তরে [illegible]
রত্নধনু যেন মহীর অঙ্গে
খচিত তাম্রকাঞ্চনে !

দূরে দূরে গিরি—কনকোজ্জ্বল,
বিমল গগনপ্রান্ত,
নীল অনাবিল স্নিগ্ধ কোমল
[illegible]-প্রান্ত !

অবসাদ মোহ সহসা টুটিল,
তীব্র বেদনা বক্ষে,
আহত সিংহী জাগিয়া উঠিল
রোষচঞ্চল-চক্ষে।

উন্নত করি' সুন্দর তনু
দাঁড়াইলা অভিমানিনী,
উত্থিত যেন গুণহীন ধনু,
উদ্যত যেন ফণিনী !

তুলি' সদর্পে বাহুবল্লরী
কহিলা গর্ব্ব-উজ্জলা ;—
"ব্যর্থ বাসনা দিবা-বিভাবরী
বহিব' এক কি অবলা ?

"নাহি কি কুহক রূপ-যৌবনে—
দুর্লভ সুধা প্রণয়ে,
সে কি আসিবে না এ জীবন-বনে
তৃষা-প্রমত্ত হৃদয়ে ?

"প্রণয়-কা[illegible]-কুরঙ্গ
শুধু কি বিজয় হানিবে ?
বিকল পীড়িত হরিবে অঙ্গ,
অধরে [illegible] ?

"দুর্লভ যদি বাঞ্ছিত মোর,
দুর্জ্জয় মম বাসনা।
নারীর সরম সুকঠিন ডোর
বাঁধিয়া রেখেছে রসনা !

"নয়নে বয়ানে ভাসে যেই ভাষা,
হাসি-মাঝে উঠে ফুটিয়া,
না পারে বুঝিতে—আশা ভালবাসা
লাজ-ভয় যাবে টুটিয়া !

"কহিব তাহারে—আজি পড়ে মনে
অপরূপ প্রেমকাহিনী,
গরবের শিলা টুটিয়া কেমনে
বহিল এ প্রেম-বাহিনী !

পঞ্চ বরষ কার রূপরাশি
সতত নয়ন-লগ্ন,
পঞ্চ বরষ হৃদয় পিয়াসী
কার তপস্যা-মগ্ন ?

"যদি নাহি শুনে যদি হেলাভরে
ফিরায় আমারে, কি হ'বে ?
সে লাজ সে ব্যথা হায় ! প্রেমভরে
শির পাতি' ল'ব নীরবে ?"

"নহি আমি শুধু মাধুরী-আধার,
নবীনা—প্রেমানুরাগিণী,
হৃদয়ে ধরিলে পারিজাত-হার,
চরণে দলিলে নাগিনী !

"সহস্র খণ্ড করি' লুণ্ঠন
মনোমন্দির দ্বার,
প্রাণ-কুসুম করি' গ্রন্থন
রচিব কণ্ঠহার !

"এই প্রেম মম অমোঘ, অমর,
অজেয়, বেদনা-দৃপ্ত,
হ'বে তার প্রেমে শত সুন্দর
সার্থক পরিতৃপ্ত!"

উল্লাসময়ী উষার উদয়,
পূর্ব্ব গগন-তট
হেমকুঙ্কুমে কি মাধুরীময়,
শোভায় স্বপন-পট!

তরুণ রবির স্বর্ণ-কিরণে
ছিন্ন তিমির-বন্ধ,
ভাসিছে সরস ধীর সমীরণে
নীপ-চম্পক গন্ধ!

চারু চন্দন নীপ্যারতরুণ
শিহরে মন্দ পবনে,
কেলি-কুতূহলী কপোতমিথুন
কুহরে কুঞ্জভবনে।

দূর বনান্তে অমিল প্রাসাদ,
শিখর উঠেছে উচ্চে,
শিরি-স্বপন যেন প্রতিভাত
অমল গোলাপ-গুচ্ছে।

পুষ্পকুসুম-রঞ্জিত মব
অশোক কুঞ্জতল,—
তুলিছে ললিত গুঞ্জন-রব
লোলুপ মধুপদল!

[illegible] শিথিল কুসুমকেশর,
[illegible] পড়িছে ভূমে,
[illegible]ঠে পল্লবে মৃদু মর্ম্মর
স্বপ্ন-জড়িত ঘুমে!

সে বিতানতলে [illegible] ধ্যানাসনে,
তরুণ তাপস প্রায়,
অজিৎ সিংহ—আয়ত নয়নে
কি কোমল [illegible] তায়!

চারুচম্পক-রুচিরদ্যুতি,
উন্নত বর দেহ,
অধরে হাস্য, ললাটে শান্তি,
আঁখি [illegible]-গেহ!

ঘনকুঞ্চিত কুন্তল-দল,
সুঠাম তরুণ তনু।
রতির সুষমা-স্বপ্ন-বিভল
সুন্দর ফুলধনু!

কাহার মাধুরী-মগ্ন আকৃতি
ভাসিছে প্রভাতী কিরণে?
কোন অজয়-সঙ্গীত-স্মৃতি
জাগিছে আকুল স্মরণে?

হোথা বনপথে আসিছে যুবতী
কল-মঞ্জীর-চরণা,
যেন চঞ্চলা বিনোদব্রতবতী
পুষ্পকুসুমাভরণা!

কুন্তল দোলে, অঞ্চল উড়ে,
মন্থর গতি গরবে!
কি রাগিণী বাজে স্বর্ণনূপুরে
বসন্ত পদ-পল্লবে!

হাতে চলে বালা, দোলে ফুলমালা,
অলকে মাণিক ঝলকে,
মঞ্জীর শোভা কি [illegible]
[illegible] বিকশে পলকে পলকে!

[illegible] কোথা [illegible] কোথা নব উষা,
  কোথায় তরুণী সন্ধ্যা?
[illegible]োলময়ী চির-অকলুষা
  আকুল[illegible]কামনা ?

উঠিছে, ফুটিছে ও [illegible]িছে
  শতেক মাধুরী স্বপনে,
লাজ-বিজড়িত মধুর হাসিতে
  কভু বা [illegible] গোপনে !

ধীরে ধীরে আসি' দাঁড়া'ল রূপসী
  অশোক[illegible]-দ্বারে,
শিহরিল দেহ—হিল্লোলা যেমনি
  প্রখর-তটিনী-ধারে !

তখনো অজিত ধ্যান-নিমগন,
  অপরূপ বিভা আননে,
খুঁজিছে কোন সোনার স্বপন
  কামনা-কল্প কাননে।

হেরিছে ধূসর গিরিবর-কোলে
  হিল্লোলময় হ্রদ,
তীরে তরুবীথি—কুসুমে দোলে
  কহ্লার কোকনদ।

বসি' তার তীরে নবীনা রূপসী
  সুষমা-স্বপন-সৃষ্টি !
করুণা-স্নিগ্ধ চারু মুখশশী,
  লোচনে মুগ্ধ দৃষ্টি !

শিলাসনে শোভে বাম করতল,
  দক্ষিণে ফুলদল,
[illegible]কোমল চরণযুগল
  [illegible] উপলখণ্ড।

তরুণ তনুর শোভাতে মুগ্ধা,
  নিন্দিছে নব-নলিনী,
নিখিল-মাধুরী-মন্থন-সুধা
  অঙ্গে ললিত লাবণি।

রূপের যুগল স্থির তরঙ্গ
  নবযৌবনমঞ্জরী,
গড়েছে কুহকী শিল্পী অনঙ্গ
  পুলকিত তনু-বল্লরী !

কুন্দ-কুসুমকোমল কপোল[illegible]
  পৃষ্ঠ অংস পরশে,
কৃষ্ণ-কেশদাম—লহরী বিলোল
  মগ্ন পবন-হরষে।

নব বাহুযুগ সহসা প্রসারি'
  উদ্দাম অভিলাষে,
রহিল যুবক,—তরুতলচারী,—
  প্রেমগদগদ-ভাষে,—

এস বাঞ্ছিতা, এস চিন্ময়ী,
  হৃদয়-পদ্মাসনে,
করহ ধন্য—কর মোরে জয়ী,
  এই সাধ শুধু মনে !

থাক অন্তরে অন্তরতমা !
  প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধা,
বাহিরে দীপ্ত রমণীসুষমা
  পাষাণ-নিগড়ে গাঁথা।

আকুল আবেগে[illegible] পদ [illegible],
  সুন্দরী গতিহীনা,
"অজিতসিংহ !" উঠিল বাজি[illegible]
  মধুরে [illegible]-বীণা !

যুবা অজিত—[illegible]-আবেশে
নয়ন নিমেষশূন্য
জাগিছে গগনে বাঞ্ছিতা-বেশে
শত জনমের পুণ্য !

"অজিত !"—অশ্রু নয়নোপান্তে,
প্রেমে বিগলিত স্বর,
শিহরে যুবক যেন ধ্যানান্তে
কুলিশাহত হয় ।

"অশোকা !"—নয়নে কি রোষদীপ্তি
কি রুক্ষ দৃপ্ত বাণী,
কে নিল কাড়িয়া না হ'তে তৃপ্তি
অমৃতপাত্রখানি ?

'অশোকা !' বাজিল ব্যাধ-খরশর
সরলা-হরিণী-বক্ষে,
কি ঘোর নিরাশা হৃদি-ভয়ঙ্কর
ভাসিল বিশাল চক্ষে !

বেগে অপসরি' দুই চারি পদ
দাঁড়া'ল বজ্রাহতা,
লজ্জা-অরুণ মুখকোকনদ,
হৃদয়ে দারুণ ব্যথা ।

"ক্ষম সুহাসিনি, রূঢ়তা আমার,"
আদরে ধরিয়া কর,
কহিলা অজিত স্নেহের আগার,
[illegible]তা-মুক্ত-স্বর ।

"কেন নত আঁখি, কেন ম্লানমুখ,
কেন কম্পিত দেহ ?
বুঝি সরলা, জিজ্ঞাসি যে ভুল,
ভুল গো ভাবিয়া স্নেহ !

আজি এ মধু মধুরিমা-মাঝ
মাধবী উষার উদয়ে,
কহ কি কামনা জাগিছে তোমার
দেবীদুর্লভ-হৃদয়ে ?"

কাঁপিল আবেগে পুলকাঞ্চিত
দেহলাবণ্যলতা,
কহিল অশোকা,—"প্রিয়, বাঞ্ছিত,
শুন, এ মর্ম্ম-কথা :—

পঞ্চ বরষ এ কুমারী-হিয়া
মগ্ন তোমারি ধ্যানে,
আকুলা সূর্য্যমুখী নিরখিয়া
ও রূপ-তপন পানে ।

এ'নহি—জীবন রূপলাবণ্য
কুসুমাঞ্জলি চরণে,
পুরাও বাসনা, কর গো ধন্য
দাসীরে জীবনে মরণে ।"

এ কি বিস্ময় কল্পনাতীত !
এ কি অদ্ভুত ঘটনা !
অশোকা কি আজ হৃদয়-লালিত
প্রণয় করিল রটনা ?

যেন মণিময় দেব-মন্দির
ভূমি-কম্পন-বলে,
অবলুণ্ঠিত মূক ধরণীর
তপ্ত ধূলির তলে ।

অশোকার এই প্রেম-পরিণয়
ক্রূর নিয়তির খেলা,
ভাবি' শিহরিল যুবা অজিতায়
তরুণ প্রভাতবেলা ।

"অশোকা! অশোকা! অলকার ছ্যুতি!
সরলতাময়ী বালা!
বহ্নিতে কেন দিয়াছ আহুতি
পুণ্য প্রণয়মালা?

আমি প্রমত্ত সুষমা-স্বপনে
মগন, আত্মহারা;
উছলে চিত্তে শতেক ধরণে
সে সুধা-মাধুরী-ধারা!

সে রূপ যখন জাগিছে স্মরণে,
নাচিছে পুলকে ধমনী;
সেই রূপময়ী বিনা এ নয়নে
ধরণীতে নাহি রমণী!

ভু'ল ভালবাসা—এ মিনতি মোর,
অকরুতেজোধারিণি!
ছিঁড়' বাসনার মায়াময় ডোর,
বনলতা যথা করিণী।'

ঝঞ্ঝাপীড়িতা যেন মাধবিকা
কাঁপিল সবেগে কামিনী,
জ্বলিয়া উঠিল রূপালোকশিখা
অমেঘবাহিনী দামিনী!

"নহে এ ক্ষুদ্র ক্ষণিক বাসনা,
উজল ইন্দ্রচাপ।
লালসা-লুব্ধা নারীর ছলনা
মরীচিকা অভিশাপ!"—

[illegible]রিল না কথা—কোভে আঁখিপথে
বহিতে চাহিল বারি,
বিদ্যুৎবেগে [illegible]
চলি' গেল [illegible]

তারকা-হীরক-[illegible]থি' কেশজালে
সন্ধ্যা দিয়াছে দেখা,
নয়নে করুণা,—নির্ম্মল ভালে
শশি-চন্দনলেখা।

ভ্রমিছে সন্ধ্যা—মৃদু-মন্দালস
অতিমন্থর গমনে,
নব-কুবলয়-স্নিগ্ধ পরশ
বরষি' মগ্ধ ভুবনে।

কাঁপে বনবীথি মলয়পবনে,
নিঝরিণী গীতি অধীরা,
ভরিছে ভুবন সুধাসমীরণে
কুসুম-গন্ধ-মদিরা।

চন্দ্র-কিরণে তন্দ্রা-মগ্ন
শা[illegible]ন-তল,
শোভিছে প্রান্তে নীরদ-লগ্ন
নীল 'অরুণাচল'।

শৈলশিখরে কুন্দ-ধবল
চারু 'মর্ম্মর-মঠ'।
অঙ্গনে চির-ছায়া-সুশীতল
বহু-পল্লব বট।

বহিছে নিম্নে কল-উল্লাসে
লীলা-চঞ্চলা 'মায়া',
নীল-নীরে কোথা জ্যোৎস্না হাসে,
কোথা চিত্রিত ছায়া।

অশোকা কি আজ ভাবিছে বসিয়া
নির্ঝর-শিলা-শয়নে?
কি আলোক ওই উঠিছে ভাসিয়া
নব-নীলাব্জ-নয়নে?

কহিলা তরুণী চাহিয়া চাহিয়া
কুমুদ-চন্দ্র পানে ;—
"কি নিরাশা হায়! উঠিছে ভাসিয়া
বেদনা-মথিত প্রাণে ?

হ'বে নাকি তা'র প্রেমে এ প্রণয়
সুন্দর সুপবিত্র ?
হেরিব কি ধরা চিরশিখাময়
মরু-মরীচিকা-চিত্র ?

কেমনে ভুলিব—কেমনে বাঁচিব,
হৃদয় বাঁধিব পাষাণে ?
চিরনিশি [illegible] বাঁচিব
বসি' [illegible]র শ্মশানে

যতদিন আঁখি না মুদি মরণে,
ছাড়িব না তার সঙ্গ,
রহিব মাতিয়া চির-প্রেমরণে,
কভু নাহি দিব ভঙ্গ।

বলিতে বলিতে সহসা ফুটিল
আননে কি প্রেম-দর্প!
বিনোদিনী বেণী দুলিয়া উঠিল—
মণিরঞ্জিত সর্প!

"আজি নিরখিব, কে মোর তাপস,
কোথা মাধুরীর ধ্যানে
থাক প্রমত্ত নিশীথ-দিবস
স্বপ্ন বিবশ প্রাণে

থাক দূরে দূরে, ওহে দুর্লভ,
হে মোর চিত্তচোর,
যত যাবে দূরে, হৃদি-বল্লভ,
বাড়িবে এ প্রেমডোর।

যদিও হে নাথ! ঠেলেছ চরণে
এ মম হৃদয়-অর্ঘ্য,
দূর হ'তে তবু হেরিব নয়নে
আমার প্রণয়-স্বর্গ।"

ত্রস্ত বলি' বালা উচ্ছ্বাসভরে
ছাড়ি' নির্ঝর-তট,
উঠিল উচ্চ শৈলশিখরে
যথা 'মর্ম্মর-মঠ'।

ধীরে ধীরে খুলি' মন্দির-দ্বার
পশিল হর্ম্ম্য-মাঝে,
চমকি উঠিল নয়ন-আসার
বাধা-বিজড়িত লাজে।

এ কি পবিত্র নিভৃত নীরব
অপরূপ তপোবন!
কোন বনে হেন সুষমা-বিভব
জুড়ায় নয়ন মন?

কোথা ধ্যানাসনে মহাতপস্বী?
কেহ কোথা নাই কক্ষে!
কেবল চাঁদের রজত-রশ্মি
হাসিছে প্রাচীর-বক্ষে!

বাতায়ন-পথে স্তিমিতনয়নে
হাসে সুন্দর শশী,
এ কি! এ কি! ওই কুসুম-আসনে
কে রয়েছে একা বসি'?

চাহিয়া চাহিয়া বিস্ময়ভরে
ফুল্ল কমল-লোচনে,
কহিল অলোকা, কম্পিতস্বরে
বীণা-ঝিনিঝিনী বচনে ;—

"এ নহে স্বপ্ন—এ নহে ভ্রান্তি,
এ নহে ইন্দ্রজাল!
মর্ম্মরে বাঁধা কুসুমকান্তি
নব বসন্তকাল!

একি এ মূর্ত্তি দৃষ্টি-নন্দন
নিখিল-চিত্ত-হরা?
এ কা'র তরুণ রূপের স্বপন
পাষাণে দিয়াছে ধরা?

কা'র কামনার নন্দন হ'তে
রূপসী কিশোরী-বেশে,
চির-আরাধ্যা এসেছে মরতে
প্রেম-তপস্যা-শেষে?

কে কুসুমরেণু সুধারসে মাখি'
গড়িল প্রতিমাখানি?
চির-লাবণ্য দিল তাহে আঁকি
জ্যোৎস্না-তুলিকা টানি'?"

নূতন চিন্তা সহসা জাগিল,
বিকৃত আনন নেত্র
আশোকার দেহে কে যেন হানিল
বিষ বৃশ্চিক-বেত্র।

কোথায় সে রূপ—ভুবনমোহন
কুমারী-চিত্ত-মোহিনী?
এ যে পরিহিতে উদাসীন
চরণদলিতা অজিনী!

"ওরে মায়াবিনী! পাষাণরচিতা
মাধুরীর মরীচিকা!
ওরে অলস্ত প্রণয়ের চিতা,
মরণ-বহ্নি শিখা!—

এইরূপে তা'র অন্তরে বসি'
ক'রেছিস্ পরিহাস?
মোর সুখরাশি, ওরে রাক্ষসী,—
তুই ক'রেছিস গ্রাস?"

ধরিল সবলে প্রতিমার পাণি,
নয়নে জ্বলিল ক্রোধ,
স্ফুরিল অধরে রোষাকুল বাণী,—
"প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!"

* * * *

হর্ম্ম্যসোপানে দাঁড়ায়ে অজিত—
প্রীতিবাঞ্ছিত আস্য;
অধরে খেলিছে জ্যোৎস্না জড়িত
সুখরঞ্জিত হাস্য।

পূর্ণ হৃদয় প্রেমগৌরবে,
নয়নে অশ্রুভার।
শান্ত ফুলরাশি করপল্লবে,
কণ্ঠে কুসুমহার।

পলকিরণে স্মিত-পুলকিতা
ধরণীর পানে চাহি'
কহিল অজিত—"অয়ি বাঞ্ছিতা,
আজি আর ভেদ নাহি!

সকল কামনা হয়েছে সফল,
সার্থক সব দুখ,
পেয়েছি তোমারে চিরমঙ্গল
দেব-দুর্লভ সুখ!

আজি এ ফুল্ল ফুলসম্ভারে
সাজাবে মূর্ত্তিখানি,
হৃদয়ে বাহিরে হেরিব তোমারে
মানসী হৃদয়-রাণী!"

কভু [illegible] শোকবিহ্বল
নীরব সংজ্ঞাহারা,
কভু সচেতন ব্যথা-চঞ্চল
আকুল পাগল পারা।

নাহিক শান্তি, নাহি সান্ত্বনা,
নাহিক নিদ্রালেশ,
স্মৃতি-সর্পিণী তুলি' শতফণা
দংশে হৃদয়দেশ।

সে রূপসী মূরতি, সে মধুর হাসি
নয়নে ভাসে না আর,
ভেয়েছে হৃদয়, হায়! রাশি রাশি
নিবিড় অন্ধকার!

যত প্রযত্নে সংবরি' শোক,
মানস-নয়নে চাহি'
খুঁজিছে অজিত সে রূপ-আলোক
অন্তরে অবগাহি'।

দূরে—অতিদূরে—সরসীর তীরে
কুহেলি-মলিন ছায়া—
দেখিতে দেখিতে লুকা'ল তিমিরে
সে স্বপনময়ী কায়া!

নিশ্বাস ছাড়ি' নিদারুণ ক্লেশে
চাহিল বেদনাবেশে,
এ কি এ মূর্ত্তি গৃহদ্বারদেশে
দাঁড়ায়ে মোহিনীবেশে?

সহসা হরষে দেহ শিহরিল,
হৃদয় আবেগময়,
[illegible]নিধি যেন নাচিয়া উঠিল
[illegible] চন্দ্রোদয়!

[illegible] ! [illegible] বাতিরঙ্গিনী
[illegible]?
[illegible]সহ সে [illegible]—রূপরঙ্গিণী
[illegible]বন-বন-চারিণী?

যে রূপ হেরিয়া মুগ্ধ [illegible] গিয়া
'মুকুর'-সরসী-তীরে
ভেসেছি সতত [illegible] জাগিয়া
আকুল [illegible]!

যে রূপের চারু [illegible] গড়িতে
করেছিনু প্রাণপণ,
যে রূপের ধ্যান তিলেক ছাড়িতে
কভু না চাহিত মন;

সে রূপের এ কি মহা পরিণতি,
বিস্ময়করী শোভা!
সে কিশোরী আজি পূর্ণযুবতী
হৃদয়-নয়ন-লোভা।

এ কি প্রসন্ন রূপ-পূর্ণিমা,
এ কি লাবণ্য-বন্যা!
তুমি কি নিখিল-রমণী-মহিমা,
বিধির মানসী কন্যা?

মূর্ত্তি ধরিয়া এলে কি আবার
অয়ি লাবণ্যবতী?
এসো, আলো কর, হৃদয় আমার,
আমি অনন্যগতি।

মুকুর সরসী! জাগিল স্মরণে
সোনালী সন্ধ্যাবেলা,
সরসীর নীরে সেই আনমনে
একাকিনী জলখেলা।

[illegible] ! অশোভন কাঁপিছে,
[illegible] বিভ্রম [illegible] ;
হায় ! এত দিন আমারে ছলিল
আমারি মাধুরীঘন ?

নীরব মূর্তি ! নিষ্ক্রিয় দেহ ;
নির্জন চারি ধার ;
শিথিল অন্তিমে ঘোর সন্দেহ—
ছুরিকা তীক্ষ্ণধার।

না—না—এ যে মায়া—মম কল্পনা
আমারেই আজি ছলিছে ;
মরীচিকারূপে মরম-বাসনা
আঁখি-সম্মুখে জ্বলিছে !

"আমি সেই—তব চিরপরিচিত
প্রেমবিহ্বলা [illegible],
এ [illegible] মোর [illegible] ভূষিত
চিরদিন উপবাসী।

মায়া প্রপঞ্চ ঘুচিয়াছে আজি,
পেয়েছি নূতন দৃষ্টি ;
নহি আমি নাথ ! মায়া, ছায়াবাজী,
প্রেম-কল্পনা-সৃষ্টি।

"চির-আরাধ্যা ! প্রিয়ে ! প্রিয়তমে !"
"বাঞ্ছিত ! হৃদয়েশ !"
সকল যাতনা মধুর মিলনে
হইল স্বপনশেষ।

প্রাচীন মিশরের পুরোহিত।

It seems agreed, that the singular people Egyptians, and, by corruption, *Gypsies*,—passed the Mediterranean immediately from Egypt, and thier motley language.. ....contains so many *Sanskrit* words, that their *Indian* origin can hardly be doubted. The authenticity of that vocabulary seems established by a multitude of Gypsy words, as—*angar* (অঙ্গার), charcoal ;—*cashth* (কাষ্ঠ), wood, *par* (পার) a bank ;—*bhu* (ভূ) earth : and a hundred more for which the collector of them could find no parallel in the vulgar dialect of Hindustan, though we know them to be pure Sanskrit, scarce changed in a single letter.—*Eighth Presidential Address, Asiatic Society, 1791.*

প্রাচীন মিশরের সহিত ভারতবর্ষের বহুদিনের পুরাতন সম্বন্ধ। প্রাচ্যের জ্ঞানগৌরব বহুদিন হইতেই দূর-দূরান্তরে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। প্রাচ্যের পণ্য-সম্ভারে যে কত নগর সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, ইতিহাস এখন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মিশরবাসী ও ফিনিকগণ প্রথমে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে তরণী ভাসাইয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিল—সে আজ কত দিনের কথা। [illegible] উপসাগরের তীরবর্তী কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া তাহারা [illegible]

...ন্যাই সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছিল। ...চ্যের সহিত প্রতীচ্যের ইহাই প্রথম সম্বন্ধ।*

পুরাকালে ...নী রোম-নগরী যখন জনপদের পর জনপদ অধিকার করিয়া সৌভাগ্যসম্ভ্রমে ধনরত্নে ধরাতলে গরীয়সী হইয়াছিল, তখন রোমের শ্যেন-দৃষ্টি হইতে মিশর রক্ষা পায় নাই। রোমকগণ তখন অত্যন্ত বিলাসী ;—য়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান নগরী রোমের অধিবাসিগণ তখন কর্ম্মহীন, অলস, উল্লাসপ্রিয়, বিলাসী, স্বেচ্ছাচারী, গর্ব্ব-মত্ত। রোমকদিগের তুষ্টির জন্য তখন নানাবিধ দুর্ম্মূল্য বিলাস-সামগ্রীর নিতান্ত প্রয়োজন হইত। ধূলিরাশির ন্যায় মুষ্টি মুষ্টি অর্থ ছড়াইয়া সেই সকল বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করিয়া রোমকগণ তখন আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। ভারতবর্ষ হইতে মিশরে ও মিশর হইতে রোমে সেই সকল অমূল্য বিলাস-সামগ্রী প্রেরিত হইত। প্রতিবৎসর গ্রীষ্মের সময় ১২০ খানি বাণিজ্যতরণী মিশর হইতে ভারত-অভিমুখে যাত্রা করিত ; এবং ভারতের অমূল্য রেশম, দুর্ম্মূল্য প্রস্তরাদি ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া শীতাগমে মিশরে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। শুনিতে পাওয়া যায়, সলমনের সময় লোহিতসাগরের পথে ৪৮,৬০০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইত।†

ভারতবর্ষের সহিত যে মিশরের কেবল বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল, তাহা নহে ; আমরা মিশরের সহিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও কতকাংশে আবদ্ধ। কথাটা অনেকের নিকট একটু অপরিচিত হইবার সম্ভাবনা। টলেমি বলিয়াছেন, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-দিগের নিকট হইতে তিনি অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণ-দিগের সহিত তাঁহার আলেকজান্দ্রিয়ায় সাক্ষাৎও হইয়াছিল। আমাদিগের পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সিরিয়ার হায়ারপোলিস এক সময়ে ভারতের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র ছিল। † এ বিষয়ের আলোচনা সময়ান্তরে করা যাইবে।

---

* (1) The works of William Robertson—vol. XII.

(2) The Ancient History of the Egyptians by M. Rollin—vol. I.

* The Scripture history shows the traffic established by Solomon with India, through the Red Sea, to have been of very great consequence, producing *in one voyage*, no less than 450 talents of gold or £8,240,000 sterling.—The Ancient Egyptians—Wilkinsons ; vol I.

† Asiatic Researches—vol. III.

যাঁহারাই মিশর ও ভারতবর্ষ উভয় দেশেই পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিশর ও ভারতের মন্দিরাদি ও প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মূর্ত্তির সাদৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। ** শুধু ইহাই নহে, মিশরের প্রবাদ-প্রসঙ্গ ও পৌরাণিক কাহিনীর সহিতও ভারতের অনেক প্রবাদ-প্রসঙ্গের ও পৌরাণিক কাহিনীর অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়কের অভাবে এক দিন কণ্বাশ্রম-শোভনা শকুন্তলার দুঃখের সীমা ছিল না, সেই অঙ্গুরীয়কের বৃত্তান্ত সকলের নিকট সুপরিচিত। প্রাচীন মিশরের ইতিহাসেও সেইরূপ একটি অঙ্গুরীয়ক-কাহিনী ঈষৎ-পরিবর্ত্তিত আকারে দৃষ্ট হয়।* যাহা হউক, ভারতবর্ষের সহিত প্রাচীন মিশরের এইরূপ নানা সম্বন্ধ আছে। এসিয়ার সহিত মিশরের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ভাষা ও ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য দেখিয়া, কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে, মিশরীয়গণ এসিয়া হইতেই উদ্ভূত। সেই মিশরের প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

যে জাতিভেদ ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জাগত, মিশরের সামাজিক ইতিহাসেও সেই জাতিভেদপ্রথা পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি প্রধান বর্ণে বিভক্ত। যদিও হেরডোটসের মতে সপ্ত বর্ণে, ডাইওডোরসের ও ষ্ট্র্যাবোর মতে তিন বর্ণে মিশর বিভক্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিশরে চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রথাই প্রচলিত ছিল। ভারতের মত মিশরেও সেই চারি প্রধান বিভাগ হইতে বহু শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতে যেমন ব্রাহ্মণ সর্ব্বজাতির শিরোমণি, মিশরেও তেমনি পুরোহিতসম্প্রদায়ই সকল সাম্প্রদায়িক বিভাগের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মিশরের পুরোহিতকুলই ভারতের ব্রাহ্মণসম্প্রদায়; তাই বলিয়া কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, মিশরের পুরোহিতসম্প্রদায় আর ভারতের ব্রাহ্মণ এক। ভারতের ক্ষত্রিয় ও মিশরের দ্বিতীয় জাতির মধ্যে সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষিত হয়। যোদ্ধা ও কৃষক লইয়া মিশরের ক্ষত্রিয়বর্ণ, উন্নত নাগরিকগণ বৈশ্য বা তৃতীয় বর্ণ, এবং সাধারণ জনগণই (The plebs) মিশরের শূদ্রবর্ণ, বা চতুর্থ জাতি। ভারতবর্ষের মত মিশরেও প্রত্যেক জাতি, আপন

** Scenery costume and Architecture chiefly on the western side of India—Capt. Robert Melville.

* See the account of Amasis and Polycrates.

আপন জাতিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিত;—ভিন্নশ্রেণীর কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবার প্রয়াস করিত না।

ভারতে ব্রাহ্মণই মস্তক; অন্যান্য বর্ণ কেহ বা দক্ষিণ হস্ত, কেহ বা বাম হস্ত, কেহ বা সেই বিরাট দেহের পদ-স্বরূপ। মিশরের ব্রাহ্মণ-বর্ণ কিরূপ ছিল, দেখা যাউক। বারেন্দ্র, রাঢ়ী, শ্রোত্রিয়, বৈদিক প্রভৃতির ন্যায় মিশরেও পুরোহিতগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। সে বিভাগের মূলে গুণগত বা কর্ম্মগত পার্থক্যই প্রধান বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পুরোহিত স্বতন্ত্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। পুরোহিত বিচারক, পুরোহিত শাসক, ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রণেতা, পূজারী, দেবমন্দিরে ছত্রচামরধারী, বলির পশু-পরীক্ষক, বলির পশু-রক্ষক, দেবমন্দিরনির্ম্মাণকারী স্থপতি, দেব-পরিচ্ছদকারী প্রভৃতি সকলেই সেই এক শ্রেষ্ঠ জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখামাত্র। কর্ম্মগত পার্থক্যের জন্য কেহ বড়, কেহ ছোট।

ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়ের বাহু ও ব্রাহ্মণের বুদ্ধি একত্র মিলিত হইয়া, রাজ্য-সংরক্ষণে, ধর্ম্মসংস্থাপনে, সুখ শান্তির প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। ক্ষত্রিয় নামমাত্র নৃপতি ছিলেন—প্রকৃত নৃপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁহারা অনায়াসে ধনরত্ন, রম্য হর্ম্ম্য, কনক-সিংহাসন, মণিময় শিরোভূষণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যমধ্যে সিদ্ধাশ্রমে অজিনাসনে বসিয়া পরমারাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। আর সিংহাসনারূঢ় নরপতি আসিয়া, সেই হোমধূমগন্ধামোদিত নবকুসুমিততরুশোভিত শান্ত আশ্রমদ্বারে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সংসারনির্লিপ্ত অনাসক্ত ব্রাহ্মণের আদেশ উপদেশের অপেক্ষা করিতেন। মিশরেও পুরোহিতশ্রেণী হইতে নৃপতি নির্দ্দিষ্ট হইত। যদি কখনও কোনও সমরব্যবসায়ী (ক্ষত্রিয়) রাজা হইতেন, তাহা হইলে সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে পৌরোহিত্যে দীক্ষিত হইতে হইত।* তিনিই তখন সমগ্র মিশর রাজ্যে ধর্ম্মের রক্ষক ও পরিচালক স্বরূপ রাজকার্য্য করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। দেব দেবীর মন্দিরে বলির ব্যবস্থা, প্রধান উৎসবকালে দেবমন্দিরে ভোগের ও সামাজিক ভোজনের ব্যবস্থা, শান্তি-সংস্থাপন বা সমর-বিঘোষণ, রণক্ষেত্রে রাজবাহিনীর পরিচালন বা সেনাপতি-

* If the choice fell on a soldier, he was immediately initiated into the order of priests and instructed in their abstruse and hidden philosophy—Plutarch as quoted in Wilkinson's Egyptians, vol. 1.

নির্ব্বাচন প্রভৃতি সকল কার্য্যেই তখন তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব পরিগণিত হইত। পৌরোহিত্যে দীক্ষালাভ একদিনে হইত না। দীক্ষার প্রারম্ভে অনেক আয়োজন আবশ্যক হইত। পুরোহিতদিগের বিদ্যামন্দিরে তাঁহাকে অনেক দিন ধরিয়া শিক্ষানবিশী করিতে হইত। ধর্ম্মতত্ত্ব, পূজাবিধি, দেশের শাসনপ্রণালী, নৃপতির কর্ত্তব্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহাকে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইত। ভারতে যেমন, মিশরেও তেমনি রাজবিধি ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত হইত। ব্রাহ্মণ রাজবিধির সৃষ্টি করিতেন। পাছে কুসংসর্গে পড়িয়া তাঁহার মানসিক অবনতি ঘটে, এই জন্ত কোন ক্রীতদাস বা বেতনভোগী সাধারণ ভৃত্য তাঁহার নিকটে আসিতে পাইত না। পুরোহিতদিগের পরিণতবয়স্ক সুশিক্ষিত সন্তানগণ নিরত তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত।

পুরোহিতসম্প্রদায়ই সর্ব্বদা রাজকার্য্যে সহায়তা করিতেন। তাঁহারাই মন্ত্রী, তাঁহারাই বিচারপতি, তাঁহারাই রাজ্যের প্রধান অমাত্য, তাঁহারাই সর্ব্বকার্য্যে নরপতির উপদেষ্টা ছিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কর্ত্তব্যপালনের ও সদাচারের উপাখ্যান শুনাইয়া, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতির উপদেশ দিয়া, তাঁহারা সর্ব্বদা রাজার ও সেই সঙ্গে দেশের কল্যাণবৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইতেন ;—রাজা অবনতমস্তকে তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ ও পালন করিতেন। পুরোহিতগণ ইতিহাস, জ্যোতিষ, ভবিষ্যৎ গণনা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। দেবদেবীর মন্দিরসংলগ্ন চতুষ্পাঠীতে এক এক সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ শিক্ষালাভ করিতেন। দেবসেবায় জন্ত ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে সঙ্গে বিদুষী ব্রাহ্মণীরাও থাকিতেন। মিশরের উচ্চবংশীয় ধনকুবেরদিগের পুরমহিলাগণ, এমন কি, রাজরাণীও এই কার্য্যে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, বরং আপনাদিগকে সম্মানিতই মনে করিতেন। রমণীগণ কখনই প্রধান পৌরোহিত্যে বৃতা হইতে পারিতেন না। পতি পত্নী যে সর্ব্বদা একই দেব ও দেবীর পূজায় ও সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা নহে।

পৌরোহিত্য বংশগত ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া প্রধান পুরোহিতের বংশধর যে প্রধান পুরোহিতই হইতেন, তাহা নহে। পুরোহিতগণ সপরিবারে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। তাঁহাদিগকে রাজকর দিতে হইত না ;—রাজভাণ্ডার বা সর্ব্বসাধারণের ভাণ্ডার হইতে তাঁহাদিগের ভরণপোষণ চলিয়া যাইত। মিশরের ভূমি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল ;—এক ভাগ রাজার, এক ভাগ পুরোহিতদিগের, এবং অপর ভাগ ক্ষত্রিয়ের ভোগ্য ছিল।

[illegible] ভিন্ন [illegible]দিগের মধ্যে সম্মানের ও প্রতিষ্ঠার [illegible] ছিল। প্রধান পুরোহিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রধান প্রধান দেবতাদিগের পুরোহিতের [illegible] অন্যান্য পুরোহিত অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। পুরোহিতদিগের মধ্যে যাঁহারা দৈবজ্ঞ ছিলেন, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগকে [illegible] ভক্তি করিত। তাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, রাজনীতিবিশারদ ও যাজনবিধি-অভিজ্ঞ ছিলেন, পুরোহিতদিগের প্রাপ্য ভূমিকর তাঁহারাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। যখন রাজ্যমধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত কোনও নূতন বিধি প্রচলিত হইত, তখন প্রধান পুরোহিত ও দৈবজ্ঞদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া মিশরাধিপ সে বিধির প্রবর্ত্তন করিতেন না। সর্ব্বদা ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়া, ধর্ম্মসংক্রান্ত সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের সাহায্য আবশ্যক হইত বলিয়া, দেবদেবীর ক্রোধাপনয়ন বা আশীর্ব্বাদ-আনয়নে পারগ ছিলেন বলিয়া, পূজাবিধি তাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল বলিয়া, পুরোহিতগণ মিশর রাজের নিকট অধিক সম্মান লাভ করিতেন। দেশের কল্যাণকামনায় তাঁহারা সর্ব্বদা দেবদেবীর পূজা করিতেন বলিয়া, অনেকেই স্বেচ্ছায় পুরোহিতদিগকে বহু ধনরত্ন দান করিতেন। মিশরবাসিগণ মনে করিত, যাঁহারা শিক্ষায় দীক্ষায় চরিত্রে [illegible] সকলের শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ, ব্যক্তিবিশেষের ও সমগ্র জাতির কল্যাণকামনায় সর্ব্বদা পূজারত, তাঁহাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সর্ব্বসাধারণের সুখসম্পদ অপেক্ষা অধিক হওয়া আবশ্যক। তাই পুরোহিতদিগকে দান করিবার সময় তাহারা মুক্তহস্ত ছিল।

ভারতবর্ষের ন্যায় মিশরেও পূজাবিধির বড় আড়ম্বর ছিল। পূজাবিধির আড়ম্বরবাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে এক দিক [illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; ব্রাহ্মণ ভিন্ন সে সকল [illegible] নিয়ম আর কেহ বুঝিত না, শিখিত না, বা শিখিবার উপায়ও ছিল না। [illegible] মুষ্টিমধ্যে নিবদ্ধ থাকে, সমাজে [illegible] চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করে—ভারতবর্ষই তাহার দৃষ্টান্ত। মিশরেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম [illegible] মিশরীয় পুরোহিতদিগেরই করতলগত ছিল। পুরোহিত ভিন্ন আর কেহ সে সমুদয় জানিত না, শিক্ষাও করিতে পারিত না; এমন কি, অনেক পুরোহিত পর্য্যন্ত সে সমুদয় সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ থাকিত। শুধু কতকগুলি ভাগ্যবানের হস্তেই ধর্ম্মের সারটুকু ছিল, আর অন্যান্য সকলে ধর্ম্মের [illegible] আবরণ লইয়া নাড়া চাড়া করিত মাত্র। ধর্ম্মের সারভাগ গুহ্য ও সূক্ষ্ম

অংশে বিভক্ত ছিল বলিলেও বলা যায়। স্থূলাংশে অধিকার না জন্মিলে কেহই সূক্ষ্মাংশের অনুধাবনে অধিকারী হইতেন না। সূক্ষ্মতত্ত্বলাভেচ্ছু শিষ্যগণ নির্ম্মলচরিত্র, সংযমী, শান্ত, সুধীর ও সুশিক্ষিত না হইলে, তাহাদিগকে সে অধিকার দেওয়া হইত না। এ জন্য অনেক সময় আবার তাহাদিগকে অতি কঠোর কায়িক ক্লেশও সহ্য করিতে হইত।

পুরোহিতদিগের ভিতর দুই প্রকার লিখনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি যে প্রণালী অবলম্বনে লিখিত হইত, তাহাকে Hieratic বলিত। অন্যপ্রকার লিখনপ্রণালী সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিত। ইহা ভিন্ন চিত্রাক্ষরও (Hieroglyphic) প্রচলিত ছিল। পুরোহিতসন্তানগণ জ্যামিতি, গণিত-শাস্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি শিক্ষা করিত। অধুনা বিলাতে বসিয়া প্রোফেসর মিল্‌নে যেমন ভূমিকম্পের গণনা করিয়া থাকেন, মিশরীয় পুরোহিতগণও সেই-রূপ গণনা করিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের যন্ত্র ছিল না, শুধু গণনার দ্বারা কার্য্য-সিদ্ধি করিতেন। মিশরীয়গণ অতিমাত্রায় অনুসন্ধিৎসু ছিল। তখনকার যুগে কোনও জাতিই এ বিষয়ে তাহাদিগের সমকক্ষ ছিল না। হেরডোটসের ইতি-হাসে লিখিত আছে, মিশরীয়গণ যে দিন যে অভিনব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিত, সেই দিনই তাহা লিখিয়া রাখিত, এবং তাহার কারণনির্দ্দেশে ব্যগ্র হইত। এইরূপে ঘটনাবিশেষের একটা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের নির্ণয় করিয়া তাহারা দিনের পর দিন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত। পক্ষের পরে হউক, মাসের পরে হউক, বৎসরের পরে হউক, যখনই আবার সেই পূর্ব্বঘটনাটি প্রত্যক্ষীভূত হইত, তখনই তাহারা তদ্বিষয়ে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইত। এ সকল বিষয়ে পুরোহিতগণই সকলের শিক্ষক ছিলেন।

তাঁহাদিগের মনে মুখে এক ছিল। সমাজের উপদেষ্টার স্বরূপ তাঁহারা যাহা বলিতেন, আত্মজীবনেও তাহারই অনুসরণ করিতেন। সে কালের সেই সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়, তাঁহারা আপন আপন উন্নত চরিত্রের বলে অমল ধবল হিমাচলের ন্যায় আত্মগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, সমাজমধ্যে মূর্ত্তিমান পবিত্রতাস্বরূপ বিরাজ করিতেন। তাঁহাদিগের যোগাশ্রম হইতে পূত হোমধূম উঠিয়া গগন সমাচ্ছন্ন করিত না বটে, তাঁহাদিগের তপোনিকুঞ্জ সামগানে মুখরিত হইয়া উঠিত না সত্য, কিন্তু দেশের ও সমাজের শাসক ও উপদেষ্টার স্বরূপ তাঁহারা যেরূপ কঠোর কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী ছিলেন, সর্ব্বদা চিত্তশুদ্ধি ও দেহশুদ্ধি লইয়া যেরূপ ব্যগ্র থাকিতেন, তাহাতে তাঁহারাও

ভারতবর্ষের সিদ্ধ তাপসের তুল্য ছিলেন। যদিও তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে সাংসারিক ভোগসুখের উপাদান অল্প ছিল না, তথাপি তাঁহাদিগের জ্ঞান ও শিক্ষা, পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাব সর্ব্বকালের জন্য তাঁহাদিগকে সংযত রাখিত, তাই তাঁহারা প্রাচীন মিশরসমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও আমাদিগেরই মত বুঝিতে শিখিয়াছিলেন, "মা কুরু ধনজনযৌবন গর্ব্বম্"।

ভারতের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় মিশরের পুরোহিতসম্প্রদায়ও ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলির প্রচার করিতেন না; ইহার জন্য তাঁহাদিগকে স্বার্থপর বলা যায় না। সংসারের কর্ম্মকোলাহল সুখ দুঃখ প্রভৃতি লইয়া সাধারণ মনুষ্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। তাহাদিগের দৈনন্দিন জীবনের জন্য দর্শনের বা ন্যায়ের বা ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বালোচনার কোনও প্রয়োজনই নাই—"তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল", সে মীমাংসায় তাহাদিগের কোনও লাভালাভ নাই; দেশের প্রত্যেকেই যদি দার্শনিক হইয়া উঠে, তাহা হইলে সংসার অচল হইয়া পড়ে। তাই পুরোহিতগণ সর্ব্বদা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে সুমহান কর্ত্তব্যের উজ্জ্বল আলেখ্য লিখিয়া, সর্ব্বদা পাপের বিভীষিকা ও নরকের যন্ত্রণা দেখাইয়া, পুণ্যের শান্তি ও স্বর্গের সুখের বর্ণনা করিয়া, আত্মজীবনে সৎকর্ম্মের পথ দেখাইয়া, তাহাদিগকে কর্ত্তব্যপরায়ণ, ধর্ম্মভীরু, শান্তিপ্রিয় ও সত্যনিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিতেন—মিশরসমাজকে সংযত করিতেন—সমাজ-হৃদয়ের উদ্দাম চাঞ্চল্য সংহত করিতেন। মন্ত্রমুগ্ধ সমাজ শিক্ষকের শিক্ষা ও জ্ঞান, চরিত্র ও আত্মশুদ্ধি দর্শনে করযোড়ে চরণে প্রণত হইত; এবং ভারতের ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্রাহ্মণসেবার ন্যায়, পুরোহিতদিগের সেবা করিত, এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদিগের আদেশ উপদেশ শিরে তুলিয়া লইয়া কৃতকৃতার্থ হইত।

ব্রাহ্মণ তপস্বীদিগের ন্যায় মিশরের পুরোহিতগণও বুঝিয়াছিলেন যে, আহার একটি গুরুতর ব্যাপার। সাত্ত্বিক আহারই উপাসনার প্রথম সোপান। তাঁহারা আরও বুঝিয়াছিলেন যে, আহারের সহিত শরীরের, শরীরের সহিত মনের, এবং মনের সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; তাই তাঁহারা আহারে ও বিহারে অতিশয় সংযমী ছিলেন। আহারের ও পানের যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ছিল, পুরোহিতগণ কোনও ক্রমেই সে পরিমাণ অতিক্রম করিতেন না। অতি সাধারণ খাদ্যসামগ্রী, কখনও কখনও অনতিতীব্র স্বল্প দ্রাক্ষাসুরা, সাধারণ বেশভূষা তাঁহাদিগের চিরসঙ্গী ছিল। তাঁহারা সামুদ্রিক বা নীল নদীর (The Nile)

মৎস্য আহার করিতেন না। পলাণ্ডু, র[illegible] (Bean), মটর প্রভৃতিও নিষিদ্ধ ছিল। মেষ, শূকর প্রভৃতির মাংস পুরোহিতদিগের অখাদ্যমধ্যে পরিগণিত হইত। শূকরপালকগণ মিসরসমাজের সর্ব্বনিম্নাসন গ্রহণ করিয়াছিল। কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে চাহিত না—তাহারা দেব-মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার পাইত না। এমন অনেক পুরোহিত ছিলেন, যাঁহারা লবণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

আহারের ন্যায় দেহশুদ্ধির দিকেও তাঁহাদিগের প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাঁহারা দিনমানে দুইবার ও রজনীতে আবার দুইবার স্নান করিতেন। সর্ব্ব শরীর সর্ব্বদা লোমহীন থাকিত, তিন দিন অন্তর ক্ষৌর কার্য্যের নিয়ম ছিল। মুণ্ডিতমস্তকে, মুণ্ডিতদেহে তাঁহারা দিবারাত্রি চারি বার স্নান করিয়া দেহ-শুদ্ধি করিতেন। মিশরসমাজে ব্রত নিয়মাদির অভাব ছিল না। পুরোহিতগণ সকল ব্রত নিয়মই পালন করিতেন। মধ্যে মধ্যে আবার তাঁহাদিগকে উপবাস করিতে হইত, হিন্দুর মত নির্জ্জল উপবাস কি না, তাহা বলা যায় না। কোনও কোনও সময় একাদিক্রমে ৪২ দিন কিংবা ততোধিক দিবস পর্য্যন্ত উপবাস চলিত;—সাত দিনের কম কখনই হইত না। উপবাসের প্রারম্ভে দেহ-শুদ্ধির ঘটা কিছু অধিক হইত।

অশনের ন্যায় পুরোহিতদিগের বসনভূষণও অতি সাধারণ ও সামান্য ছিল। কিন্তু উৎসবের সময় তাঁহারা জমকাল পোষাক পরিধান করিতেন। সকলের পরিচ্ছদই একরকম ছিল না; সম্প্রদায়বিশেষে পোষাক পরিচ্ছদেরও তারতম্য ছিল। প্রধান পুরোহিতগণ যখন দেবতার সমক্ষে পশু বলি দিবার আয়োজন করিতেন, অথবা শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে গমন করিতেন, কি অভিষেকের পূর্ব্বে নরপতিকে স্নানাদি করাইতেন, তখন ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত আলখাল্লায় দেহ আবৃত করিতেন। উৎসব ও পুরোহিত-দিগের পদগৌরব অনুসারে নানাপ্রকার পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইত। মন্দিরে পূজা করিবার সময় স্বর্ণহার, স্বর্ণবলয়, কুসুমমাল্য প্রভৃতি ধারণ করিবার রীতি ছিল। পুরোহিতগণ সাধারণতঃ কার্পাসনির্ম্মিত সাধারণ পরিচ্ছদই পরিধান করিতেন। পুরোহিতগণ তালপত্রের অথবা Papyrus বৃক্ষের (পেঁপে গাছ) বল্কলে বিনির্ম্মিত পাদুকা ভিন্ন অন্য পাদুকা ব্যবহার করিতেন না। যেমন অশন, তেমনই ভূষণ ও তদুপযুক্ত বসন ছিল; আর শয়নের ব্যবস্থাও ঠিক সেইরূপ। ভূমিতলে চর্ম্ম, অথবা তৃণ, অথবা তালপত্র

বিছাইয়া, তাঁহারা শয্যারচনা করিতেন। সেই তৃণ বা তালপত্রে বিরচিত শয্যার উপর মাদুর অথবা চর্ম্ম বিছাইয়া কোমল উপাধানের পরিবর্ত্তে কঠিন কাষ্ঠখণ্ডে শির রক্ষা করিয়া পুরোহিতগণ অনায়াসে নিশিযাপন করিতেন। পুরোহিতদিগের একের অধিক দারপরিগ্রহ করিবার নিয়ম ছিল না, কিন্তু অনেকে তাহাও করিতেন না। চিরদিন অকৃতদারই থাকিতেন।

যে সময় ভারতবর্ষের সহিত মিশরের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তখন তথায় সিংহাসনে পুরোহিত, বিচারাসনে পুরোহিত, মন্ত্রী অমাত্য প্রভৃতিও পুরোহিত। তাঁহারা দীনক্লেশে, সামান্য আহারে, সামান্য ভূষণে তুষ্ট হইয়া, ধর্ম্ম-সংরক্ষণে, রাজ্য-সুশাসনে ও স্বার্থত্যাগ ও আত্মসংযমে সমাজের হিত-সাধনে নিয়ত ব্যাপৃত ছিলেন। তখন ভারতবর্ষে যেমন ব্রাহ্মণ সুপ্রতিষ্ঠিত, মিশরে তেমনি পুরোহিত সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতেরও তখন সুবর্ণযুগ, মিশরেরও তখন সুবর্ণযুগ। আর কি সে দিন ফিরিয়া আসিবে?

সহযোগী সাহিত্য।

ভারতের আদিম অধিবাসী।

"ডন" নামক সুপরিচালিত দৈমাসিক হইতে আমরা এই প্রবন্ধটি পত্রস্থ করিলাম।

ভারতবর্ষের প্রায় এক কোটী অশীতি লক্ষ অধিবাসী দুর্গম অরণ্য বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশ ও ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত জলাভূমিতে বাস করিয়া থাকে। উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের শীতল অরণ্য-সঙ্কুল পর্ব্বতে, ভারতবর্ষের উত্তর-প্রান্তস্থিত পার্ব্বতীয় গিরিমালার ক্রোড়ে ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অরণ্যে, মধ্য-ভারতের শৈলমালা প্রভৃতি স্থানে, এই সকল অধিবাসীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলেই তাহারা এরূপ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, এবং তাহাদিগের আবাসভূমি এরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত যে, তাহাদিগের সহিত পরিচয়-স্থাপন একরূপ অসম্ভব। ভারতবাসীরা জাপানের এনো ও অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে যত দূর অবগত আছেন, এই সকল স্বদেশবাসী অসভ্যদিগের সম্বন্ধে তাহাদের সেরূপ অভিজ্ঞতা নাই।

ভারতের এই সকল আদিম অধিবাসীদের প্রধান বাসস্থান ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। গঙ্গাতীর হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা ও উত্তরে এলাহাবাদ হইতে দক্ষিণে গোদাবরীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বনভূমিই তাহাদিগের প্রধান বাসস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। জাতিগত ও অন্যান্য সাদৃশ্যের হিসাবে বিভক্ত করিলে দেখা যায় যে, গণ্ডজাতি মধ্যভারতে, ভীল ও কোলি জাতি পশ্চিম-ভারতে, মেয়ার ও মীণা জাতি রাজপুতানায়, কোল, সাঁওতাল ও বাগদী জাতি বঙ্গদেশে, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের মধ্যবর্ত্তী

স্থানে, গণ্ডেরা-সকলেই প্রত্যেক অংশের অরণ্য-সঙ্কুল স্থানে সমবেত হইয়াছে। মধ্য-ভারতেই অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক অসভ্যজাতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ ও আসাম ঠিক ইহার পরে স্থান পাইবার যোগ্য। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যবর্ত্তী স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বন্যজাতি বাস করে। এতদ্ব্যতীত আরও নানাপ্রকার জাতি, কেবল দক্ষিণ-ভারত ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া আছে। প্রত্যেক জাতির নাম বিভিন্ন, এবং প্রত্যেকের নূতন প্রকার বিশেষত্বজ্ঞাপক চিহ্নও বর্ত্তমান। সীমান্ত প্রদেশের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব ভাগে সঙ্করজাতিসমূহ বাস করিতেছে। বহুদিন হইতে তাহারা অসভ্যদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা যে আফগান, মঙ্গোলিয়ান ও ব্রহ্মদেশীয় মূল হইতে উৎপন্ন, তাহাদের শারীরিক গঠন ও অভ্যাস হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। এই জাতিসমূহ সমতল-ভূমির অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ ও বনভূমিনিচয়ের তাহারাই যথার্থ উপযুক্ত অধিবাসী। তাহারা না থাকিলে বনভূমি নিত্যবর্দ্ধনশীল বন্যজন্তুরই একমাত্র আবাসস্থল হইয়া থাকিত। বন্যজাতিসমূহ বনজন্তুদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে দেয় না। তাহারা না থাকিলে পার্ব্বত্য প্রদেশে বাসগৃহের চিহ্নমাত্র লোপ পাইত, এবং অরণ্য পরিষ্কার পূর্ব্বক বাসোপযোগী করিবার আশামাত্র থাকিত না। এই বন্যজাতিবৃন্দ অনেকটা বন্যজন্তুদিগেরই মত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তথাপি তাহারা অরণ্যচর পশুদিগের মতই স্বাধীন। অত্যাচারের প্রতি যে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণাবশতঃ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ লোকালয় ত্যাগ করিয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এখনও এই বনচরদিগকে অত্যাচারে সেইরূপ বীতরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। দাসত্ব ও যথেচ্ছাচারে ঘৃণা তাহাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ।

মধ্যভারতের যে অংশ গোদাবরীর নিম্নতম উপত্যকার পূর্ব্বপ্রান্তে ও মহানদীর দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত, উহাই অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন ভারতের অন্যতম প্রদেশ। এই প্রদেশ উন্নতভূমি ও শৈলমালায় সমাকীর্ণ, এবং ইন্দ্রবতী নাম্নী গোদাবরীর বৃহৎ শাখানদীর তীরভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রদেশ সাধারণতঃ গণ্ডোয়ানা নামে পরিচিত। এখানকার অরণ্যভূমি এরূপ দূষিত বাষ্পে পরিপূর্ণ যে, বহুসংখ্যক ইংরাজ ও দেশীয় কর্ম্মচারী জরীপ করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই বেতসজালজটিল, দীর্ঘতৃণসমাচ্ছন্ন ও শেগুন অরণ্যে পরিবৃত প্রদেশ সমুদ্র-সমতল হইতে অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই সকল পল্লীতে গণ্ডেরা অযত্ননির্ম্মিত পর্ণকুটীরে বাস করে। ইহারা একপ্রকার নগ্ন বলিলেই হয়। কোনও অপরিচিত ব্যক্তি পল্লীর সন্নিহিত হইলে, ইহারা কুটীর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে, এবং সন্নিহিত শৈলমালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। বনে উহাদের বাস, বনজাত ফলমূলই উহাদের জীবনোপায়। স্থানে স্থানে ইহারা কুঠার ও অগ্নির সাহায্যে সামান্যরূপ কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। গোদাবরী-সন্নিহিত গণ্ডোয়ানার প্রান্তভাগে বা উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে ধান্যক্ষেত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। বনজাত ফলমূল মধু প্রভৃতি ও মৃগয়ালব্ধ মাংসই মধ্যবর্ত্তী গণ্ডদিগের প্রধান অবলম্বন। তাহারা নিপুণ-শিকারী, তীর-ধনুকের সাহায্যে সুন্দর শিকার করিয়া থাকে। মারিয়ার পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী ইন্দ্র-বতীর উত্তরভাগে 'গণ্ডোয়ানা' প্রদেশ অবস্থিত। এই স্থলে 'মারিয়া'দিগের বাসস্থান। তাহারাই গণ্ডদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বন্যস্বভাবাপন্ন। ইন্দ্রবতীর দক্ষিণে, যেখানে গোদাবরী

ইহার একটি শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই স্থলে [illegible] জাতি বাস করে। ঠিক ইহার দক্ষিণে গোদাবরীতীরবর্ত্তী নিম্নভূমিখণ্ডের প্রান্তভাগে 'কোইস্' জাতির বাস। ইহারা সকলেই গণ্ডজাতির অন্তর্ভূত; তাহাদের কথোপকথনের ভাষা এক হইলেও সামাজিক রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ ভাগের গণ্ডজাতির আদিমকালীন আচার ব্যবহার সমতলভূমির হিন্দুদিগের সংস্পর্শে অনেকপরিমাণে রূপান্তরিত হইয়াছে।

ভীলজাতি ভীলওয়ারা প্রদেশে বাস করে। এই প্রদেশ রাজপুতানা, খান্দেশ ও মহারাষ্ট্র রাজ্যের ইন্দোর প্রদেশের কিয়দংশ লইয়া গঠিত। মধ্য-প্রদেশের এই সকল স্থল পরিব্রাজকের অগম্য। পরস্পরসংলগ্ন বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া যে স্থানে নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া এই গিরিবেষ্টনের মধ্য দিয়া বোম্বাই প্রদেশে নর্ম্মদা যে স্থলে প্রশস্ত নদীর আকার ধারণ করিয়াছে, সেই স্থল অবধি ভীলদিগের বাসস্থান। এই উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ভীলদিগের জন্য ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে নানাবিধ অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। ভীলদিগকে সুশাসিত করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। অবশেষে ইংরাজ গবর্মেণ্ট ভীলদিগকে বশীভূত করিবার জন্য একটি ভীল-সেনাদল সংগঠনের প্রস্তাব করেন। সেনাদলে প্রবেশ লাভ করায়, ভীলদিগের উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতির বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শান্তিরক্ষা বা পুলিসের কার্য্যে ভীলদিগের অসাধারণ নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহারা সুনিপুণ শিকারী, সুদক্ষ অরণ্যচর ও অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। ইহাদের সত্যপ্রিয়তা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহারা কুকুরের মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করে, তাহা কখনও মিথ্যা হয় না। ভীলেরা সদাপ্রফুল্ল, সরলহৃদয়; কিন্তু অত্যন্ত সুরাপায়ী। পশ্চিম-ভারতের বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্য বন্যজাতিসমূহকে কোলি জাতি কহে। আকৃতি ও প্রকৃতিতে তাহারা ভীলদিগেরই অনুরূপ। গুর্জ্জর ও মালব প্রদেশের 'গ্রাসিয়া,' কাথিবারের 'কাথিস' ও 'কাত্রি' জাতিরা বলে যে, তাহারা লঙ্কেশ্বর রাবণের বংশধর। সহ্যাদ্রির পাদমূলে তাহাদের বাসস্থান।

'খণ্ডেরাই' পূর্ব্বঘাট অদ্রিশ্রেণীর প্রধান অসভ্য অধিবাসী। তাহাদের দেশ গণ্ডোয়ানার পূর্ব্বসীমা হইতে বঙ্গোপসাগর অবধি ও উত্তরে মহানদী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। খণ্ডজাতি গণ্ড ও ভীলজাতি অপেক্ষাও বর্ব্বর। তাহারা কৃষিকার্য্য ও যুদ্ধ বিগ্রহের অনুরাগী। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্য তাহাদের প্রীতিপ্রদ নহে। পিতাকে তাহারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। তিনিই সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। পিতাই একমাত্র পার্থিব দেবতা। তাঁহার অনুশাসন রাজ-আদেশের ন্যায় তাহারা পালন করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে খণ্ডেরা পিতৃদেবতার তৃপ্তির জন্য তাঁহার সম্মুখে মনুষ্য উৎসর্গ করিত। তজ্জন্য তাহারা সমতলভূমি হইতে মনুষ্য হরণ করিয়া লইয়া যাইত। ভবিষ্যৎ-প্রয়োজন-সাধনের জন্য তাহারা অপহৃত মনুষ্য প্রতিপালন করিত। পরে প্রয়োজন মত তাহাদিগকে বলি দিত।

নীলগিরি পর্ব্বতমালার শস্পসমাচ্ছন্ন ক্রমনিম্ন ভূমিতে পর্ণনির্ম্মিত কুটীরে 'টোডা' জাতি বাস করে। তাহাদের কুটীরগুলির প্রবেশদ্বার অপরিসর ও অনুচ্চ। এই ক্ষুদ্র দ্বারপথে তাহারা হামাগুড়ি দিয়া যাতায়াত করে। মান্দ্রাজ বিভাগের অন্যান্য অসভ্য জাতির

মধ্যে হিংস্রপ্রকৃতি 'খর্‌বার' [illegible], দীর্ঘকেশ বিভীষণমূর্ত্তি 'পুলিয়াব' জাতি ও ভ্রমণশীল '[illegible]জার' জাতি উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছোটনাগপুর অবস্থিত। তাহার পূর্ব্বভাগে ছোটনাগপুরের মালভূমি। এই বিস্তীর্ণ তরঙ্গায়িত পর্ব্বতসমাকুল প্রদেশের কোথাও বা অরণ্য নিবিড়, কোথাও বা বৃক্ষসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। এই প্রদেশের বন্যজাতিরা অসংখ্য নামে পরিচিত। কতকগুলি এই পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে। কিন্তু [illegible]কলেরই আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় ত্রিংশৎ প্রকার কথোপকথনের ভাষা প্রচলিত আছে।

এই [illegible]দেশের কোল জাতির কতিপয় শাখাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তন্মধ্যে 'মন্দা,' 'ভূমিজ,' 'কোল' [illegible]র্কা'রা যুদ্ধব্যবসায়ী। কোলেরাই উল্লেখযোগ্য। কোলেরা নৃত্যকলায় বিশেষ অনুরাগী।

ছোটনাগপুরের মধ্যভাগের সুবিস্তৃত মালভূমিতে 'মুণ্ডা' জাতি বাস করে। ছোটনাগপুরের মধ্যভাগে ও শাখানদীর তীরবর্ত্তী পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশ তাহাদের প্রধান আবাসস্থল।

প্রত্যেক গ্রাম্য পঞ্চায়তের (Community) প্রধান ব্যক্তি বা মণ্ডলকে 'মুণ্ডা' বলে। সাধারণের মতানুসারে মুণ্ডা নির্ব্বাচিত হয়। সাঁওতালদিগের মণ্ডলেরা 'মুঞ্জি,' এবং 'ভূমিজ কোল'দিগের মণ্ডলেরা 'সরদার' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন্দারা সিংবঙ্গা অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্রের উপাসক। সূর্য্যেরপত্নী। চন্দ্রের কলাপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটি অপূর্ব্ব প্রবাদ কল্পিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে এক সময়ে চন্দ্র স্বীয় পতি সূর্য্যের নিকট অবিশ্বাসিনী হন। সূর্য্য বিশ্বাসঘাতিনী পত্নীকে কঠিন দণ্ড দান করেন। ক্রোধান্ধ হইয়া সূর্য্য স্বীয় পত্নীর মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। চন্দ্র পরমরূপলাবণ্যশালিনী ছিলেন, সে জন্য সূর্য্য অনতিবিলম্বে পত্নী-বিয়োগে ঘোরতর অনুতপ্ত হন। অতঃপর পত্নীবিয়োগে অনুতপ্ত হইয়া তিনি সময়ে সময়ে তাহাকে পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও শোভায় ভূষিত হইবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু একবার তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইবার নহে, এই জন্য এখনও তিনি প্রতিকলায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন।

মানভূমে 'ভূমিজ কোল'দিগের বাসস্থান। তাহারা অর্দ্ধ-অসভ্য, অর্দ্ধ হিন্দু। তাহারা কখন কখন কুলীর কার্য্য, কখনও বা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদিগের প্রকৃতি অন্যরূপেরই মত উচ্ছৃঙ্খল। প্রতিবৎসর মানভূম জেলা হইতে চা বাগানে যে সমস্ত কুলী আমদানি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ভূমিজ কোলের সংখ্যাই অধিক। তাহারা মানভূম জেলার মধ্য ও দক্ষিণ ভাগে, সুবর্ণরেখা ও কোসাই নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করে। তাহাদিগের দেশ পর্ব্বতমালার দ্বারা বিভক্ত বলিয়া তাহাদিগের মধ্যে অনেক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। পশ্চিমদিকবর্ত্তী অসভ্য জাতিরা মুণ্ডাদিগের আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। পূর্ব্বপ্রান্তবাসী অসভ্যেরা বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, এবং হিন্দু রীতি নীতি অবলম্বন করিয়াছে।

কোলজাতির মধ্যে 'হো'রাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। তাহাদিগকে লার্‌কা যুদ্ধজীবী কোলও বলে। তাহারা দীর্ঘাকার, সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠদেহ। ছোটনাগপুরের অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে তাহাদের তুল্য সাহসী শ্রমসহিষ্ণু জাতি আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

সিংহভূম জেলার মধ্যবর্ত্তী মুক্ত মালপ্রদেশ তাহাদের অধিকৃত। এই স্থানটি কহ্লান নামে পরিচিত।

কোল-বংশের তিনটি শাখা ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক অসভ্য জাতি ছোটনাগপুর মালভূমির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে। উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে 'ওরায়ন' [illegible], গঙ্গাতীরে 'চেরস' জাতি, পালামৌ প্রদেশে 'প্যারিয়া' ও 'বিজ্রিয়া' জাতি, মানভূম ও [illegible] 'খেরিয়া', হাজারিবাগ 'বীরহোড়' প্রভৃতি জাতির আবাসস্থান।

সাঁওতাল জাতি বঙ্গদেশের পশ্চিমবর্ত্তী প্যালামৌ, হাজারিবাগ, মানভূম প্রভৃতির অরণ্যে ও রাজমহল শৈলশ্রেণীর পাদদেশে বাস করিয়া থাকে। এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ সাঁওতাল পরগণা নামে অভিহিত।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'বেলুচী', 'পাঠান', 'ওয়াজিরি', 'গুণোটী', 'আফ্রিদি', 'মোমুন্দ', 'সোয়াৎ' প্রভৃতি জাতি বাস করিয়া থাকে। এই সকল অসভ্য জাতির কতকাংশ ইংরাজ গবর্মেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

হিমালয় গিরি-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত উত্তরসীমান্তবর্ত্তী ভূমির পশ্চিমপ্রান্ত হইতেই 'ভুটিয়া', 'খাসিয়া', 'বক্সা' ও 'থারু' জাতির বাসস্থান পরিদৃষ্ট হয়। 'লিম্বু', 'মুরমি', 'কিরাস্থি' ও 'লেপচা' জাতি নেপাল ও সিকিম রাজ্যে, এবং 'মেচ' ও 'কচ' জাতি তরাই, ডুয়ার ও উত্তর-বঙ্গের সীমান্তে দৃষ্ট হয়।

ভুটান রাজ্যের পূর্ব্ব হইতে আসামের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত হিমালয় প্রদেশে বহুতর অসভ্য জাতির বাস। এখনও বৃটিশ-গবর্মেণ্টের তাহাদের সহিত কোন সংস্রব হয় নাই। কেবল বাহিরের গিরিপাদমূলে যে সকল জাতি বাস করে, তাহাদের অধিকৃত স্থানের কিয়দংশ বৃটিশ গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। [illegible] ইংরাজ গবর্মেণ্টের বশ্যতাস্বীকার করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় ইহারা তাঁহাদের নিকট হইতে নানারূপ নির্দ্ধারিত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে 'আকা', 'দাফলা', 'মিরি', 'আবর' ও 'মিশমী'রাই উল্লেখযোগ্য। তাহারা ব্রহ্মপুত্র নদের অপেক্ষাকৃত উচ্চ উপত্যকাভূমিতে বাস করে। দক্ষিণ উপত্যকাভূমতে 'কামটি', 'সিংপো' ও 'নাগা' জাতি বাস করে। নাগা শৈলমালার পশ্চিমপ্রান্তস্থ প্রদেশ, 'খাসিয়া', 'গারো', 'কাছাড়িয়া', 'মিকির' ও 'কুকি' জাতির অধিকৃত। শেষোক্ত জাতির আবাসস্থান হেলাকান্দি উপত্যকা হইতে চট্টগ্রামের সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। বৈশাখ। "ভারতী" ঊনত্রিংশ বৎসরে পদার্পণ ক[illegible] আমরা সানন্দে "ভারতী"র অভিনন্দন করিতেছি। বাঙ্গালার মাটীতে আগাছারই একাধিপত্য, [illegible] সাহিত্যের আবাদে কোনও মতেই 'সোনা ফলে না'। হয় ত আমরাই 'কৃষিকাজ জানি না'; কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখি, এ দেশে আগাছাই বেশ দ্রুত, ক্ষেত ছাইয়া ফেলে। মাসিকপত্রের চাষ ত নাই বলিলেও চলে; আনাচে কানাচে মাসিকের যে সামান্য 'আওলাত' দেখিতে পাই, তাহাও প্রায় নিষ্ফল। অনেক স্থলে যেমন অঙ্কুরের উদ্গম, অমনই পলযপয়োধিজলে দত্ত

[illegible] জন্মমাত্রেই, সূতিকাগারেই, পত্র-শিশুদের পেঁচো-প্রাপ্তি ও গঙ্গালাভ। কেবল দুঃখ করিয়াই নিস্তার নাই, নৈরাশ্যে মন ভাঙ্গিয়া যায়। এই দুর্দ্দিনে "ভারতী"র দীর্ঘজীবন আশায় আলোর মত মনোরম মনে হইতেছে। কিন্তু এই হর্ষেও বিষাদ উপস্থিত! এই কি সেই ভারতী? হিমালয়নিঃসৃতা গঙ্গার ন্যায় যে ভারতী দ্বিজেন্দ্রনাথ হইতে প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য সরস স্নিগ্ধ করিয়াছিল, স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ অভিসম্পর্ণে যাহার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, যে ভারতীর কমলবন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার লীলাভূমি, বর্ত্তমান সম্পাদিকা সেই পুণ্য প্রবাহ খবরের কাগজের 'খাপা'য় [illegible]ইয়া দিলেন! এই কি সেই ভারতী? প্রৌঢ়ে সে জগদ্ধাত্রীর সৌন্দর্য্য কই? কচি খুকীর 'দেয়ালা' কি উনত্রিংশবর্ষীয়া ভারতীর পক্ষে কোনও মতে শোভন হইতে পারে? ভারতীর বিজ্ঞাপনে এবার অতিরিক্ত গর্জ্জন শুনিয়াছিলাম। কিন্তু কথায় বলে, 'যত গর্জ্জায়, তত বর্ষায় না'। প্রবাদটি সত্য। বৈশাখ-সংখ্যায় প্রবন্ধের 'বর্ষণ' তত আশানুরূপ নয়। বিজ্ঞাপনের ধুমধামেই অধ্যবসায় উপিয়া গিয়া থাকিবে। "মাঙ্গলিক" কি একটি কবিতা? যাহার আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা নাই, তাহারও "মাঙ্গলিক" রচিবার স্পৃহা হইতে পারে; 'কেঁচোও অনেক সময় চিৎ হইয়া শুইতে চায়,' কিন্তু ছাপাইয়া পাঠকের স্কন্ধে তাহা চড়াইয়া দিবার হেতু কি? সম্পাদিকা কি মনে করেন, তিনি ভারতীর প্রথম পৃষ্ঠায় যাহা ছাপাইয়া দিবেন, তাহাই বাঙ্গালা সাহিত্য ছাপাইয়া উঠিবে? "অসীমে মগন হয়ে শক্তি লাভ সসীম সাধনে" খুব উৎকৃষ্ট হেঁয়ালি, কবিতা নয়। কবির অনুমতি,—"সর্ব্বশেখরে চাহ;"—আচ্ছা, আমরা চাহিতে প্রস্তুত, কিন্তু কোথায়, কোন দিকে, কাহার পানে চাহিব কহিবর? "সর্ব্বশেখর" চেতন, অচেতন, না উদ্ভিদ? তিনি নর, না নারী? যক্ষ, না রক্ষ? "মকরাম্বুজোজ্জ্বল স্নান করিয়া" বসিয়া আছি, বলুন, আপনার "সর্ব্বশেখর" কে, তাঁহাকে দর্শন করি, আমার "হোক অক্ষয় বল সমাধান!" এমনতর দুর্ব্বোধ কবিতা পড়িয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে হইলে প্রথমেই যে "অক্ষয় বল" মূলধন চাই,—হেঁয়ালী বুঝিবার বুদ্ধি না ধরিলেও, ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরাও তাহা বুঝিতে পারি। যদি রাগ না করেন ত একটি পরামর্শ দি—স্বদেশবাসীকে যদি শক্তিশালী করিতে চান, তাহা হইলে এমন গুরুপাক শক্তিমন্ত্র পড়াইয়া তাহাদিগকে খামকা 'কাহিল' করিবেন না। "মাঙ্গলিকে"র শঙ্খ ঘণ্টা নীরব না হইতেই শ্রীমতী সরলা দেবী "আমার বাল্যজীবনী" লইয়া উপস্থিত। এ "বাল্যজীবনী"র উপযুক্ত সমালোচনা কমলাকান্ত করিতে পারিতেন, আমাদের সে দুঃসাহস নাই। আমরা কেবল দুই একটি প্রশ্ন করিব। "বাল্যজীবনী" বাঙ্গালী পাঠকের জন্য রচিত কি না? যাহারা বাঙ্গালা পড়ে, তাহারা বুঝিতে পারে, লেখিকার এমনতর কোনও সাধু উদ্দেশ্য আছে কি না? যদি সেরূপ কোনও সঙ্কল্প করিয়া লেখিকা কলম ধরিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সে অভিপ্রায় পণ্ড হইয়াছে। "আমার সব প্রথম যে নিজেকে মনে পড়ে সে তিন বছরের আমি!" ইহা স্মৃতিশক্তির পরাকাষ্ঠা বা ইন্দ্রজাল হইলেও, বাঙ্গালা নহে। "বালিকার সাবানপিচ্ছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যত তাহারা মর্দ্দন ও ঘর্ষণের দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, তত সেই অধীরা বালিকা * * * নর্দ্দমার দিকে ছুটিতেছে।" ধরিয়া রাখিবার এ কি অপরূপ ব্রহ্মাস্ত্র! ইহাতে কি বুঝিব? বাল্যকালে যে তাহার যথা

কহিতেন, অন্ততঃ সেই ভাষায় লেখেন না কেন? তাহা হইলে পাঠকদিগকে এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না, মাতৃভাষাও 'আস্ত' থাকে, এমনতর 'ধাস্ত' হইয়া যায় না। প্রতিভা যাহা উদ্গিরণ করে, তাহাই 'ক্লাসিক' হইয়া যায়, এ কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু একটু বিচার করিয়া শব্দবিন্যাস না করিলে সহজবুদ্ধি সামান্য পাঠকের বিপদের সীমা থাকে না। এই দেখুন "শেয়ালদহ ষ্টেশনের লাইনে কখনো খালি রেলগাড়ী পড়িয়া থাকিত। বিকালবেলা হাওয়া খাওয়াইবার জন্য লইয়া গিয়া কোন কোন দিন চাকরেরা আমাদের কয় ভাই বোনকে সেই গাড়ীতে চড়াইয়া দিত। একদিন তাহাতে বসাইয়া হঠাৎ তাহারা গাড়ী টানিতে লাগিল। গল্পটি বেশ, এবং জমিতেছিল। কিন্তু "তাহারা" অর্থাৎ ভৃত্যগণ "গাড়ী টানিতে লাগিল" শুনিয়া মনে হয়, ভীম, হারকিউলিস্, অন্ততঃ স্যাণ্ডো লেখিকার চাকর ছিল, নতুবা সাধারণ চাকরে হাতু-লক্কার জোরে একটা 'ওয়াগন' টানিতে পারিবে কেন? হয় ত তাহারা 'ঠেলিয়া' থাকিবে;—হয় ত তিন বৎসর বয়সের এই কাহিনী লেখিকার ঠিক মনে নাই, তাই লিখিবার সময় একটু ওলটপালট হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফলে এই সামান্য ঘটনাটি 'অতিপ্রাকৃত' হইয়া পড়িয়াছে। হয় ত "সুর-বালা-জীবনী" লিখিবার পথে এইরূপ বিবিধ অন্তরায় কণ্টক বিদ্যমান। পাঁচ ছয় বৎসরের একটি ঘটনা এই,— "কিন্তু আশ্চর্য্য, আমার একবারে নিঃসঙ্গ মনে হইল না। আকাশ যেন সঙ্গী রহিয়াছে, আলো যেন সঙ্গী রহিয়াছে, আর থাকিয়া থাকিয়া মনে মনে একটা অনুভব হইতে লাগিল, আমার দিদি শাস্তিবিধাতা ঈশ্বর তিনিও ঐ কোন্ এক জায়গায় রহিয়াছেন, আকাশে সিঁড়ি লাগাইলেই যেন তাঁহার কাছে পৌঁছান যাইবে।" আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু আমরা যদি পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে এমনতর অনুভব করিতাম, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে কাকা ঠাকুরদাকে তাহা কর্ণগোচর হইত, তাহা হইলে বেত্রের হাতে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। সেই বয়সেই লেখিকার উপলব্ধি হইয়াছিল,—"তিনি। ঈশ্বর আর আমি কি এক প্রকারে আবদ্ধ! বাস্তবিক দুনিয়ার গতি অতি আশ্চর্য্য! কেহ চাহিবে না চাহিয়া যাহা পায়, কত মুনি ঋষি তাহারই কামনায় যুগ যুগ যোগে মগ্ন থাকিয়াও হয় ত তাহা পান নাই! কালিদাস পার্ব্বতীর শিক্ষার কথায় বলিয়াছেন,—"প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ।" ইহাও সেইরূপ। ধর্ম্মসভার হীরেন বাবুও বোধ করি ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন না। লেখিকা বলিতেছেন, —"কিন্তু সেই অতি শৈশবে যেদিন ছাদের উপর উঠিয়া প্রাণী (!)-পূর্ণ বিশ্বকে দেখিয়া আমি নির্ভীক ছিলাম, সেদিন আমার মন যেন নিষ্ঠুর কণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছিল,—'পূর্ণ জগতে' ইত্যাদি * * * এদিন এ মায় মনের সেই অবলম্বন কোথা হইতে আসিল তাই ভাবি। বোধ হয় তাহা সহজাত হইবে, শিক্ষালব্ধ নহে বলিতে পারি, এ ভাবনা লেখিকার একলার নয়, যে পড়িবে, তাহাকেই ভাবিত করিতে হইবে। অত অল্প বয়সে এত বড় অবলম্বন 'সহজাত' হইতে পারে, বর্ণজাত' হইতে পারে, কল্পনাজাত হইবারও বিশেষ আটক নাই। আমরা কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পাঠকদিগের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি। লেখিকা একবার অন্ধকারে সিঁড়ি ভাবিয়া "বুড়ো তিনকড়ি দাসীর কুঞ্চিত্বপূর্ণ বলিত অপরিষ্কৃত গণ্ডে চুমু' খাইয়াছিলেন। ঘটনাটি বড় মজা, অতি মধুর। ইহাতে আনন্দের

[illegible] আছে। অন্ধকারে কেহ 'চুমু' খাইও না। অন্ততঃ পকেটে দেশলাই রাখিও, [illegible] জালিও, তার পর যোগ্যপাত্রে 'চুমু' অর্পণ করিও। খুব হুঁসিয়ার! নয় ত কোনও [illegible] চাকরাণী তোমার সোণার 'চুমু' চুরী করিতে পারে। এখানে আর একটি প্রশ্ন আপনি উপস্থিত হইতেছে। লেখিকা এই চুম্বনকাণ্ডের পরের প্যারাতেই বলিতেছেন যে, "আর একবার একটী গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম।" তাহা হইলে বুঝিব কি যে, ছয় বৎসর বয়সে অন্ধকারে রামের 'চুমু' শ্যামকে দিয়া ফেলিলে অপরাধ হয়? "সেই কোমল মধু মাংসপিণ্ডকে ভালবাসিয়া আদর" করিয়াছিলেন, তাই কি চুম্বনের অদল বদল অপরাধের কোটায় পড়িল? উদ্দিষ্ট দিদির কপোলের বদলে যদি কোনও অনুদ্দিষ্ট দিদির কপালে পড়িত, তাহা হইলেও কি অপরাধ ঘটিত?—লেখিকা এই কয় পাতার মধ্যে কত কাণ্ডই করিয়াছেন! "রাজা ও রাণী"র রাজা আক্ষেপ করিয়াছিলেন,—

> "নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
> ক্ষমা তব : তাহারো দিলে না অবকাশ?"

শ্রীমতী সরলা দেবীর ভাবী বসোয়েলও বলিতে পারেন,—

> "লিখিতাম 'জীবনী' তোমার ভিক্ষা মাগি উপাদান
> তাহারো দিলে না অবকাশ?"

ভাষা সম্বন্ধে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সংস্কৃত ও বাঙ্গালার খিচুড়ী এখন অত্যন্ত চলিত হইয়া পড়িয়াছে। "মড়া-দাহ" ও "শব-পোড়ান" এখন নিশ্চিন্তচিত্তে মাসায় সর্ষপতৈল দান করিয়া সুপ্তি সুখে মগ্ন—আর কেহ তাহাদের লইয়া টানাটানি করে না।—ইহাতে আর নূতনত্ব নাই। আর "দৈবী অস্ত্র" উদ্যত করিয়া ব্যাকরণকে ভয় দেখাইয়া লাভ কি? 'অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে' আপনাদের করকমলে যে অস্ত্র বিরাজ করিত, যাহার নাম ছিল সম্মার্জ্জনী, "দৈবী" অসঙ্কোচে তাহার বিশেষণ হইতে পারে। কিন্তু অস্ত্র শব্দটি পুংলিঙ্গ, তাহার পক্ষে "দৈব" শব্দটিই পর্য্যাপ্ত। "ঐশ্বরী দান"ও "দৈবী অস্ত্রে"র ভায়রা ভাই। পুরুষের উপর নারী জাতির রাগ সুপ্রসিদ্ধ,—লেখিকা কি পুরুষ বিশেষণগুলির পৌরুষ হাড়ে চটিয়াছেন?—তাহাদিগকেও "ভারতী"র কুঞ্জ হইতে নির্ব্বাসিত করিতেছেন? শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" প্রবন্ধে পরিষদের ওকালতী করিয়াছেন, এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এবং এই কৃতজ্ঞতারূপ নিরাকার বস্তুর দ্বারা আমরা অবাধে সম্পাদকের হস্তস্থিত ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। কোনরূপ সাকার ভিক্ষার তিনি প্রত্যাশা করিবেন না। পরিষদের কর্ত্তব্য বলিয়া লেখক রামেন্দ্রবাবুর কল্পনায় যাহা আছে, সম্পাদক রামেন্দ্রবাবু তাহা কার্য্যে পরিণত করুন না। শ্রীযুক্ত হাভেলের লিখিত "দেশী তাঁত" সংবাদপত্রের উপযোগী,—উল্লেখযোগ্য, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। এবারকার "ভারতীতে" আর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নাই। "খেয়াল-খাতা" অস্পৃশ্য। "আমার বাল্যজীবনী"ও খেয়ালখাতারই অন্তর্গত; বোধ করি, সম্পাদিকার খেয়ালেই তাহার 'পূর্ব্বনিপাত' হইয়াছে। অন্য সুপ্রবন্ধ না থাক,—"একশ্চন্দ্র স্তমো হন্তি, ন চ তারাগণৈরপি।" বাল্যজীবনীই এ সংখ্যার পূর্ণচন্দ্র, খেয়ালখাতার তারাগুলি তাহাতেই নিষ্প্রভ হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর "নববর্ষ" একবার "অমৃত-মদিরায়" পড়া গিয়াছে। কাহার খেয়ালে আবার খেয়ালখাতার আসরে আসিল?

তন্ত্র।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বিধি, বা নিয়ম, বা শাস্ত্র, এই অর্থেই তন্ত্র শব্দ ব্যবহৃত হইত। এখন তন্ত্র-শাস্ত্র বলিলে যে বিশেষ শাস্ত্র বুঝা যায়, উহা একটি গুপ্ত সাধনবিধি। এ প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই বিশেষ শাস্ত্রটির উৎপত্তির ইতি-হাস ও বিবিধ তন্ত্রোক্ত সাধনের কালনির্ণয় প্রভৃতির পূর্ব্বে, প্রচলিত তন্ত্র-গ্রন্থগুলির কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

দেবদেব মহাদেব, রুদ্র স্বরূপ; তিনি মহাকাল। কেবল সংহার বা প্রলয়েই যে মহেশ্বরের মহিমা প্রকাশিত, তাহা নহে; সাধকেরা ইঁহাকে শিবস্বরূপ মঙ্গলময় বলিয়া পূজা করেন। অতি প্রাচীন ঋষি-বচনেও আছে,—"রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" এই মহাদেবের মহাশক্তি মহাদেবী বলিয়া পূজিতা। এই মহাদেবীর পূজাই তন্ত্রের বিশেষ প্রতিপাদ্য। দুই তিনখানি বৈষ্ণব তন্ত্র দেখিয়াছি; কিন্তু ঐগুলি যে অত্যন্ত আধুনিক, এবং শক্তিপূজার তন্ত্রের অনুকরণে রচিত, তাহা এ দেশের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক-পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন। কালনির্ণয়ের প্রসঙ্গে সে সকল কথা পরে বলিব।

মাতৃরূপে আদিকারণ বা অনাদি শক্তির পূজা, তন্ত্রের বিশেষত্ব। অন্য কোনও প্রকার পূজাবিধিতে এই সুমধুর ভাবটি নাই; এ দেশেও নাই, বিদেশেও নাই। খ্রীষ্টানের সাধনায় মা বলিয়া পূজা নাই; মা বলিয়া দেব-সম্বোধনে খ্রীষ্টানের অত্যন্ত আপত্তি। হর-দুর্গা অভেদ মূর্ত্তিতে পিতা ও মাতা; এবং মাতৃস্বরূপ সৃষ্ট সন্তানের নিকট অধিক প্রিয়। এই ভাবটি সম্ভ-বতঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। সময়ের কথা পরে বিচার করিব। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী শক্তি অসহায় সন্তানের মাতা, এই ভাবটি শাক্তের তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রধান কথা। বৈষ্ণব ধর্ম্মে পুত্ররূপে পূজা আছে, পতিরূপে পূজা আছে, কিন্তু মাতৃরূপে নাই।

তন্ত্রে যে সকল গুপ্তসাধনবিধি আছে, বামাচার আছে, সেগুলি কিরূপে কোন্ সময়ে মাতৃপূজার সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা এখন বলিব না। তন্ত্র-শাস্ত্রের

আর একটি সাধারণ ভাবের কথা উল্লেখ করিয়াই, বিশেষ বিশেষ তন্ত্রের স্থূল-মর্ম্ম বা সাধন-বিধির উল্লেখ করিব। তন্ত্র-শাস্ত্রের সাধারণ পরিচয়-প্রদানই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বেদপাঠে বা বৈদিক অনুষ্ঠানে স্ত্রীশূদ্রাদির অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণীরাও দেবালয়ে বা গৃহে প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করাইলে অর্ঘ্য বা অঞ্জলি দান করিতে পারেন। তন্ত্রের বিধানে স্ত্রী হউক, শূদ্র হউক, সকলেই মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারে; এবং নিজে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শিবাদি ইষ্টদেবতার পূজা করিতে পারে। দেবপূজায় এই সাধারণ অধিকারের বিস্তৃতি তন্ত্র-শাস্ত্রের দ্বিতীয় বিশেষত্ব।

এ দেশে কত তন্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। জানিতে পারা যাইবে কি না, তাহাতেও সন্দেহ হয়। মূলতঃ একটা মোক্ষ-বিধি বা সাধনপ্রণালী যদি নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা হইলে পরে অনেক সাধক তাহা অবলম্বন করিয়া অনেক গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন। এই জন্যই বিবিধ স্থলে শ্যামারহস্য, তারারহস্য প্রভৃতি এত রচিত হইয়াছে যে, এখন তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য।

আমরা শ্যামারহস্য, তারারহস্য, চামুণ্ডাতন্ত্র, বগলাতন্ত্র, ছিন্নমস্তারহস্য ও বৃক্কযোনিমাহাত্ম্য সম্বলপুর অঞ্চলের হাতের লেখা পুঁথিতে দেখিয়াছি। এই গ্রন্থগুলিতে মহানির্ব্বাণের মানস পূজা, এবং কুলার্ণব ও কামাখ্যাতন্ত্রের বামাচার দেখিতে পাই। কোনও নূতনত্ব বা বিশেষত্ব নাই বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে পরিচয়-প্রদান অনাবশ্যক।

তন্ত্রের সপ্তম গ্রন্থ (এই সংখ্যা-গণনায় সপ্তম বুঝিতে হইবে) বৃহৎ কালী-তন্ত্রের বিশেষ উল্লেখ করিব। এই গ্রন্থে দশমহাবিদ্যার স্বতন্ত্রপূজা বিধি আছে। হইতে পারে যে, এই পূজাবিধি অনেকের জানা আছে; তথাপি পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক অংশে বিশেষ প্রয়োজন হইবে বলিয়া স্থূল কথাগুলি লিখিতে বাধ্য হইলাম। তাহা হইলে আমার মীমাংসা যুক্তিযুক্ত হইবে কি না, পাঠকেরা অনায়াসে বিচার করিতে পারিবেন।

(১) কালী;—ইঁহার তিনটি নাম পাওয়া যায়। যথা, কালী, কপালিনী এবং কুল্লা। পূজায় এই তিন নামে তিনবার আচমন করিতে হয়। ধ্যানে বলা হইয়াছে, ইনি চতুর্ভুজা, শবারূঢ়া, মহাভীমা, ঘোরদংষ্ট্রা, শিবা, মুণ্ডমালা-ধরা, ললজ্জিহ্বা, দিগম্বরা ও শ্মশানবাসিনী। দক্ষিণ দিক হইতে হস্ত-

গণনা করিলে, ইঁহার দ্বিতীয় হস্তে খর্পর, তৃতীয়ে খড়্গ, চতুর্থে নরমুণ্ড। এবং প্রথম হস্ত বরাভয়-প্রদানে উদ্যত। বীজমন্ত্রে তিনটি ক্রীং, দুটি হ্রীং ও দুটি হুং উচ্চারিত ও স্বাহা বলিয়া শেষ। একটি অষ্টদল পদ্মের চক্রের মধ্যে একটি বৃত্ত, এবং ঐ বৃত্তের মধ্যে চারিটি ত্রিভুজ একের পরে অন্যের মধ্যে অঙ্কিত; এই চিত্রটির উপর দেবীর প্রতিষ্ঠা কল্পনা করিতে হয়।

(২) তারা; বীজমন্ত্র ওঁ হ্রীং ক্রীং হুং ফট্; এখানে ফট্, কিন্তু কালীতে স্বাহা। দেবীর আসন—অষ্টদল পদ্মের মধ্যে একটি বৃত্ত, এবং বৃত্তের মধ্যে একটি ত্রিভুজ; ঐ ত্রিভুজের মধ্যে ত্রীং লিখিত হয়। প্রথম হস্তে পাশ, দ্বিতীয়ে খর্পর, তৃতীয়ে খড়্গ, এবং চতুর্থে ইন্দীবর। মণিবন্ধটি একটি সর্পে বেষ্টিত। ইনি শব-হৃদয়স্থিতা, অট্টহাসপরা, ও পিঙ্গলজটাবিশিষ্টা। ধ্যানে ইঁহাকে হুংকারবীজোদ্ভবাও বলা হইয়াছে। নেপালের তারার কথা ভবিষ্যতে বলিব।

(৩) ষোড়শী;—ইঁহার ও ভুবনেশ্বরীর আসন একটি ত্রিভুজমাত্র। ধ্যান—"বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্ভুজাং ত্রিলোচনাং, পাশাঙ্কুশশরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং ভজে।" ইনি ও ভুবনেশ্বরী আসনে উপবিষ্টা, এবং ঐ আসন বহুদলযুক্ত পদ্ম।

(৪) ভুবনেশ্বরী। ভুবনেশ্বরীও ত্রিনয়ন। ইঁহার কুচ উন্নত; এবং বাম পদ অন্য পদে স্থাপিত। প্রথম কর বরাভয়প্রদ, দ্বিতীয় করে খর্পর, তৃতীয়ে অঙ্কুশ, এবং চতুর্থে পাশ।

(৫) ছিন্নমস্তা;—ইঁহার ছিন্ন মস্তক ও রুধির-ধারা-পানকারিণী দুইটি ডাকিনীর ছবির সহিত অনেকেই পরিচিত। দেবীর নগ্নমূর্ত্তি, "রত্যাসক্ত-মনোভবোপরি" স্থিত। আসন,—অষ্টদল পদ্মের মধ্যে একটি বৃত্ত, এবং ঐ বৃত্তের মধ্যে প্রথমে একটি ত্রিভুজ। ঐ ত্রিভুজের তিন কোণে হুঁ ফট্ লিখিত হয়। ত্রিভুজের মধ্যে পরে পরে তিনটি বৃত্ত অন্তর্ভুক্ত, এবং কেন্দ্রস্থলে একটি ত্রিভুজের মধ্যে হুঁ লিখিত হয়। বীজমন্ত্র—শ্রীং হ্রীং ক্লীং হুং হুং ফট্ স্বাহা।

(৬) ভৈরবী—ইঁহার আর এক নাম ত্রিপুরভৈরবী; এই নামটি পরে প্রয়োজনীয় হইবে। ইনি বস্ত্রাবৃতা, পদ্মাসনা ও গলদেশে মুণ্ডমালাভূষিতা। প্রথম হস্ত বরাভয়ে উদ্যত, দ্বিতীয় হস্তের মণিবন্ধে সর্প, তৃতীয়ে রুদ্রাক্ষমালা, এবং চতুর্থে গ্রন্থ। বীজমন্ত্র—হসৈং হসকরীং হসৈং।

(৭) ধূমাবতী। ইঁহার রূপটি বিশেষ যত্নে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন

আছে। ইঁহাকে স্তোত্রে রুক্ষবর্ণা, ধূম্রপানপরায়ণা ও মদিরাপানবিহ্বলা বলা হইয়াছে। ধ্যানটি যথাযথ দিতেছি :—

বিবর্ণা চঞ্চলা দুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিমুক্তকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা॥
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা।
শূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষা ধৃতহস্তা বরান্বিতা॥
প্রবৃদ্ধঘোণা চ কুটিলা ভৃশাং তু কুটিলেক্ষণা।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহাস্পদা॥

স্তোত্রে আবার বলা হইয়াছে,—

চর্ব্বন্তীমস্থিখণ্ডং প্রকটকটকটাশব্দসংঘাতমুগ্রং
কুর্ব্বাণা প্রেতমধ্যে কহহ কহ কহা হাস্যমুগ্রং কৃশাঙ্গী।

এই অতিভীষণ বর্ণনার পর আবার আছে,—

দুরারাধ্যা দুরাচারা দুর্জ্জনপ্রীতিদায়িনী।

বীজমন্ত্রটি এই,—ধূঁ ধূঁ ধূমাবতী ঠঃ ঠঃ।

(৮) বগলা ;—দ্বিভুজা এক হস্তে অসুরের জিহ্বা উৎপাটন করিতেছেন। অন্য কথা নেপালের তান্ত্রিক বিধির কথায় লিখিব।

(৯) মাতঙ্গী ; -ইনি সিংহাসনাস্থা ও চতুর্ভুজা। ইঁহার হস্তে অসি, অঙ্কুশ, ঘেটক ও পাশ। পূজা -কালীমন্ত্রে হইবে ; কেবল ধ্যান স্বতন্ত্র।

(১০) কমলাত্মিকা ;—ইনিও চতুর্ভুজা ; ধ্যান ভিন্ন অন্য পূজাবিধি ষোড়শীর মত। পদ্মের উপর ইঁহার আসন ; এবং ২টি হস্তী দুই দিক হইতে মাথায় জল ঢালিতেছে।

৮ম—মাতৃকাভেদ ও মাতৃকামাহাত্ম্যতন্ত্র। এই গ্রন্থে নানা প্রকার মারণ, উচাটন, বশীকরণাদির মন্ত্র আছে ; এবং মাতৃকাদেব স্বরূপ-কথা আছে। মাতৃকা কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া উচিত। প্রথমে দেখা যায় যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিন জনের শক্তিতে তিনটি মাতৃকা কল্পিত ছিল ;— যথা, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী। তাহার পর আবার ঐন্দ্রী (শচী), কৌমারী (দেবসেনা) ও বারাহী মাতৃকা পাই। এই ছয়টির সমষ্টি লইয়া ষষ্ঠীদেবী। কুমারের জন্মে ইঁহারা শিশুপালন করিয়াছিলেন বলিয়া কুমার ষন্মাতুর ; এবং শিশুর মঙ্গলের জন্য ষষ্ঠীপূজা। কুত্রাপি বা উহার সহিত চামুণ্ডা ও চর্চ্চিকা যুক্ত হইয়া অষ্ট-মাতৃকা পাই। কোথাও বা সপ্ত-মাতৃকার উদাহরণে দেখিতে পাই,—ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী চৈন্দ্রী রৌদ্রী বারাহিকী

তথা, কৌবেরী চৈব কৌমারী মাতরঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ। এখানে ছয়টির সহিত কৌবেরী নূতন সংযুক্ত। মহাভারতের দুইটি স্থলে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে মাতৃকার সংখ্যা পাই ষোলটি। যথা,—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা।

মহাদেবের পার্শ্বচর ভূতগুলির নাম ছিল গণ; এবং তিনি নিজে ছিলেন গণপতি। তাহার পর মহাদেবের অধীনে ঐ গণগুলির নায়করূপে একটি স্বতন্ত্র গণপতি পাই। পরে উনি আবার মহাদেবেরই পুত্র হইলেন। মহাদেবের শক্তিতে যে একটি মাতৃকা, তাঁহাকে আবার সংখ্যায় অনেক দেখিতে পাই। যখন ঐ মাতৃকাগুলি ভবানীর পার্শ্ববর্ত্তিনী দেখি, তখনও উহারা অসংখ্য। মালব দেশের ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রস্তরলিপিতে ঐ দেশ মাতৃকা বা প্রেতিনীসঙ্কুলা ও ভয়ানক বলিয়া উল্লেখ আছে। ঐ মাতৃকাবর্গে কালী নামও পাওয়া যায়। অভিধানেও আছে, কালিকা যোগিনীভেদে কৃষ্ণে গৌর্য্যাং ঘনাবলৌ।

মাতৃকাগুলিকে পূজায় বশ করিতে পারিলে সাধু ও অসাধু সকল কার্য্যই সাধন করিয়া লওয়া যায়, তন্ত্রে এইরূপ কথা আছে। উড্ডীশ (৯), ক্রিয়োড্ডীশ (১০), ও ফেৎকারিণী (১১) তন্ত্রে কেবল এইরূপ মন্ত্রাদি ভিন্ন আর কিছু নাই। অধিকাংশ মন্ত্রের সঙ্গে খাঁটি বাঙ্গালা কথা মিশ্রিত পাই। উহাতে "ভাত পড়া" আছে, "কামরূপ কামাখ্যার আজ্ঞা" আছে, এবং মন্ত্রের মধ্যে অনেক একালের কথা আছে। ফেৎকারিণীতে যে শ্মশানসাধনা আছে, উহাও মাতৃকামাহাত্ম্যের অনুরূপ। সাধনাটা শ্মশানে শবের উপর বসিয়া রাত্রিকালে করিতে হয়।

১২শ ও ১৩শ - কুমারী-তন্ত্র এবং রুদ্র যামল-তন্ত্র।

কুমারী-তন্ত্রে ও রুদ্রযামলে কুমারীপূজার বিশেষ বিধি ও কুমারীদিগের শ্রেণীবিভাগ পাওয়া যায়। কুমারীনির্ব্বাচনে জাতিভেদ করিলে পাপ হয়, এইরূপ ব্যবস্থা আছে। কুমারী নিজে সাক্ষাৎ দেবীর প্রতিমা, এবং ভিন্ন ভিন্ন বয়সে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেবী। এই শ্রেণীবিভাগের স্থূল মর্ম্ম এই ; - কুমারী এক বৎসর বয়সে সন্ধ্যা, দুই বৎসরে সরস্বতী, তিন বর্ষে ত্রিধামূর্ত্তি, ৪ বর্ষে কালিকা, ৫ বর্ষে সুভগা, ৬ বর্ষে উমা, ৭ বর্ষে মালিনী, অষ্টমে গৌরী, নবমে রোহিণী, দশমে কন্যা, একাদশে রুদ্রাণী, দ্বাদশে ভৈরবী,

ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মী, চতুর্দ্দশে পীঠনায়িকা, পঞ্চদশে ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোড়শে অম্বিকা। কিন্তু যৌবনোন্মত্তা কুমারীই পূজায় প্রশস্ত। কুমারীপূজা না হইলে কোনও যজ্ঞাদির ফল হয় না। গন্ধর্ব্বতন্ত্র, বৈষ্ণবতন্ত্র হইলেও, তাহাতেও এই ব্যবস্থা আছে। রাধাতন্ত্রেও কাত্যায়নীর পরিবর্ত্তে কেবল রাধা আছেন, এই যাহা প্রভেদ। গন্ধর্ব্বতন্ত্র (১৪) ও রাধাতন্ত্রের (১৫) বৈষ্ণব ভাবের কথা পরে বলিব।

১৬ হইতে ২১; দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত যে তন্ত্র কয়েকখানির নাম করা গেল, উহাতে যে সকল বামাচারের কথা আছে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় অত্যন্ত অপবিত্র। ঐ সকল সাধনের কথা কুলার্ণব, কামাখ্যা, গুপ্তসাধন, নির্ব্বাণ, (মহানির্ব্বাণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ), নীল ও বৃহন্নীল তন্ত্রে বিশেষ ভাবে আছে। ঐ সকল অপবিত্র কথার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে গেলেও কল্পনা দূষিত হয়, এবং চিত্ত কলুষিত হয়। আমাদের দেশের নিষ্ঠাবান প্রাচীন শাক্তেরাও ঐ সকল অনুষ্ঠান অতি ঘৃণিত ও পাপপূর্ণ মনে করিয়া দূরে পরিহার করিতেন।

নীল ও বৃহন্নীল তন্ত্রে 'মহাচীন ক্রম' আছে। হিমালয়প্রদেশস্থ জাতি চীনজাতীয় বলিয়া কথিত হইত; এবং এখন যে দেশ চীন বা চায়না নামে খ্যাত, উহার প্রাচীন নাম ছিল মহাচীন। এতৎপ্রসঙ্গে এইটুকু স্মরণ রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তন্ত্রশাস্ত্রে 'মহাচীন ক্রম'ও অবলম্বিত হইয়াছিল। উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, দেবীপূজায় অবশ্যব্যবহার্য্য একশ্রেণীর জবা ফুল, ঐ চীন দেশের আমদানি; এ দেশে ছিল না।

২২—২৫,—কঙ্কালমালিনী, জ্ঞানসঙ্কলিনী, তোড়ল ও নিরুত্তর তন্ত্র, তান্ত্রিক যোগ বা হঠযোগের কথায় পূর্ণ। অর্ব্বাচীন বৌদ্ধযোগ ও দ্রাবিড়ী যোগ যে পতঞ্জলির নামে প্রসিদ্ধ যোগানুশাসন হইতে ভিন্ন, তাহা স্বতন্ত্রভাবে দেখাইব। এই অর্ব্বাচীন যোগে যে সকল অদ্ভুত শারীরতত্ত্ব পাওয়া যায়, এবং থিয়সফিষ্টেরা যাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় নিযুক্ত, তাহা এই সকল গ্রন্থে অল্পপরিমাণে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা চিরদিনই এই সকল যোগসাধন অগ্রাহ্য করিয়াছেন; এবং আপনাদের সন্ধ্যা ও গায়ত্রী একমাত্র সাধনার সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

২৬; একখানি গায়ত্রীতন্ত্রও পাওয়া যায়। উহাতে যে প্রকার বিধান আছে, সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরা তাহা অবলম্বন করেন নাই। একটা নিজের

কথা বলিব ; পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন। আমার স্মরণ আছে যে, [illegible] হইবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র সন্ধ্যা ও গায়ত্রী মু[illegible] করিয়াছিলাম। আমার সেই সময়কার সাবিত্রীগুরু তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া গায়ত্রীর শাপোদ্ধার প্রভৃতি কয়েকটি নূতন মন্ত্র শিখাইয়াছিলেন, এবং সেই সময়ে প্রসঙ্গক্রমে তান্ত্রিক সন্ধ্যা গায়ত্রীর কথা বলেন। তখনই শুনিয়াছিলাম যে, মন্ত্রগ্রহণ করিবার পর যদি গুরু আদেশ দেন, তাহা হইলেই তান্ত্রিক সন্ধ্যা গায়ত্রীর সাধনা করা যাইতে পারে, নচেৎ নহে।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও গায়ত্রীতে কিছু বিশেষত্ব দেখিলাম না। উহার সঙ্গে যে একটি দেবীধ্যান আছে, তাহাও সন্ধ্যার অন্তর্গত বলিয়া মনে হয় না।

২৭ ;— কামধেনুতন্ত্র নামে বঙ্গদেশে একখানি তন্ত্র প্রচলিত আছে। অন্যত্র কোন তান্ত্রিক পণ্ডিত এই গ্রন্থের নাম জানেন না। গ্রন্থখানি যে [illegible] পণ্ডিতের রচনা, এবং অত্যন্ত একালের, তাহা বুঝিতে পারা যায়। [illegible]দির যে তত্ত্ববর্ণনা আছে, তাহা হইতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় [illegible] বঙ্গদেশে প্রচলিত অক্ষরের রূপ বর্ণিত হইয়াছে। তন্ত্রগ্রন্থমাত্রেই জাতি-নির্বিশেষে সাধনার অধিকার আছে। কিন্তু এই গ্রন্থে কেবল শূদ্রাদির উপর কটাক্ষ [illegible]। এই কটাক্ষ ও তীব্রতা কেবল [illegible] শূদ্রের প্রতি, কিন্তু সাধনাই [illegible] আচণ্ডাল সকল জাতিই দ্বিজতুল্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

[illegible] মহানির্বাণতন্ত্রখানির [illegible] উল্লেখ করিতেছি। এই তন্ত্রখানি পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে [illegible] তান্ত্রিক অ[illegible] এদেশে [illegible] হইয়াছিল, এবং [illegible] তন্ত্র-প্রদর্শিত [illegible] অবলম্বিত হইয়াছিল, তখন [illegible] দোহাই দিয়াই অনেক [illegible] নিবারিত করিবার জন্য এই পবিত্র গ্রন্থখানির অভ্যুদয়। [illegible] সকল কুলাচার পাওয়া যায়, সেগুলি আদৃত ছিল বলিয়াই [illegible] কোন প্রকারে তাহা স্বীকার করিয়া, মদ্যমাংসাদি পরিহার পূর্ব্বক কুলাচারের [illegible] ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে ; এবং মোক্ষপথের জন্য আদর্শ সাধনা নির্দিষ্ট হইয়াছে। তান্ত্রিক প্রথায় শৈববিবাহের বিধান করিয়া [illegible] অর্থাৎ [illegible]পরিহারের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। একদিকে কামাখ্যা [illegible] কথা যে, পরস্ত্রী না হইলে "স্বকীয়" সাধনা হইবে না, অন্য দিকে এই তন্ত্রের উপদেশ যে, ভৈরবীচক্রে হউক, যেখানে হউক, পরস্ত্রী স্পর্শ করিলেই ঘোর নারকী হইতে হইবে

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কতকগুলি প্রবন্ধ সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে যে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র লক্ষ্য করিয়া। এই গ্রন্থনির্দ্দিষ্ট মানসপূজা সকল শ্রেণীর ঈশ্বরবিশ্বাসীর নিকট চিরদিন আদৃত হইবে। এই তন্ত্রোক্ত মোক্ষতত্ত্ব প্রাচীন অদ্বৈতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমি যে কয়েকখানি তন্ত্রের পরিচয় পাইয়াছি, তাহারই কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। এ বিষয়ে আরও কত গ্রন্থ আছে, কে জানে! এ পর্য্যন্ত ইংরাজী কিংবা বাঙ্গালায় তন্ত্রগুলির স্থূল মর্ম্ম লইয়া, অথবা গ্রন্থগুলির কালনির্ণয় বিষয়ে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাদি রচিত হয় নাই বলিয়া, গ্রন্থ-পরিচয় প্রবন্ধটি দীর্ঘ করিতে হইয়াছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

স্নেহের জয়।

লোকনাথ যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন তিনি ব্যতীত আর কেহ তাঁহার পত্নী রাধামণির অসাধারণ বিষয়বুদ্ধির কথা জানিত না। তাঁহার স্বজনগণ ও কুটুম্বিনীরা রাধামণিকে পাকা গৃহিণী বলিয়াই জানিতেন। কেবল লোকনাথ বিষয়কার্য্য সম্বন্ধেও পত্নীর কুশাগ্রবুদ্ধির সাহায্য লইতেন। স্বামীর বিপুল সম্পত্তির কোন কথাই পত্নীর অজ্ঞাত ছিল না। তাই অপুত্রক লোকনাথ পরিণতবয়সে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, চিকিৎসকগণ যখন তাঁহাকে উইল করিতে ইঙ্গিত করিলেন, তখন তিনি বিরক্তিপ্রকাশ করিলেন। লোকে বলিল, মরিতে বড় অনিচ্ছা; কিন্তু যম কাহারও ইচ্ছা অনিচ্ছার কাজ করে না। শেষে তাঁহার এক জন বন্ধু কথায় কথায় এমনও বলিলেন যে, উইল করিলেই মানুষ মরে না। তবে মরণ বাঁচন গালি নহে। কখন কি হয়, বলা যায় না। সময় থাকিতে সম্পত্তির ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। লোকনাথ তাঁহার অযাচিত সদুপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। উপদেশ উপেক্ষিত হইলে মানুষের আত্মাভিমান আহত হয়। বন্ধুগণ আর কেহ সে কথা তুলিলেন না। লোকনাথ জানিতেন, তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। তিনি আরও

জানিতেন, রাধামণি সম্পত্তির যেরূপ সুব্যবস্থা করিতে পারিবেন, তেমন আর কেহ পারিবে না। তাই তিনি উইল করিলেন না।

স্বামীর মৃত্যুতে রাধামণি তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। যে উপায়ে তিনি সুচতুর কমলাকান্তের নিকট প্রাপ্য টাকা আদায় করিলেন, তাহাতে সকলেই বুঝিল, রাধামণি কেবল পাকা গৃহিণী নহেন,—পাকা বিষয়-বুদ্ধিশালিনীও বটেন। দুই এক জন স্ত্রীলোক পুরুষের বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন; ইনি তাঁহাদের এক জন। সে সময় কমলাকান্তের মত চতুর ব্যক্তি অধিক ছিল না। তিনি লোকনাথের নিকট ঋণী ছিলেন। লোকনাথের মৃত্যু হইলে তিনি লোকনাথের সহিত তাঁহার অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার কথা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার বিধবার উপকারার্থ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানভার লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; উদ্দেশ্য,—সম্পত্তি করতলগত করেন। রাধামণি তাহা বুঝিলেন; বুঝিয়া মনে মনে হাসিলেন। প্রকাশ্যে তিনি বলিলেন, ভাল; ইহা তাঁহার পরম সৌভাগ্য। তাঁহার স্বামী অনেকের কাছে টাকা পাইতেন; কমলাকান্ত প্রথমে সেই সকল আদায়ের উপায় করিয়া দিউন। প্রাপ্য টাকার হিসাব প্রস্তুত হইল; দেখিয়া কমলাকান্ত বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের ঋণ মিটাইয়া দিলেন। তিনি ভাবিলেন, টোপ্ ফেলিলেন; সম্পত্তিটা হস্তে আসিলে ঐ টাকা দুই দিনে পাইবেন। কিন্তু কয় দিন যাতায়াত করিয়া তিনি বুঝিলেন, স্ত্রীবুদ্ধির নিকট তাঁহার বুদ্ধি নিষ্প্রভ; সম্পত্তি তাঁহার হস্তে আসিবে না।

এ দিকে রাধামণি সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার তিন কন্যা,—যোগমায়া, শ্যামাসুন্দরী ও তারাসুন্দরী। যোগমায়া লোকনাথের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র যদুনাথ ও স্বামী রামেশ্বর রাধামণির সংসারেই ছিলেন। কন্যার মৃত্যুর পর রাধামণি বহুবার রামেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, "যদু আমার কাছে থাকুক। তুমি পুনরায় বিবাহ করিয়া ঘরসংসার কর।" রামেশ্বর বলিতেন, "আপনার মত মা আমি কোথায় পাইব?" রাধামণির বিশ্বাস হইয়াছিল, তিনি সম্পত্তির লোভে সংসার পাতাইতে অসম্মত;—স্ত্রীর মৃত্যুর পরও শ্বশুরালয়বাসী। তাঁহাকে লোভী জানিয়া রাধামণি তাঁহার হস্তে সম্পত্তির তত্ত্বাবধানভার দিলেন না। শ্যামাসুন্দরীর স্বামী রমানাথ অত্যন্ত অলসপ্রকৃতির লোক; আবার তাঁহার বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে রাধামণির সন্দেহ ছিল। তিনিও সে ভার

পাইতেন না। তারাসুন্দরীর স্বামী আশুতোষ—কর্ম্মঠ, চতুর ও পরিশ্রমী। রাধামণি তাঁহাকেই দেখিবার ভার দিলেন।

২

এক বৎসর কাটিয়া গেল। ব্যবহারে যেমন অস্ত্রের ধার তীক্ষ্ণ হয়—সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়া আশুতোষের কর্ম্মক্ষমতা তেমনই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। রাধামণি সন্তুষ্টা হইলেন। তাঁহার অন্য জামাতা দুই জনের মনে ঈর্ষা হইল,—কাজ পাইলে আমরাও দক্ষতা দেখাইতে পারিতাম।

কিন্তু হস্তে অধিক টাকা আসিলে মস্তিষ্ক শীতল রাখা সকল সময় সহজ হয় না; আশুতোষেরও হইল না। তিনি বুঝিলেন, এক বৎসরে রাধামণির সতর্ক দৃষ্টির প্রখরতার হ্রাস হইয়াছে,—তিনি তাঁহাকে বিশ্বাস করেন। এই সময় তহবিলের টাকা লইয়া তিনি কিছু গুছাইয়া লইতে পারেন। তহবিলের টাকা পূরণ করিয়া রাখিবেন, মধ্য হইতে তাঁহার কিছু লাভ হইবে; কেহ জানিতেও পারিবে না। অর্থলাভের আশায় ক্রমে তিনি আর অর্থনাশের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তহবিলে হাত পড়িল।

পৌষ কিস্তির টাকা বন্যার জলের মত আমদানি হইতে লাগিল। আশুতোষও ঘোড়দৌড়ের বাজিতে, কোম্পানির কাগজের বাজারে রাতারাতি বড়মানুষ হইবার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। কেহ কেহ মনে করে,—মাথিত গণ্ডার, লুটিত ভাণ্ডার। আশুতোষও তেমনই হাতে প্রচুর অর্থ পাইয়া একেবারে প্রচুর লাভের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পড়তা পড়িল না, বাজি জয় করা দূরে থাকুক—দানও পড়িল না। ক্রমেই টাকা যাইতে লাগিল। যত টাকা যাইতে লাগিল, তিনি নষ্টধন-উদ্ধারের আশায় ততই জিদ করিয়া খেলিতে লাগিলেন;—ঘরা টাকার আশায় ঘরের টাকা পরকে দিতে লাগিলেন।

মার্চ্চ কিস্তির লাটের টাকা পাঠান হইল। রোকড় সহি করিতে যাইয়া আশুতোষ মজুদ তহবিলের অঙ্ক দেখিয়া শিহরিলেন। গোপনে তহবিল পরীক্ষা করিলেন। সর্ব্বনাশ! এখন উপায়? তহবিল বুঝাইয়া দিবার সময় না হইতেই অত্যন্ত সহসা তিনি মফঃস্বল-পরিদর্শনে বাহির হইলেন।

মফঃস্বল-পরিদর্শন আবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অতর্কিত যাত্রায় রাধামণির একটু সন্দেহ হইল।

৩

আশুতোষ মফঃস্বলে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে পরিদর্শনে চলিলেন। তাঁহার অসাধারণ উৎসাহে সকলেই বিস্মিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতে তিনি পুণ্যাহের দিন জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে আষাঢ়ের শেষে নির্দ্দিষ্ট করিলেন, এবং পুণ্যাহের দুই দিন মাত্র পূর্ব্বে সদরে উপস্থিত হইলেন।

পুণ্যাহ হইয়া গেল। সালতামামির সময় উপস্থিত। শরীর অসুস্থ বলিয়া আশুতোষ কাগজপত্র শেষ করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে শারদীয় পূজা উপস্থিত হইল। পূজার গোলে সেরেস্তার কাজ চাপা পড়িল। তাহার পর কয় দিনের অবকাশ। অবকাশান্তে কর্ম্মচারীরা যখন উপস্থিত হইলেন, তখন আর বিলম্ব করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এ দিকে হিসাবনিকাশে অযথা বিলম্ব দেখিয়া রাধামণির সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। তিনি কাগজপত্রের জন্য তাগিদ করিলেন।

সব প্রকাশ হইয়া পড়িল।

রাধামণি বলিলেন, তিনি আর কন্যা জামাতার মুখদর্শন করিবেন না।

আশুতোষ রাধামণিকে জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, এখন অনুনয়, বিনয়, অশ্রু, কিছুতেই কিছু হইবে না। ক্রোধের প্রথম বেগ অপনীত না হইলে, এ সব ব্যর্থ হইবে।

এ অবস্থায় লাঞ্ছিত হইয়া শ্বশুরালয়ে বাস অসম্ভব বুঝিয়া অগত্যা পত্নীকে ও পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া আশুতোষ শ্বশুরালয় ত্যাগ করিলেন। গমনকালে তারাসুন্দরী জননীকে প্রণাম করিলেন; রাধামণি মুখ ফিরাইলেন। তারাসুন্দরী কি বলিতে যাইতেছিলেন, অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

৪

আশুতোষ সপরিবারে নূতন গৃহে আসিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। তিনি একটি সওদাগরি আফিসে চাকরী করিতেন। সুদিনে আশুতোষ তাঁহার সহিত তত ঘনিষ্ঠতা রাখেন নাই সত্য, কিন্তু রাধামণির উপদেশে তারাসুন্দরী রাখিয়াছিলেন। পাকা গৃহিণী রাধামণি সর্ব্বদাই কন্যাকে বলিতেন,—"দেবর দরিদ্র বলিয়া যদি তাহার সহিত সম্পর্ক না রাখ, লোকে তোমারও দুর্নাম করিবে, আমাকেও ভাল বলিবে না। যখন সামান্য ঘনিষ্ঠতা রাখিলে লোকে প্রশংসা করে, তখন সে ঘনিষ্ঠতা রাখাই কর্ত্তব্য।"

এখন দুই ভ্রাতা এক বাসা করিলেন। আশুতোষ কর্ম্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাজ সহজেই জুটে না।

রাধামণি জামাতার উপর রাগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে কন্যার উপরও রাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার খাস দাসী বিদ্যা তাঁহার কন্যাদিগকে ও তাহাদের সন্তানগণকে পালন করিয়াছিল। সে প্রত্যহ না হউক, এক দিন অন্তর আসিয়া তারাসুন্দরীর ও তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের সংবাদ লইত। তারাসুন্দরী তাহার নিকট জননীর সকল সংবাদ পাইতেন।

নূতন গৃহে আসিয়া আশুতোষের বাহির অপেক্ষা ঘরেই অধিক বিপদ হইল। তারাসুন্দরীর প্রফুল্ল মুখ দিনান্তকনককিরণভ্রষ্ট সান্ধ্যগগনের মত অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। সেই অজস্রসুখলালিতা সৌভাগ্যসম্পদযুতা স্ত্রীর সম্মুখে আসিলেই তিনি আপনাকে দারুণ অপরাধী মনে করিতেন। তাহার ব্যবহারে তারাসুন্দরী যে মর্ম্মপীড়িতা, তিনি তাহা বুঝিতেন। তাঁহারও মনে হইত,—কেন লোভে পড়িয়া এমন কর্ম্ম করিলাম? আপনি লাঞ্ছিত হইলাম, দুর্নাম লইলাম, আর পত্নীকে মর্ম্মব্যথা দিলাম?

তারাসুন্দরীর মর্ম্মব্যথার আর অবধি রহিল না। স্বামী কেন এ কাজ করিলেন? তিনি কেমন করিয়া লোকের নিকট মুখ দেখাইবেন? তিনি মুখ দেখাইতে পারিতেন না। লজ্জায় ঘৃণায় তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইত—চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িত। তিনি দারিদ্র্যদুঃখ সুখে ভোগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু এ কলঙ্ককালি মুখে মাখিতে, হায়, বড় যাতনা। এখন উপায় কি? তিনি ভাবিয়া কোন উপায় পাইতেন না। পুত্র কন্যার মুখ চাহিয়া তিনি কাঁদিতেন, ইহারা নিরপরাধ, কিন্তু লোকের নিকট পিতার অপরাধ সন্তানকেও স্পর্শ না করিয়া যাইবে না। অণুবীক্ষণে যেমন জলবিন্দু-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র কীট বৃহৎ দেখায়, তাঁহার আত্মগ্লানিপূর্ণ হৃদয়ে তেমনই স্বামীর অপরাধ অতি গুরু দেখাইত,—বুঝি প্রকৃত অপেক্ষাও গুরু দেখাইত।

এক দিন তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাঁহার অপরাধ কি? কিন্তু মনে সে চিন্তার অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে না হইতে তিনি আপনাকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। স্বামীর অপরাধই তাঁহার অপরাধ,—তাই তাহাতে তাঁহার হৃদয় আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইত।

এমনই ভাবে দুই মাস কাটিয়া গেল। আশুতোষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল যাতনা আপনার হৃদয়ে—আর পত্নীর সম্মুখে।

এই অবস্থায় পৌষ মাসের মধ্যভাগে তারাসুন্দরী যখন বলিলেন, তিনি পৌষসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে যাইবেন, তখন আশুতোষ যেন বিশেষ সুস্থ বোধ করিলেন। নূতন গৃহে আসিয়া অবধি তারাসুন্দরী কোথাও গমন করেন নাই—কোন দিন কিছু চাহেন নাই। আশুতোষ মনে করিলেন, পত্নীর মনের গুরুভার অপনীত হইয়াছে। তাই তিনি বিশেষ সুস্থবোধ করিলেন।

আশুতোষের কনিষ্ঠ আফিসে ছুটী লইলেন। তিনি সঙ্গে যাইবেন। নৌকা ভাড়া করা হইল। নির্দ্দিষ্ট দিন তারাসুন্দরী যাত্রা করিলেন।

তারাসুন্দরী কিছু দিন হইতে একবার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্রচিত্তা হইয়াছিলেন; কিন্তু সাক্ষাৎ করা ঘটিয়া উঠে নাই।

৫

"বৌঠাকুরাণী, ঐ ষ্টীমার দেখা যায়।" নৌকার অনাবৃত অংশ হইতে তারাসুন্দরীর দেবর তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। তারাসুন্দরী চাহিয়া দেখিলেন,—কূলে নৌকার পর নৌকা, তাহারই মধ্যে—তাঁহাদের নৌকার দুইখানি নৌকার পর—হংসমণ্ডলমধ্যে রাজহংসের মত বৃহৎ ষ্টীমার। তাঁহার নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"আমি সব সন্ধান লইয়া আসি"—বলিয়া দেবর কূলে অবতরণ করিলেন,—জনারণ্যে মিশিয়া গেলেন। তারাসুন্দরী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই দেবর ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, "অদূরে তাম্বু পড়িয়াছে।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তুমি একটু লক্ষ্য করিও।"

দেবর কূলে নামিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক জন রমণী ষ্টীমার হইতে তীরে শিবিকায় আরোহণ করিলেন।

দেবর তারাসুন্দরীকে সংবাদ দিলেন।

তারাসুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তীরে অবতরণ করিলেন। তীর স্নানার্থী ও স্নানার্থিনীতে পূর্ণ। উভয়ে সেই দলে মিশিয়া সাগরাভিমুখে চলিলেন।

সম্মুখে সাগর—নীলোর্ম্মিময়,—কামরূপী,—প্রভাতরবিকরপ্রফুল্ল; পশ্চাতে তীর,—জনসঙ্কুল,—ধূপগন্ধামোদিত—শঙ্খঘণ্টাদিরবমুখর। সম্মুখে সাগরের উচ্ছ্বাস—পশ্চাতে ভক্তির উচ্ছ্বাস।

৬

রাধামণির শিবিকা তাম্বুতে উপনীত হইল।

রাধামণি স্নান করিতে যাইবেন। সংবাদ পাইয়া তাম্বুর বাহির হইতে বৃদ্ধ কর্ম্মচারী সংবাদ দিলেন, তাম্বুর দ্বার হইতে সাগর পর্য্যন্ত পথ দুই পার্শ্বে কানাত দিয়া ঘেরা হইতেছে। কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে, সামান্যমাত্র অবশিষ্ট আছে; তিনি অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিলে ভাল হয়। শুনিয়া রাধামণি বলিলেন, "তীর্থ করিতে আসিয়াছি, অত সম্ভ্রম অনাবশ্যক।

রাধামণি স্নান করিতে চলিলেন। বিদ্যা দাসী সঙ্গে চলিল।

স্নান করিয়া রাধামণি যখন কূলে উঠিলেন, সেই সময় এক জন রমণী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাধামণি চাহিয়া দেখিলেন,—তারা! তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বাষ্পোচ্ছ্বাসে তারাসুন্দরীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি কষ্টে আত্মসংবরণ করিলেন, বলিলেন, —"মা, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ। আমি আর তোমার ত্যাজ্য—কলঙ্কলাঞ্ছিত এ জীবন রাখিব না। মা, তোমার মাতৃপরিত্যক্তা কন্যাকে এই সাগরে বিসর্জ্জন করিয়া যাও।"

তারাসুন্দরীর অশ্রুধারা জননীর সিক্ত চরণ ধৌত করিতেছিল।

বিদ্যা দাসী থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল।

রাধামণি মুহূর্ত্তমাত্র স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু আর পারিলেন না,—মাতৃহৃদয়ে স্নেহ জয়ী হইল—স্নেহপ্রবাহে ক্রোধ ভাসিয়া গেল। তিনি সেই সৈকতে বসিয়া কন্যাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন।

বহু কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি মাতা পুত্রীর উপর পতিত হইল; লোক জমিতে লাগিল। তারাসুন্দরীর সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। রাধামণি তাহা দেখিলেন,—উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সংবরণ করিলেন। তিনি আপনি উঠিয়া কন্যার হস্তধারণ করিয়া তাহাকে উঠাইলেন, বলিলেন, "তারা, চল।"

তারাসুন্দরী উঠিলেন। তিনি আর কোনও কথা কহিলেন না। জীবনে অনেক সময় বাক্য অনাবশ্যক; হৃদয়ভাব আত্মপ্রকাশ করিতে বাক্যের অপেক্ষা রাখে না। রাধামণি চাহিয়া দেখিলেন, কন্যার মুখে দারুণ বেদনার চিহ্ন। তারাসুন্দরী দেখিলেন, বিগলিত স্নেহভাব।

উভয়ে তাম্বুতে আসিলেন।

৭

তাবুতে রাধামণি বিশেষ যত্ন করিয়া তারাসুন্দরীর দেবরকে আহার করাইলেন। কুটুম্বদিগকে তিনি স্বয়ং বিশেষ যত্ন আপ্যায়িত করিলেন। আর সকলের আহার শেষ হইলে পূজা শেষ করিয়া রাধামণি আপনার সামান্য খাদ্য পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জিদ করিয়া তারাসুন্দরীকে অগ্রে ষ্টীমারে পাঠাইয়া দিলেন; বলিলেন, "নৌকায় নিশ্চয়ই কষ্ট পাইয়াছিস। যাইয়া বিশ্রাম কর্।" অগত্যা তারাসুন্দরী ষ্টীমারে গমন করিলেন। বিন্দা সঙ্গে গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাধামণি ষ্টীমারে ফিরিলেন।

কামরায় প্রবেশ করিয়া রাধামণি দেখিলেন, তারাসুন্দরী কাঁদিতেছে। তারাসুন্দরী কামরায় জননীর প্রবেশ জানিতেও পারিলেন না। রাধামণি কন্যার পার্শ্বে বসিলেন; সস্নেহে ডাকিলেন,—"তারা!" কন্যা ফিরিয়া দেখিলেন,——মাতা। জননীর সেই স্নেহের আহ্বানে তাঁহার অশ্রুপ্রবাহ দ্বিগুণ বহিতে লাগিল।

রাধামণি সস্নেহে কন্যার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। জননীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া তারাসুন্দরী কাঁদিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাধামণি কন্যাকে বলিলেন, "তারা, চুপ কর। আমি তোদের উপর রাগ করিয়া কয় দিন থাকিতে পারি? তোরা ছাড়া আমার আর কে আছে?"

বহুক্ষণ কাঁদিয়া তারাসুন্দরীর হৃদয়াবেগ প্রশমিত হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "মা, তুমি আমাকে গ্রহণ করিয়াছ। এখন আমি সুখে মরিতে পারিব।"

রাধামণি বলিলেন, "তারা, অমন কথা বলিতে নাই।" মাতৃহৃদয়ে অপত্যস্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রাধামণির নয়নযুগল আর্দ্র।

তারাসুন্দরী বলিলেন, "মা, তুমি আমাকে গ্রহণ করিলে। কিন্তু আমার এ কলঙ্ক ত যাইবে না।"

রাধামণি মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "সে জন্য ভাবিস্ নে। আমি তাহার উপায় করিব।" তাঁহার দুই চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গণ্ড বহিয়া আসিয়া বিধবার পুণ্য শুভ্রাম্বরে পড়িল।

তারাসুন্দরী মুখ তুলিলেন। ক্রন্দনস্ফীত নয়নে আনন্দের আলোক অমানিশাশেষে ঊষালোকের মত দেখাইল। তাঁহার মনের ভার দূর হইল। মা যাহা বলিয়াছেন, তাহা করিবেন।

তারাসুন্দরী দুই দিন স্নানদানাদি পুণ্যকার্য্যে জননীর সঙ্গে রহিলেন, মনে বিশেষ শান্তি পাইলেন।

দুই দিন পরে রাধামণির ষ্টীমার গৃহাভিমুখে ফিরিল।

৮

ষ্টীমার কলিকাতার ঘাটে উপনীত হইল। কয়খানি যান ঘাটে উপস্থিত ছিল। রাধামণির আদেশে বিন্ধ্যা দাসী একখানি যানে আশুতোষের গৃহে গমন করিল।

আশুতোষের নিকট যাইয়া বিন্ধ্যা জানাইল,—মা ডাকিয়াছেন। সহসা এ সংবাদে আশুতোষ কিছু বিচলিত হইলেন; বিন্ধ্যাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিন্ধ্যা প্রকৃত কথা বলিল না।

আশুতোষ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন।

বিন্ধ্যা বলিল,- মা শীঘ্র যাইতে বলিয়াছেন। এখনই চলুন।

আশুতোষের মনে আশঙ্কার ছায়াও পড়িল। কিন্তু ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন, যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তিনি কম্পিতহৃদয়ে যাত্রা করিলেন।

* * * * * * *

আশুতোষ শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন।

শ্বশুরালয়ে ভ্রাতাকে দেখিয়া আশুতোষের বিস্ময় অস্থির ব্যাকুলতায় সীমায় উপনীত হইল। তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু ভ্রাতাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ হইল না। তিনি সংবাদ পাইলেন, রাধামণি তাঁহার [illegible] অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি তাঁহার নিকট চলিলেন।

সত্য সত্যই রাধামণি জামাতার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আশুতোষ যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাধামণি বলিলেন, "তুমি সহসা চলিয়া গিয়াছ। কাযকর্ম্ম সব বিশৃঙ্খল হইয়া আছে। এখন আদায়ের মুখ্য সময়; এখন এরূপ করিলে অসুবিধা হইবে। আমার কিছু টাকার প্রয়োজন। যাইয়া দেখ, তহবিলে কত টাকা আছে।"

"যে আজ্ঞা!" বলিয়া আশুতোষ কাছারীতে যাইলেন। দেওয়ান কাগজ-পত্র লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। রোকড়ের পাতা উল্টাইয়া আশুতোষ দেখিলেন, তিনি যে টাকা লইয়াছিলেন, তাহা রাধামণি স্বহস্তে "নিজ খরচ" বলিয়া রোকড়ে খরচ লিখিয়া দিয়াছেন। কালি কেবল শুকাইয়াছে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

চীন-জাহাজের যাত্রী।

যেমন হইয়া থাকে, সকল স্থানেই যাত্রী উঠিল ও নামিল। কিন্তু সিঙ্গা-পুর হইতে হংকং যাইবার সময়েই জাহাজে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভিড় ছিল। এই সময় জাহাজের উপর সকলজাতীয় সকল শ্রেণীর যাত্রীই একত্র দেখা যাইত। নানাপ্রকার লোকপূর্ণ,যেন একটি ছোট সহরের মত। বর্ম্মা, মগলে, চীনে ও জাপানী স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও বালিকা দিন রাত্রি একত্র থাকিতে দেখিয়া, তাহাদের আচার ব্যবহার ও রীতি-নীতি পরীক্ষা করিবার এমন সুবিধা আর হয় না। বিভিন্নজাতীয় য়ুরোপীয় ও আমেরিকানেরও অসদ্ভাব ছিল না। বন্দরে নামিয়া লোকের সঙ্গে মিশিবার ও কথা কহিবার এত সুবিধা হয় না। এখানে মিশিতে ইচ্ছা করিলেই মেশা যায়। এমন কি, সুধু এই সময়ে দেখিয়া এই সকল নানাজাতিগত কি কি মিল ও অমিল আছে, তাহা অনেকটা বুঝা যায়। সকলেই আলাপ করিতে ব্যস্ত। ভাষা না জানিলেও অন্যের সাহায্যে সকল লোকের সকল কথা বুঝা যায়। আর আমার যথেষ্ট অবসর, যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা ও নির্ভাবনায় নির্ম্মল বায়ুসেবনে স্বাস্থ্যের প্রফুল্লতাবশতঃ চিন্তাশক্তি বেশ প্রফুল্ল ছিল। যে যে ঘটনাগুলি দেখিয়াছি, মনে গাথিয়া গিয়াছে। এই জন্য এই সময়ের ঘটনাগুলির কথা এবং সে গুলি দেখিয়া আমার মনে যে যে ভাবের উদয় হইত, সে সকল এই প্রবন্ধে আলোচনা করিয়া লেখা আবশ্যক মনে করিলাম।

ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ও বেশভূষাধারী হইলেও, সকলজাতীয় মানুষে যে কতকটা ঐক্য আছে, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। যে সকল বিষয়ে মিল আছে, তাহার সহিত তুলনায়, অমিলগুলি অতি অল্প, অতিশয় নগণ্য।

সকল দেশের লোকেই যে এক রকম ভাবে, এবং অবস্থাবিশেষে প্রায় এক রকমই কাজ করে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রবাদ ও চলিত কথা দেখিলে বুঝা যায়। তুফানময় চীনসমুদ্রে কিছু দিন ত উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া ছিলাম। পরে যখন উঠিলাম, তখন আবার পূর্ব্বের মত লোকদের সঙ্গে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলাম।

এক জন চীনেম্যান অনেকগুলি পুস্তক সঙ্গে আনিয়াছিল। চীন ভাষায় লিখিত ঐ পুস্তকগুলির পাতা খুব পাতলা,—খড়-নির্ম্মিত চীনে কাগজে এক

দিকে মাত্র ছাপা। তার মধ্যে একখানি পুস্তক চীনবাসীদিগের প্রবাদ ও চলিত-কথা-বিষয়ক। অনেকগুলি চীনদেশের প্রচলিত প্রবাদ তাহাতে একত্র সঙ্কলিত ছিল। বইখানির পাতার ভিতর শুকনো ফুলের পাপড়ী দেওয়া ছিল। আমিও ঐ রকম বইয়ের ভিতর ফুলের পাতা রাখিতে ভালবাসি। ঐ স্থানই ফুলের পাতা রাখিবার বেশ স্থান বলিয়া মনে হয়।

যখন ইস্কুলে পড়িতাম, সেই সময় হইতেই আমি নানা ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ সংগ্রহ করিতাম। এখনও আমার সে সংগ্রহের খাতা আছে। হাত-পাখার গায়ে প্রবাদগুলি লিখিয়া রাখিতাম,—সর্ব্বদা চোখে পড়িবে বলিয়া। আমাদের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেদের ভাল ভাল প্রবাদগুলি মুখস্থ করাই। প্রবাদ আমার বড়ই ভাল লাগে; যেন বহুকালের দেখে-শিখা জ্ঞানগুলি হীরক-খণ্ডের মত এক একটি ডেলায় সঞ্চিত রহিয়াছে। পুরাকালের জ্ঞান-জগতের সেইগুলি যেন Fossil remain.

এই বইখানি আমার বড়ই ভাল লাগিল। কতকগুলি প্রবাদের মানে সেই চীনের নিকট হইতে জানিয়া লইলাম। দেখিলাম, তার মধ্যে অনেকগুলির মত প্রবাদ, ইংরেজী, সংস্কৃত, বা বাঙ্গলাতে আমার জানা আছে। সেইগুলির মত ঠিক এক রকম। তাই বলিয়াছি, সকল দেশের লোকেই প্রায় এক রকম ভাবে, এবং অবস্থাবিশেষে একরকমই কায করে। তাহাদের মধ্যে, কতকগুলি প্রবাদ, Parallel passage ও বাঙ্গালা তরজমার সহিত নিম্নে লিখিলাম।

"নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং"—প্রদীপ নিভিয়া গেলে আর তাতে তৈল দিয়া কি হইবে? এ কথার মর্ম্মান্তিক তাৎপর্য্য প্রাচীন চীনেরাও বুঝিয়াছিল।

আর একটি প্রবাদে ঠিক এই শ্লোকটির মত ভাব।—

সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রো প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নগা যথাপঃ প্রবলা পাত্রমায়াতি সম্পদঃ॥

বড়ই সারগর্ভ ও সদুপদেশপূর্ণ নীতিকথা। পিতার কোলে উঠিতে পাইলেন না বলিয়া অভিমানে যখন ধ্রুবের ঠোঁট ফুলিতেছিল, তখন তাঁহার মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

সুচরিত্র হও, ধর্ম্মপরায়ণ হও, সকল লোকের ও সকল জীবের মঙ্গলসাধন কর। তাহা হইলে জল যেমন সর্ব্বদা নিম্নগামী হয়, সকল সুখ সম্পদও উপযুক্তবোধে তোমাতেই আসিবে।

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর মধ্যে একটি ইউরোপীয়, তাঁহার ভীমাকৃতি স্ত্রী ও দুইটি শিশু ছিল। মেম সাহেব অহরহ তাঁহার চীনে আয়ার সহিত কলহ করিতেন। এত চেঁচাইতেন যে, লোক জমিত। তাঁহার স্বামী Shekespear এর (কুঁদুলী-দমন) "Taming of the Shrew" নামক নাটকের "পিট্রু-সিওর" মত দেখিতে, এবং তিনি স্ত্রী অপেক্ষা আরও চেঁচাইয়া স্ত্রীকে খুব জব্দ রাখিতে পারিতেন। এক দিন স্ত্রী 'সেলুনে' বসিয়া একটি সিল্কের বডি শেলাই করিতে করিতে আয়ার উপর খুব রাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্বামী আয়ার উপরে যেন আরও রাগিয়া চেঁচাইয়া—আয়াকে বকিতে বকিতে—টেবিল চাপড়াইয়া—কাচের গ্যাস ভাজিয়া—তাঁহাব স্ত্রী যে রেশমের জামাটি শেলাই করিতেছিলেন, সেইটি লইয়া, ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। স্ত্রী তৎক্ষণাৎ চুপ! আপনিই সেই জামাটি মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া, নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। এটি স্ত্রীকে জব্দ করিবার জন্ত কেবলমাত্র রাগের অভিনয় বলিয়া মনে হইল। নয় ত আয়ার উপর রাগ করিয়া স্ত্রীর জিনিস লোকসান করিবেন কেন! তাঁহার কাছ থেকে ঐ অভিনয়টুকু যদি আমি শিখিয়া আসিতাম, আমারও অনেক কাজে লাগিত!

দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটি জাপানী ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী ও শ্যালিকাকে লইয়া 'এময়ে' যাইতেছিলেন। ইঁহার বৃহৎ গালার কারবার আছে। তিন জনই এক ঘরে থাকিতেন। তিন জনে সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ লইয়া ব্যস্ত। জাপানী রমণীরা সর্ব্বদাই উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেন ও উচ্চ রবে হাসিতেন। কে কত ভারী, তাই দেখিবার জন্ত পরস্পরকে কোলে করিয়া তুলিতেন। পুরুষটিও স্ত্রীলোকদিগকে ও স্ত্রীলোকরাও পুরুষটিকে সকলের সম্মুখে কোলে করিয়া তুলিতেন। অন্যে অবাক হইয়া তাঁহাদের অদ্ভুত ক্রীড়া দেখিত। তাহাতে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপও ছিল না। সময় সময় স্ত্রীলোকরা এলোচুলে হাত ও গলা-কাটা নাইটগাউন মাত্র পরিয়া ক্যাবিন হইতে ডেকের উপর আসিতেন। একে বেঁটে আকৃতি, তাহাতে লম্বা কাল চুল, পায়ের গুলফ অবধি ঠেকিত। চোখ ছোট ও গাল উচু বলিয়া হাসিলেই চোখ দুটি বুজিয়া গিয়া দেখিতে অতি সুন্দর হইত। সকলেরই চক্ষু সেই দিকে ছুটিত। ইহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হইত না। যেমন বালক বালিকারা একত্রে খেলা করে, তাঁহারাও তেমনি নিঃশঙ্কচিত্তে খেলা করিতেন। তাঁহাদের এইরূপ স্বাধীনভাবে খেলা দেখিয়া আমাদের অনেকেরই কুটিল মনে কতই কুৎসিত কল্পনা আসিত।

জাহাজে আমি ছাড়া আর একটি হিন্দু পরিবার ছিল। এক [illegible] চোবে তাহার স্ত্রী ও একটি শিশু কন্যাকে লইয়া যাইতেছিল। স্ত্রীর কালো ফুল-ছিট্-কিং-পরা; পায়ে রূপার অলঙ্কার ছিল; ঘাগ্‌রাটি রঙ্গিন ছিটের; নাকে নথ ও কানে বড় বড় অনেকগুলি মাকড়ি। তাহারা ডেকযাত্রী। আর তাহাদের পাশেই দুই জন জাপানী ও একটি জাপানী রমণী থাকিত। সেই জাপানীদের সঙ্গে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে চোবের স্ত্রীর এত সখ্য জন্মিয়া গেল যে, যদিও সে তাহাদের কথা বুঝিত না, তবু দিনরাত্রি জাপানীদের কাছে থাকিত। সে হিন্দীতে ও তাহারা নিজের ভাষায় কথা কহিত। ভাবে ভাবে আন্দাজে অর্থের বিনিময় হইত। বুঝুক না বুঝুক, সর্বদাই তাহাদের সঙ্গে হাসি। জাপানীরা কলা ও পান আনিয়াছিল, চোবের স্ত্রীকেও খাইতে দিত। সে তাহা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়াই খাইত। [illegible] নিজে কিন্তু কি সব ভাজাভুজি করিয়াছিল, তাহাই খাইত; তাহাদেরও [illegible] না। কিন্তু চোবেকে দেখিতাম স্ত্রীর [illegible]টি।

প্রথম শ্রেণীর সম্মুখে এক [illegible] ছিল। [illegible] ফর্সা [illegible] উচ্চ [illegible]। মুখে [illegible] চুপ করিয়া থাকিত। [illegible] কেন? [illegible] ভদ্রোচিত মনে অভিমান ছিল। এক খানা বেতের ইজিচেয়ার সঙ্গে আনিয়াছিল; তার উপরেই দিনরাত বসিয়া বা শুইয়া থাকিত, কাহারও সহিত মিশিত না। তাহার সঙ্গে তাহার স্ত্রী ও একটি ছোট [illegible] ছিল। সকলেরই অনিন্দ্যসুন্দর গড়ন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার ও মানের ভাব। ডেকযাত্রী স্ত্রীলোকদের থাকিবার আলাহিদা স্থান ছিল। সেইখানে তার স্ত্রী ও শিশুর থাকিবার কথা, কিন্তু সে রমণী স্বামীকে দূরে রাখিয়া থাকিতে পারিত না। সেই চেয়ারখানির পাশে এসে সারা দিন বসিয়া থাকিত। পরস্পরের সঙ্গেও মুখে বেশী কথা নয়। চাহনি [illegible] প্রণয় প্রকাশ পাইত। সে ছেলেটির অতি সুস্থ শরীর ও গোল গাল গড়ন। উলঙ্গ কোমরে একগাছি লাল ঘুনশি ও মাথার মাঝে চুলে লাল ফিতা বাঁধা, বাকী মাথা কামান। সবে চলিতে শিখিতেছে। আধ-আধ বুলি বলে' দিন রাত সেই ডেকের উপর ট'লে ট'লে চলিয়া বেড়াইত। জাহাজ শুদ্ধ লোক অনিমিষনয়নে চাহিয়া থাকিত। আমার ক্যাবিন থেকে ঢুকিতে বেরুতে দেখা যাইত। সে দিক দিয়া গেলে আমার সে দৃশ্য হইতে চোখ আর ফিরিত না।

[illegible] শ্রেণীতে দুইটি বর্ম্মারমণী একত্র থাকিতেন; তাঁহাদের সহিত কোনও পুরুষ ছিল না। তাঁহারা খালি পাইলেই আমাদের ডেক-চেয়ার দখল করিয়া বসিতেন। কাপ্তেনের কুকুরটি লইয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া খেলা করিতেন। অনেক রাত্রি অবধি একলা ছাদে ঘুমাইতেন। বুকের উপর অবধি লুঙ্গী বাঁধা থাকে বলিয়া তাঁহাদের চলা ফেরা যেন আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাবের। জমীতে পা ঘেঁসটাইয়া চলিতে হয়। রেঙ্গুনে এক দিন আসিবার সময় বর্ম্মানাচ দেখিয়াছিলাম। রমণীদল সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া একত্র অঙ্গ হেলাইয়া নাচে, দেখিতে অতি সুন্দর। কিন্তু আমাদের দেশের মত নাচে চঞ্চল অঙ্গ-বিক্ষেপ নাই।

সকল জাতির স্ত্রীলোকের তুলনায় চীনজাতীয় স্ত্রীলোককে দেখিতাম, সবার অপেক্ষা ভিন্নপ্রকৃতি; মুখে হাসি নাই, উচ্চ কথা নাই। নির্দ্দিষ্ট স্থানে একত্রে বসিয়া সন্তানের যত্ন করিতেন।

দেখিলাম, যদিও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের ভাষা আলাহিদা বলিয়া তাহারা পরস্পরের সহিত মিশিতে পারিত না, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ছেলেরা অনায়াসে পরস্পরের সহিত মিশিয়া খেলা করিত। যেন শিশুভাষা একটি আলাহিদা ভাষা, সকল শিশুই জানে। তাই তাহাদের পরস্পরের মনের ভাব বুঝিতে কষ্ট হয় না।

Fitz Jonah এর যে বিখ্যাত সার্কাস আসিয়া কলিকাতায় খেলা দেখাইয়া গিয়াছে, তাহারা হংকং, সিঙ্গাপুর, পিনাং ইত্যাদি স্থানেও ঐরূপ খেলা দেখাইতে দেখাইতে আসিয়াছে। তাহারা আমাদের জাহাজেই ছিল। তাহাদের চাকর-বাকরদের দেখিয়া মনে হইত, নীচ শ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের আমাদের দেশের নীচজাতীয় লোকের সঙ্গে অনেকটা মিলে। পশুর মত আচার ব্যবহার—খাওয়া শোয়া। স্থুল ক'রে অঙ্গভঙ্গী করে কথা কওয়া, আর কথায় কথায় দিব্বি গালা, আর অশ্লীল বিষয়ের আলোচনা করা। তাহাদের ভিতর যে সব স্ত্রীলোক তারে ও ঘোড়ার খেলা দেখাইত, তাহাদেরও স্বভাব সংসর্গদোষে ঐরূপ হইয়াছে।

আর একটি দম্পতীর কথা বলিয়াই শেষ করিব। ইনি এক জন ফরাসী স্ত্রীলোক। প্রথম স্বামী ইঁহাকে কোনও কারণে আদালতের সাহায্য লইয়া পরিত্যাগ করেন। তার পর অনেক দিন ইনি রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী ছিলেন। চার পাঁচ বৎসর হইল, এক জন ইংরাজ যুবক সওদাগর ইঁহাকে বিবাহ

করিয়াছেন। 'দুটি মেয়ে হইয়াছে; তাহাদের মায়ের মত নীল নীল চঞ্চল চোখ। বিবাহের ছ' মাস পরেই প্রথম কন্যাটি ভূমিষ্ঠ হয়। এখন ইনি সংসারী হইয়া বেশ সুখী হইয়াছেন। সর্ব্বদা শেলাইয়ের কাজ লইয়াই থাকিতেন। ছেলেদের যত্ন আদরের সীমা ছিল না। কাহারও সঙ্গে মেশা নাই। স্বভাবের কোনওরূপ চাঞ্চল্য নাই। প্রতি কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার সবই উচ্চ আদর্শের। অতীত জীবন হেয় হইলেও এখন তাঁহার প্রকৃতি একেবারে বদলাইয়াছে। তার আর বিচিত্রতা কি? একবার ভুল হইলে কি আর শোধরান যায় না?

একটি লোক একটি চীনে ফুল আমাকে উপহার দিল, তার কতকগুলি পাপড়ী ঝরা ও অপরগুলি ঝরিয়া যাইতেছে। অমন ফুল আবার কেহ কাহাকেও উপহার দেয়! জাহাজে বলিয়াই সাজিল। জাহাজে ত ফুল ফুটে না; আর হংকংও প্রকৃতিদত্ত ফুলের রাজা নয়। যাহা ফুটে, তাহা অতি কষ্টে। কি চীনে, কি ইউরোপীয়ান, সকলেই দেখিলাম এখানে ফুল ভালবাসে। তাই ফুলের [illegible]ব দাম।

এক জন কথা কহিতে কহিতে চুরি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আবৃত্তি করিল। শুনিবামাত্রই বুঝিলাম, এটি ছন্দ, গদ্য নহে। তার ভাবার্থ আমাদের দেশের নিম্নোক্ত প্রবাদটির মত,—

চুরী বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়েন ধরা,
যদি পড়েন ধরা ত অমনি গলায় দড়া।

হংকং হইতে এই চীনেম্যানটি উঠিয়াছিল। তার সঙ্গে অনেকগুলি চীনেভাষায় লিখিত বই ছিল। আমি সেগুলি প্রায়ই উল্টে উল্টে দেখিতাম। কাগজগুলি বড় পাতলা, এক পিট ছাপা। পরে জানিতে পারিলাম যে, তার মধ্যে একখানি বই চীনদেশীয় প্রবাদ ও Quotation সম্বন্ধীয়। এ কথা অন্য প্রবন্ধে বলিব। সকল দেশের লোকেই যে একরকম ভাবে, এই সকল প্রবাদ ও উদ্ধৃত কথাগুলি দেখিলে তা বেশ বুঝা যায়।

শ্রীইন্দুমাধব।

খুশ্‌হালের কবিতা।

খুশ্‌হাল।

বাদশাহ জাহাঙ্গীর যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে আফ্‌গান জাতির প্রিয় কবি খুশ্‌হাল খাঁর জন্ম হয়। যেমন আফ্রিদি, মোমন্দ, জাকা-খেল প্রভৃতি (Clan) বা গোত্রের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ 'খতক' নামক আর একটি (Clan) আছে; খুশ্‌হাল তাহার অধিনায়ক ছিলেন। ইনি যৌবনে শাজাহাঁর সম্প্রীতি লাভ করেন; বার্দ্ধক্যে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক নানারূপে লাঞ্ছিত হন। তাহার পরিচয় তাঁহার কবিতায় পাওয়া যায়। এই সময়ে ইনি অনেকবার মোগলের বিরুদ্ধে সৈন্যচালন করেন। কয়েকবার কবির ভাগ্যে জয়লাভও ঘটিয়াছিল। শেষদশায় শত্রু মিত্র কেহই তাঁহার সংবাদ রাখিত না, কবি অতি দুরবস্থায় তনুত্যাগ করেন। ইঁহার কবিতা 'পুস্তু' ভাষায় রচিত; ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। খুশ্‌হালের কবিতায় 'খতকে'র নির্ভীকতা, পাঠানের পরশ্রীকাতরতা, ও খুশ্‌হালের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল কবিতা অলঙ্কার-ভারে বাধিত নহে,—সহজ, সরল, পুরুষোচিতবীরত্বব্যঞ্জক।

দেবদারু ও বনলতা।

বর্ষায় বাড়িয়া বনলতা
উচ্চে উঠে দেবদারু বাহি';
'কত হ'ল বয়ঃক্রম তব?'
জিজ্ঞাসে তরুর মুখ চাহি'।

তরু কহে, 'বর্ষ' দুই শত,
মাস দুই এ দিক ও দিক।'
লতা বলে, 'এতে বুদ্ধি এই,—
সপ্তাহে যা' হ'ল মোর ঠিক?'

তরু কহে, 'বাঁচ আগে শীতের তুষারে,
আয়ুও বুদ্ধির কথা হ'বে তার পরে!"

'খতক'।

যখন কোনও খতক চড়ে ঘোড়ায়,
বুকের প'রে লয় সে বাঁধি' ঢাল:
পাগ্‌ড়ী-প্রান্ত হেলায় উড়ে হাওয়ায়
শোভা করে দীর্ঘ বিশাল ভাল।

ঘোড়া যেমন ছুটছে হাওয়ার জোরে,
দেখ্‌রে ফিরে, ছুট্‌ছে ছায়া তারি
'সর্দার হ'তে মন যে কেমন করে,—
সাধ ক'রে তাই খোঁজে মারামারি।

পৃথিবীর সার্থকতা।

মনে কর তুমি নাই,—অথচ তোমার
নিখিল বিপুল বিশ্বে পূর্ণ অধিকার।

এ কথা কেমন ?— শুধু কথামাত্র সার।
গ্রহ তারা—পুষ্প ফলে বিচিত্রদর্শন—
বীজমন্ত্র সম—এই নিখিল ভুবন ;—
ব্যাখ্যা, অর্থ, সার্থকতা, সকলি 'জীবন'।

জ্ঞান।

জন্মকালে বুদ্ধি যদি নাহি দেন বিধি,
কার সাধ্য সে নির্ব্বোধে দেয় জ্ঞাননিধি ?
জড়মতি কি করিবে করি' অধ্যয়ন ?
'কলপ' মাখিয়া বুড়া পায় কি যৌবন ?

বীর।

যে করে প্রাণের সদা ভয়,
অর্থনাশে ক্ষুব্ধ যেই হয়,
হেন জন রাজা হ'য় কবে ?
রাজা জিনি' ভোগ নাহি হ'বে

সিংহাসন, অথবা শ্মশান—
রাজাদের বিশ্রামের স্থান !
বীরোচিত নহে যার মন
বৃথা তার হাজার পণ্টন !

'সাকী'র প্রতি

ওগো সাকী ! মদিরা বিলাও
পেয়ালা ভরিয়া বারেবার,
'মধুপান বিনা মধু যাবে'—
বলিও না—দোহাই তোমার !

আর কবে ফুল-দলে পান
কুসুমুখী সুন্দরী সঙ্গিনী,
কোন্ বাধা বাধে মোতে আজি—
হেন দিনে—বল ত রঙ্গিণী !

দেখ, কি বলিছে ওরা—শোন,—
কি বলিছে বাঁশীতে বীণায়,
'গেলে দিন আসে না ফিরিয়া'—
কি দারুণ, কি বিষম হায় !

মিষ্ট বড় জীবনের সুখ,—
হায় যদি থাকে চিরদিন,
চিরকাল থাকিল না যদি—
গণ' তারে তুচ্ছ অর্থহীন।

কত না নূতন প্রেম হায় !—
দলিত কালের পায় পায় !

রূপের মাধুরী।

মিথ্যা কথা, পদ্ম নহে তুলনা তাহার,
লজ্জা মানে মৃগনাভি কেশবাসে যার
কৃষ্ণ ভুরু ধনু তার, পক্ষরাজি-শর,
প্রাণ শর লাগে হায় প্রাণের ভিতর।
তীক্ষ্ণ যেন তরবারি দু'টি আঁখি তার,
প্রেমিকের প্রাণ লা'রে যুদ্ধ অনিবার।
অধরের কোণে কৃষ্ণতিল শোভমান,
খুলেছে হাবসী শিশু চিনির দোকান !
প্রদীপ্ত আলোক সম রূপশিখা তার,
প্রেমিক পতঙ্গ ফিরে ঘিরি' অনিবার।
কপোল পরশে শুধু কাণের সে দুল,
অধর চুম্বিতে পায় লবঙ্গের ফুল !
অনিন্দ্য সে রূপ তার—রূপের মাধুরী,
কেবল পাষাণ প্রাণ, এই খেদে মরি !
কে জানে, কত লোকে কত কি যে চায়,
খুশ্‌হাল মুগ্ধ শুধু রূপের প্রভায়।

বসন্তে।

আবার ভাটেরা গান ধরিল নূতন,
নূতন কাহিনী বাঁশী কহে অনুক্ষণ।
থাকুন গুহায় যোগিবর,
আমি আজ যাব উপবনে ;
ওই দেখ বসন্তের ফুল—
আমায় যে ডাকিছে সঘনে !
ভূমিতে রাখিতে ক্ষুধা ঘুমায় ভিখারী,
অধোমুখ আজো রাজা রাজ্যকথা স্মরি !

দেখিতে যা ভাল লাগে চোখে,
দেখিলে তা' দোষ যদি হয়,
তবে—তবে—তবে খুশ্‌হাল
আজন্ম আসামী সুনিশ্চয় !

নিয়তি ।

দিন দিন নিয়তির নূতন ব্যাভার,
প্রণয়ে প্রশ্রয়ে তার নাহিক প্রত্যয়
এক দণ্ডে শক্তিমানে করে ধূলিসার,
দুর্বলার কীটে'র তু[illegible]'—তারি পায়ে জয় !

নিশ্চিত নূতন তরী ডুবায় সলিলে
ভগ্ন তরী কভু ঝড়-তুফানে বাঁচায় ;
কি করিতে পারি হায় ! আমি এ নিখিলে ?
কে আছে সুহৃদ মম, কারে ডাকি হায় !

যাহা করি, বাধা দেয় নিয়তি তাহায় ;
কেহ নাহি শুনিবারে এ মম ক্রন্দন ;
'অদৃষ্ট'—অদৃষ্ট যদি না থাকিত হায়,—
কিংবা মোরে দৃষ্টি হ'তে করিত বর্জ্জন !

মহতের দুঃখ হেথা, নীচের উন্নতি,
শিশু বালিকার অঙ্গে দগ্ধ শত শত,
ছিন্নবাসে লজ্জা পায় বরাঙ্গী যুবতী ;
আমীর না মিলে রুটী, মর্ত্তে মেওয়া যত !

বিশ্বাসী ভক্তের গৃহে আসন দুর্লভ,
বঞ্চকের ঘরে দেখ রত্ন ঝলমল !
সাজ সওয়ারের ভারে ক্লিষ্ট অশ্ব সব,
গর্দ্দভ আরামে খায় নব-তৃণ-দল !

আনন্দে সকল পাখী কেলি করে বনে,
বন্দী শুধু সেই—যার সুকণ্ঠ, সুঠাম !
সত্য কি কল্পনা ইহা—বুঝাব কেমনে ?
শান্ত হও খুশ্‌হাল !—ভাগ্য তোরে বাম ।

ঔরংজেব ।

ছিন্ন ভিন্ন আজি মোর আত্ম-পরিজন,
দুঃখে মগ্ন, কে কোথায় নাহিক সন্ধান ;
অরাজক রাজ্য মোর, মাঝে জনপদ,
পরবাসে মরে প্রজা, দুঃখে ক্লিষ্ট প্রাণ ।

কয় মাস ছিনু হায় দিল্লীর কারায়,
এবে আমি বন্ধুহীন—বন্দী রঙ্গিপুরে,
ঔরংজেব কিছুমাত্র ভাবে না সে কথা,
ক্ষতি কি পীড়নে তাঁর অন্তে যদি মরে !

আমা হ'তে অভাগাও আছে এই স্থানে,
এ বিলাপ নহে শুধু একাকী আমার,
সংখ্যায় বিংশতি 'সুবা' এই হিন্দুস্থানে,
ব্যাপিল বিংশতি সুবা ক্রন্দনে প্রজার ।

সামন্ত সর্দ্দার যত সুবায় সুবায়,
বন্দী কেহ, নষ্ট কেহ সংশয়ে সন্দেহে ;
শুধু রঙ্গিপুরে বন্দী দুই শত জন,
আরো কত আছে কারা—কত বন্দী তাহে !

প্রথমে পিতার পরে পশু-আচরণ,
তার পর উচ্চনীচে নাশে বহুজনে,
সত্য—সে মিথ্যা বলে—মিথ্যা কথা তার,
হেন জন নাহি দেশে দুঃখ যে না মনে ।

দাক্ষিণাত্য হ'তে আসি' তুলিয়া পতাকা ;
করিল অনেকে ধ্বংস বিশ্বাস ঘাতক ;
প্রথমে মুরাদ সনে সন্ধির শপথ,
তার পর উজ্জয়িনী হরিল সে ঠক্ !

আগ্রায় আসিল, কাল আসিল দারার,
বন্দী হ'ল শাজাহান ; গেল বন্ধুদল ;
পিতৃদশা পাইলেন মুরাদ ক্রমশঃ ;
দারার পশ্চাতে গেল মুকতাদি খল !

তার পর ফিরিঙ্গিদের সুজারে নাশিতে ;—
পলাইল শাহ সুজা, হারি' কাজোয়ায় ;
তার পর আজমীঢ়ে দারা সনে রণ ;
কুটিলা কৌশলে, দারা পশ্চিমে পলায়।

আবার কৌশলে ধরি' জুনার মালিক
পাঠাল দিল্লীতে, দারা হ'ল দ্বিখণ্ডিত ;
হেথা সুলেমান শেখ দারার কুমার
পড়িল খলের হাতে রুধিরে মণ্ডিত।

কত জন দিল্লী হ'তে হ'ল বহিষ্কৃত,—
কে জানে কোথায় তারা ত্যজে ভদ্রবাস ?
পিতৃকুল ক্রমমতে নাশে ঔরংজেব,
পারস্য আরব স্তব্ধ মনে পেয়ে ত্রাস।

শুধু দুই বর্ষে ঘটে এত প্রেত-লীলা,
আরোহিল ধর্মধ্বজী দিল্লী-সিংহাসনে ;
হত্যা অত্যাচার বিনা অন্য কথা নাই ,
বাঁচিলে সে বেশী লোক র'বে না ভুবনে।

শঠতার সংগঠিত অস্থি মজ্জা তার,
বাহিরে দেখায় যেন পেগম্বর পীর ,
বিচারিয়া দেখ যদি তার ব্যবহার —
বুঝিবে 'চক্রান্ত' তার মূলমন্ত্র স্থির।

মানুষে কোথায় বল করে হেন কাজ,
বন্দী করে—হত্যা করে আপন পিতায় ?
এমনি করুণা মরি ! এমনি হৃদয়,
আপন সুবিধা পরে দৃষ্টি শুধু হায় !

উৎপীড়িত অভাগার রাখে না সংবাদ,
সমান নির্দ্দোষ দোষী বিচারে তাঁহার ,
এই সে সম্রাট, হায় ! এই ঔরংজেব,—
এমনি চরিত্র তাঁর—এত ব্যবহার !

গোসানী-মঙ্গল।

গোসানী-মঙ্গল একখানি অতি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি। সন ১৩০৬ সালে কলিকাতা আলবার্ট কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন এম্ এ. মহোদয়ের আগ্রহে ও আদেশে, কোচবিহারের অন্তর্গত গোসানীমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ডিমাই ১২ পেজী ১০০ পৃষ্ঠায় ইহা সমাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি গোসানী-মঙ্গলের একখানি অতি পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিখানি কোচবিহারের অন্তর্গত বড়মরিচা-নিবাসী শ্রীযুক্ত মৌলবী আমানতউল্লা চৌধুরী জমীদার সাহেবের পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। দুইখানি বাঙ্গালা পুঁথির পাঠ কখনও সর্ব্বাংশে একরূপ হয় না। ইহা যেন একটা সাধারণ নিয়ম। সুতরাং বলা বাহুল্য, এই মুদ্রিত ও হস্তলিখিত গোসানী-মঙ্গলে স্থানে স্থানে পাঠের বিস্তর অমিল আছে। শেষোক্ত পুঁথিখানি

এক জন হিন্দু বৈরাগীর নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। শুনা গিয়াছে, বৈরাগী প্রত্যহ যথাবিধি পুঁথিখানির পূজা করিতেন।

"গোসানী-মঙ্গল" কোচবিহার বা তৎপ্রদেশের আদি বাঙ্গালা কাব্য। ইহা ঠিক কোন্ সময়ে বিরচিত হইয়াছে, তাহা আজিও সম্পূর্ণ নির্ণীত হয় নাই। ইহাতে গোসানী দেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনচ্ছলে কোচবিহারের রাজা কান্তেশ্বরের অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী নামধেয় জনৈক কবি ইহার প্রণেতা। কবির পিতা করুণাকর দাস মহাশয় কোচবিহারপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যে পরমসুখে বাস করিতেন। কবি 'মঙ্গলাচরণে' গাহিয়াছেন,—

হরেন্দ্রনারায়ণ রাজা, বেহারের পালেন প্রজা, তাঁহার তনয় এক, পাইয়া চৈতন্ত্য ভেক,
যাঁর যশ ঘোষে সর্ব্বজন। চিন্তে হরি-চরণ-কমল।
সেই রাজ্যে করে ঘর, সাধু সে করুণাকর, তাঁর আদেশিলা দেবী, কহে রাধাকৃষ্ণ কবি
পরম বৈষ্ণব গুণধাম। সুমধুর গোসানী মঙ্গল॥

এই কবি যে গোসানী দেবীর এক জন পরম ভক্ত, তাহা তাঁহার আবেগ-উচ্ছ্বসিত হৃদয় নিঃসৃত এই সুললিত কাব্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়।

চণ্ডী দেবীই 'গোসানী' * নাম গ্রহণ করিয়া কোচবিহার অঞ্চলে আপনার পরিচয় ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, 'গোসানী মঙ্গল' ঠিক এতদঞ্চলের চণ্ডী কাব্যেরই রূপান্তর, বা অনুরূপ একখানি কাব্য। রাজা কান্তেশ্বর এই 'গোসানী' দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। যে গ্রামে দেবীর মন্দির সংস্থাপিত, তাহা 'গোসানী-মারি' নামে বিখ্যাত হইয়া আছে। গোসানী-মারিতে রাজা কান্তেশ্বরের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের বহুল নিদর্শন আজিও বর্ত্তমান।

গ্রন্থখানি কবিত্বপূর্ণ। ইহার ভাষা সরল, বর্ণনা স্বাভাবিক ও স্পষ্ট পরিস্ফুট। গ্রন্থারম্ভে কবি বলিতেছেন :—

বেহারের দক্ষিণ গ্রাম নাম জামবাড়ী। পার্ব্বতী সহিত শিব কৈলাসের তলে।
সেই গ্রামে জাম বৃক্ষ আছে সারি সারি॥ একত্রে বসিয়া কথা কহে নানা ছলে॥
সুবর্ণবরণ জাম ফলে বারমাস। শিব কহে শুন দুর্গা আমার বচন।
শ্রীফল বেলাদি তথা চির পরবাস॥ এই রাজ্যে যত লোক সুখী সর্ব্বজন।

* দেবতার 'গোসাঁই' নাম আছে, তাহা সকলেই জানেন। গোসাঁই—'গোস্বামী' শব্দের অপভ্রংশমাত্র। 'গোস্বামী'র স্ত্রীলিঙ্গ 'গোস্বামিনী' অপভ্রষ্ট হইয়া 'গোসাঁইনী', এবং তাহা পুনর্ব্বার অপভ্রষ্ট হইয়া 'গোসানী' রূপ ধারণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

সুবর্ণবরণ ফল বেলাদি শ্রীফলে। চণ্ডী কহে বর দাও তোলা মহেশ্বর।
ঘরে ঘরে শিব দুর্গা পূজে কুতুহলে॥ এই রাজ্যে রাজা হ'ক নাম কান্তেশ্বর॥

কান্তেশ্বরের পিতার নাম ভক্তীশ্বর; মাতার নাম অঙ্গনা। অঙ্গনা,—

তন্ত্র মন্ত্র শুনে আর বেদ রামায়ণ। স্বামিমুখে শুনি সতী চণ্ডীর মাহাত্ম্য।
কথায় প্রসঙ্গে উঠে চণ্ডীর পূজন॥ চণ্ডী পূজিবার তরে করিল মনস্থ॥

তার পর ভক্তবৎসলা মহামায়া চণ্ডী আসিয়া দম্পতী-যুগলকে স্বপ্নে দেখা দিলেন, এবং বলিলেন,—

শুন শুন ভক্তীশ্বর, শুনহ অঙ্গনা। তোমার তনয় হবে রাজ্যের ঈশ্বর॥
তোমা বই হ'তে প্রিয় নাহি কোন জনা॥ রাখিবা পুত্রের তুমি কান্তনাথ নাম।
করহ আমার পূজা লহ ইষ্ট বর। এ কথা কহিয়া দেবী হ'ল অন্তর্দ্ধান।

আদেশমতে চণ্ডীর পূজা হইল। পূজার ফলে অঙ্গনা দেবীর গর্ভে সুল-সুলক্ষণাক্রান্ত কান্তেশ্বর জন্মগ্রহণ করিলেন। তৎপরে কান্তেশ্বর,—

অল্পকাল গুরুস্থানে করি অধ্যয়ন। ব্যাকরণ কাব্যশাস্ত্রে হইয়া পণ্ডিত।
বাঙ্গালা সংস্কৃত শিখে করিয়া যতন॥ তন্ত্র মন্ত্র আদি শিখে আর রাজনীত॥

এইরূপে দেবীর বরপুত্র কান্তেশ্বর অল্প দিনেই কৃতবিদ্য হইলেন। এমন অধীতশাস্ত্র রাজা যে ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্মানুরক্ত হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

গোসানী-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কবি বলেন,—

সসৈন্যে সাজিয়া রাজা করিল গমন। পঞ্চগব্যে গোসানীরে করাইয়া স্নান।
চণ্ডীমণ্ডপেতে আসি দিল দরশন॥ সিংহপৃষ্ঠে গোসানীরে দিলেন আসন।

'গোসানী'র আসন-দান শেষ হইবার পর ভক্ত রাজা দেবীর নিকট লক্ষ বলিদানের আদেশ করেন। মহাসমারোহে উৎসর্গ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই দেবীর সেবায়েতদিগকে 'দেউরী' বলে। গ্রন্থের শেষ এইরূপ,—

গোসানী ঠাকুরাণী যার দিকে চায়। ইহাকে শুনিয়া যে করিবে উপহাস।
ধন জন পুত্রে সে আনন্দে বেড়ায়॥ অবশ্য গোসানী তারে করিবেক নাশ॥
গোসানী আদেশে এই পাঁচালী প্রকাশ। পাঁচালী লিখিয়া হয় মনের উল্লাস।
হরি ভজ ওরে মন গুরুপদে আশ॥ গোসানী-মঙ্গল ভণে রাধাকৃষ্ণ দাস॥

উপরে যাহা যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহার ভাষা ও রচনা-প্রণালী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুঁথিখানি অতি প্রাচীন ও কোচবিহার অঞ্চলের আদি বাঙ্গালা কাব্য; কিন্তু উদ্ধৃত অংশগুলিতে ইহার ভাষার প্রাচীনতা আদৌ পরিলক্ষিত হয় না কেন? আমরা যে মুদ্রিতগ্রন্থাবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, তাহার পাণ্ডুলিপিতে

প্রকাশক মহাশয় সম্ভবতঃ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়াই ইহার প্রাচীনত্ব লুপ্ত হইয়া থাকিবে। আমাদের অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নিতান্ত দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। প্রাচীন সাহিত্যের সংশোধনাদি করিবার অধিকার কাহারও নাই। প্রাচীন 'রূপ' অক্ষুণ্ণ নাই, এই কারণে, এই পুঁথি-খানির কুচবিহারের সংস্করণে আমাদের আকাঙ্ক্ষা সফল বা প্রয়োজন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং এই গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক। *

শ্রীআবদুল করিম।

বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা।

ধর্ম্মবিপ্লবে বঙ্গসাহিত্য অভ্যুদিত ও কালে কালে পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে; ইহা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় কেহ কেহ দেখাইয়াছেন। আধুনিক কালেও মুখ্যতঃ ধর্ম্মবিপ্লবেই বঙ্গভাষা প্রভূতপরিমাণে উপকৃত হইয়াছে। ইংরাজ-প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ মুদ্রাযন্ত্র সহ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে সংঘর্ষেই বাঙ্গালা গদ্য একপ্রকার সৃষ্ট হইয়াছে।

ধর্ম্মবিপ্লব ও বঙ্গসাহিত্য।

সাহিত্যের শক্তি, স্থায়িত্ব ও গাম্ভীর্য্য অনেকাংশে গদ্যের উপর নির্ভর করে। ইংরেজের পূর্ব্বে এই গদ্য বাঙ্গালায় ছিল না বলিলেই হয়। পাদ্রীগণ ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা গদ্যে পুস্তকাদির প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন;—এই প্রবল আঘাতে আমাদের স্থিতিশীল সমাজের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। এই আঘাতের প্রতিঘাতস্বরূপ বঙ্গদেশে বীরপুরুষ রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। তিনিই বঙ্গীয় গদ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন; তিনি এক দিকে উপনিষদ্, বেদান্ত-দর্শন প্রভৃতি সমুচ্চ দার্শনিক গ্রন্থনিচয়ের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষাকে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও জ্ঞান গবেষণার সমুচ্চ মাহাত্ম্যে উদ্বুদ্ধ করেন, আবার অন্য দিকে ঐশ্বর্য্যময়ী ইংরাজী ভাষা জনসাধারণে সম্যক্ প্রচলিত করিবার উপায় উদ্ভাবিত করিয়া যান। এইরূপে বঙ্গদেশে এক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত,

---

* এই প্রবন্ধটি সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত রঙ্গপুর কাকিনা নিবাসী বন্ধুবর সুকবি শেখ ফজলল করিম সাহেবের লিখিত পত্রাবলম্বনে সঙ্কলিত।—লেখক।

অচিন্ত্যপূর্ব্ব, বিশাল জ্ঞানসমুদ্রের মুক্ত বাতাস বহিতে থাকে। তাহা পাইয়াই ক্রমে বাঙ্গালীর হৃদয় বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বাধীনতার প্রয়াসী হইয়াছে। বঙ্গের সমাজে সাহিত্যে সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের সম্মিলিত ভাবপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে নবজীবন দিয়াছে। বঙ্গসাহিত্য এই দুই [illegible] চিরকল্লোল শুনিয়াছে, এবং সাহিত্যজগতে আপন পদবী খুঁজিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আদ্যন্ত ছন্দোময়ী কবিতা। প্রাচীন কবিগণের তেমন কোনও সাহিত্যাদর্শ ছিল না। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী ভিন্ন প্রকৃত সাহিত্য-নামের উপযুক্ত কাব্য প্রাচীন সাহিত্যে বিরল। তখন কবিগণ প্রায়ই স্বপ্নে আদিষ্ট হইতেন, এবং দেবদেবীর পরিতোষকল্পে কাব্য লিখিতেন। ধর্ম্মের একপ্রকার অঙ্গাবরণ পরাইয়া লেখাগুলি বাহির করিতে হইত। 'বিদ্যাসুন্দরে'র মত পুস্তকও কালীর মাহাত্ম্যের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন ধর্ম্মেরও তেমন উচ্চ আদর্শ ছিল না। স্তবস্তুতি, পূজার্চ্চনা, ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ ছিল। চরিত্রের স্থৈর্য্য বা পবিত্রতা, চিত্তের স্বাধীনতা বা নৈতিক বল, প্রচলিত ধর্ম্মের কোথাও উদ্দিষ্ট ছিল না। শিব আশুতোষ; সময় সময় এক একটা দৈত্যকে বর দিয়া আপন সৃষ্টি বিপন্ন করিয়া ফেলিতেন। দুনিয়ার যত চোর, ডাকাত, ভবানীকে দুই একটা ছাগমুণ্ড দিয়াই নির্ব্বিঘ্নে অত্যাচার করিয়া বেড়াইত। পরলোকের কথা বলিতে পারি না, ইহলোকে তাহাদের কোনও বিচার ছিল না। মৃত্যু-কালে কৈলাসপর্ব্বত হইতে শিবদূত আসিয়া লগুড়াঘাতে যমদূতগণকে তাড়াইয়া দেবদেবীভক্তগণকে মোক্ষধামে লইয়া যাইত। যে দেশে সাহিত্যের আদর্শ কেবল ধর্ম্মশিক্ষা, স্পষ্টতঃ দেবদেবীভক্তি, সে দেশে দেবদেবীর আদর্শও যদি হীন হয়, তাহা হইলে, সাহিত্যকে পাতালমুখে গমন করিতে হয়। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মতি, গতি ও রুচি ইংরাজ-প্রভাব-কাল পর্য্যন্ত নিম্নাভিমুখীই ছিল। ধর্ম্মশিক্ষাই সাহিত্যের আদর্শ হওয়ায় সাহিত্যের প্রকৃত মূর্ত্তি স্ফূর্ত্ত হয় নাই। কবিগণের প্রতিভা বিকাশলাভের অবকাশ বা প্রণোদনা—কিছুই পায় নাই। রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ, চণ্ডী ও মনসার মাহাত্ম্য, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, শ্রীচৈতন্যের চরিত্রবর্ণন, বা বিদ্যা-সুন্দরের আখ্যান, এই কয়টি পদার্থই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিষয়। স্থূলতঃ বলিতে গেলে, প্রাচীন কবিগণ শত শত কবি মিলিত হইয়া এক এক বিষয়ে

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য।

এক একখানি কাব্য রচিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে লেখনীধারণ করায় তাঁহারা নিজের স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে, বা পরের জিনিস অধিকারীর অজ্ঞাতে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপে অপূর্ব্ব চৌর্য্যবৃত্তিতে প্রাচীন সাহিত্যে এক একটা কাব্য প্রণীত হইয়াছে।

কোনও প্রবল জাতীয় ভাব বা ব্যক্তিগত শক্তিসামর্থ্যের উপর আস্থা না থাকায়, বরং পদে পদে ভাগ্য, দৈব, অথবা দেবদেবীর প্রসাদের উপরই এক-মাত্র নির্ভর থাকায়, প্রাচীন সাহিত্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অবাধে পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই। 'চন্দ্রধর' প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশ্বামিত্র বা প্রমিথিয়স্। কিন্তু মানবের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন কবির উদ্দেশ্য ছিল না। তাই চন্দ্রধরকে "কালী"র নিকট পরাজিত হইতে হইয়াছিল। সাহিত্যের একটি অত্যুন্নত বীরপুরুষকে লৌকিক বিশ্বাসের যূপমূলে বলি দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে কবিকঙ্কণও কালকেতুর উন্নত চরিত্রকে ভীরুতা ও কলঙ্কের অতল জলে ডুবাইয়াছেন। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহ সপ্রমাণ হয় যে, তাঁহারা মানবজীবনের অথবা সাহিত্যের কোনও উন্নত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই সকল কাব্য লিখিতে বসেন নাই। দেবদেবীর অখণ্ড-মাহাত্ম্য-বর্ণনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য; তাই দেবদেবীর পবিত্র পীঠতলে বারবার বীর-বলি প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কেবল স্থানে স্থানে কবিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ভাবের নবোদিত সূর্য্যকিরণ প্রথমে রামমোহন রায়ের সমুন্নত ললাটেই প্রতিভাত হইয়াছিল। এই রাম-মোহন রায়ের হৃদয়েই প্রথমে সাহিত্যের শুভ্র আদর্শ প্রতিবিম্বিত হয়। সেই

বঙ্গসাহিত্যের নূতন আদর্শ ও নূতন ধারা।

আদর্শের আবির্ভাবের ফলে বঙ্গসাহিত্যে যে ভাববিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে এ দেশের সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যশাস্ত্র বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে। বৌদ্ধ অথবা মুসলমানজাতির সংস্রবে শত শত বৎসরে যাহা ঘটে নাই, এক ইংরেজী ভাষা অতর্কিতে তাহার কোটি গুণ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। রামমোহন স্বয়ং উক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যথাশক্তি সাহিত্যের সেবা করিয়া যান। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তই এই আদর্শকে বঙ্গসাহিত্যে পরি-ণত ও কার্য্যকর করেন। তাঁহারা বঙ্গভাষার শিক্ষাগুরু। তাঁহারাই বঙ্গ-ভাষাকে সুমার্জ্জিত ও সুগঠিত করিয়া আগামিনী প্রতিভার উপযুক্ত রঙ্গভূমি করিয়া যান।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই নবপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যরঙ্গের প্রথম ভেরীনিনাদ করেন। কাব্য, নাটক, প্রহসন, সনেট, গীতিকবিতা প্রভৃতি বিষয়ে এই উদ্ধতস্বভাব শিশু অতি উদ্দামভাবে ক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন; বাঙ্গালীকে নূতন গান শুনাইয়াছেন; প্রচলিত বিশ্বাস, ছন্দোবন্ধ, ভাষা ও ব্যাকরণের দিকে লক্ষ্যমাত্র না রাখিয়া মধুসূদন পূর্ণ স্বাধীনতায় আপন হৃদয়ের আবেগে গান গাহিয়াছিলেন। তাহা প্রথম প্রথম রক্ষণশীল বঙ্গসমাজের কর্ণে ভাল শুনায় নাই। কিন্তু মধুসূদনের সেই উদাত্ত গান প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। পরবর্ত্তী সাহিত্যে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থে তাহার অপ্রতিহত প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

মধুসূদন দত্ত, মহাকাব্য প্রভৃতি।

মধুসূদনের সময় হইতেই বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে এক নূতন বাতাস বহিতেছে, এবং বাঙ্গালীর সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হইয়াছে। মধুসূদনই বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম পুরুষ কবি; ছন্দের ঝঙ্কার, ভাবের বিস্ফূর্ত্তি ও প্রখরতা, প্রতিভার সামর্থ্য ও স্বাধীনতা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণে কবি প্রকৃতপ্রস্তাবে পৌরুষভাবাপন্ন বলিয়া উক্ত হইতে পারেন, সেই সমুদয়ই মধুসূদনে ভূরিপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-ভাবের সাধক ছিলেন। সুতরাং নারীহৃদয়সুলভ তারল্য ও মাধুর্য্যগুণে তাঁহাদের কাব্য পরিপূর্ণ। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ঘনরাম ও ভারতচন্দ্রে এই পৌরুষভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া মধুসূদনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। আবার মধুসূদন এক দিকে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার ও ভাবের সঙ্গমস্থলে প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত সাহিত্যের বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের হোমার, ভার্জ্জিল, টাসো, দান্তে, মিলটন ও বায়রণ প্রভৃতি পৌরুষশক্তিশালী কবিগণের পদতলে বসিয়া মধুসূদন শিক্ষাগ্রহণ করেন। ইহাদের ছায়ায় মধুসূদনের প্রতিভা ঘনতা, পূর্ণতা ও প্রকাণ্ডতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মধুসূদনের রচনায় যে একটা স্বাভাবিক ললিতগতি আছে, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবির উপযুক্ত, তাহাতে তাঁহার উক্তিগুলি অক্লেশে বিকশিত হয়। বাঙ্গালার কোনও কবি এ পর্য্যন্ত সেই স্বাভাবিকতার সমীপবর্ত্তী হইতে পারেন নাই। এই স্বাভাবিকতার গুণেই মধুসূদন দেশের আপামর সাধারণ সকলের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সমস্বভাবাপন্ন কবিগণের সহিত তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, অল্প কথায় রসোদ্রেক করিবার নৈপুণ্য

মধুসূদনের কিরূপ অসাধারণ ছিল। হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্র যুদ্ধবর্ণনায় বা শোকপ্রকাশে অতিরিক্ত ভাষা-জঞ্জালের সৃষ্টি করিয়া যে স্থলে এক একটা সর্গ বাড়িত করিয়াছেন, মধুসূদন সেই স্থলে দুই কথায় সমস্ত সাঙ্গ করিয়া অনেক সময় অধিক চমৎকারিত্ব দেখাইয়াছেন। এইরূপ তুলনাতেই মধুসূদনের আভ্যন্তরীণ শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্য বুঝিতে পারা যায়।

বঙ্গভাষায় মধুসূদনের স্থাননির্দ্দেশ করিতে হইলে, বলা যায় যে, মধুসূদন দত্ত নামে এক জন 'টিটান' [illegible] বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রীসীয় প্রমিথিয়সের মত স্বর্গ হইতে প্রতিভার [illegible] বহ্নিশিখা বাঙ্গালীর জন্য হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তজ্জন্য তাঁহাকে কঠোর দণ্ড গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সমস্ত জীবন দুর্দ্দশার পাষাণশৈলে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিয়া, মন্ত্রণা পাইয়া, অবিশ্রাম অশান্ত আকাঙ্ক্ষার [illegible] গ্রহণ করিয়া ও কুক্ষিদেশে ক্ষুধার [illegible] করাল দংশন সহ্য করিয়াও, সেই মহাপুরুষ [illegible] স্বীকার করেন নাই, সেই অগ্নি [illegible] করেন নাই। তাঁহার তীব্রযন্ত্রণার নিরাশানিশ্বাস প্রকাণ্ড যজ্ঞকুণ্ডোত্থিত উদ্দীপ্ত অগ্নিশিখার মত এখনও বাঙ্গালীর হৃদয় স্পর্শ করিতেছে। তাঁহার হৃদয় মেঘের মত বহ্নিপূর্ণ, জলপূর্ণ ও ধ্বনিপূর্ণ ছিল। তিনি সেই অগ্নি, সেই জল ও সেই ধ্বনি বঙ্গসাহিত্যে [illegible] গিয়াছেন। সেই মহামেঘের বর্ষণের পর বঙ্গদেশ শ্যামল শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ফল পাকিবার সময় আসিয়াছে।

মধুসূদনের দোষদর্শন করিতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে, মানব-মনের উপর যাহাতে চিরস্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত হয়, এমন গাম্ভীর্য্য, নৈতিক গুরুত্ব, অথবা অসামান্য উদ্ভাবনীশক্তি মধুসূদনের ছিল না। তাঁহার কাব্যাদিতে মানবের ভয়, দয়া, ক্রোধ, প্রীতি প্রভৃতি বৃত্তিসমূহের সমুজ্জ্বল প্রতিকৃতি আছে। কিন্তু ঐ সকল প্রতিকৃতির ভিতর মানবের জন্য অণুমাত্র সান্ত্বনা নাই। শোক-

মধুসূদনের দোষ।

পীড়িত রাবণ, অশোকবনে বন্দিনী সীতা, পতিপ্রাণা প্রমীলা, কলঙ্কিনী তারা, ভুজঙ্গিনী কৈকেয়ী, তেজস্বিনী জনা,—ইহারা অতি উজ্জ্বল মনোহর চিত্র। কিন্তু মানবহৃদয়ের কোন নৈতিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য কবি এই সকল চিত্র আঁকিয়াছেন? মধুসূদনের স্বপক্ষে ইহার একমাত্র সাহিত্যসঙ্গত উত্তর, সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা, চিত্রকলার ভাবে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করাই কবির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই সব চিত্রে সান্ত্বনা কোথায়? এমন যে হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, তৃতীয় রিচার্ডের চিত্র, ইহাদের মধ্যেও অপরিসীম সান্ত্বনা ও নিবৃত্তি আছে। হঠাৎ গোচর

আওয়াজ হইলে শুধু শ্রবণেন্দ্রিয় বধির হইয়া যায়, হৃদয় স্তম্ভিত হয়, কিন্তু মানবজীবনের কোনও নীতিসূত্র লক্ষিত হয় না।

আবার কাব্যক্ষেত্রে মধুসূদন আদর্শ বলিয়া যাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই 'রসে'র কবি। আদি, হাস্য, করুণ প্রভৃতি রসের অবতারণা করিয়া চিত্ত-বৃত্তির তৃপ্তিসম্পাদনই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রায় সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যের আলঙ্কারিকেরা রসোদ্রেকই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়া গিয়াছেন। উজ্জ্বলতা, তারল্য ও আবেশই রসের প্রধান ধর্ম্ম। ইহারা বহির্মুখ; ধ্যান, গাম্ভীর্য্য ও শান্তি (Repose) প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তির সহিত রসের আন্তরিক অসামঞ্জস্য আছে; তাই রসের বাড়াবাড়ি করিতে গেলে ভাব ক্ষীণ-প্রভ হইয়া আসে। মধুসূদনে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। অতিমাত্রায় রসের পোষণ করিতে গিয়া তিনি সতর্কতা ও ধ্যানযোগ হারাইয়াছিলেন। মানব-হৃদয়ের কূটতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে গভীর ধ্যানযোগের আবশ্যক। সেই ধ্যানযোগের অভাবেই তিনি চরিত্রসৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার চিত্রগুলির মধ্যে অসৌষ্ঠব ও অসামঞ্জস্য অমার্জ্জনীয়ভাবে বর্ত্তমান।

পূর্ব্বেই আভাষ দিয়াছি, ভারতচন্দ্রই বাঙ্গালায় মধুসূদনের অব্যবহিত শিক্ষাগুরু। একটু প্রণিধানপূর্ব্বক উভয় কবির কাব্য পাঠ করিলেই তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। ভারতচন্দ্রের ছন্দোঝঙ্কার ও ওজোগুণ মধুসূদনে যথেষ্ট; আবার ভারতচন্দ্রের সেই অত্যুদ্ধত আদিরস-রসিকতাও, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনায়, বীরাঙ্গনায় ও স্থানে স্থানে মেঘনাদেও নির্ভীকভাবে উলঙ্গ হইয়া আছে। মধুসূদন এই রোগের বশবর্ত্তী হইয়া স্বহস্তাঙ্কিত চিত্রগুলির উপর সময় সময় নিতান্ত অবিচারে কলঙ্ক-কালিমা অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। অপর দিকে, প্রাচীন গ্রীসীয় আদর্শের অনুকরণে ও সম্ভবতঃ পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যের রচনা-ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া, দেবদেবীর মাহাত্ম্য-বর্দ্ধনের জন্য পদে পদে মানবের মাহাত্ম্য ও পুরুষকারকে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদনের ভেরীর পর হেমচন্দ্রই বঙ্গরঙ্গভূমে 'শিঙ্গা' বাজাইয়াছেন। নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও, এই দুই জন একস্বভাবাপন্ন কবি। সহৃদয় কবি হেমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম মধুসূদনকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া আলিঙ্গন দিয়াছিলেন। মধুসূদনের মাহাত্ম্য নিজে বুঝিয়া সকলকে বুঝাইয়াছিলেন। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র উভয়েই প্রচুরপরিমাণে

হেমচন্দ্র

বিদেশীয় প্রাচীন কবিদিগের ভাব-সঙ্কলন ও পথানুসরণ করিয়াছেন। মধুসূদনের স্বাভাবিকতা অসাধারণ; তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক পাত্রে পতিত হইলে পরের জিনিসও তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া প্রতিভাত হয়। শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণ ইহাকেও এক শ্রেণীর মৌলিকতা বলিয়া মনে করেন।

মধুসূদন ধূম, জ্যোতিঃ, সলিল ও মরুতের সংযোগে বঙ্গভূমির সাহিত্য-কাননে এক অভিনব বর্ষাচিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। সহস্র দোষ সত্বেও, একমাত্র স্বাভাবিকতার গুণে, এই চিত্র বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়া আছে।

মধুসূদনের মত স্বাভাবিকতা হেমচন্দ্রের নাই; তবে প্রতিভার ইন্দ্রজাল সম্পূর্ণমাত্রায় আছে, এবং তিনি মধুসূদন অপেক্ষা অধিক সাবধান ও সতর্ক।

কিন্তু এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, কবির পক্ষে এই সতর্কতা তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতিগত হওয়া আবশ্যক। অন্যথা, কেবল বহিরঙ্গভাবে অলঙ্কারশাস্ত্রাদি হইতে যে সতর্কতার শিক্ষালাভ হয়, তাহা কবিত্বশক্তির বিকাশের পক্ষে বরং অন্তরায় হইয়া থাকে। হেমচন্দ্রের সতর্কতায় তাঁহার কবিতা স্থানে স্থানে নির্জীব হইয়াছে।

হেমচন্দ্রের কবি-হৃদয় বীরজনসুলভ কঠোরতায় ও সাধুতায় পরিপূর্ণ। ইহাই বঙ্গীয় কাব্যজগতে হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব। তাঁহার কবিতা পাষাণের মত কঠোর, অকুটিল, অতিশয় দুদ্ধর্ষ, কিন্তু নীরস নহে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে এইরূপ আর এক জন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভারবি। হেমচন্দ্র এ কালের কবি নহেন। এই বাঙ্গালী কবির হৃদয় প্রাচীন গ্রীক কবির উপাদানে গঠিত। তাঁহার বিষাণ এ কালে বাজিলেও প্রাচীন 'হেলিকন' পর্ব্বতের আমদানি। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রাচীন হোমার, টাসো, দান্তে, পিণ্ডার প্রভৃতির সান্নিধ্য অনুভব করিয়াছিলেন। এই সকল কবির ন্যায় তাঁহাকেও জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কারণে দুঃখ যন্ত্রণার দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে হইয়াছিল। অতীন্দ্রিয় পদার্থে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যচক্ষু শক্তিহীন হইয়াছিল, এবং হোমার ও মিলটনের ন্যায় তিনিও অন্ধ হইয়াছিলেন। প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় তাঁহার সঙ্গীতধ্বনি অতিমানবঘটনাবলম্বনে, উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে নিম্নস্থ জনমানবকে লক্ষ্য করিয়া ঝরিতেছে। তাঁহার সমস্ত চেষ্টায় নৈতিক লক্ষ্য ও মানব-মনের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্য বিদ্যমান। হেমচন্দ্রের সাহিত্যিক আদর্শ মহান্। তিনি

শুধু সরস্বতীর প্রিয়পুত্র নহেন, প্রিয় সেবক। নানা দিগ্দেশ হইতে ধনরত্ন আনিয়া তিনি আমাদের দীনা বঙ্গভাষাকে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার সারস্বত-জীবন সর্ব্বত্র মৌলিক-কবিত্বময় না হইলেও, তাহা মহত্ত্বের উজ্জ্বলতায় চিরদিন উদ্ভাসিত থাকিবে

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, এই কবিত্রয়ের মধ্যে হেমচন্দ্রের হৃদয় সমধিক উন্নত ও প্রশস্ত। পৃথিবীর উন্নতিস্বপ্নে, সর্ব্বপ্রকার আশায় ও তাহার সাফল্যে হেমচন্দ্রের আন্তরিক সহানুভূতি। মধুসূদন সম্পূর্ণ বিজাতীয়ভাবাপন্ন। বাঙ্গালী জাতির বা বঙ্গসমাজের সহিত তাঁহার কোনও সহানুভূতি ছিল না। তিনি শক্তি ছিল বলিয়াই আস্ফালন করিতেন, গান গাহিতে জানিতেন বলিয়াই গাহিতেন। গৌড়জনের জন্য অক্ষয় মধুভাণ্ডারের সৃষ্টি করিয়া যাইব, অমর হইব, 'স্মৃতিজলে চিরকাল তামরস'দ'র মত ফুটিয়া থাকিব, এইরূপ উৎকট যশোলিপ্সাতেই তিনি ভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। দেশের সামাজিক মূল 'শিকড়' হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, তাঁহার প্রতিভাতরু সমাজের অন্তস্তলবাহী প্রকৃত প্রাণরস আকর্ষণ করিতে পারে নাই অকারণে আধ্যাত্মিক 'শিকড়' বিস্তার করিয়া বঞ্চিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে স্বদেশপ্রেম, অধীনতা ও দেশাচারের কঠোর পীড়ন হেমচন্দ্রের প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, এবং পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত কবির রচনাতেই অল্পাধিকপরিমাণে বিদ্যমান আছে, মধুসূদনে তাহার লেশমাত্রও দেখিতে পাই না। এই অধঃপতিত জাতির হৃদয়োচ্ছ্বাস যখন প্রথম পরিব্যক্ত হইয়াছিল, তখন উক্ত অতিপ্রয়োজনীয় লক্ষণগুলি আদৌ প্রকাশ পায় নাই।

পরবর্ত্তী না হইলেও, বিচারের সুবিধার জন্য, হেমচন্দ্রের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাই আলোচ্য। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙ্গালা গদ্যকে নিখুঁত সংস্কৃতানুযায়ী করিয়া যান। কালীপ্রসন্ন ঘোষও অনেকাংশে তাহাই রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা স্বভাবশীলতা ও স্বাধীনতা গুণে প্রকৃত বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। পরবর্ত্তী লেখকগণ ও সাময়িক পত্রিকাদি, তাহা সাগ্রহে অবলম্বন করিয়া, তাহার শক্তি সামর্থ্য দিন দিন বাড়াইয়া তুলিতেছেন। বাঙ্গালা গদ্য সাগ্রহে বঙ্কিমের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সংস্কৃতবহুল রচনায় দেশীয় ভাব ও চিন্তা স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। বিদেশীয় ব্যাকরণের [illegible]র বন্ধনের মধ্যে দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্র ভাবগুলি বরং নিপীড়িত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র. উপন্যাস প্রভৃতি।

অথচ এই সমস্ত ক্ষুদ্র ভাব ও ক্ষুদ্র ঘটনাই বর্ত্তমানে সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইতেছে।

বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য আদর্শ-চরিত্র-সৃষ্টি ছাড়িয়া সুখ-দুঃখ-পূর্ণ পাপ-পুণ্যময় প্রকৃত মানব-চরিত্রের অঙ্কনে অবহিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের এই আদর্শ লইয়া উপন্যাস লিখিতে বসিয়াছিলেন; তাই তাঁহাকে যথাসাধ্য প্রচলিত ভাষার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। উপন্যাস ছাড়িয়া কেবল দর্শনাত্মক প্রবন্ধ লিখিতে বসিলে হয় ত বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরাদির অবলম্বিত সংস্কৃত-বহুল রচনা-প্রণালীর অনুসরণ করিতেন, এবং বঙ্গভাষা আজও বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন হইতে বহু দূরে অবস্থান করিত।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছেন। কপালকুণ্ডলায় সর্ব্বপ্রথম প্রতিভার সেই সমুদ্রগর্জ্জন দূর হইতে শুনা গিয়াছে; চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া, বাঙ্গালী গৃহস্থের গৃহদ্বারে আসিয়া, তাহাকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুলকে পুলকিত করিয়াছে। বাঙ্গালী এই ধ্বনি ইহার পূর্ব্বে কি পরে আর শুনে নাই; ইহা সূর্য্যাস্ত দেশের আমদানি। সুতরাং ইহার দোষগুণ এখনও ভাল করিয়া বুঝিবার সময় আসে নাই।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমের স্থায়ী সিংহাসন, তাহা কেহ কোনও কালে অস্বীকার করিতে পারিবে না। উপাখ্যানের নৈতিক ভিত্তি, ভাষার শক্তি, ত্বরিতগতি ও সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতাগুণে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অধিকার-লাভ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ইংরাজী বা ফরাসী উপন্যাসের বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র বা প্রকাণ্ডতা নাই। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে ওজস্বী বৈচিত্র্যময় চরিত্রসমাবেশ নাই। তাঁহার উপন্যাসের আয়তন ক্ষুদ্র। বর্ণিত চরিত্রগুলিও তত প্রকাণ্ড নহে, এবং মানবজীবনের এক একটা সরল ও ব্যাপক ভাবের আশ্রয়ে তাহারা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি মানবজীবনের বা সমাজের তেমন কোনও সূক্ষ্ম সমস্যা লইয়া আবির্ভূত হয় নাই।

বঙ্গীয় উপন্যাসের আশা।

ইহার জন্য কিয়ৎপরিমাণে বঙ্গসমাজও দায়ী। আমাদের সমাজে বৃহৎ চরিত্র, বৃহৎ জীবন, বিকাশ পাইতে পারে না। সমাজ শত সহস্র নিয়মের ও দেশাচারের বেড়াজালের সৃষ্টি করিয়া মানব-জীবনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

ইহার ভিতর বিপুল ঘটনাভিঘাতে উদ্দীপ্ত হইয়া স্বাধীন মানবচরিত্র উঠি-বার, বসিবার অবকাশ পায় না। পাশ্চাত্য সমাজের অবাধ স্বাধীনতা, সামাজিক সমস্যা প্রভৃতি এই সমাজে এখনও প্রবেশলাভ করে নাই। পাঠক ও সমালোচকের রুচিও সমাজের অনুশাসনে গঠিত হইয়াছে। আদর্শ, ভিত্তিভূমি, অথবা বিশেষ সম্ভাব্যতা না থাকিলে, কবি কাহার নির্ভর করিয়া সৃষ্টি করিবেন? আকাশে চরিত্রস্থাপন করিতে গেলে, তাহা পর মুহূর্ত্তে ভূলুণ্ঠিত হইয়া যায়। ইয়ুরোপীয় উপন্যাসের বৈচিত্র্য অথবা বিশালতার স্পর্দ্ধা করি-বার সময় অথবা ক্ষমতা এখনও বাঙ্গালীর হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি একটা প্রেমের খেলা। দাম্পত্য প্রেমে সন্দেহ ব্যভিচারই তাহার প্রায় সমস্ত উপন্যাসের মেরুদণ্ড।

বঙ্গদেশে গার্হস্থ্যজীবন ভিন্ন জীবন নাই, এবং প্রেম ভিন্ন বৃহত্তর বা ব্যাপকতর ভাব নাই। বৈষ্ণব কবিদের সময় হইতে বাঙ্গালী এই প্রেম লইয়া নাড়া চাড়া করিয়া আসিতেছে, এবং প্রেমের বিষয়েই বাঙ্গালীর প্রতিভা বিশেষ ফুটিয়াছে। "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" এই বাক্য আমরা ভালরূপে বুঝিয়াছি, এবং অন্যকে বুঝাইতেছি! আবার ঠিক এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রমণী-চরিত্র পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা অধিক বিকশিত হইয়াছে। বঙ্গসমাজে রমণীর ও গৃহিণীর একটা বহুকাল-প্রচলিত আদর্শ আছে। পুরুষ-চরিত্রের তেমন কোনও আদর্শ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির প্রধান গুণ এই যে, তাহারা সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-প্রণালীতে তেমন কোনও সংকীর্ণতা নাই। এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে কেহ আর এইরূপ মোহিনী শিল্পপ্রতিভা দেখাইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের পর উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্বর্ণলতা-প্রণেতার নাম সর্ব্বাগ্রে মনে উদিত হয়। স্বর্ণলতার প্রথমাংশ বাঙ্গালীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক উপন্যাস। ইহা বঙ্গীয় পরিবারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

অন্যান্য উপন্যাস-লেখক।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নানা বিষয়ে মনঃসংযোগ করাতে, তাঁহার প্রকৃত উপন্যাসরচনায় ক্ষমতা ভালরূপে বিকশিত হইতে পারে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা উপন্যাস ভিন্ন অন্য দিকেও স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। তিনি বঙ্গসাহিত্যের এক জন উৎকৃষ্ট সমালোচক; এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান-

কাব্যের তিনিই অগ্রণী। তিনি শেষ বয়সে উপন্যাসে ও "ধর্ম্মতত্ত্বে" গীতোক্ত ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, এবং গভীর গবেষণার সাহায্যে নবীনচন্দ্রের সমবর্ত্তী কালে পুরাণাদির অন্ধকারগুহা হইতে কৃষ্ণ-চরিত্রের উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার এই কাব্য বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়িফলপ্রসূ হইবে, আশা করা যায়। নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ে, পদ্যে ও গদ্যে, বঙ্গদেশে নবভাবে দার্শনিক ভিত্তিতে কৃষ্ণ-চরিত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন।

নবীনচন্দ্র ; জাতীয়ভাব ও ঐতিহাসিক কাব্য।

মধুসূদন ও হেমচন্দ্র বহুপরিমাণে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মহাকাব্য-কারগণের অনুসরণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের কাব্যগুলির সমস্ত লোভনীয় উপাদান ও উপকরণ তাঁহারা প্রতিভার ইন্দ্রজালের সাহায্যে বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইঁহাদের পর নবীনচন্দ্রের প্রতিভা জাতীয়-ভাব-অবলম্বনে বঙ্গীয় কাব্যজগতে মৌলিক ভাবে বিকশিত হইয়াছে। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তাঁহাদের আদর্শের বশে নানাবিধ অলৌকিক উপকরণের আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং এই শ্রেণীর উপকরণের ভাণ্ডার এককপ রিক্ত করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র এই শ্রেণীর উপকরণের আশ্রয় না লইয়া সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর বাগ্দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বঙ্গবাসীকে অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনাইয়াছেন।

অনেকে অনুমান করেন, বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্র বায়রণের শিষ্য! অবকাশ-রঞ্জিনী, ক্লিওপেট্রা ও পলাশীর যুদ্ধের মূলীভূত ভাবপ্রবাহের অনুধাবন করিলে, নবীনচন্দ্র যে প্রথম বয়সে বায়রণের অনুকরণ করিতেছিলেন, এই অনুমান সঙ্গত বোধ হয়; তদ্ভিন্ন বায়রণের কাব্যাদিও ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বায়রণের কবিতা সর্ব্বত্র জ্বালাময়ী; গভীরতা অপেক্ষা তাহাতে তরঙ্গ অধিক, এবং তিনি রচনাপ্রণালী বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবধান ও অসতর্ক। এই সমস্ত দোষে ও গুণে নবীনচন্দ্রও পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহা অত্যন্ত বায়রণ পাঠের ফল, মনে হয় না।

নবীনচন্দ্রের মৌলিকতা।

নবীনচন্দ্রের প্রকৃতি ও সাহিত্যজীবনেও ইহার মূল 'শিকড়' নিহিত আছে। রঙ্গমতীতে নবীনচন্দ্র তাঁহার অন্য সমস্ত কাব্য অপেক্ষা অধিক ধরা দিয়াছেন; উচ্ছৃঙ্খল বন-প্রকৃতির মত কবিপ্রকৃতি মধ্যে মধ্যে সমস্ত শৃঙ্খলা নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছে; বর্ষার পার্ব্বত্য নির্ঝরের মত কাব্যাবলী, রস, অলঙ্কার প্রভৃতি তারবেগে বিদলিত উন্মূলিত করিয়া যথেচ্ছ ছুটিয়াছে। এই কাব্যে কবির হৃদয়শোণিত সঞ্চারিত হইয়াছে।

নবীনচন্দ্র রঙ্গমতীর প্রত্যেক অঙ্কে যত দূর আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছেন; ইহার প্রত্যেক অঙ্কে যত দূর হৃদয়বিতরণ করিবার অবসর পাইয়াছেন, আর কোনও কাব্যে তত দূর পারেন নাই। কবি স্বয়ং এই কাব্যের প্রধান নায়ক বলিলে, কথাটি অমূলক হয় না। এই কাব্যে এমন অনেক সুদীর্ঘ জল্পনা ও বর্ণনা আছে, যাহা একমাত্র কবির সম্পর্কেই সার্থক হয়।

নবীনচন্দ্রের প্রতিভা অনেকপরিমাণে ঐতিহাসিক, পূর্ব্বে বলিয়াছি। কল্পনা ও বিচিত্রভাবপ্রবণতার সহিত এই ঐতিহাসিক প্রতিভা সম্মিলিত হইয়া কবির হৃদয় গঠিত করিয়াছে। সত্যের সহিত কল্পনার সংমিশ্রণে, কায়ার সহিত অদ্ভুত ছায়াবাজির সংমিশ্রণে, বিরাট রক্তমাংসবহুল শরীর ও বিপুল সুখদুঃখভাস্বর চরিত্রের সৃষ্টিই এই কবির বিশেষত্ব। সামান্য কাঠামোর উপর চকিতে বিচিত্র কল্পনাজাল বিস্তার করিতে, এক কটাক্ষে তাহার আয়ত্ত মধ্যে আয়ত্ত করিয়া রেখাপাত করিতে, নবীনচন্দ্রের তূলিকা খুব পটু। তাঁহার কাব্য-পাঠকের মনে ইহা সর্ব্বপ্রথমে আঘাত করে, এবং শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়।

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস লিখিয়া নবীনচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের কবি। পূর্ব্ব-পূর্ব্বকাল হইতে ধর্ম্মবিপ্লবে বঙ্গসাহিত্য কিরূপ উপকৃত হইয়াছে, তাহার কিয়ৎপরিমাণে আভাষ দিয়াছি। নবীনচন্দ্রের চেষ্টাও এই ক্ষেত্রে কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ, প্রেমদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সমধর্ম্মী। বৈষ্ণব কবিগণ স্বহস্তে রাধাকৃষ্ণ গঠিত করিয়া তাঁহাদিগকে দেব-বোধে পূজা করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রও কল্পনায় অভিনব কৃষ্ণ-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ভক্তের ন্যায় পূজা করিয়াছেন। এই বিষয়ে আধুনিক বাঙ্গালী কবি পিতামহ প্রপিতামহের ভাবধর্ম্মের বশীভূত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। অপর পক্ষে, এই কাব্য-গুলিতে প্রাচীন মহাকাব্য ও আধুনিক উপন্যাস, এই উভয় প্রকৃতি সম্মিলিত হইয়াছে; ইহাতে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতের ভক্তিপ্রবণতাও বহুপরিমাণে না আছে, এমন নহে। প্রভাসের কৃষ্ণ পূর্ণমাত্রায় শ্রীচৈতন্য। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ 'সোঽহং' জ্ঞান ছাড়িয়া প্রকৃত ভক্তের ন্যায় এই কাব্যে নৃত্য করিয়াছেন। রৈবতকে যে মহিমান্বিত কৃষ্ণচরিত্রের আভাস সূচিত হইয়াছে, তাহা

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি; হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকাল।

[illegible]ভাবে কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে প্রকাশ পায় নাই; তাহা শ্রীচৈতন্যের চরিত্রের প্রভাব ও দেশব্যাপী ভক্তিধর্ম্মের বিজয়-ধ্বজার কথা।

বহুপূর্ব্বে মনীষী কেশবচন্দ্র সেন শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের বর্ত্তমান আদর্শ প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেন। তাঁহার পথানুসরণে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" নামক পুস্তকে কৃষ্ণ-চরিত্রের মাহাত্ম্য সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের কবিকল্পনার দিগন্তবিসারী চক্ষুর সম্মুখে এই বিষয় প্রকট, মহান্ ও বিভক্তাবয়ব হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে; এবং ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক তথ্য, সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য, সৃষ্টি ও আবিষ্কার একাকার হইয়া, এই বিপুলায়তন কাব্যত্রয়ের উদ্ভব হইয়াছে। বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগের জাতীয় সংঘর্ষ, ফরাসী বিপ্লব, অ্যাবটের নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, চিন্তাদগ্ধ মেরী এণ্টনিয়েট, মানবহিতৈষিণী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি সকলেই এই মহাকাব্যের উপকরণ যোগাইয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে জাগ্রত হইয়া পূর্ব্বকালের ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি আধুনিক পরিচ্ছদ অবলম্বনে এই কাব্যে পরিস্ফুরিত হইয়াছে। ধর্ম্ম, স্বাধীনতা, সাম্য-ভাব, মৈত্রী, দাসত্বপ্রথা, বিবাহপ্রথা, অদৃষ্টবাদ, জনবৃদ্ধি প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের সমস্যাসমূহের বিচার বিতর্ক ও কবির আত্মমতানুযায়ী সিদ্ধান্তে এই কাব্য মুখরিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয়তা নাই, ধর্ম্মই এই সমাজের মূল ভিত্তি ও বন্ধনগ্রন্থি, সুতরাং এই কাব্যকে বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে।

নবীনচন্দ্রের দোষ।

কিন্তু এই কাব্যে যে সমস্ত সাহিত্যগত দোষ বর্ত্তমান আছে, তাহাও গুণের অনুপাতে অল্প নহে। তাঁহার রচনা-প্রণালীর বাহুল্য, পুনরুক্তি, অসতর্কতা ও কবির ভাববিহ্বলতা, স্থানে স্থানে সর্গবন্ধে শৈথিল্য, অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের বর্ণন ও কবির প্রকাশ্য-ভাবে পাঠককে ধরা দেওয়া ও অনাবশ্যক রসিকতা করিবার প্রয়াস প্রভৃতি দোষ, রসজ্ঞ পাঠকের চক্ষে সুস্পষ্ট।

নবীনচন্দ্র ভাবুক; প্রকৃত কুশলী কবি নহেন। ভাবাবিষ্ট হইলে তাঁহার আত্মসংযম থাকে না। তিনি ভাবের বেগে মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশ পাতাল পরি-ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারেন; শত বৎসরের সূক্ষ্ম বীজাণুকে মহাবৃক্ষে পরিণত করিতে পারেন,—যদি কোনও মাহেন্দ্রমুহূর্ত্তে উহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কারণ, প্রতিভা আকাশের হাওয়ায় পরিচালিত হয়। তাঁহার হৃদয় যদি কোনও দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুটে, তাহা হইলে অবিরাম ছুটিতে থাকে ; যেন তাহাকে সংযত করিবার শক্তি কবির নাই, ইচ্ছাও নাই। এই কারণে তিনি শক্তিশালী কবি হইয়াও কাব্যকুশলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

নবীনচন্দ্রের প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ কবির অনুরূপ বেগ আছে, স্থানের প্রসারও আছে, কিন্তু অনুরূপ গাম্ভীর্য্য ও আত্মসংযম নাই ; তাঁহার কল্পনা চঞ্চলা পক্ষিমাতার মত প্রত্যহ নব নব দেশে নব নব বৃক্ষে নব নব শাখায় উড়িয়া বেড়ায় ; প্রত্যহ নব ভিন্ন প্রসব করিয়া এক চঞ্চুর আঘাতেই তাহাকে ফুটাইয়া রাখিয়া যায়। ধৈর্য্যের সহিত তাহার উপর জাগিয়া থাকিয়া উত্তাপ দিবার অপেক্ষা রাখে না। এই চাঞ্চল্য, এই দ্রুতগতি ও এই প্রচণ্ডশক্তি তাঁহার কাব্যের প্রত্যেক পত্রে অনুভূত হয়। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস যে বিশাল কল্পনা-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের উদ্দেশ্য যেরূপ মৌলিক ও পৃথিবী-পরিব্যাপী, তাহাদের রঙ্গভূমি যেরূপ বিপুল ও অনন্তপ্রসারিণী, তাহাদের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে ছায়ালোকসম্পাতে যেরূপ বর্ণসৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা যদি উপযুক্ত ধৈর্য্য ও নৈপুণ্যের সাহায্যে দৃঢ়ীভূত হইত, এমন কি, যদি শুধু কাটিয়া ছাঁটিয়া দোষাশ্রিত অংশগুলি বাদ দেওয়া হইত, তাহা হইলে, ইহা পৃথিবীর উৎকৃষ্ট মহাকাব্য-শ্রেণীতে স্পর্দ্ধার সহিত স্থানগ্রহণ পারিত। স্বদেশে বিদেশে বাঙ্গালী এই কাব্য গৌরবের সহিত দেখাইতে পারিত। ক্রমশঃ।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

ফিরিঙ্গি বণিক্।

নবম পরিচ্ছেদ।

কালিকট।

"Great is the country, rich in every style,
Of goods from China sent by sea to Nyle."—*Lusiad.*

ভারতবর্ষের অলৌকিক ঐশ্বর্য্যকাহিনী সেকালের ইউরোপীয় কবিকল্পনাকে নিরতিশয় মুখর করিয়া তুলিয়াছিল! কবিকাহিনী কিয়ৎপরিমাণে অতিরঞ্জিত না হইয়া যায় না। তথাপি তাহাকে একেবারে অলীক বলিয়াও প্রত্যাখ্যান

করিবার উপায় নাই। "বহুমূল্য জনশ্রুতিঃ"; লোকসমাজে যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত হয়, তাহার মূলানুসন্ধান করিতে পারিলে, কিছু না কিছু সত্যসংবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় কবিকুলা যে সকল জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া এরূপ মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মূলেও কিছু না কিছু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত ছিল। জনসাধারণ তাহার আবিষ্কার-সাধনের জন্য ব্যস্ত হইত না; তাহারা জনশ্রুতিকেই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিত। কবিকল্পনায় কেবল সেই তথ্যই বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। সেকালের ইউরোপীয় জনসাধারণের নিকট ভারতবর্ষ যে ভাবে প্রতিভাত হইত, "লুসিয়াদে"র কবিতায় তাহারই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

সেকালের ইউরোপের তুলনায় ভারতবর্ষ সত্য সত্যই সমধিক সম্পন্ন রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত। তখনও বিশ্ববিজয়িনী বাণিজ্যশক্তি পরিস্ফুট হইয়া, ইউরোপকে পরস্বাপহরণের অধিকারদান করে নাই! তখনও নগরে নগরে শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ইউরোপকে শিল্পকৌশলে পরাক্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই। তখনও জলে স্থলে বাহুবিস্তার করিয়া ইউরোপ ছলে বলে কৌশলে এসিয়ার অন্তরাত্মা প্রকম্পিত করিবার ক্ষমতা লাভ করে নাই।

তখন কেবল ইউরোপের জীবন-প্রভাত। সে প্রভাতে ইউরোপের নরনারী কেবল বিস্মিতনয়নে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ভারতবর্ষের মতই শিল্পবাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিবার উপায়-অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

যে দেশ সুদূর মহাচীন সাম্রাজ্যের বহুমূল্য পণ্যভাণ্ডার কুক্ষিগত করিয়া নীলনদের উভয় তটের বিবিধ পণ্যবীথিকা সজ্জীভূত করিত,– পণ্যবিনিময়ে ইউরোপের সমগ্র জনপদের কষ্টসঞ্চিত ধনভাণ্ডার বহন করিয়া আনিত,– তাহা যে ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, সে কথা জলে স্থলে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ভারতবর্ষ বহু বিস্ময়ের লীলাভূমি বলিয়া সভ্যসমাজে সুপরিচিত। তাহার পুরাতন সাহিত্য ও শিল্পকলা অদ্যাপি কত অধ্যয়নশীল পাশ্চাত্য অধ্যাপকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে! তাহার অলৌকিক জ্ঞানগৌরব অদ্যাপি থাকিয়া থাকিয়া কত অভিনব তথ্যের মূল অনুসন্ধানের সন্ধান প্রদান করিয়া ভারতবর্ষকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিতেছে; তাহার কথা সুধীসমাজের অপরিজ্ঞাত নাই।

ভারতবর্ষের সমুদ্রসৈকতের পুরাতন জনসমাজ অতিপুরাকালেই সমুদ্র-পথে অগ্রসর হইয়া নানা দিগ্দেশের পণ্যসংগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছিল, পুরাতন সাহিত্যে অদ্যাপি তাহার বিবিধ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনুভোতভ নাবিকবর্গের অপরিসীম অধ্যবসায়ে অধিকাংশ সভ্যদেশেই ভারতবাণিজ্যের প্রবল প্রভাব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। অন্য কোনও সভ্যজাতি বাণিজ্য-বিস্তারে ভারতবর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার সাহস প্রকাশ করে নাই। ইস্লাম অর্থলাভের আশায় ভারতবর্ষের অনুগত হইয়াই বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিল। সে বাণিজ্যে পরস্বাপহরণপ্রবৃত্তির সংস্রব ছিল না; জাতি-ধর্ম্মের কলহ কোলাহল কাহারও শান্তিভঙ্গ করিত না;—যে পারিত, সে তাহার শক্তিসামর্থ্য অনুসারে নিরুদ্বেগে বাণিজ্য ব্যাপারে অর্থোপার্জ্জন করিত।

ইউরোপের প্রথম চেষ্টাতে এই আকাঙ্ক্ষাই বর্ত্তমান ছিল;—ভারত-বাণিজ্যের অভিনব জলপথের আবিষ্কার-সাধনের আশায় পর্ত্তুগাল হইতে সমুদ্রযাত্রা করিবার সময়ে গামার হৃদয়ে হয় ত এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভারতভূমিতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সে সাধু-সংকল্প তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে উপনীত হইবামাত্র, তদ্দেশে ইস্লামের আধিপত্য দর্শন করিয়া, গামার খৃষ্টধর্ম্মানুরাগ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। যে জাতির প্রবল বাহুবলে স্থলবাণিজ্যপথ হইতে ইউরোপ চিরনির্ব্বাসিত হইয়াছে, জলবাণিজ্যপথেও তাহাদিগের প্রবল প্রতাপ লক্ষ্য করিয়া, গামা তাহা চূর্ণ করিবার উপায়চিন্তা করিতে করিতেই ভারতবর্ষাভিমুখে পোতচালনা করিয়াছিলেন। কালিকটের বন্দরে উপনীত হইবার অল্পকাল পরেই সে গুপ্ত সংকল্প প্রকাশিত হইয়া পড়িল!

পুরাকালে দাক্ষিণাত্যে কেরল নামক একটি সম্পন্ন রাজ্য বর্ত্তমান ছিল; পুরাতন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেরল রাজ্য চতুঃষষ্টি গ্রামে বিভক্ত হইয়া, সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। এখন যাহার নাম মালাবার উপকূল, তাহা সেই পুরাতন কেরল রাজ্যের চতুর্থাংশ-মাত্র। পশ্চিমে আরবসাগর, পূর্ব্বে গিরিপ্রাচীর,—মধ্যস্থলে মালাবারের সংকীর্ণভূমি,—কোনও স্থলে মতোন্নত, কোনও স্থলে সম্পূর্ণ সমতল। স্থানে স্থানে পরিসর এত সংকীর্ণ, যেন ঘাটগিরি আসিয়া সমুদ্রসৈকতে মিলিত হইয়া রহিয়াছে। এই সংকীর্ণ সমুদ্রতটে কত বন্দর বর্ত্তমান ছিল, তাহার

বিকৃত বিবরণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল কালিকট বন্দরের নাম এখনও জগদ্বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

যে সকল অর্ণবপোত পারস্য, আরব ও মিশর দেশে যাতায়াত করিত, তাহাদের যাত্রাপথে দণ্ডায়মান থাকিয়া, মালাবার-উপকূল কত অতীত ঘটনাই না প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে। যে সকল অর্ণবপোত প্রাচ্য দ্বীপ-সমূহের পণ্যভাণ্ডার মিশরদেশ পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যাইত, তাহারাও মালাবারের উপকূলভূমির নিকট দিয়াই গমন করিতে বাধ্য হইত। এই সকল কারণে মালাবারের উপকূল বহু বিদেশীয় নরনারীর নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বাণিজ্যের বিজয়লক্ষ্মী মালাবার হইতে সর্ব্বপ্রকার কলহকোলাহল চিরনির্ব্বাসিত করিয়া, নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মকে আশ্রয়দান করিয়াছিল। যে সকল য়িহুদীয়, পারসীক বা মিশরীয় ভদ্রসন্তান মালাবারে বসতি করিতেন, তাঁহারা ভারতবাসীর ন্যায় অধিকার লাভ করিয়া, বিদেশাগত হইয়াও, রাজকার্য্যে অসঙ্কোচে নিয়োগ প্রাপ্ত হইতেন। এই সকল কারণে মালাবারের ইতিহাস বাণিজ্যপরায়ণ ইউরোপীয় বন্দরের ইতিহাস হইতে পৃথক্।

ইউরোপে কেবল সমরকাহিনীর আতিশয্য! ইউরোপের শিল্পবাণিজ্যের ইতিহাসেও কেবল হিংসার কথা,—নরহত্যার কথা, পরস্বাপহরণের কথা,—যেন শোণিতের অক্ষরে দুর্দ্দান্ত দস্যুর কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে! সে দেশের ধর্ম্মান্ধ নরনারী ধর্ম্মের নামে কত অধর্ম্মসঞ্চয় করিয়াছে, পুণ্যের নামে কত অপবিত্র আচারের অনুষ্ঠানে লিপ্ত হইয়াছে, নিরন্তর বিদ্বেষবিষে জর্জ্জরিত হইয়া, মানবের ললাটপটে কত দুরপনেয় কলঙ্করেখা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কথা কোনও ইতিহাসপাঠকের অপরিজ্ঞাত নাই! ভারত-বাণিজ্যের ইতিহাস তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সত্যনিষ্ঠায় ভারতবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা; শান্তি ও প্রীতিতে ভারতবাণিজ্যের প্রসার; নিরবচ্ছিন্ন অধ্য-বসায়ে ভারত-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি! যাহা গুণ, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার ফলেই ভারতবাণিজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে! ফিরিঙ্গি বণিকই তাহার একমাত্র মূল কারণ। প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনায় সেই মূল কারণ প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে।

কেবল রাজ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য জনপদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেবল বাণিজ্যব্যাপার লইয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিত। তাহার দুর্ভেদ্য গিরিপ্রাচীর

[illegible] করিয়া, ভারতীয় রাষ্ট্রবিপ্লব সাগরবক্ষে উপনীত হইত না। দিল্লীর উত্থান পতনের সহিত মালাবারের উত্থান পতনের সংস্রব দেখিতে পাওয়া যাইত না। কালিকটের বন্দরে চিরদিনই ভারতবাণিজ্যের বিজয়বার্তা; সেখানে অন্য কথা,—অন্য চিন্তা লোকচিত্ত আলোড়িত করিবার অবসর প্রাপ্ত হইত না। আয়তনে ক্ষুদ্র হইয়াও, কালিকটের বন্দর এইরূপে বৃহৎ বিজয়গৌরবলাভের অধিকারী হইয়াছিল।

যত দূর পর্য্যন্ত কুক্কুট-রব শ্রুত হইতে পারে, তাহাই কালিকটের স্বাভাবিক পৌর-সীমা,—এই জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া কালিকট শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। তাহা যে সমুদ্রযাত্রার জন্যই সর্ব্বত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, রাজবংশের উপাধি অদ্যাপি তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। রাজার উপাধি "সামুরী"; * —তাহাতে সমুদ্রের উপর আধিপত্য থাকাই সূচিত হয়। ফিরিঙ্গি বণিক্ "সামুরী"র উচ্চারণ-বিকৃতি সাধিত করিয়া, কালিকটরাজকে "জামোরিণ" নামে সুপরিচিত করিয়া গিয়াছেন।

ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যতরণী কালিকট বন্দরে উপনীত হইবার সময়ে, তদ্দেশে নানা জাতির ও নানা ধর্ম্মের নরনারীর বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোন্ পুরাকালে তাহার সূত্রপাত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। খৃষ্টাবির্ভাবের বহুপূর্ব্বেও মালাবারের উপকূল ভারতবাণিজ্যের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্যের রাজদূতগণও মালাবারে বসতি করিতেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কালিকট নগরে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক ছিল না। ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রিত্ব কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের সংখ্যাও অধিক ছিল না। ক্ষত্রিয়গণ সমর-শিক্ষা বিরত হইয়া বাণিজ্যে অর্থোপার্জ্জনের আশায় ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। সকলেই বৈশ্যাচার-পরায়ণ হইয়া, বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

য়িহুদীয়গণের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। তাঁহারাই ইউরোপের চিরভ্রমণশীল প্রধান বণিক্; অদ্যাপি সকল সভ্য দেশেই য়িহুদীয় বণিকের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে তাঁহাদের অর্থবল প্রবল ছিল। খৃষ্টানসমাজ য়িহুদীয়গণকে ঘৃণা করিলেও, ঋণগ্রহণের জন্য য়িহুদীয়গণের

---

* Zamorin, the European form of the Tamil Samuri is still used in official addresses to the Calicut chief.—Sir W. Hunter.

বাহির হইতে ব্যাখ্যা হইতেন। ইউরোপের বাণিজ্যব্যাপারের মূলে য়িহুদীয়গণের সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে পারস্যোপসাগরের ভারতবাণিজ্যপথ য়িহুদীয়গণের করতলগত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে য়িহুদীয়গণ দলে দলে ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পারসীকগণও এইরূপে ভারতবর্ষে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া, অদ্যাপি দাক্ষিণাত্যে বিবিধ বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত রহিয়াছেন।

পারস্য, আরব, মিশর প্রভৃতি পাশ্চাত্যরাজ্যে যে সকল ধর্মধর্মের অভ্যুদয় হইত, তাহা অন্যত্র প্রচারিত হইবার পূর্বেই, ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলে তাহার কথা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। এই কারণে, খৃষ্ট ও মহম্মদের ধর্মমত অল্পদিনের মধ্যেই মালাবারে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মালাবারে খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হইবার মূল কারণ কি, তদ্বিষয়ে বাদানুবাদের অভাব নাই। এ বিষয়ে দাক্ষিণাত্যে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহাই ক্রমে ক্রমে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। স্বনামখ্যাত বিশপ হীবর ও স্যর উইলিয়ম হণ্টার তাহার বিবিধ তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই দাক্ষিণাত্যের জনশ্রুতিকেই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের সহিত খৃষ্টধর্মের পুরাতন সংস্রবের মূল রহস্য কালক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

যীশুখৃষ্ট জর্দন-নদের তীরে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। দীক্ষা-গুরু "জন" অবশ্যই খৃষ্টান ছিলেন না। তাঁহার বেশভূষার যেরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে "বস্তিকধারী" সন্ন্যাসী বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে প্রাচ্য সাধুপুরুষগণ তাঁহাকে সূতিকাগারে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, এ কথা খৃষ্টধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। তৎকালে এসিয়াখণ্ডের জলে স্থলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অব্যাহত গতির ও স্বধর্মবিস্তারের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ করিলে, যীশুখৃষ্টের দীক্ষাগুরুকে ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধশ্রমণ বলিয়াই স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয়। এ বিষয়ে যাহা কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। তথাপি মনে হয়,—খৃষ্টজন্মবৎসরের পূর্বে ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ ভিন্ন "বস্তিকধারী" সন্ন্যাসী আর কোনও দেশে বর্তমান ছিল না। যাহা হউক, খৃষ্টধর্ম যে এসিয়া হইতেই ভারতবর্ষে প্রথম উপনীত হইয়াছিল, ফিরিঙ্গি বণিকের ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

[illegible] তাঁহাকে অবশ্য স্বজাতির মুক্তিদাতা বলিয়া য়িহুদিগণের [illegible] বহির্গত হইয়াছেন, খৃষ্টধর্মপ্রবর্তক যীশুখৃষ্ট তাহাকে স্বজাতির নিকট প্রচারিত করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ইহাকে তাঁহার স্বজাতিপ্রীতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন,—আগে য়িহুদীগণকে, তাহার পর অন্যান্য নাগরিকগণকে— নবধর্মের সুসমাচার বিতরণ করিও। য়িহুদীগণ ধর্মামৃত হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া বাহ্যাড়ম্বর ও ক্রিয়াকাণ্ড লইয়াই উন্মত্ত ছিলেন। তাঁহাদের নিকটে ধর্মব্যাখ্যা করাই যীশুখৃষ্টের সর্বপ্রথম লক্ষ্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি তাহার জন্যই অকালে দেহবিসর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খৃষ্টশিষ্যগণের মধ্যেও এই প্রবৃত্তি প্রবল ছিল।

খৃষ্টশিষ্য টমাস নামক সন্ন্যাসী প্রবাসী য়িহুদীগণের নিকট ধর্মপ্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। টমাস নানা স্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশের মালিয়াপুর নামক স্থানে দেহবিসর্জন করেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে মালিয়াপুরে মেলা বসিয়া থাকে। তাহা দাক্ষিণাত্যে "সেন্ট টমাসের মেলা" নামে সুপরিচিত। ফিরিঙ্গি বণিক মালাবারের উপকূলে উপনীত হইবার সময়ে এই সম্প্রদায়ের খৃষ্টানদিগের আধিপত্য প্রবল ছিল। তাঁহারা রাজকার্য্যে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া সেনাবিভাগে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর ভারতবর্ষীয় খৃষ্টানগণ কখনও কখনও মন্ত্রিপদেও আরোহণ করিতেন। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের হিন্দু রাজার মন্ত্রী খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। খৃষ্টানগণ ভারতবর্ষে স্বধর্মের আচার ব্যবহার প্রতিপালন করিবার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন; মুসলমানদিগের পক্ষেও তাহাতে কোনরূপ বাধা উপস্থিত হয় নাই। ধর্মে ও আচার ব্যবহারে পৃথক্ হইয়াও, রাজতন্ত্রে ও বাণিজ্যব্যাপারে এই সকল ভারতপ্রবাসী বিধর্ম্মিগণ ভারতবাসী বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন।

যে সকল মুসলমান অতি পুরাকাল হইতে মালাবারে বাস করিতেন, তাঁহারা আরব দেশ হইতে সমাগত, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ধর্মান্ধ ছিলেন না। যাঁহারা মিশর ও পারস্যদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা খৃষ্টবিদ্বেষী হইলেও, হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না। মালাবারে হিন্দু মুসলমান তুল্যভাবে বাণিজ্যব্যাপারে প্রভুত্ব লাভ করিতেন। বরং অনেক সময়ে মুসলমান বণিকেরাই সমধিক প্রভুত্বের পরিচয় প্রদান

করিতেন। মালাবারের হিন্দু অধিবাসিগণ [illegible] বণিকগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, লাভের লোভে, তাঁহাদিগের সহিত চিরপরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ক্রেতার সংখ্যা অধিক হইলেই বিক্রেতার অধিক লাভের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। এই কারণে, মালাবারের হিন্দু অধিবাসিগণ নূতন ক্রেতাকে সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন না। *

ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষে মালাবার অপেক্ষা ভারতবর্ষের অন্য কোনও স্থান অধিক অনুকূল হইত বলিয়া বোধ হয় না। অন্যান্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মালাবারের সমুদ্রোপকূল বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একটি ক্ষুদ্র বন্দরমাত্রই একটি রাজ্যের শেষ সীমা! তাহার রাজা কেবল বাণিজ্যশুল্ক সংগ্রহ করিয়াই অর্থোপার্জ্জনে ব্যাপৃত! কেহ কখনও তাঁহার শাসনক্ষমতা অস্বীকার করিবে, কেহ কখনও বাহুবলে রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য সদর্পে অগ্রসর হইবে, কেহ কখনও হিংসাদ্বেষ প্রজ্বলিত করিয়া মালাবারের শান্তিকুটীর ভস্মসাৎ করিবে,—এরূপ আশঙ্কা কদাচ রাজমস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয় নাই। পুরাকাল হইতে কত বিদেশের বণিক আসিয়া বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছে, কেহ কখনও স্বপ্নেও কালিকট রাজার সহিত কলহ উপস্থিত করে নাই। রাজা এই সকল কারণে রাজ্যরক্ষার্থ বহুসংখ্যক সৈন্য পালন করিতেন না। সুতরাং পর্ত্তুগালের পক্ষে এরূপ অরক্ষিত ক্ষুদ্ররাজ্যের ক্ষুদ্র নরপতিকে বাহুবলে পরাজিত করিবার সম্ভাবনা ছিল।

ভাস্কো ডা গামা যখন ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন, তখন ভারতবাণিজ্যের এইরূপ অসহায় অবস্থার সন্ধানলাভ করিয়া নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। রাজ্যজয়, বাণিজ্যবিস্তার ও ধর্ম্মপ্রচার একত্র সুসম্পন্ন করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্রের সন্ধানলাভ করিয়া, ফিরিঙ্গি বণিক তস্করের ন্যায় ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে প্রথম পদক্ষেপ করিলেন। যে দেশে সকল জাতির ও সকল ধর্ম্মের তুল্যরূপ সমাদর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা গুণ হইয়াও দোষের আকর হইয়া উঠিল। যাহা ছিল না, ফিরিঙ্গি বণিকের আগমনে তাহাই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তাহা নির্ব্বাপিত করিবার শক্তি না থাকায়, রাজা ও রাজ্য দগ্ধ হইয়া গেল! সেই তালীবনরাজিনীলা ভারতসাগরবেলা যদি প্রতি দিবসের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিত, তবে সভ্যসমাজ স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাইত,—

* They welcomed foreign merchants, as the greater part of their revenues consisted of dues on Sea-trade.—Sir W. Hunter.

ফিরিঙ্গি বণিক ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করিয়াই কত অত্যাচার অবিচারের প্রশ্রয় দান করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের তুলনায় পর্ত্তুগাল অগণ্য ক্ষুদ্র রাজ্য। কিন্তু কালিকটের তুলনায় পর্ত্তুগাল ক্ষুদ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে না। কালিকটের ন্যায় অরক্ষিত ক্ষুদ্র বন্দরকে বাহুবলে পরাভূত করিবার ক্ষমতা ছিল বলিয়াই পর্ত্তুগালের বিশ্ববিখ্যাত নাবিকরাজ ভারতবর্ষে রাজ্যসংস্থাপনের আশা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। গামা ধর্ম্ম-কলহের সহিত বাণিজ্য-কলহ মিশ্রিত করিয়া, কালিকটের বন্দরে এক অশ্রুতপূর্ব্ব বিপ্লব উপস্থিত করিয়া, কালিকট-রাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তাহার কথা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

তিব্বতীয় বৌদ্ধ চিত্রফলক।

প্রায় এক মাস পূর্ব্বে ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের হোম্-মেম্বর অনারেবল্ স্যার এ. টি. অরণ্ডেল একখানি চিত্রফলক কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রেরণ করেন। বিগত তিব্বত যুদ্ধের সময়ে ঐ ফলক তিব্বতদেশের গ্যাংচি প্রদেশের সন্নিহিত কোনও বৌদ্ধবিহার (সম্ভবতঃ ৎক্রেডিং নামক বিহার) হইতে আনীত হইয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটীর ফাইলোলজিক্যাল সেক্রেটারী ডাক্তার রস্ উহা পরীক্ষার নিমিত্ত আমার নিকট প্রেরণ করেন। অরণ্ডেল সাহেবের অনুমতি *

---

* অরণ্ডেল সাহেব ২৮শে জুন তারিখে ডাক্তার রসকে যে পত্র লেখেন, তাহা এই —

BRAIG DHU, SIMLA,
28th. June, 1905.

Dear Dr. Ross,

In reply to your letter of the 24th Instant. I am delighted that the scroll should prove to be of such great interest. By all means keep it for the meeting of the Asiatic Society. Please also give my compliments to Pandit Satis Chandra Vidyabhushan and say I shall look forward with pleasure to reading his paper in the Society's Journal.

With kind regards
I am yours sincerely,
(Sd) A. T. ARUNDEL.

করিয়া অদ্য আমি এই জুলাই তারিখে এসিয়াটিক সোসাইটীর মাসিক অধি-বেশনে প্রদর্শন * করি।

ফলকখানির বয়ঃক্রম অনুমান ৩০০ তিন শত বৎসর। ইহার অনুপম কারুকার্য্য চীনদেশীয় শিল্পের অনুকরণে সম্পাদিত। ইহার দৈর্ঘ্য তিন হাত চারি ইঞ্চি, এবং বিস্তার কিঞ্চিন্‌ন্যূন দুই হাত। নানা বর্ণে রঞ্জিত স্বর্ণময় লতা, পত্র, কুসুম, চক্র ইত্যাদির যথাবিধি সমাবেশে ফলকখানির সৌন্দর্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার বিচিত্র মূর্ত্তিসমূহ বস্ত্রের † উপর অঙ্কিত ও রঞ্জিত।

ফলকের [illegible] রক্তবর্ণ ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ যোগাসনে সমুপবিষ্ট। তিনি সুখাব[illegible] স্বর্গের অধীশ্বর ও পশ্চিম ভুবন অধিষ্ঠিত। তাঁহার দুই পার্শ্বে সমুজ্জ্বল ম[illegible]। ফলকের মধ্যস্থলে বুদ্ধ শাক্যসিংহের প্রশান্তমূর্ত্তি। তিনি না[illegible]র প্রতি চক্ষুর্নিবিষ্ট করিয়া পদ্মাসনে সমাসীন। চতুঃপার্শ্বে তাঁহার [illegible] ও অলৌকিক ঘটনাবলী অঙ্কিত।

(১) প্রথমতঃ [illegible]সিংহের নিকট ব্রহ্মা সহাম্পতির প্রার্থনা। বহু তপস্যার পর শাক[illegible] করিয়া যে সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা অতি [illegible] মনুষ্যলোকে প্রচার করিলে কোনও ফল হইবে না, [illegible] করিয়া, [illegible] অনেক দিন নীরব ছিলেন। অনন্তর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বুদ্ধের [illegible]ট গয়ায় সমুপস্থিত হন। "হায়! সংসারের [illegible] হইল [illegible]" বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে তিনি বুদ্ধের নিকট কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করেন, "ভগবন্! সংসারে এমন অনেক মহাত্মা বিদ্যমান আছেন, যাঁহারা রাগ দ্বেষ ও মোহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন নহেন, এবং যাঁহারা আপনার ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক"। ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে বুদ্ধদেব জগতে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য স্বীকৃত হন।

---

* ৩রা জুলাই তারিখের ষ্টেট্সম্যানে "The Tebetan scrolls" এই নামে বর্ণিত চিত্র-ফলকের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। ৭ই জুলাইএর ষ্টেট্সম্যানে এসিয়াটিক সোসাইটীর কোনও সভ্য উহার কোনও কোনও বিষয়ের প্রতিবাদ প্রকাশিত করেন। ৯ই জুলাইএর ষ্টেট্সম্যানে ঐ প্রতিবাদের খণ্ডন করিয়া আমি এক উত্তর প্রকাশিত করি। ১০ই জুলাই তারিখে অপর কোনও ব্যক্তি আর একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত করেন। ১২ই জুলাই তারিখে আমি উক্ত প্রতিবাদের খণ্ডন করিয়া বর্ণিত বৃত্তান্তের [illegible] সপ্রমাণ করি। [illegible]।

† [illegible] হইয়াছে। ঐ [illegible] উপর [illegible] দেওয়া হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধদেবের [illegible]। বুদ্ধদেব ভাবিলেন, "কাহার নিকট সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মপ্রচার করিব? কে আমার প্রথম শিষ্য হইবে?" [illegible]যোগে দেখিতে পাইলেন, রুদ্রক রামপুত্র ও আরাড় কালাম, [illegible] দেহত্যাগ করিয়াছেন। তদনন্তর পঞ্চ ভদ্রবর্গীয় ব্রাহ্মণের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিবার উদ্দেশে বারাণসী যাত্রা করিলেন। পথে গঙ্গা নদী। তাঁহার সঙ্গে তর-পণ্য নাই। নাবিক তর-পণ্য না পাওয়ায় [illegible] করিল না। তিনি আকাশপথে উত্তরণ করিলেন। রাজা বিম্বিসার [illegible] শুনিয়া নাবিককে ভর্ৎসনা করিয়া [illegible]গণের নিকট [illegible] পণ্য [illegible]য়ের প্রথা একেবারে রহিত করিয়া দিলেন।

(৩) তৃতীয়তঃ আজীবক সম্প্রদায়ের উপক নামক [illegible] ব্যক্তির সহিত বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎকার। যখন বুদ্ধদেব [illegible] যাইতেছিলেন, তখন উপক পথিমধ্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "[illegible]! আপনি কাহার শিষ্য? আপনার ধর্ম্ম কি?" ইত্যাদি [illegible]

(৪) বারাণসীতে ধর্ম্মচক্র[illegible]

(৫) কপিলবস্তুর রোহিণী নদীতীরে বুদ্ধদেবের [illegible]

সাক্ষাৎকার।

(৬) কোশলরাজ প্রসেনজিতের সাক্ষাৎকার।

(৭) রাজা বিম্বিসার বুদ্ধ ও তদীয় শিষ্যমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া বেণুবন প্রদান করেন।

(৮) শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডদ নামক বণিক জেতবন ক্রয় করিয়া বুদ্ধকে প্রদান করেন।

(৯) অনাথপিণ্ডদ ও তদীয় কন্যাগণ বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

(১০) সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ ও অগ্রশ্রাবক-পদ-প্রাপ্তি।

(১১) কশ্যপের অগ্নিহোত্রগৃহে বুদ্ধদেবের অলৌকিক ক্ষমতাপ্রকাশ।

(১২) এলাপত্র নাগের বৃত্তান্ত।

(১৩) [illegible] বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচার। ইত্যাদি।

[illegible] অসংখ্য চিত্র এই ফলকের উপর অঙ্কিত। প্রত্যেক ঘটনার নিম্নে [illegible] সেই ঘটনার পরিচায়ক এক একটি inscription পালি অক্ষরে উৎকীর্ণ

তাহার উৎকীর্ণ আছে। সর্ব্বসমেত ৪৩টি inscription দৃষ্ট হইল। এমন অনেক ঘটনা অঙ্কিত আছে, যাহার নিম্নে কোনও প্রকার inscription নাই।

ফলকখানির পৃষ্ঠদেশে লিখিত আছে যে, ইহা বিহারের দক্ষিণ পার্শ্বে লম্বমান করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা দ্বারা বোধ হয়, উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে যথাক্রমে এইরূপ আর তিনখানি ফলক লম্বমান ছিল। বস্তুতঃ, বুদ্ধের জীবনের সমগ্র ঘটনা এই ফলকে অঙ্কিত নাই। তিনি প্রচারক-ব্রত অবলম্বন করিবার পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের ঘটনামাত্র ইহাতে অঙ্কিত আছে। সম্ভবতঃ, তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ঘটনা অপর তিনখানি ফলকে অঙ্কিত ছিল। বহু অনুসন্ধান করিয়াও ঐ তিনখানি ফলক পাই নাই।

এই ফলকচতুষ্টয় অমূল্য পদার্থ। লামাগণ উহাকে "কোন্-ছোগ্" অর্থাৎ "দুর্লভ হইতেও দুর্লভ" বস্তু বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তিব্বতে অনেক পরিব্রাজক গমন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এরূপ চিত্রফলক কেহই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। গ্যাংচির পথ অতি দুর্গম। ইংরেজ সৈন্য ঐ পথ দিয়া গমন করায় উহার সন্নিহিত বিহারের দ্রব্যসমূহ উহাদের হস্তগত হয়। গ্যাংচির সন্নিহিত বিহারসমূহ অতি প্রাচীন। তিব্বতের প্রাচীন ও দুর্লভ বস্তুসমূহ উহাতেই সঞ্চিত ছিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

সহযোগী সাহিত্য।

ধৃতি ও স্মৃতি।

ইন্দ্রিয়ার্থের সান্নিধ্যবশতঃ যে সকল ক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহাদের উপরাগ (সেই সেই ক্রিয়ার অনুভূতি) আমাদের চিত্তে সংলগ্ন হইয়া থাকে। যে শক্তি দ্বারা চিত্তে অনুভূত ক্রিয়ার ছাপ বা উপরাগ সংলগ্ন হয়, চিত্তের সেই শক্তিকে ধৃতি বা ধারণাশক্তি কহে। স্মৃতিশক্তির যেরূপ ধৃতি বা ধারণা একটি অঙ্গ, সেইরূপ সেই ধৃত বিষয়ের পুনরায় প্রত্যাহ্বান বা আবিষ্কারও ইহার অন্যতর কার্য্য। ডাক্তার জন্ কেটার "সেঞ্চুরি ম্যাগাজিন" নামক সাময়িকপত্রে লিখিয়াছেন, ধৃতি ব্যক্তিকে দৃষ্ট ঘটনার যাবৎ-প্রতিমা-গ্রহণ অনুরূপ; সুতরাং ধৃতিকেই স্মৃতিশক্তির মূলস্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। অতিক্রান্ত ব্যাপারের উপরাগকে স্মৃতিপথে আলোকিত করিতে হইলে, প্রথমে এই সমস্ত উপরাগগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে হয়; বস্তুতঃ ভবিষ্যতে

[illegible] [illegible] তাহাদিগের পড়িয়া [illegible] অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে। যে উপায়ে এই [illegible] সম্পাদিত হয়, তাহাই এখন বিবেচ্য।

স্মৃতি বা ধারণা যে প্রণালীতে নির্দ্ধারিত হয়, তাহা বুঝিতে পারিলে দুই ঘটনার প্রক্রিয়া অঙ্কন কেমন করিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা বুঝা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। কোনও বাক্য বা কোনও চিত্র, বা কোনও বস্তুর উপরাগ মস্তিষ্কে উপস্থিত হইবামাত্র, মস্তিষ্ক কোষগুলির সন্নিবেশে পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের সহিত মোমের উপর অঙ্কিত মোহর বা ছাপের তুলনা হইতে পারে। ধাতুর উপাদানগত কোনও পরিবর্তন ঘটে না, কেবল তৎসংশ্লিষ্ট অণু সকলের সন্নিবেশের রূপান্তর ঘটে। এই বিস্তার ব্যাপার বালুকা-মুদ্রিত চরণ-চিহ্নের সহিতও তুলিত হইতে পারে। বালুকাকণাগুলি যাহার পর যাহা, তার পর তাহাই থাকে, অথচ পদচিহ্ন-গুলি ফুটাইয়া তুলে। স্থির জলের উপর দাঁড়ের দ্বারা ঘর্ষণ করিলে যেরূপ ব্যাপার ঘটে, উপরাগ মস্তিষ্কের উপাদানগত হইয়া তদ্রূপ ক্রিয়ার উৎপাদন করে। প্রথম দুই এক বার দাঁড়ের ঘর্ষণ দূরীভূত হইলে মনে হয়, জলের যেন কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই; কিন্তু পরবর্তী অবঘর্ষণ সকল এইরূপ ক্রিয়াশূন্য নহে; সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার অণু সকলের সমাবেশ আর পূর্ব্বের মত নাই। যদি এই সময় ঘর্ষণ বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে জল স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু [illegible] অবঘর্ষণে জলের আর সে স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকে না; তাহার স্থায়ী রূপান্তর ঘটে।

মস্তিষ্কের অণু সকলেরও এই গতি। একবার তাহাদিগের পূর্ব্ব শৃঙ্খলার বিপর্য্যয় ঘটিলে তাহারা আর পূর্ব্ব সমাবেশ প্রাপ্ত হয় না; রূপান্তরিত অবস্থাতেই অবস্থিতি করে। এই ভাব কখনই একবারে তিরোহিত হয় না। বারংবার যে ঘটনা ঘটে, তাহার অঙ্কন বা প্রতিকৃতি অধিকতর দৃঢ় হয়, এইমাত্র প্রভেদ। রূপান্তরের হিসাবে প্রথম প্রতিকৃতি বিনষ্ট হয় না; তাহার পর যতই পরিবর্তনস্রোত তাহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, ততই মস্তিষ্ক-কোষাণু সকলের সন্নিবেশ পরিবর্তিত হইতে থাকে।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, মস্তিষ্কের কোষ সংখ্যায় ৬০ কোটির ন্যূন ত নহে, বরং অধিক হইবে। একটি কোষ যদি একটি উপরাগ-ধারণের উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে ৬০ কোটি বিভিন্ন ধারণা, এ কি কম কথা? তার পর যদি ৬০ কোটি কোষের এক, দুই, বা ততোধিক ক্রমে permutation করা যায়, তাহা হইলে ধারণার আর কি সংখ্যা থাকে! মনে করুন, এক একটি কোষ যেন এক একটি অক্ষর। শব্দ শব্দের ভিতর প্রবেশ করিলেও এই অক্ষর আপনার অস্তিত্ব সর্ব্বদাই অক্ষত রাখে; শুধু শব্দ সব কেন, বিভিন্ন ভাষায় ইহা ব্যবহৃত হইলেও যে অক্ষর, সেই অক্ষর; হস্তে লিখিত কিংবা মুদ্রিত, [illegible] [illegible]; তা ছাড়া সর্ব্বত্রই ইহা আপনার স্বকীয়ত্ব অব্যাহত রাখে। যাহার সহিত সংযুক্ত হয়, তাহারই রূপান্তর সাধন করে, কিংবা তাহার দ্বারাই রূপান্তরিত হয়। অক্ষর সম্বন্ধে যেমন এই ব্যাপার, কোষ সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই।

সকলেই জানেন যে, আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালন মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থিত [illegible] ও স্নায়ুমণ্ডলের সম্মিলিত ক্রিয়া; যেমন যে কোষই ইহাতে লিপ্ত থাকে, তাহা [illegible]

তড়িৎবৎ প্রবাহ সকল ও গতি-সমুৎপাদক স্নায়ুতন্ত্র সকল এই অঙ্গসঞ্চালন ক্রিয়ার যোগদান করে। কিন্তু এই অঙ্গসঞ্চালন স্বতঃপ্রবর্ত্তিত বলিয়া বোধ হওয়ায় আমরা অনেক সময়ে অদ্ভুত যান্ত্রিক ব্যাপার আর ধারণার ভিতর আনি না। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, একটি মক্ষিকা তাহার পক্ষসঞ্চালনে সেকেণ্ডে দশ হইতে পনর হাজার বার পক্ষ স্পন্দিত করে; প্রত্যেক স্পন্দনই এক একটি স্নায়বিক কার্য্য। এখন মক্ষিকা যখন উড়িতে থাকে, তখন,—ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয় যে,—এই সময় কত স্নায়ুকোষ কিরূপ তড়িৎগতিতে কি কার্য্যই না করে!

অঙ্গ-সঞ্চালনের দিক হইতে না দেখিয়া যদি আমরা জ্ঞানের উৎপত্তির দিক হইতে দেখি, তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই? মনে করুন, আমরা একটি ঘড়ির দিকে চাহিতেছি। ঘড়ির আকার, আয়তন, উপাদান, সময়,—সমস্তই আমাদের চিত্তে উপরাগ উৎপন্ন করিতেছে; কিন্তু এই উপরাগ সকলের উৎপত্তি সুন্দর ভাবে শৃঙ্খলিত। যেটি যখন স্মরণ করিতে চাই, সেইটি তৎক্ষণাৎ যেন কোথা হইতে বাহির হইয়া আসে।

ঘটনাটি এই,—রেটিনা নামক পর্দ্দায় বাহ্যার্থের প্রতিবিম্ব পড়িয়া, তাহার সংবাদ, স্নায়ুতন্ত্র-যোগে মস্তিষ্কের দিকে ধাবমান হইয়া, চক্ষুস্পার্শ্বের ধাতু সকলকে আলোড়িত করিয়া, মস্তিষ্কের নিকট যখন সমুপস্থিত হয়, তখন তাহার উপর এমন সকল দাগ পড়িতে থাকে, যাহা ঘড়ি-আকৃতি—সময়ের তালিকার সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাপক। দর্শনেন্দ্রিয় সম্বন্ধে যেমন রূপ-দর্শন, শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে তদ্রূপ শব্দের উপলব্ধি। এইরূপ প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধে।

স্থূল কথা, বালুকার উপর যেমন পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়, সেইরূপ মস্তিষ্কের কোষাণু সকল বাহ্যার্থের প্রতিবিম্ব বহন করে। এই প্রতিবিম্ব সকল কেবল যে সেখানে অঙ্কিত থাকে, তাহা নহে; এমন ভাবে শৃঙ্খলিত হয় যে, যখন যেটি সম্পন্ন করা যায়, তখনই সেটি মানসপটে প্রতিফলিত হয়। আমাদের মস্তিষ্কে ৬০ কোটি কোষাণু এইরূপ নিরন্তর বাহ্যার্থের প্রতিবিম্ব বহন করিবার জন্য অবিরত নিয়োজিত হইয়া কিরূপ দ্রুতগতিতে এই প্রতিবিম্ব সমুৎপন্ন করে, মক্ষিকার পক্ষ-বিস্তারণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে রক্ত-সঞ্চালন যেমন দ্রুতগতিতে হওয়া আবশ্যক, তেমনি ইহার উপাদান সুপুষ্ট হওয়া চাই, অত্যধিক দ্রুতগতি যেমন বিঘ্নাত্মক, অতি ধীর গতিও সেইরূপ অনিষ্টকর। মস্তিষ্ক কোষের যথোচিত পরিপোষণ স্মৃতিশক্তির প্রাখর্য্যের একমাত্র হেতু।

কাবুলের আমীর।

“স্ট্র্যাণ্ড” নামক সাময়িকপত্রে মিষ্টার আর্থর হ্যামিল্টন কাবুলের বর্ত্তমান আমীর হবিবুল্লার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি নানারূপ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। তিনি বলেন, আমীর হবিবুল্লা পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সিংহাসন নিষ্কণ্টক নহে। ভূতপূর্ব্ব আমীরের মহিষীর অনুরোধ ও বীর ভ্রাতৃবর্গের দুর্ব্যবহারে তাঁহাকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। আমীর হবিবুল্লার পিতা দুর্দ্দান্ত ও প্রকৃতিপুঞ্জের অশ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সুতরাং তিনি প্রবল-

প্রতাপে ও নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান আমীর তাঁহার পিতার ন্যায় দৃঢ়চেতা ও গুণশালী নহেন। এ জন্য তিনি তাদৃশ নিপুণতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে পারিতেছেন না। আফগানিস্থানের অধিপতির রাজ্যগঠন ও রাজ্যশাসন এই উভয়বিধ শক্তি থাকা আবশ্যক। কিন্তু আমীর হবিবুল্লা এই উভয় প্রকার শক্তি যথাযথরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তিনি দুর্ব্বলচেতা, পুরোহিতগণের পরামর্শানুসারে ও স্বীয় ভ্রাতা সর্দ্দার নসিরুল্লা খাঁর মন্ত্রণায় পরিচালিত। নসিরুল্লাও লোকান্তরিত আমীরের পত্নী, সর্দ্দার উমার খাঁর জননী, বিবি হালিমা কাবুলের রাজপরিবারে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। এই কারণে আমীর হবিবুল্লাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইয়াছে। তিনি স্বীয় জননীর পদোচিত গৌরব ও সম্মানরক্ষার্থ এক দল রক্ষিসৈন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সেনাদল সর্ব্বদা বিবি হালিমার প্রাসাদ রক্ষা করিতেছে। প্রকারান্তরে, রাজমাতা একরূপ বন্দিনীর ভাবেই রহিয়াছেন।

কিন্তু সর্দ্দার নসিরুল্লার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির হ্রাস করা আমীরের পক্ষে সহজসাধ্য নহে আমীর স্বীয় প্রতাপশালী ভ্রাতার ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন না। ভারত গবর্মেণ্টের প্রেরিত 'ডেন মিশন' (কাবুল মিশন) কাবুল নগরে উপনীত হইবার পূর্ব্বে সর্দ্দার নসিরুল্লা খাঁ সালারী বা কাবুলের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু মিশন কাবুলে উপনীত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি 'ইৎউমাৎ-উদ্দৌলা' বা রাজ্যের স্তম্ভ এই উপাধি লাভ করেন। নসিরুল্লা রাজ্যের স্তম্ভরূপে পরিণত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি রাজ্যরক্ষাকল্পে কত দূর যত্ন করিবেন, সে বিষয়ে ঘোর সংশয় বিদ্যমান। নসিরুল্লার হৃদয়ে কাবুলের সিংহাসন-লাভের উচ্চাভিলাষ অঙ্কুরিত হইয়াছে। সুযোগ ও সুবিধা উপস্থিত হইলেই তিনি যে কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিরূপ কৌশলে ও কাহাদিগের সহায়তায় নসিরুল্লা স্বীয় সংকল্প সিদ্ধ করিবেন, তাহা তাঁহার বর্তমান কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া কিছুই অনুমান করা যায় না। কিন্তু এসিয়ার অন্যান্য রাজ্যের ন্যায়, আফগানিস্থানেও ঘটনাচক্র দ্রুততর বেগে আবর্তিত হইতেছে, সুতরাং এই ঘটনাবলীর প্রভাবে কাহার অধঃপতন ও কাহার উন্নতিলাভ ঘটিবে, তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। রাজপরিবারের ও তৎসংসৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের নানাবিধ চক্রান্তবশতঃ আমীর হবিবুল্লাকে অনেক সময় দারুণ অশান্তিতে কালযাপন করিতে হয়। বিবি হালিমাকে অষ্ট প্রহর প্রহরিপরিবেষ্টিত অন্তঃপুর-কারায় আবদ্ধ রাখিয়াও আমীর বাক্যডরের শান্তি নাই। রাজমাতা গুপ্তচারিণী ও প্রহরিপরিরক্ষিতা হইলেও, তিনি প্রখরবুদ্ধিশালিনী ও সহায়সম্পন্না। বন্দিনী অবস্থাতেও তিনি সর্ব্বদা রাজপরিবারে প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। আফগানিস্থানের রাজকার্য্যে রমণীদিগের প্রভাব অসামান্য। পারিবারিক প্রত্যেক কার্য্যে রমণীর প্রাধান্য বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কাবুলের রাজদরবারে রমণীদিগের যেরূপ প্রভাব দৃষ্ট হয়, তাহা পুরোহিতদিগের প্রাধান্য অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। পূর্ব্বে রাজকার্য্যে রমণীর একপ প্রাধান্য ছিল না। অধুনা ইহা বিশেষ প্রবল হইয়েছে।

হবিবুল্লা পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিবার পর হইতে কাবুলের রাজান্তঃপুরে নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পুরোহিতবর্গের উপদেশে ও পরামর্শে আমীর তিনটি পত্নীর সহিত বিবাহবন্ধন ছেদন করিয়াছেন। কোরাণে লিখিত আছে যে, কোনও ব্যক্তি চারিটির অধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কোরাণের এই উক্তি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত পুরোহিতেরা আমীরকে পত্নীত্যাগের পরামর্শ দেন। কিন্তু রাজান্তঃপুরে দিন দিন উপপত্নীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। বেগমদিগের পরিচর্য্যানিরতা রূপযৌবনসম্পন্না ক্রীতকিঙ্করীরা আমীরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া তাঁহার উপপত্নীর পদে উন্নীত হয়। কিন্তু এই সকল অভাগিনীর পরিণাম অনেক সময়েই অতীব শোচনীয় হইয়া থাকে। যে নারী রূপ যৌবন, রমণীজনসুলভ হাবভাব ও নৃত্যগীতনৈপুণ্যে আমীরের চিত্তহরণ করে, তাহাদিগকে অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইতে হয়।

পুরোহিতদিগের কৃপাবাহুল্যে চারিটি পত্নী এখন আমীর বাহাদুরের অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন।—(১) ইনায়েতুল্লার জননী (২) হায়েতুল্লার মাতা, (৩) উলিয়াজানকা (ইউসুফ খাঁ সরকাজির কন্যা; ইনিই পূর্ব্বে আমীরের প্রিয়তমা বেগম ছিলেন, ইঁহার গর্ভে একটি কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে), (৪) কবীরজানের মাতা। শেষোক্ত বেগমই উলিয়াজানকা বেগমের স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইনিই এখন আমীর বাহাদুরের প্রিয়তমা বেগম। উলিয়াজানকা বিশেষ গুণবতী। অন্তঃপুরবাসিনীদিগের নিকট ইনি হিন্দুস্থানী বেগম নামে পরিচিতা। শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যের প্রভাবে ইনি অবরোধমধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকালে উলিয়া ভারতবর্ষের কোনও বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন। এ জন্ত সঙ্গীতকলায় ইনি পারদর্শিতালাভ করিয়াছিলেন। উলিয়া পিয়ানো বাজাইয়া গান করিতে পারেন। তিনি আফগান পতি, আফগান জাতি ও আফগানিস্থানের অনুরাগিণী নহেন। দৈবক্রমে আমীর বাহাদুরের নিকট উলিয়াজানিকা বেগমের মনোভাব প্রকাশিত হওয়ায় আমীর তাঁহার প্রতি বিরূপ হন।

যে রমণী সম্প্রতি রাজঅবরোধে প্রধানা বেগমের পদ অধিকার করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে পরিচারিকা ছিলেন। ইউসুফ খাঁর কন্যার ন্যায় তিনি গুণবতী নহেন। এই রমণী দুর্দ্দান্তপ্রকৃতি, অদম্যপ্রবৃত্তিসম্পন্না, গর্ব্বদৃপ্তা ও প্রভুত্বপ্রয়াসিনী। তিনি স্বহস্তে তিনটি বাঁদীর প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। পরিচারিকাদিগের মধ্যে কেহ কোনও অপরাধ করিলে এই নিষ্ঠুর বেগম স্বয়ং তাহাদিগকে প্রহার করেন। যে সকল বাঁদী ভবিষ্যতে আমীরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে পারে বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মে, তিনি তাহাদিগের অঙ্গহানি সাধন করিয়া থাকেন। আমীরের উপর এই বেগমের প্রভাব অসীম। তিনি নৃত্যগীত দ্বারা আমীরের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তিনি কালিমা বিবির ন্যায় মেধাবিনী ও হিন্দুস্থানী বেগমের ন্যায় রমণীজনোচিত কোমলতা গুণে ভূষিতা নহেন। আমীরের এই বেগম-চতুষ্টয় পদমর্য্যাদানুসারে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমীরের প্রথমা পত্নী কবীরজানের মাতা বার্ষিক এক লক্ষ মুদ্রা, দ্বিতীয়া বেগম উলিয়াজানকা আশী হাজার টাকা, তৃতীয়া বেগম হায়েতুল্লার জননী চল্লিশ সহস্র মুদ্রা ও সর্ব্বকনিষ্ঠা পত্নী বার্ষিক কুড়ি হাজার টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এক সময়ে সর্দ্দার মহম্মদ উমার খাঁর জননী বিবি হালিমা আমীরের দরবারে চীনের রাজমাতা ও কোরিয়ার রাজমহিষীর স্থায় প্রতিপত্তি ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় পুত্রকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অসমসাহসিকতা প্রকাশ করাতেই তিনি এক্ষণে বন্দিনীর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। হালিমা বিবির পুত্র জননীর ন্যায় উৎসাহশীল ও সাহসী নহেন। এই কারণে তিনি মাতার সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারে নৃপতির প্রথমা বেগমের গর্ভজাত পুত্রই পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইয়া থাকেন। তবে যিনি বলে ও কৌশলে রাজসিংহাসন অধিকার করেন, লোকে তাঁহাকেও রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। রাজ্যের উত্তরাধিকারী তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও, পিতার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া, তাঁহার সিংহাসনপ্রাপ্তির বিষয়ে কোনও প্রতিবন্ধক হয় না।

কাবুলের বর্ত্তমান আমীর হবিবুল্লা খাঁ ভূতপূর্ব্ব আমীর আবদর রহমানের বিবাহিতা গুবরেজ নাম্নী বাঁদীর গর্ভসম্ভূত পুত্র। কিন্তু তিনি উত্তরাধিকারসংক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে আফগানিস্থানের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। আমীরের অন্যতমা পরিণীতা পত্নী বিবি হালিমা, আমীর দোস্তমহম্মদের বংশপ্রসূতা বলিয়া রাজসিংহাসন-প্রাপ্তির দাবী করিয়া থাকেন। ইনি যে রাজবংশসম্ভূতা, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যদি এই রমণী কোনও প্রকারে স্বাধীনতালাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে বিবি হালিমা স্বীয় পুত্র সর্দ্দার ওমার খাঁকে যে অবিলম্বে ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করিবেন, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। যদি ওমার খাঁ বিদ্রোহাচরণে সাফল্যলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার দাবী তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও আমীরের সহোদর সর্দ্দার নসিরুল্লা খাঁর দাবীর অপেক্ষা উপেক্ষণীয় হইবে না। স্বর্গীয় আমীর আবদর রহমানের পুত্রত্রয়ের মধ্যে বয়ঃক্রমের বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে হবিবুল্লার এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নসিরুল্লার জন্ম হয়। মহম্মদ ওমার খাঁ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার সহিত তদীয় অগ্রজদ্বয়ের বয়ঃক্রমগত পার্থক্য অনেক অধিক। বর্ত্তমান আমীরের উত্তরাধিকারী ইনায়েতুল্লা ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার সহিত তাঁহার খুল্লতাত বিবি হালিমার পুত্রের বয়সের প্রভেদ ১৮ মাস মাত্র।

ভবিষ্যতে কাবুলের রাজনীতিক্ষেত্রে এই কিশোরবয়স্ক খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে রাজসিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্ব হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। উভয়েই কিশোরবয়স্ক। কালসহকারে যদি ইঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবের সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে আমীর হবিবুল্লার চেষ্টা ব্যতীত তদীয় পুত্র ইনায়েতুল্লা কখনও নিষ্কণ্টকে সিংহাসনারোহণে সমর্থ হইবেন না। কিন্তু আমীর স্বীয় পুত্র ইনায়েতুল্লাকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়া রাজদরবারে স্থান-প্রদান ও তৃতীয়া বেগমের গর্ভজাত পুত্র হায়েতুল্লাকে (ইনি ১৮৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জননী বদক্সান প্রদেশ হইতে ক্রীতা কিঙ্করী) বদক্সানের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় পারিবারিক সমস্যা জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। এ দিকে বিবি হালিমার পুত্র ওমার খাঁকে কোনও সম্মানের পদে উন্নীত করা হয় নাই। তিনিও জননীর ন্যায় এক প্রকার নজরবন্দী অবস্থায়

কালাতিপাত করিতেছেন। এই সকল ঘটনা হইতে অনুমিত হয় যে, কাবুলের রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ঘোরতর গৃহবিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে।

বৌদ্ধলামার শিরস্ত্রাণ

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায়বাহাদুর বৌদ্ধ-গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির সাংবৎসরিক অধিবেশনে তিব্বতীয় লামাদিগের 'পাল্‌সা' বা শিরস্ত্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি বিবরগুণে চিত্তাকর্ষক ও নানারূপ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। রায় বাহাদুর বলেন ;—

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহাত্মা অতিশের (শ্রীজ্ঞানদীপঙ্করের) জনৈক প্রসিদ্ধ শিষ্য তাঁহার জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করেন। মগধের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তৎকালে কিরূপ টুপি পরিধান করিতেন, অতিশের উক্ত জীবনবৃত্তান্তে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশীলা নামক রাজকীয় মঠে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের একটি মহাসভার অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে তিব্বত রাজদূত নাগটাহো লচাড়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি মগধের তদনীন্তন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত স্থবির রত্নাকরের নিকট সংস্কৃত শিখিবার জন্য তখন মগধে অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত তিব্বতীয় রাজদূত এই মহা অধিবেশনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাহার এক স্থলে লিখিত আছে, উপাসনাকালে বৌদ্ধপণ্ডিতমণ্ডলী টুপি বা উষ্ণীষ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য কাহারও মুখে গর্ব্ব বা অহঙ্কারের চিহ্ন প্রকটিত হয় নাই। (অতিশাই নামথর, ২২ পৃষ্ঠা)।

বৌদ্ধমঠে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়, এ কথা সকলেই হয় ত অবগত আছেন। ভগবানের চরণে সংসারের সমস্ত ভোগবিলাস উৎসর্গ করিবার ইহাই প্রথম ও প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কেশ মস্তকের স্বাভাবিক ভূষণ। এ জন্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা প্রথমেই মস্তক মুণ্ডিত করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেবের অনুশাসন অনুসারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের কোনরূপ শিরস্ত্রাণ-ধারণে অধিকার নাই। তবে কেন উত্তরপ্রদেশস্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎসব দিবসে ও উপাসনাকালেও মস্তকাবরণ ধারণ করেন? বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই! সত্য বটে যে, মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণ ধর্ম্মের অনুশাসনপালনে কিছু উদার, তাঁহারা হীনযানপন্থী বৌদ্ধগণের ন্যায় সুবর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার ব্যবহার দোষাবহ বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু কোনও সম্প্রদায়ের কোনও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীই কখনও টুপি ব্যবহার করেন না। শাস্ত্রানুসারে শিরস্ত্রাণের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ধর্ম্মসংক্রান্ত কোনও অনুষ্ঠানকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মস্তক, বাহু ও পদতল অনাবৃত রাখিতে শাস্ত্রানুসারে বাধ্য। তাসিলাম্পো নামক বৌদ্ধমঠে অবস্থানকালে আমি বহুবার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের উষাকালীন উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলাম। রজনীশেষে প্রায় চারি ঘটিকার সময় বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। তখন শীতাধিক্যবশতঃ তাপমান যন্ত্রের পারদ ২২ ডিগ্রীরও নিম্নে নামিয়া যাইত। কিন্তু তত শীতেও প্রত্যেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্ম্মমন্দিরের বহির্দ্দেশে পাদুকা ত্যাগ

পূর্ব্বক নগ্নপদে পরিভ্রমণ করিতেন। শীতনিবারণের জন্য তাঁহারা পশমনির্ম্মিত আঙ্গরাখা পরিধান করিতেন বটে, কিন্তু সকলেরই বাহু অনাবৃত থাকিত। প্রধান পুরোহিত বেদীর উপর আসন পরিগ্রহ করিবামাত্র সন্ন্যাসীরা কোণাকৃতি সুদীর্ঘ মস্তকাবরণ পরিধান করিতেন। আমি এই অপূর্ব্ব রীতির উৎপত্তি বিষয়ে কারণানুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কোনও সন্ন্যাসীই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই।

আমি প্রথমতঃ ভাবিয়াছিলাম যে, শীতাধিক্যবশতঃ বুঝি সন্ন্যাসীরা নিবিড় টুপি ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বিগত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে আমি পিকিনের বহুবিধ বৌদ্ধমঠ পরিদর্শন করিয়াছিলাম। তথায় প্রাচীনমতাবলম্বী মহাযানপন্থী বহুসংখ্যক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। তত্রত্য অন্যান্য বৌদ্ধমঠের সন্ন্যাসীদিগের অপেক্ষা তাঁহারা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। হোসাঙ্গ সন্ন্যাসীরা (চীনদেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) অনাবৃত-মস্তকে উপাসনা করিয়া থাকেন। তথায় শীত অত্যন্ত প্রখর। কিন্তু তথাপি কোনও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপাসনাকালে মস্তকাবরণ ব্যবহার করেন না। অতঃপর আমি বৌদ্ধধর্ম্মের অনু-শীলনার্থ শ্যামদেশ ও সিংহলে গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি কোথাও উপাসনাকালে কোনও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে টুপি পরিতে দেখি নাই। তাঁহারা আমায় বলিয়াছিলেন যে, কোনও ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎসবদিবসে বা উপাসনাকালে তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে মস্তকাবরণ ধারণের ব্যবস্থা নাই। এমন কি, মস্তকে কোন্‌ও প্রকার পরিচ্ছদ কেশও বৌদ্ধ ধর্ম্মানুশাসনের অনুমোদিত নহে।

আমি তিব্বতীয় ভাষার অভিধান সঙ্কলনকালে বহুতর প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম। উক্ত পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে অতিশাই নামধর নামক গ্রন্থে প্রথম 'পান্‌সা' বা পণ্ডিতের টুপি ধারণ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ অতিশ তিব্বত-যাত্রাকালে মস্তকে টুপি পরিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম তিব্বতীয় লামাদিগের মধ্যে মস্তকাবরণ ধারণ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত করেন। "প্যাগ্‌সাংজন্‌জাং' নামক তিব্বতীয় গ্রন্থে পণ্ডিতদিগের শিরস্ত্রাণ-ধারণের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ভারতবর্ষ ও তিব্বতের প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ। এই গ্রন্থের এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চিটাগাঁও (বর্ত্তমান চট্টগ্রাম) নগরের পণ্ডিতবিহার নামক বৌদ্ধমঠে জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিতের কোন বৃদ্ধা রমণীর সহিত ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে বাগ্‌যুদ্ধ হইতেছিল। সেই সময়ে উক্ত পণ্ডিতের মস্তকে একটি কোণাকৃতি দীর্ঘ টুপি ছিল। তিনি তর্কে জয়লাভ করিলেন। সেই অবধি দীর্ঘাকৃতি শিরস্ত্রাণ বা টুপি ধারণের প্রথা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইল।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়াছিল। ট্টিলোপা পণ্ডিত তখন চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মঠের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। অতিশের শিক্ষক নারোপা তাঁহার নিকট ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করেন। চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এখনও সম্পূর্ণ হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। আমি পণ্ডিতবিহার মঠের স্থাননির্দ্দেশ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া-ছিলাম, কিন্তু উক্ত মঠ কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহার আবিষ্কার করিতে পারি নাই

চট্টগ্রামের দশ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে পাহাড়তলী নামে একটি স্থান আছে। তথায় মহামুনি নামে একটি বৌদ্ধমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। আমি মন্দিরটি পরিদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু বিহার বা মঠের কোনও নিদর্শন তথায় দেখিতে পাই নাই। মন্দিরমধ্যে মৃত্তিকানির্ম্মিত একটি বৃহৎ বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ আধুনিক ও শিল্পসুষমা-বর্জ্জিত। বর্ত্তমান চট্টগ্রাম নগরে একটি অতি প্রাচীন মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদটি প্রাচীন বিহার মঠের ধ্বংসাবশেষের উপর মুসলমান জেতৃগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া আমার সন্দেহ হইত। কারণ, তৎকালে মুসলমান জেতৃগণ আপন প্রতাপ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিজিতদিগের ধর্ম্মমন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপর মসজিদ নির্ম্মাণ করিতেন। সুতরাং বৌদ্ধদিগের এই ধর্ম্মমন্দির ধ্বংস করিয়া মুসলমান জেতারা মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। গত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পবলিক্‌ওয়ার্কস বিভাগের কর্ম্মচারীরা চট্টগ্রামের অদূরবর্ত্তী একটি পাহাড়ের উন্নত ভূমি সমতল করিবার সময় একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত করেন। মূর্ত্তিটি প্রায় চারি ফুট উচ্চ হইবে। সাধারণ বুদ্ধপ্রতিমূর্ত্তির ন্যায় এই মূর্ত্তি ও উপবেশনাবস্থায় নির্ম্মিত। মূর্ত্তিটি তিনটি স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড হইতে ক্ষোদিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইহার প্রথমার্দ্ধ অর্থাৎ মস্তকের শীর্ষভাগ পাওয়া যায় নাই। মূর্ত্তির মুখমণ্ডল এখনও অবিকৃত অবস্থায় আছে। কেবল নাসিকার অগ্রভাগ যেন কিছু বিকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই মূর্ত্তিটি সম্ভবতঃ পাথর-ঘাটার শিলাখণ্ড হইতে কোনও আরাকাণী শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমার মতে, এই বৌদ্ধমূর্ত্তি বিহার মঠ হইতে অপহৃত করিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সন্নিহিত পাহাড়ে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য তাহারা অতি ব্যস্ত-ভাবে পলায়ন করিয়াছিল, সুতরাং এই সুবৃহৎ মূর্ত্তিটিকে সুদূর পর্ব্বতাশ্রয়ে বহন করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই। পণ্ডিতের শিরস্ত্রাণ সম্বন্ধে আমি চট্টগ্রামের প্রাচীন বৌদ্ধদিগের নিকট অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমায় বলিয়াছিলেন, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শিক্ষাপ্রণালী চট্টগ্রামে প্রবেশলাভ করিবার পর হইতে আর কেহ টুপি পরিধান করেন না। তদবধি উক্ত প্রথা চট্টগ্রাম হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।

তিব্বতীয় ঐতিহাসিকেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, বিগত খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রবর্ত্তিত হয়। তখন তিব্বতে খিস্রং ডিউটসান রাজত্ব করিতেন। উক্ত সম্রাট মগধের নালন্দামঠ হইতে বৌদ্ধগুরু শান্তিরক্ষিতকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। শান্তিরক্ষিত তিব্বতের প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টার কার্য্য ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থাদির তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিতেন।

তিব্বতে শান্তিরক্ষিতের নাম বোধিসত্ব। স্বীয় পবিত্র চরিত্র ও সদাচারের জন্য শান্তি-রক্ষিত উক্ত নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের জাহর প্রদেশের রাজপুত্র। জ্ঞানগর্ভ তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মগ্রন্থের তিনি এক জন উপদেষ্টা ছিলেন। মাধ্যমিক যোগাচার্য্য আশ্রমের তিনি এক জন শিষ্য। তাঁহারই আদেশানুসারে তিব্বতরাজ উদ্যানের (বর্ত্তমান কাবুল) তান্ত্রিক মতের প্রচারককে তিব্বতে

লইয়া যান। এই তান্ত্রিকের নাম পদ্মসম্ভব; পদ্মসম্ভব মস্তকে টুপি ব্যবহার করিতেন। এই টুপিই তিব্বতীয় পণ্ডিতদিগের ব্যবহৃত 'পাদুসা' বা পদ্ম টুপি। অধুনা প্রত্যেক লামা এইরূপ শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কথিত আছে, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম তিব্বতীয় রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ও, নিম্নশ্রেণীর নরনারীর নির্ব্বাণপন্থা-অবলম্বন করিবার উপযোগী হইবে বলিয়াই উহা তিব্বতে প্রবর্ত্তিত হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম অতি সহজে রাজপরিবারকে নির্ব্বাণপন্থা দেখাইয়া দেয়। উক্তমতাবলম্বী সন্ন্যাসীরা উপসনাকালে মস্তকে রত্নখচিত শিরস্ত্রাণ ধারণ করেন, এবং রমণীরা রত্নালঙ্কার পরিধান করিয়া থাকেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

উদ্বোধন। বৈশাখ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের "শ্রীশ্রীরামানুজচরিত" ও স্বামী অখণ্ডানন্দের "তিব্বতে তিন বৎসর" চলিতেছে। শ্রীযুক্ত ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ইতর জন্তুদিগের মানসিক বৃত্তি" উল্লেখযোগ্য সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। লেখকের ভাষায় এখনও জড়তা আছে। "মনোবৃত্তি"ই কি পর্য্যাপ্ত নয়? আবার "মানসিক বৃত্তি" কেন? শ্রীম—র "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি "হিত' মনোহারি চ"; তাহা বহুবার বলিয়াছি, আর না বলিলেও চলে।

বঙ্গদর্শন। বৈশাখ। বঙ্গদর্শনের মোট পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মধ্যে সাড়ে ছাব্বিশ পৃষ্ঠা সম্পাদক রবীন্দ্র বাবু স্বয়ং অধিকার করিয়াছেন। বামন ঠাকুর তিন পদক্ষেপে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। সম্পাদক ঠাকুর "নৌকাডুবি" ও "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে" একখানি মাসিকের অর্দ্ধেক ব্যাপ্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু "সম্ভাষণে" বলিতেছেন,—"বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদ্ আপনার আলোচ্যবিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট নিবেদন এই যে, এই আলোচনা-ব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন্। তাহা হইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানার চর্চ্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চ্চার অঙ্গ। বাংলাদেশে এমন জিলা নাই, যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্ত-সংগ্রহে ইঁহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায়, তবে সাহিত্যপরিষদ্ সার্থকতালাভ করিবেন। * * * বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্যপরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণসংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।" * * * ইত্যাদি রবীন্দ্রবাবুর এই সাধু প্রস্তাব "ইঁদুরের পরামর্শে" পরিণত না হইলেই আমরা সুখী হইব। এরূপ অনুষ্ঠানে, যিনি বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে সক্ষম, এমন এক জন "নায়ক" আবশ্যক।

দেশে ছাত্রের অভাব নাই, ছাত্রমণ্ডলেও কাজ করিবার ইচ্ছা বা শক্তির অসদ্ভাব নাই। সেই তরুণ শক্তিকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যে শক্তি ও নিপুণতা আবশ্যক, বঙ্গদেশে সচরাচর তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যে নেতৃত্বে যে আদর্শে ছাত্রসম্প্রদায় অনুপ্রাণিত হইবে,—নিষ্কাম কর্ম্মে ব্রতী হইবে, সে আদর্শ নির্জ্জীব সভায় সম্ভবে না। সে জন্য মনুষ্যত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব চাই। পরিষৎ সভা ডাকিতে পারেন, নেতা যোগাইতে পারিবেন কি? রবীন্দ্র বাবু স্বয়ং অগ্রসর হইলে ভাল হয়। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "ভট্টাচার্য্য মহাশয়" একটি সুন্দর আলেখ্য। "সিপাহী বিদ্রোহের কিছু দিন পূর্ব্বে নবদ্বীপের স্বনামপদ শিরোমণি মহাশয় প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন। * * * পূর্ব্বরাত্রি গৌরীপুর গ্রামে কুটুম্ব-গৃহে যাপন করিয়া প্রত্যূষে তিনি আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সঙ্গে এক জন মাত্র ভারবাহী, খড়ি নদীর ধারে পৌঁছিতে বেলা প্রহর উত্তীর্ণ হইল। রাজপুরের ঘাটের উপর ক্ষুদ্র আম্রবাটিকা দেখিয়া তিনি বিশ্রাম ও স্নানাদির জন্য উপবেশন করিলেন। * * * মাধব পেটারি হইতে ডাবা হুঁকা বাহির করিয়া তাহাতে জল পুরিল এবং এক ছিলিম তামাক সাজিয়া প্রভুকে সেবন করিতে দিবার পূর্ব্বে নল প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে একটি আম্রশাখা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইল। শিরোমণি ইহা নিবারণ করিলেন। তন্ময় হইয়া তিনি প্রস্ফুটিত মুকুলস্তবকের শোভা এবং তাহাতে প্রমত্ত মধুপকুলের সঞ্চরণ লক্ষ্য করিতেছিলেন। * * * এমন সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক নদীর অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইল। * * * ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখিয়া সহজেই তাহারা সঙ্কুচিত হইল এবং উত্তপ্ত নদীসৈকত ভাঙ্গিয়া দূরের ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিয়া শিরোমণি কিছু ব্যস্ত হইলেন। মাধব দাস প্রভুর নির্দ্দেশমত ছুটিয়া আসিল, এবং বলিয়া গেল, 'মাসকল, ঠাকুর ইচ্ছা করেন এইখানেই তোমরা চান কর, তিনি আড়ালে যাচ্চেন।' তখন শিরোমণি পেটারি ও বস্ত্রাদি সেইখানে রাখিয়া মাধবদাস সঙ্গে মেয়েদের দৃষ্টিপথবহির্ভূত হইয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া তাহারা পূর্ণকুম্ভকক্ষে ঘাট হইতে উঠিল, কিন্তু চলিয়া না গিয়া ঠাকুরের দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইল। ইহা লক্ষ্য করিয়া ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন, সম্ভবতঃ মেয়েগুলি তাঁহার দ্রব্যাদি অরক্ষিতাবস্থায় ফেলিয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছে। কাজেই তাঁহাকে সেখানে ফিরিতে হইল। * * * প্রৌঢ়া দুই জন কক্ষের কলস হইতে কিছু কিছু জল মাটীতে ফেলিয়া তাহার উপর পূর্ণকুম্ভ দুইটি রাখিল এবং ঠাকুরকে গলবস্ত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তখন উভয়েই করজোড়ে প্রার্থনা করিল, আজ মধ্যাহ্নে তাঁহাকে তাহাদের গৃহে পদধূলি দিতে হইবে। শিরোমণির পথে বিলম্ব করিবার উপায় ছিল না। তিনি মহিলাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।" ব্রাহ্মণ কথাপ্রসঙ্গে প্রৌঢ়াদ্বয়ের প্রমুখাৎ অবগত হইলেন, "গ্রাম, আধ ক্রোশ হাঁটিয়া প্রত্যহ দুইটি বেলা, পানীয়জলসংগ্রহার্থ এইখানে সকলকে আসিতে হয়। কেন না, গ্রামের প্রাচীন দীর্ঘিকা ফাল্গুন মাসেই শুকাইয়া গিয়াছে, এবং দুই বৎসর হইতে গ্রামের ব্রাহ্মণ জমীদারদের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তাঁহারা কোন প্রতিকার করিতে পারেন না, তাঁহাদের মেয়ে ছেলেরা পর্য্যন্ত প্রত্যূষে এখানে আসিয়া স্নানাদি করিয়া যান। রাজপুরে বড় ২।৪টা ডোবা আছে, নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রামগুলিতে তাহাও নাই। অতঃপর না

খোকাদের মুখে জলকষ্টের এই কাহিনী শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ করুণার্দ্র হইলেন। * * * মহিলারা চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য্য সায়াহ্নিক শেষ করিলেন, এমন সময় ঢুলের ঢকাধ্বনির ক্রমশঃ নিকটতর হইল। তখন গাজনের সন্ন্যাসীরা দলে দলে বেত্র-দণ্ডহস্তে নাচিতে নাচিতে নদীতীরে আসিয়া পৌঁছিল। * * * সন্ন্যাসীদের তিনি (শিরোমণি) নিকটে ডাকাইলেন। প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, রাজপুরের মাঠে, গ্রামের অদূরে অথচ বাহিরে যে পরিষ্কার ভূমিখণ্ড আছে, তথায় একটি দীঘি কাটাইয়া দিলে ৫।৭ খানি গ্রামের লোকে জল খাইয়া বাঁচিতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে সেই ভূমিখণ্ড যাহার লাখেরাজ সম্পত্তি, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসিদলে উপস্থিত ছিল। পঞ্চাশ টাকা মূল্যে সে জমীটুকু ছাড়িয়া দিতে রাজি হইল। হিসাব করিয়া শিরোমণি মহাশয় দেখিলেন, ন্যূনাধিক দেড় সহস্র মুদ্রায় কার্য্যটি সম্পন্ন হইবে।" তাহার পর শিরোমণি মহাশয় "পেটারি হইতে তুলট কাগজ ও লেখনী বাহির করিলেন, মাধব লাক্ষারসে কালী প্রস্তুত করিয়া দিল।" পাঠক কি মনে করিতেছেন, শিরোমণি মহাশয় এই জলকষ্টের দারুণ কাহিনী "বঙ্গবাসী" পত্রে পাঠাইবার জন্য তদ্দণ্ডে সেই নদীতীরে প্রবন্ধ লিখিতে বসিলেন? তা নয়, সেই দরিদ্র করুণাবতার হৃদয়-বাণীর পরামর্শে অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। আজ কাল সে পথে পরোপকার করিবার প্রথা নাই। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালার পল্লীতে সে পুণ্য প্রথা বিদ্যমান ছিল। হায় সেকাল! এখন গ্রন্থকারের ভাষায় 'গল্পের শেষ' শুনুন,—"পেটারির ভিতর ক্ষুদ্র কাঠের বাক্সে স্বর্ণরৌপ্য মুদ্রায় প্রায় দেড় হাজার টাকাই এবার শিরোমণি মহাশয় জমা করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল, সেই অর্থে গৃহিণীর নিকট বহুদিনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা অর্থাৎ সস্ত্রীক তীর্থদর্শন এবং ভবিষ্যতের অন্নসংস্থানের জন্য একটী ভাল জোৎ খরিদ করিবেন। কিন্তু সে কথা আর মনে ঠাঁই দিলেন না। গণিয়া টাকাগুলি পঞ্চাইতের প্রধান ব্যক্তির হাতে দিলেন, এবং প্রয়োজন হইলে আরও সাহায্য পঠাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।" * * * "ইহার তিন বৎসর পরে জমীদার মহাশয়েরা নূতন দীর্ঘিকার চারিটি রোহিতমৎস্য ধরাইয়া শিরোমণি মহাশয়কে উপহার দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বাহকটিকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া মৎস্যের মূল্যস্বরূপ কয়েকটি মুদ্রা তাহার সঙ্গে ফেরত পাঠাইলেন, এবং বলিয়া দিলেন, উহা পুষ্করিণীর সংস্কার কার্য্যে ব্যয় হইবে। রাজপুর গ্রামে আজও সেই পুষ্করিণী আছে, তাহা 'ভট্টাচার্য্য পুকুর' বলিয়াই খ্যাত।" শ্রীশবাবু নিপুণহস্তে দিব্য তুলিকায় এই পুণ্য অবদানের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণে" ও শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "রঘুবংশ" প্রবন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বিনয় ও সাবধানতার পরিচয় দিয়াছেন। "রঘুবংশের দিলীপের উপাখ্যানের মূল কোথায়," উভয় অধ্যাপকই তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত, কিন্তু কেহই 'সাহস করিয়া' কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সুতরাং আমরা নাচার। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ত্রিবঙ্কুর" সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "প্রাচ্য সভ্যনিষ্ঠা"র প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

স্থানাভাবে অন্যান্য মাসিকের সমালোচনা এবার প্রকাশিত হইল না।

জাপানী চিত্রকরের চিত্রশালা।

হং কং।

যে দিন প্রথমে হংকংএ নামি, সেই দিনই এই চিত্রশালাটি দেখিয়াছিলাম। সে চিত্র-গৃহের রাস্তার ধারের দেয়ালটি, আলো যাইবে বলিয়া, কেবল শার্সিতে গঠিত,—রাস্তা হইতেই ভিতরকার ছবিগুলি সব দেখা যায়। কত লোক পথ চলিতে চলিতে বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া ছবি দেখে। আমার সেখান হইতে দেখিয়া আশা মিটিল না। পতঙ্গ যেমন আলো দেখিলে অনন্যগতি হইয়া তাহাতেই আকৃষ্ট হয়, আমিও সেইরূপ হইলাম।

চিত্রকর তখন সমাপ্তপ্রায় একটি ছবিতে নিবিষ্টচিত্তে তুলি বুলাইতে-ছিলেন। আর কতকগুলি চীনেম্যানও চিত্রকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। আমি ভিতরে যাইবামাত্রই চিত্রকর উঠিলেন। বোধ হয়, মনে করিলেন, ক্রেতা আসিয়াছে। ক্ষীণদেহ যুবাপুরুষ, ঢলঢলে চিত্র বিচিত্র পোষাক পরা। মাথার চুলগুলি বড় বড় ও সিঁথাকাটা, কতকটা আমারই চুলের মত। সাধারণ জাপানীরা এত বড় চুলও রাখে না; এমন সিঁথিও কাটে না। বোধ হয়, কেবল চিত্রকরেরই এই দস্তুর। তিনি মিষ্ট সুরে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"Good morning!" চিত্রকরের গলার মিষ্ট সুর শুনিয়া ও তাঁহার অভিবাদনের হাবভাব দেখিয়া আমি তখনই বুঝিলাম, ইনি আমাকে দয়ার চক্ষে দেখি[illegible]ন।

আমি প্র[illegible]ই বলিলাম,—"[illegible]মি কিনিতে আসি নাই। সুন্দর সুন্দর চিত্র[illegible] বাহির[illegible] [illegible] মিটিল না বলিয়া নিকটে দেখিতে আসি-লাম।" সোজা[illegible] তিনি একমুখ হাসিয়া বলিলেন, "বেশ করেছেন শুভাগমন ক[illegible]" ("quite well come!") জাহাজে ছাড়া শিক্ষিত জাপানীর সঙ্গে ক[illegible] আমার প্রথম। আমার প্রত্যেক প্রশ্নের তিনি সযত্নে উত্তর দিতে [illegible]লিলে[illegible]. বর্ম্মা ও চীনদেশে অনেক ইংরাজী-জানা লোকের সঙ্গে কথা কহিয়াছি; এমন সরল সুস্পষ্ট উত্তর কোথাও শুনি নাই। ঠিক যেন আমার মনের কথা বুঝিয়া লয়েন, এবং তাহার যথাযথ উত্তর দেন। সৌন্দর্য্য-জ্ঞান আছে বলিয়া তাঁহার সেই উত্তরগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী বলিয়া মনে হইল।

যে দিকটি প্রথমে দেখিলাম, সে দিকটিতে সবই চীনা ও জাপানী চিত্র। জাপান দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ও জাপানী গার্হস্থ্যজীবনের আলেখ্য। সে সব চিত্র দেখিলে অনেকাংশে জাপান দেখার কাজ হয়। আমার এই কয়খানি ছবি দেখিয়া ও চিত্রকরের মুখে তাহার বৃত্তান্ত শুনিয়া কত যে শিক্ষা হইল, তাহা বলিবার নয়। কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাইলে যেমন তাহার লোভ বাড়িয়া যায়, আমারও সেইরূপ হইল। যে কয় দিন হংকংএ ছিলাম, শেষদিন ছাড়া প্রত্যহই সেই চিত্রশালায় যাইতাম। প্রত্যহই তিনি চিত্র দেখাইতেন, এবং কতকক্ষণ ধরিয়া বুঝাইয়া দিতেন। আমি সাহেব নহি, হিন্দু, এ কথা শুনিয়া তাঁহার আত্মীয়তা আরও বাড়িয়া গেল। শিক্ষিত জাপানীরা ভারতবাসীকে এমনই স্নেহ ও সম্মান করেন। ভারতবর্ষ তাঁহাদের মনে অতি পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়।

দরজার সম্মুখের ছবিখানিতে দেখিলাম, একটি বৌদ্ধমন্দিরের প্রাঙ্গনে অনেকগুলি হরিণশিশু নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। শুনিলাম, নিরামিষভোজী প্রাণিহিংসাবিরহিত জাপান দেশে এরূপ যথার্থই দেখা যায়। কল্পনা-লিখিত নহে। সেইখানেই আবার ঘুঘুর মত একরকম পাখী মাটী থেকে শস্য খুঁটিয়া খাইতেছে। একটি জাপানী রমনী পুণ্যকর্ম্ম-বিবেচনায় হরিণ ও পাখীকে নিজের হাতে খাওয়াইতেছেন। পাখীগুলি তাঁহার হাত হইতে খুঁটিয়া খাইতেছে। পরস্পরের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস, কাহারও মনে সন্দেহ বা ভয়ের লেশমাত্র নাই। হরিণগুলির সিং নাই। বোধ হয়, অহিংসার দেশে থাকিয়া যন্ত্রগুলি অনাবশ্যক ব[illegible] আর জন্মায় না।

তাহাদের পাশেই "ক্রিসেন থিমম্" (crysanthemum) ফুলের [illegible] চিত্র। এই ফুল জাপানের বড়ই প্রিয় ফুল। নানা রঙ্গের সতেজ বড় বড় পাপড়ি যুক্ত গাঁদা, সূর্য্যমুখীজাতীয় ফুল। প্রতি বৎসর এই ফুল ফুটিবার সময় দেশ জুড়িয়া উৎসব হয়। ভিন্ন-ভিন্ন-আত্মায়ুক্ত ফুলগুলি [illegible] সাজাইবারই বা কি পারিপাট্য! ছবিখানির দিকে চাহিলে নয়ন জুড়ায়।

তাহার পাশেই চেরীব্লসম (cherry blossom) নাম[illegible] এক প্রকার সুগন্ধি ছোট ফুল ফুটিবার বাৎসরিক বসন্ত-উৎসবের নৃত্যের ছবি। রমণীগণ ফুলসাজে সাজিয়া, খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া, গলায় ফুলের মালা, হাতে ফুলের বালা পরিয়া, সারিবন্দী হইয়া নৃত্য করিতেছে। [illegible] মুখে হাসি ও মনে আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে। কোনও [illegible] যেন ফুলের গন্ধে আর

মনের আনন্দে মাতোয়ারা। শুনিলাম, জাপানে ফুলের এতই আদর যে, প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর প্রাঙ্গনে ফুলের বাগান আছে। তাহার কত যত্ন, কত পরিচর্য্যা। প্রত্যেক শুভ কার্য্যেই ফুলের আবশ্যক। কাহারও বাড়ী ফুল ফুটিলে পাড়া শুদ্ধ লোক তাহা দেখিতে আইসে।

তাহার পাশেই কতকগুলি বীভৎস রসের ছবি। সেইগুলি দেখিয়া কতক-গুলি জাপানী প্রথার পরিচয় পাইলাম, এই যা। নয় ত আমার সে সব ছবি দেখিতে একটুও ভাল লাগিল না। খুন খারাপী, মারামারি, কাটাকাটি প্রভৃতি আসুরিক লীলা কি ফুলের পাশে রাখা উচিত হইয়াছে? শুনিলাম, জাপানে নাকি এই বীভৎস রসের আদর আছে। যাত্রা বা অভিনয়ের আসরে হত্যাকাণ্ড সচরাচর সকলের সম্মুখে অভিনীত হইতে দেখা যায়। দর্শকবৃন্দ তাহাতে আনন্দ অনুভব করে। যে ছবিগুলির কথা বলিতেছি, তাহার মধ্যে কতকগুলি এই,—

এক জন জাপানী "সামুরাই" "হারীকুরী" অর্থাৎ ছোরা দিয়া আপনার পেট চিরিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। অপমানিত বা অপদস্থ হইলে আত্মসম্মানরক্ষার জন্য এরূপ আত্মহত্যা করা বড়ই গৌরবের বিষয়। উপবিষ্ট অবস্থায় ছোট ছোরা দিয়া নিজের পেটে একটি সোজা আঘাত করিয়াছে। তাহা হইতে রক্তের স্রোত বহিতেছে। দুর্ব্বলতাবশতঃ ঘাড়টি নত হইয়া পড়িতেছে। সেই ছোরা তাহার পর যদি আপনার গলাতেও দিতে পারা যায়, বা খাপের মধ্যে রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে গৌরবের আর সীমা থাকে না। তবে প্রথমে নিজেকে নিজে আহত করিলে পর চতুর্দ্দিকস্থ বন্ধুবর্গ তরবারির দ্বারা মস্তক ছেদন করিয়া মৃত্যুর সাহায্য করে। নহিলে সে আস্তে আস্তে মৃত্যু আরও কষ্টকর হইত।

তাহার পরই কতকগুলি চীন-জাপান ও রুস-জাপানের জলযুদ্ধের ও স্থলযুদ্ধের ছবি। দুর্দ্ধর্ষ জাপানী সেনার পশ্চাৎধাবনে ঢল ঢলে পোষাক পরা চীন সেনারা ঊর্দ্ধশ্বাসে টিকি উড়াইয়া পালাইতেছে! দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া পালাইবার রকম দেখিলে এ কথনও মনে হয় না যে, তাহারা যথার্থই লড়াই কি তাহা জানিয়া লড়াই করিবে বলিয়াই সৈন্য-দলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। জাপানী আঁকিয়াছে কি না, তাই হয় ত চীনেকে আরও হেয় করিয়া আঁকিয়াছে। এক একটি অগ্নিময় "বম্‌শেল" সৈন্যদলের মধ্যে পড়িয়া শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য নরহত্যা করিতেছে। এ সব ছবি যেন চোখে বিঁধিতে লাগিল।

এই সকল অশান্তিপূর্ণ বীভৎসরসাত্মক যুদ্ধ বিগ্রহের ছবিগুলির পাশেই একটি স্বর্গীয় দূতের ছবি। জ্যোৎস্নার আধ-আলো আধ-ছায়ায় শূন্যে উড়িতে

উর্দ্ধতে সুষুপ্ত পৃথিবীর উপর বিশ্বের শুভকামনাপূর্ণ শান্তিসঙ্গীতধারা বর্ষণ করিতেছেন। যুদ্ধের ছবির পাশে সে ছবিখানি দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন তিনি যুদ্ধের শান্তি গানই গাহিতেছিলেন,—

"নির্ব্বাণ হোক বৈরানল, বীরকুলের হোক কুশল ;
স্থির থাকুক ভূমণ্ডল, সুখে থাকুক প্রজাগণ !"

সেখান হইতে চোখ ফিরাইয়া তাহার পার্শ্বে দেখিলাম, জাপান-রাজ মিকাডো ও তাঁহার মহিষীর ইউরোপীয় পোষাক পরা প্রতিকৃতি। সুন্দরী মিকাডো-মহিষীকে এই পোষাকে বড়ই কদর্য্য দেখাইতেছে। ঠিক যেন আয়ার মত। শুনিলাম, ইনি এরূপ বিদেশীয় সাজ সজ্জা পরিতে বড়ই ভালবাসেন। দেশের বিস্তর লোকেরই এখন সকল বিষয়ে ইউরোপের অনুকরণে অনুরাগ। সেই জাপানী চিত্রকরের মুখে এই সম্বন্ধে আর একটি অতি বিস্ময়কর সংবাদ শুনিলাম যে, এই-রূপ সজ্জায় স্ত্রী স্বামীর অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে পান, কিন্তু দেশীয় পোষাক পরা থাকিলে সামাজিক নিয়মানুসারে স্বামীর পিছনে পিছনে চলিতে হয়।

এই ছবির পাশেই দেখিলাম, একটি বয়স্ক শিশু তাহার মাকে সেখানে আসিতে দেখিয়া খেলার সাথীদের ক্ষণকালের জন্য ছাড়িয়া ছুটিয়া মার স্তন্যপান করিতে আসিতেছে। মার মুখে সন্তানবৎসল্যের ভাব ও ছেলের মুখে মাতৃস্নেহের অভিব্যক্তি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। চারি চোখে এক হইতেই দু' জনেরই মুখে হাসি। এক জন কোলে লইতে ও অপর জন কোলে উঠিতে সাগ্রহে হাত বাড়া-ইয়াছে। অত বড় ছেলে এখনও মাই খায় কেন, এ কথা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলাম যে, জাপানে ছেলেরা অনেকে ৪।৫ বৎসর অবধি মাই খায়। গরু বা অন্য পশুর দুগ্ধ ব্যবহার করিবার প্রথা নাই, তাই এরূপ করিতে হয়। এরূপ অপর কোথাও দেখিও নাই, শুনিও নাই।

তাহার নিকটেই একটি জাপানী বিবাহের ছবি। বর-বধূ বিবাহ-আসরে পাশাপাশি বসিয়া মাঙ্গলিক মদ্যপান করিতেছেন। শুনিলাম, চীনদেশের মত কনেকে বরের বাড়ী আনাইয়া বিবাহ দেওয়া হয়। আমাদের দেশের বা বর্ম্মার বা ম্যালের মত বরকে কনের বাড়ী যাইতে হয় না। চিত্রকর আমাকে কতকটা বিস্মিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার দেশে কি হয় ?" আমার উত্তর শুনিয়া বলিলেন, "কে সম্পর্কে বড় ?—কি হওয়া উচিত ?" আমি উভয়েরই সম্মানরক্ষা করিয়া বলিলাম, "দু জনেরই চার্চ্চে গিয়া বিবাহিত হওয়া উচিত। তাহাতে কাহারও মর্য্যাদার হানি হয় না!" বুঝা গেল, জাপানে স্ত্রীস্বাধীনতা

থাকিলেও সকল দেশেই স্ত্রীজাতির উপর একটু অবজ্ঞার ভাব লোকের মস্তকে অন্তরে থাকে। সহজে যায় না।

তার পাশেই বুদ্ধদেবের সৌম্যমূর্ত্তি। ঠিক রেঙ্গুনের মূর্ত্তিগুলির অবিকল নকল। এ সকল অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বর্ম্মাবাসীগণই যেন "পোপ" বা শিক্ষা-গুরু। চীনেও তাহাই দেখিয়াছি, এই জাপানী ছবিতেও তাহাই দেখিলাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কষ্ট ভাবিয়া যেন ধ্যানস্তিমিত নেত্রে জল আসিতেছে। সে আত্মা কত বড় মহান ছিল!—অমন জীবনের আর ইতিহাসে তুলনা নাই। সন্তান-আশায় নিরাশ এমন পিতার বৃদ্ধবয়সের পুত্র —ও অকালে অতিসহসা প্রসূত হওয়াতে (Precipitate labor) মাতার মৃত্যু ঘটায় আজন্ম মাতৃহীন, তাঁহার মনে যে দয়া দৌর্ব্বল্য একটু বেশী থাকিবে, তায় আর বিচিত্র কি! আজন্মচিন্তাশীল স্বভাবের উপর আবার কেমন ঘটনাচক্র ঘটিল। যে পথে যান, সেই পথেই বাধা! এক দ্বারে বার্দ্ধক্য, অপরে জরা ও অপর দ্বারে মৃত্যু দেখা দিল, শেষে নিষ্কাম যোগীর শান্তমূর্ত্তি চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গন্তব্য পথ দেখাইল। সে গতি ত আর রুদ্ধ হইবার নয়। অন্তরের একান্ত আগ্রহে একে একে কত পথই খুঁজিলেন। শাস্ত্রের উপদেশ মুক্তিপথের সংবাদ দিতে পারিল না। কঠোর তপস্যাতেও শান্তি আসিল না। ধীর যুক্তিপূর্ণ চিন্তায় সে সমস্যা পূর্ণ হইল। মহান জীবনের এই ইতিহাসগুলি সব সেই ধ্যানমগ্ন কাঁদ-কাঁদ মুখখানিতে লেখা দেখিলাম।

তাহার পাশেই দেখি, বিজ্ঞানগুরু হার্বার্ট স্পেন্সরের সৌম্য মূর্ত্তি অঙ্কিত। চুলগুলি সব পাকা, বৃদ্ধ বয়সেও চক্ষুর জ্যোতি কিছুমাত্র নিভে নাই। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, যেন জ্ঞানজগতের কি তত্ত্ব-উদ্ভাবনে রত। ইনি সমস্ত মানবের বন্ধু। বিশেষ জাপানের পরম বন্ধু ছিলেন। যেমন হইয়া থাকে, নাস্তিক বিশ্বাসের মধ্যে প্রগাঢ় বিশ্বপ্রেম প্রচ্ছন্ন ছিল। দেহের জ্যোতি যেন চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

তার পাশেই টেনিসনের লিখিত কৃষক-তনয়া "ডোরা"র প্রতিকৃতি। শস্যক্ষেত্রে বালিকা পিতৃহীন অসহায় একটি শিশু লইয়া যত্ন করিতেছেন শিশুর পিতাকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, প্রতিদান পান নাই তার সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে —

> "—And the day went,
> And the sun fell,
> And all the land was dark."

" Wherever than wilt go &c.,
&c. God."

"—Awako arise my dearest love,
Heaven's last best gift,
My ever new delight.
Arise—Awake!"

তার পাশেই "রুথের ছবি"। বিদায়কালে মরুভূমির মধ্যে শাশুড়ীকে মিনতি করিতেছেন,—"আমাকে ছেড়ে যেও না!" স্বামী পুত্র সব হারাইয়া শ্বশ্রূ বলিতেছেন, "সব বিসর্জ্জন দিয়ে আমি আমার দেশে যাচ্চি, তুমি তোমার বাড়ী ফিরে যাও।" রুথ মরুভূমির পথে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার হাত দুইটি ধরিয়া বলিতেছেন,—Wherever thou wilt go, I will go, thy country is my country, thy people, my people and thy God my God.

তাহার পার্শ্বেই কবিগুরু মিল্টনের প্যারাডাইস্ লস্টের একখানি ছবি। অতি প্রত্যূষে অ্যাডাম সুষুপ্তা ইভকে জাগাইতেছেন। অরুণের লাল আভা তাঁহার মুখে পড়িয়াছে। দুঃস্বপ্নের অশান্তিরেখা মুখে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অ্যাডাম অতি আদরে গা ঠেলিয়া বলিতেছেন, "Awake arise my dearest love Heaven's last best gift my ever new delight—arise awake."

অপর প্রাচীরে আর কতকগুলি অতি সুন্দর ছবি। তার মধ্যে প্রথমেই Birth of Hellenএর ছবিখানি কিছু অশ্লীল। তবে কবিতার চক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের সকল নিয়ম সকল সৌন্দর্য্যই পবিত্রতা মাখান বলিয়াই, বোধ হয়, হংকংএর রুচি-পুলিশ আপত্তি করে নাই। নদীর ধারে উত্তেজিত হংসরাজ গ্রীবা বাড়াইয়া সাগ্রহে চঞ্চুপুটে আবেশ-আসন্ন "লীডা"র অধরোষ্ঠ ধরিয়াছেন। তাহার ডানাগুলি মেলান ও পক্ষিশরীরে পক্ষরাজি কণ্টকিত।

তাহার পার্শ্বেই "ওয়াটার বেবী।" জলদেবীর প্রথম শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইয়াই কাঁদিতেছে। মা যেন আড়ষ্ট, ছেলে নিতে জানেন না। তার ঘাড় ঝুঁকে পড়েচে। চুলগুলি ভিজিয়া গিয়াছে। ছোট ছেলের দুঃখকষ্টহীন কান্নার রেখাগুলি মুখে সুস্পষ্ট বিদ্যমান। আর তাঁহার নিজের শরীর গোলমালে প্রায় বিবস্ত্র। ছেলেটিকে সম্মুখে রাখিয়া বিমূঢ়ের মত এক পা জলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বিস্ময় ও নূতন প্রীতিমাখান মুখের ভাব। ছেলে হওয়া যে কি, যেন জানিতেন না।

"স্নানাগারে জাপানী রমণী"র ছবিতে দেখিলাম, বৃক্ষের বোতাম খোলা

ক্ক পরি এক জন রমণী স্নানাগারে যাইতেছেন। শুনিলাম, জলে নাবিবার সময় সাধারণ স্নানাগারে সকলের সামনে বিবস্ত্রা হইয়া নাবিতে হয়—জাপানে এইরূপ প্রথা। মুখে যেন কূট হাসি, যে কেহ তাঁহার দিকে তাকায়, সেই মনে করে, যেন তাহার দিকে অনুরাগপূর্ণ চাহনি চাহিয়া হাসিতেছেন। আর নীচের ঠোঁটের মধ্যভাগ লাল রঙ্গে চিত্র করা। এ প্রথাটি চীনেও দেখিয়াছি। আমাদের দেশে পায়ে আল্‌তা পরে। ইউরোপে গালে রক্তিম আভা লাগায়। কিন্তু ঠোঁটে এমন মধুর চিত্র আর কোথাও দেখি নাই।

পাশেই "ফুজীয়ামা"র গগনস্পর্শী চূড়া মেঘ-লোক ভেদ করিয়া উঠিতেছে। তাহার শিখরদেশ চিরকাল তুষারে আচ্ছন্ন। তাহারই মধ্য হইতে আগ্নেয়গিরির অগ্নিউৎপাত মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে। অহরহ ভূমিকম্প হয়। গম্ভীর সৌন্দর্য্যের সহিত ভীষণতার মিশ্রণ। পর্ব্বতটি সহরের অনতিদূরে অবস্থিত, অহরহ দেখা যায়। আমাদের হিমালয়ের মত এইটি জাপানীদের দেবতার স্থান। জাপানের পবিত্র ধাম বলিয়া গণ্য।

তাহার পাশেই একটি Lake side villa, অর্থাৎ হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী আবাস-গৃহ। ছোট একতালা গৃহটির ঢালু ছাদ চীনে ফ্যাশানের মত,—ধার ও কোণ উঁচু করা। চারি পার্শ্বে বাগান ও ফুলের গাছ। স্বচ্ছ জলে কুটীরটির ছায়া পড়িয়াছে। দূরের পাহাড় ও পার্শ্বের গাছও সেখানে প্রতিভাত হইতেছে। দুই একখানি পাল্-তোলা নৌকা জলে ভাসিতেছে। সবগুলিই দুই একটি রেখায় আঁকা। তাহাতেই কত সজীবতা, কত সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে! জাপানী চিত্রের এইরূপ সরলতা, Simplecityই পরম গুণ। ছোট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নির্জ্জন সেই কুটীরটি দেখিলে মনে হয়, যেন যাবতীয় পার্থিব সুখের আলয় ও শান্তির ধর্ম্ম-মন্দির।

মঙ্গোলিয়ান দেশের দোকানে এত ককেশিয়ান দেশের ছবি রাখা হয় কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে চিত্রকর বলিলেন যে, ইউরোপ ও আমেরিকাতেই এই সকল ছবির ক্রেতা অধিক। তাঁহার মুখে শুনিলাম, তিনি ইউরোপের ও আমেরিকার প্রায় সকল দেশে গিয়াছেন। ইটালীতে চিত্রবিদ্যা দেখিবার জন্য অনেক দিন ছিলেন। অনেকগুলি চিত্র ইটালীয় আদর্শে আঁকা। "Birth of Hellen", "Water baby" ও "Birth of a Pearl" সেখানকার আঁকা। আমি তাহার মধ্যে অনেকগুলি চিত্র ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর কতকগুলি ছবির পুস্তকে দেখিয়াছি।

এই জাপানী চিত্রকরের চিত্রশালার চিত্র দেখিয়া ও তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া আমি জাপান সম্বন্ধে অনেক কথা শিখিলাম। সে শিক্ষার উপকারিতা এই যে, বর্ম্মা, ম্যাণ্ডেলে, চীনদেশের সঙ্গে তুলনায় তাহা কিরূপ দাঁড়ায়, এই বুঝা। দেখিলাম, অনেকাংশেই প্রথা একরূপ ; যেন সকলগুলিই মঙ্গোলিয়ান জাতি বলিয়া এমন মিল হইয়াছে। যে যে বিষয়ে মিল ও যে যে বিষয়ে অমিল, সে কথা পরে বলিব।

Birth of a Pearl,—"মুক্তার জন্ম"। স্থির সমুদ্রের নীল জলের উপর ভাসমান একটি ঝিনুকের ডানা খুলিয়া একটি অনিন্দ্যসুন্দরী মধুরমূর্ত্তি রমণী বলিতেছেন,—"এই যে আমি এসেছি।" বালারুণের নৈসর্গিক আভা-বিশিষ্ট তাঁর মুখের দিকে চাহিলে মনে হয় যেন তাঁর সজীব চোখের তারা দুটি নড়িতেছে—চোখে পলক পড়িতেছে। যেন "সাধনার ধনকে" কে অন্তরের সহিত যুগযুগান্তর ধরিয়া ডাকিতেছিল ; এত দিনে তিনি দেখা দিয়া জুড়াইলেন।

শ্রীইন্দুমাধব।

শিবাজী-প্রসঙ্গ।

জন্মকাল।

১৫৪৯ শকাব্দের বৈশাখী শুক্লা প্রতিপৎ বৃহস্পতিবার রাত্রিশেষে, (ইংরাজী মতে শুক্রবার, ৬ই এপ্রিল, ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে) আনুমানিক ৫১ দণ্ড ২৫ পল সময়ে, অশ্বিনী নক্ষত্রের চতুর্থ চরণে, কুম্ভ লগ্নে শিবাজীর জন্ম হয়। তাঁহার মেষরাশি ও দেবগণ ছিল।

মৃত্যুকাল।

মঙ্গলগ্রহ জন্মস্থান-গত ও শনি অষ্টমস্থানস্থিত হওয়ায়, ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শিবাজীর মৃত্যুযোগ উপস্থিত হয়। কেরলজাতক নামক জ্যোতিগ্রন্থে লিখিত আছে,—

লগ্নে ভৌমে ইষ্টমে মন্দে সূর্য্যো বা ব্যয়মৃত্যুগে।
ত্রিপঞ্চাশত্তমে বর্ষে মৃত্যুস্তস্য ন সংশয়ঃ।

শিবাজীর জীবনে এই জ্যোতিষ-বচনের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ১৬০২ শকাব্দের (১৬৮০ খৃঃ) চৈত্রের শুক্লা পূর্ণিমা (উত্তরফাল্গুনী) রবিবার, (৫ই এপ্রিল)

দিবা দ্বিপ্রহরে, ৫২ বৎসর ১০ মাস ২ দিন বয়সে, শিবাজী ইহলোক ত্যাগ করেন। মহাবীর নেপোলিয়ানও ৫৩ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পঞ্চত্বলাভ করিয়াছিলেন।

মৃত্যু-রহস্য।

শিবাজীর সমসাময়িক জীবনীলেখক কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ্ বলেন, জ্বররোগে শিবাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার জ্ঞান অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তীর্থজলে স্নান এবং ভস্ম ও রুদ্রাক্ষধারণ-পূর্ব্বক যোগ অবলম্বন করেন। যোগ-যুক্ত অবস্থায় তাঁহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হয়। রামদাস স্বামীর নিকট শিবাজী যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ একাধিক বখরে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিবাজীর মৃত্যুকালে ও মৃত্যুর পর নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহারা বিস্তারিতভাবে সে সকলের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বর্ণনা অতি-রঞ্জিত হইলেও যে ভিত্তিহীন নহে, তাহা ফ্রায়ার নামক পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীর বর্ণনা-পাঠে বুঝিতে পারা যায়। ফ্রায়ারের বর্ণনায় প্রকাশ, শিবাজীর মৃত্যুবর্ষে ধূমকেতুর উদয়, দ্বাদশঘটিকাব্যাপিনী রক্তবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিজনিত প্লাবনে ১৬ সহস্র মহাপ্রাণীর বিনাশ, ভীষণ দুর্ভিক্ষপাত প্রভৃতি দুর্ঘটনা ঘটে। মিঃ কার্কেরিয়া নামক জনৈক পার্শী পণ্ডিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মহাবীর সিজারের মৃত্যুকালে যে ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই শিবাজীর মরণকালে সমুদিত হয়। ঐ ধূমকেতু পাশ্চাত্যসমাজে "নিউটন্‌স্ কমেট" নামে পরিচিত। ফ্রায়ার যুগল চন্দ্রের উদয়-কথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বখর-লেখকেরা বলেন, শিবাজীর মৃত্যুকালে ধূমকেতু, ভূমিকম্প, রাত্রিকালে যুগল ইন্দ্রধনুর উদয়, দিগ্‌দাহ প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত সংঘটিত হইয়াছিল।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল শিবাজীর মৃত্যু সংঘটিত হইলেও, মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত অনেকে তাঁহার ইহলোক-ত্যাগের সংবাদে আস্থা-স্থাপন করিতে পারেন নাই। সুরাটের ইংরাজ বণিকেরা ঐ বর্ষের ৭ই মে তারিখের পত্রে বোম্বাই নগরীস্থিত সহযোগীদিগকে এ বিষয়ে যে নিশ্চয়াত্মক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একাংশ এইরূপ,—

Sevagee's death is confirmed from all places; yet some are still under a doubt of the truth, *such reports having been used to run of him before some considerable attempt:* therefore not be too confident until better assured.

অর্থাৎ, "শিবাজীর মৃত্যুবার্ত্তার যাথার্থ্য চারি দিক্ হইতেই সমর্থিত হইতেছে; তথাপি কেহ কেহ এখনও উহাতে সন্দেহপ্রকাশ করিতেছেন। কারণ, ইতি-

[illegible] যখনই কোনও [illegible] কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই [illegible] এই প্রকার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। অতএব, এতদপেক্ষা নিশ্চিত সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনারা শিবাজীর মৃত্যুসংবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিবেন না।” ১৮ই মে তারিখে সুরাটের ইংরাজেরা এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া বোম্বায়ে পত্র লেখেন। অতঃপর বোম্বায়ের ইংরাজ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের বঙ্গদেশীয় কর্ম্মচারীদিগের নিকট এ সংবাদ প্রেরণ করেন। তদুত্তরে বঙ্গদেশের ইংরাজেরা ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের পত্রে এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন যে, “শিবাজী এতবার মরিয়াছেন যে, এখন কেহ কেহ তাঁহাকে অমর বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। যত দিন শিবাজীর আরব্ধ কার্য্যকলাপের সম্পূর্ণ বিরাম না হইবে, ততদিন শিবাজীর মৃত্যুসংবাদ সহজে কেহই বিশ্বাস করিবে না। কারণ, অনেকেরই ধারণা, শিবাজী যেরূপ ক্ষিপ্রতা ও সফলতার সহিত কার্য্যসাধন করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর কেহ সেরূপ ভাবে কার্য্যসাধন করিতে পারিবে, ইহা সম্ভবপর নহে।” তাঁহাদিগের এতদ্বিষয়ক মূল পত্রাংশ এই,—

Sevagi *has died so often* that some begin to think him immortal. 'Tis certain, little belief can be given to any report of his death, until experience tell the waiving of his hitherto prosperous affairs; since when he dies *indeed*, it is thought he has none to leave behind that is capacitated to carry on things at the rate and fortune he has all along done.

শিবাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ যে কেবল ইংরাজ প্রভৃতি বৈদেশিক ও দূরদেশবাসীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; শিবাজীর অতিনিকটসম্পর্কীয় লোকেও অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার দেহত্যাগের প্রকৃত সংবাদ জানিতে পারেন নাই। এমন কি, তাঁহার অন্যতমা পত্নী পুতলা (পুত্তলিকা শব্দের অপভ্রংশ) বাঈ পিত্রালয়ে অবস্থিতি হেতু বহু বিলম্বে স্বামীর পরলোকগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হন। তিনি সন্তানহীনা ছিলেন বলিয়া পতির অনুমৃতা হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুমরণের [illegible] “আষাঢ় শুক্লা একাদশী” বলিয়া বখরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুতলা বাঈর এত বিলম্বে অনুমৃতা হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধান কারণ, শিবাজীর মৃত্যু-সংবাদজ্ঞাতে অতিরিক্ত বিলম্ব।

বলা বাহুল্য, কপটাচার ও প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্যই শিবাজীকে বহুবার স্বীয় মৃত্যুসংবাদের প্রচার করিতে হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রদেশে এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে, শত্রুর নেত্রে ধূলিনিক্ষেপের জন্য তিনি আপনার ন্যায় ৫।৬ জন লোককে শিবাজী সাজাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দুর্গে স্থাপন করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষ গ্রন্থে শিবাজী।

১৫৭৫ শকাব্দে (১৬৫৩ খৃঃ) রচিত একখানি জ্যোতিষগ্রন্থে শিবাজী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

প্রভুক্ত তৎকরণং গ্রহসিদ্ধয়ে সুগমদৃগ্গণিতৈক্যবিধায়ি যৎ।
ইতি নৃপেন্দ্র শিবাজিত-নোদিতঃ প্রকুরুতে কৃতি কৃষ্ণবিদগ্রবাট্।

গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"নৃপেন্দ্র শিবাজী গ্রহসিদ্ধির জন্ম দৃক্‌গণিতৈক্য-বিধায়ী সুগম জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করিতে বলায়, আমি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ রচনা করিতেছি।" এই জ্যোতিষগ্রন্থের নাম "করণকৌস্তুভ।" গ্রন্থকার কৃষ্ণজ্যোতিষী কোঙ্কণ ঘাটমাথার অন্তর্গত "মাওয়ল" প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। মাওয়লের লোকদিগকে "মাওলী" বলে। মাওলী সেনার সাহায্যে শিবাজী এক দিকে যেমন নবহিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অন্য দিকে মাওলী পণ্ডিতের সাহায্যে দৃক্‌-প্রত্যয়মূলক অভিনব জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করাইয়া গ্রহসিদ্ধির সুগম পন্থা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে শিবাজীর বয়স ২৬ বৎসর মাত্র ছিল। সেকালের মহারাষ্ট্র জমীদার ও জায়গীরদারদিগের মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রের ন্যায় নীরস বিষয়ে দৃক্‌প্রত্যয়-সিদ্ধ নূতন গ্রন্থ রচনা করাইবার কল্পনা কাহারও মস্তকে উদিত হয় নাই। কিন্তু শিবাজী সেই অল্প বয়সে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও এই বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার সামান্য মনস্বিতার পরিচায়ক নহে। শিবাজীর পিতা রাজা শাহজীর আশ্রয়েও অনেক বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। "দেব-পূজা-সাগর" প্রভৃতির ন্যায় সাধারণ গ্রন্থের রচনায় তাঁহাদিগের শক্তি ব্যয়িত হইয়াছিল। কিন্তু শিবাজী সেই গতানুগতিক পথ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অধীন পণ্ডিতদিগকে নূতন বিষয়ে গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর আদেশে "রাজব্যবহারকোষ" নামক নূতন কোষগ্রন্থ রচিত হয়। এই কোষে তদানীন্তন মুসলমান রাজসভাসমূহে ব্যবহৃত আরবী ও পারসী শব্দনিচয়ের সংস্কৃত প্রতিশব্দসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে।

শিবাজীর রাজমুদ্রা।

শিবাজীর রাজমুদ্রার উপর নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি উৎকীর্ণ ছিল,—

প্রতিপচ্চন্দ্রলেখেব বর্দ্ধিষ্ণুর্বিশ্ববন্দিতা।
শাহসূনোঃ শিবস্যৈষা মুদ্রা ভদ্রায় রাজতে।

[illegible] মুদ্রা সম্ভবতঃ ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর রাজা উপাধি গ্রহণকালে নির্ম্মিত [illegible]। ইহার পর ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার যথারীতি রাজ্যাভিষেক ও "ছত্র-পতি" [illegible]াবিগ্রহণ সময়ে এই শ্লোকটির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পরবর্ত্তী রাজমুদ্রায় উৎকীর্ণ শ্লোকের শেষার্দ্ধের পাঠ এইরূপ,—

শাহাত্মজস্য মুদ্রেয়ং শিবরাজস্য রাজতে॥

রাজমুদ্রাকে মহারাষ্ট্রী ভাষায় "শিক্কা" বলে। সরকারী কাগজপত্রের শীর্ষদেশে এই শিক্কা নামক বৃহৎ রাজমুদ্রা অঙ্কিত করা হইত। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার ক্ষুদ্র রাজমুদ্রা ছিল, তাহাকে "মোর্ত্তব" বলা হইত। এই ক্ষুদ্র মুদ্রা লেখ্য বিষয়ের শেষ ভাগে অঙ্কিত করিবার রীতি ছিল। সে যাহা হউক, ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে শিবাজীর রাজমুদ্রা কিরূপ ছিল, তাহা জানা যায় না। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যভাবে রাজা উপাধি-গ্রহণের পূর্ব্বেও যে রাজমুদ্রার ব্যবহার করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। তাঁহার পেশওয়া বা মন্ত্রী শ্যামরাজ নীল-কণ্ঠের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উৎকীর্ণ আছে,—

শ্রীশিবনরপতি হর্ষ-নিধান।

শামরাজ মতিমৎ প্রধানঃ॥

এই মুদ্রাটি পিত্তলনির্ম্মিত। ইহার উপরিভাগ রৌপ্যময়। সমস্ত মুদ্রাটির ওজন ২॥০ তোলা। উহার নিম্নভাগ (মুখভাগ) ডিম্বাকৃতি বা বৃত্তাভাসবৎ। শ্যামরাজের মোর্ত্তবটিরও আকার প্রকার তাঁহার বৃহৎ মুদ্রার অনুরূপ। তবে উহার আকার ক্ষুদ্র ও ওজন ১ তোলার অধিক নহে। শ্যামরাজ নীলকণ্ঠ ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে পেশ-ওয়ে পদে নিযুক্ত ও ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে পদচ্যুত হন। শ্যামরাজের মুদ্রা হইতে প্রতি-পন্ন হয় যে, শিবাজী আপনাকে প্রকাশ্যভাবে "রাজা" বলিয়া ঘোষণা করিবার পূর্ব্বেও নিশ্চিত কোনও প্রকার রাজমুদ্রা ব্যবহার করিতেন। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণজ্যোতির্বিদ তাঁহাকে "নৃপেন্দ্র" বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে সাধুপ্রবর তুকারাম তাঁহাকে যে পত্র লিখেন, তাহাতেও তাঁহাকে রাজা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পাঠক অবগত আছেন যে, শিবাজীর পিতা শাহজী বিজাপুরের দরবার হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন।

শিবাজীর গুপ্তচর।

হিন্দুসাম্রাজ্যস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শিবাজী চর-বিভাগের যেরূপ গঠন ও পরিপুষ্টি বিধান করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা ভারতবর্ষের বিগত সহস্র বৎসরের

মধ্যে কোনও প্রদেশের হিন্দুশাসনের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। চর-বিভাগের অপকর্ষই যে পাঠানদিগের হস্তে ভারতীয় রাজন্যবর্গের পরাভব ঘটিবার একটি প্রধান কারণ, তাহা শিবাজীই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি পররাষ্ট্রের অন্তর্গূঢ় কার্য্য-কলাপ, গতিবিধি, ও উদ্দেশ্য মন্ত্রণাদির প্রতি সূক্ষ্ম ভাবে দৃষ্টি রাখিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত কর্ত্তব্য অবধারণ ও স্বরাষ্ট্রের রাজকার্য্যসমূহ পরিচালন করিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন। শিবাজীর নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় ও সামরিক গুপ্তচরেরা নিবিড় তন্তুজালের ন্যায় সমগ্র দক্ষিণাপথকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। অব্যবস্থিতচিত্ত সাম্ভাজীর রাজত্ব-কালে শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত চর-বিভাগ অকর্ম্মণ্যপ্রায় হইয়াছিল বলিয়াই আওরঙ্গজেবের হস্তে মহারাষ্ট্ররাজ্যের ভূয়সী দুর্দ্দশা সংঘটিত হয়। পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথের সময় হইতে নানা-ফড়নবীসের সময় পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র রাজপুরুষেরা চর-বিভাগের সুব্যবস্থা ও পুষ্টি-সাধন বিষয়ে যথাসাধ্য শিবাজীর অনুকরণ করিয়া বহু বিঘ্ন-বিপত্তির হস্ত হইতে মহারাষ্ট্র দেশকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

চর-বিভাগের সুব্যবস্থাগুণে শিবাজীও বহু বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার চর-বিভাগে সুদক্ষ কর্ম্মচারী না থাকিলে আফজল খাঁর অভিযানেই শিবা-জীকে ঘোরতর বিপন্ন হইতে হইত। আফজল খাঁ শিবাজীর অধিকৃত প্রদেশে প্রবেশ করিবামাত্র শিবাজীর গুপ্তচরেরা তাঁহার শিবির হইতে গূঢ় সংবাদ সংগ্রহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বিশ্বাস রাও নানাজী নামক জনৈক কায়স্থ সর্দ্দার ফকীরের বেশে প্রত্যহ আফজলের শিবিরে গমন করিতেন। তিনিই কৌশল-পূর্ব্বক আফজলের মনের ভাব অবগত হইয়া শিবাজীকে জ্ঞাপন করেন। আফ-জল শিবাজীকে বাক্য-কৌশলে মুগ্ধ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক ধৃত করিবার সংকল্প করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস রাওয়ের মুখেই শিবাজী প্রথম অবগত হন। এই কারণে তিনি পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

লুণ্ঠনাদি কার্য্যে শিবাজী তাঁহার গুপ্তচরগণের নিকট হইতে বিশেষ সহায়তা লাভ করিতেন। কোনও স্থান লুণ্ঠন করিবার পূর্ব্বে শিবাজীর গুপ্তচরেরা সেখান-কার ধনবান্ ও দুর্বৃত্তদিগের তালিকা সংগ্রহ করিয়া আনিত। তাহার পর আর এক দল গিয়া সেই তালিকা ঠিক কি না, তাহা জানিয়া আসিত। কখনও কখনও স্বয়ং শিবাজীও গুপ্তবেশে গমনপূর্ব্বক লুণ্ঠনযোগ্য নগরের অধি-বাসীদিগের অবস্থা জানিয়া আসিতেন। লুণ্ঠনকালে যাহাতে কোনও সাধুপ্রকৃতি

ধনবানের উপর অথবা অল্পবিত্ত ব্যক্তির উপর অত্যাচার না হয়, তাহার জন্য যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিবার উদ্দেশেই শিবাজী এরূপ তালিকা-সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন। সুরট-লুণ্ঠনকালে তত্রত্য এক জন অতি ধনশালী ইহুদী ব্যবসায়ী দরিদ্রদিগের দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতেন জানিয়া শিবাজী তাঁহার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করেন নাই। সেখানকার ফরাসী ধর্ম্মযাজকেরা যাহাতে কোনরূপে উৎপীড়িত না হন, তিনি তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কয়েক জন দুষ্টপ্রকৃতি ইংরাজ ভিন্ন আর সকল ইংরাজই তাঁহার আক্রমণে রক্ষা পাইয়াছিলেন। কৃষিজীবী, রমণী, বালক, বৃদ্ধ, সাধু সন্ন্যাসী ও ফকীরদিগের উপর যাহাতে কোনও অত্যাচার না হয়, তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। শিবাজীর এই নিয়মের বিষয় অবগত হইয়া, সুরটবাসীদিগের মধ্যে অনেকে স্ত্রীবেশধারণ পূর্ব্বক মহারাষ্ট্র সৈনিকদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, শিবাজীর গুপ্তচর বিভাগের সুব্যবস্থা-গুণে তাঁহার লুণ্ঠনাদি ব্যাপারে সাধুসজ্জনগণ অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতিলাভ করিতেন।

যুদ্ধকালে সৈন্যগণ পরাজিত শত্রুপক্ষকে লুণ্ঠন করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিত, তাহার সমস্তই রাজকোষে জমা করিবার নিয়ম শিবাজী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থায় সৈনিকগণের লুণ্ঠনবৃত্তি দমিত থাকিত। সৈনিকেরা লুণ্ঠিত দ্রব্যের একাংশ আত্মসাৎ করিতে পারে এবং তজ্জন্য তাহাদের লুণ্ঠন বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে পারে ভাবিয়া, তিনি সৈনিকদিগের কার্য্যকলাপ-পরিদর্শনের জন্য বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কারণে শিবাজীর সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে সৈনিকদিগের লুণ্ঠনপ্রিয়তা কখনও নিয়মের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। পেশওয়েগণের আমলে এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যত্ন-প্রকাশ না করায় মহারাষ্ট্র সেনার উচ্ছৃঙ্খলতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, বঙ্গসাহিত্যে যে সকল কাব্যাদি উপকরণ দিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহাদের বিষয় আলোচিত হইল। তাঁহারা বঙ্গ-

সাহিত্যের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা আজন্মবন্দিনী বঙ্গভাষার চরণশৃঙ্খল উন্মোচিত করিয়াছেন, এবং মাতৃভাষার মালিন্য দূর করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত মহত্ত্ব ও স্বাধীনতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ কাব্যাদি ব্যতীত বঙ্গভাষায় আর এক শ্রেণীর কাব্য-সাহিত্য উদ্ভূত হইয়াছে; তাহাই এক ভাবে বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ-সম্পদ্। তাহারও আলোচনা আবশ্যক।

ইংরাজী প্রভাবে বঙ্গসমাজে অনেক পরিমাণে স্বাধীনতার আবির্ভাব হইয়াছে। এই স্বাধীনতা সাহিত্যেও প্রবিষ্ট হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ফলে আধুনিক ইউরোপে 'গীতিকাব্য' নামক একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মানবের সুখ, দুঃখ, ভয় ও বিস্ময়, প্রতি দিনের অগণিত আশা ও নিরাশা, ইহাতে স্থান পাইয়াছে, এবং মানব-হৃদয়ের অপরিমিত সহানুভূতি পাইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে।

প্রাচীন মহাকাব্য-রচনার সহিত ইহার প্রভূত বৈসাদৃশ্য আছে। আদর্শ-চরিত্র-সৃষ্টি মহাকাব্যের লক্ষ্য। মহাকাব্যের কবি স্বয়ং উচ্চ বেদীতে অধিষ্ঠিত হইয়া নিম্নস্থ শ্রোতৃবর্গকে লক্ষ্য করিতেছেন; আধুনিক কবিতায় এক অব্যক্ত গভীরবেদনাময় সঙ্গীত মানব-হৃদয় হইতে অনন্ত আকাশের দিকে উত্থিত হইতেছে। আধুনিক কবিতার সহানুভূতিই মূল কেন্দ্র, এবং প্রকৃত জীবনই প্রায়শঃ কবিতার ভিত্তি। স্থৈর্য্য ও বিশ্বাসই প্রাচীন-সাহিত্যের মূল ধর্ম্ম, সুতরাং তাহার লক্ষ্য ঠিক আছে। আধুনিক সাহিত্য গভীর সংশয়ে, আশায়, হতাশায় ওতপ্রোত হইয়া উন্মত্তবৎ কোনও অজ্ঞাত লক্ষ্যের উদ্দেশে প্রধাবিত। প্রাচীনের আদর্শ অতীতে, আধুনিকের আদর্শ ভবিষ্যতে; সে বর্ত্তমান ও অতীতের উপর সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভবিষ্যতের ছায়া-রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পদার্থ অপেক্ষা তাহার স্বরূপ-তত্ত্ব ধরিবার জন্য আধুনিক সাহিত্য লালায়িত হইয়াছে। এই লালসা, আবেগ ও উদ্বেগ যে জাতীয় কবিতায় বিকশিত হইতেছে, তাহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র, মানবদেহের ন্যায় ক্ষুদ্র; কিন্তু তাহার ভাব ও আকাঙ্ক্ষা দেহস্থ মনের ন্যায় বৃহৎ ও অনন্তপ্রসারী। এই সকল কবিতা অনেক সময় দুই কথায় মানব-হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে উদ্দীপ্ত করে। শরীর ক্ষুদ্র হইলেও, কবির শক্তি ও নৈপুণ্যের গুণে ভাবরূপ অনন্তের ধারণায় ও আভাসে এই সকল কবিতা সময় সময় প্রাচীন মহাকাব্যের ন্যায় আদৃত হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যগুলি প্রকাণ্ড পর্ব্বত; তাহাতে প্রস্তর,

কঙ্কর ও বালুকারাশির মধ্যে স্থানে স্থানে উজ্জ্বল রত্ন নিহিত আছে, স্বীকার্য; কিন্তু তাহাতে কবির শ্রান্তি, দৈন্য ও অসমর্থতা প্রকাশ না পাইয়া যায় না। অপর পক্ষে, আধুনিক উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র কবিতা, প্রত্যেকে এক একটি নির্ম্মল, বিশুদ্ধ, নিটোল হীরকখণ্ড, চিরদিন ব্যবহার করিবার যোগ্য। ইংরাজী সাহিত্য এই কবিতার গৌরব বুঝিয়াছে, তাই তাহারা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীটস্‌ প্রভৃতিকে শ্রেষ্ঠ কবির আসন দিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিগণ বহুপূর্ব্বে স্বাধীনভাবে যে সকল ক্ষুদ্র কবিতায় ভাবপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও সময়ে সময়ে ভাবের বৃহত্ত্ব ও অসীমতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৈষ্ণব কবিতা অমর, বঙ্গসাহিত্যে তাহার প্রভাব বিলুপ্ত হইবার নহে। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের সহিত এই কবিতার অপূর্ব্ব স্নেহবন্ধন আছে। অনেক কাল ধরিয়া বাঙ্গালার কবিমণ্ডলীর ভিতর দিয়া এই জাতীয় কবিতা পরিস্ফুট হইবার চেষ্টা করিতেছে, বাঙ্গালার জলাজঙ্গলের আর্দ্র বাতাসের মত এই কবিতা আর্দ্র, স্নিগ্ধকারী, কখনও কখনও ম্যালেরিয়া-দুষ্টও বটে। ইহা প্রেমের কবিতা। বঙ্গ-কবি শতমুখে প্রেমের বিবৃতি করিয়াছেন, তবু তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। এই স্রোতের বশবর্ত্তী হইয়া ইতিপূর্ব্বে রামনিধি গুপ্ত বঙ্গসাহিত্যে কয়েকটি অতি মনোহর প্রণয়সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছেন। নিধুবাবুর গান বিশুদ্ধ, গভীর ও দাম্পত্য-প্রেম-মূলক, তাহা বঙ্গসাহিত্যে প্রণয়-সঙ্গীতের যুগান্তর সূচিত করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম দাম্পত্য প্রেম নহে। বৈষ্ণব কবিগণই একরূপ নামকরণ করিয়াছেন, তাহা 'পিরীতি'। পিরীতিতে শান্তি নাই; মিলন ও বিরহ, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের আন্দোলনে হৃদয় উত্তপ্ত হয়। তাহাতে কবিতার রঙ্গভূমি যথেষ্ট প্রসারিত হয়, সন্দেহ নাই। সম্প্রতি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে, পরিণয়হীন প্রেমের প্রাচুর্য্যে পুনরায় প্রাচীন গীতিকবিতার স্রোত অবাধে প্রবাহিত হইয়াছে; হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এই শ্রেণীর কবিতা লিখিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান কালে যে কোনও লেখক কলম ধরিতেছেন, তাহার নিকট হইতেই এই শ্রেণীর কবিতা পাওয়া যাইতেছে। এই সকল গীতিকবিতার অধিকাংশই আলোচনার যোগ্য নহে। ইহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাবের প্রগাঢ়তা বা ঐকান্তিকতায় প্রাচীন চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির কবিতাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। পরিশুদ্ধ ভাষায় নব নব শব্দাবলীর সাহায্যে কেবল একটা কোলাহল উত্থিত হইতেছে।

বঙ্গে গীতিকবিতা ও তাহার বৈশেষত্ব।

এ দেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে আনীত নবগীতি-কবিতার আদি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। বিহারীলাল আধুনিক গীতি-সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান

নবগীতিকাব্যে বিহারীলাল।

পাইবার যোগ্য। ইনি প্রকৃতিকে এক নব ভাবে দেখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার কবিতার মূলতত্ত্ব সৌন্দর্য্য-পিপাসা। ইংরাজ কবি কীট্‌সের ন্যায় তাঁহার হৃদয় এই পিপাসায় জগতের দিকে উন্মুক্ত ছিল। "সারদামঙ্গল" ও "বঙ্গসুন্দরী"তে ইনি স্থানে স্থানে এমন মহনীয় কমনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে আর দেখা যায় নাই। তিনি সৌন্দর্য্য-পিপাসু কবি, এবং জীবনে সেই সৌন্দর্য্য অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন : সেই জন্য তিনি সর্ব্বজনসমাদৃত কবি হইতে পারেন নাই।

বিহারীলালের অপূর্ণতা তাঁহার শিষ্য রবীন্দ্রনাথে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ গুরুকে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু গুরুকে বিস্মৃত হন নাই। কবি রবীন্দ্রনাথ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী। এখনও তাঁহার সমালোচনার সময় আসে নাই। সে সময় বহু দূরবর্ত্তী থাকুক—বঙ্গসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রভায় কৃতার্থ, সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হউক।

রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে যে সকল মৌলিক উপকরণ ও স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে কোনও কবি কিংবা লেখক পারেন নাই। তাঁহার প্রতিভা নিত্য নব নব পথে খেলিতেছে। তিনি বঙ্গসাহিত্যকে এমন শব্দসম্পদ, ভাবের উপাদান, রচনার কারুকার্য্য, চরণের গাম্ভীর্য্য, অলঙ্কারের পারিপাট্য ও ছন্দের শত সহস্র প্রকার বৈচিত্র্যে ভূষিত করিয়া যাইতেছেন যে, বঙ্গভাষা স্পর্দ্ধা করিয়া পৃথিবীর অন্য সাহিত্যকে আপন কুটীরে নিমন্ত্রণ করিতে পারে। তাঁহার "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ", "[illegible] সমুদ্রদর্শনে", "মানসসুন্দরী", "বসুন্ধরা", "পুরস্কার" ও আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা ও অনেকগুলি সনেট আমরা জগতের সাহিত্য-প্রদর্শনীতে নির্ভয়ে পাঠাইতে পারি। ইহা বঙ্গভাষার অল্প গৌরবের কথা নহে।

রবীন্দ্রনাথের এই উন্নতির মূল কারণ স্বাধীনতা। তিনি শৈশব হইতেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতায়, এমন কি, সময়ে সময়ে স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বীয়

রবীন্দ্রনাথের উন্নতির মূল।

শক্তির অনুসরণ করিতেছেন ; সমস্ত শক্তিশালী মানবের চরিত্রে প্রকৃতি এক অপূর্ব্ব দাম্ভিক উগ্রতা মিশ্রিত করিয়া দেন। ইহার বলে তাঁহারা সমস্ত প্রশংসা অপ্রশংসা তুচ্ছ করিয়া অবিশ্রান্তপ্রবাহে আপন উদ্দেশ্যের দিকে ছুটিয়া যাইতে

পারেন, আপনাকে চরিতার্থ করিয়াছেন। এই স্বাধীনতায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও অপ্রকৃতি উভয়ই চরিতার্থ হইয়াছে; আমরা বঙ্গীয় সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব্ব অভিনেতার অভিনয় দেখিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই ছন্দের বন্ধন ও ভাষার সৌকুমার্য্যের প্রতি তাচ্ছীল্য করিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল ভাব-প্রকাশ। যে রূপেই হউক, ভাবপ্রকাশ করিতে পারিলেই কবিতা হইল, ইহাই তাঁহার আদিম আদর্শ ছিল। এই আদর্শের বশীভূত হইয়া তিনি প্রকৃত কবিতাও লিখিয়াছিলেন, অনেক তুচ্ছ জিনিসও লিখিয়াছিলেন। কারণ, তখন তিনি ভাবকে আপনার আয়ত্ত করিতেছিলেন। যখন কবি কোনও একটা সুন্দর ভাবকে বশীভূত করেন, তখন সেই ভাব যে ছন্দে ও যে ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাহা কবিতা; কিন্তু ভাবকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত না করিয়া, অথবা ভাবের আভাসমাত্র ধরিয়া, উৎকৃষ্ট ভাষায় অনবদ্য ছন্দোবন্ধে গ্রথিত রাশি রাশি পুঁথিও কবিতা নহে। তাহা দুর্ব্বলতার, ভাবোন্মাদের পরিচায়ক। এই কবির কিশোর বয়সের প্রায় সমস্ত কবিতাই শেষোক্ত শ্রেণীর। তিনি পরিণত বয়সে এই দোষ পরিহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন ক্রমে ভাবের উপর প্রাধান্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন ভাষা তাঁহার হস্তে আপনি আসিয়া ধরা দিয়াছে। তাঁহার বহুকালের একাগ্র সাহিত্য-সাধনা সফল হইয়াছে।

এই কথাগুলি এত বিশেষ করিয়া বলিবার কারণ এই যে, বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার প্রকৃত পথের নির্দ্ধারণ বিষয়ে, ইহা হইতে সাহায্য পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের শত সহস্র অনুকরণশীল ভক্ত শিষ্য বঙ্গসাহিত্যে তুমুল কাব্য-কলরব উত্থাপিত করিয়াছেন। ইঁহাদের কাহারও স্বাধীনতা নাই। প্রায় সকলেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের পূর্ব্বোক্ত ভাব-বিকারে গ্রস্ত। একমাত্র স্বাধীনতার প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথ ত্রাণ পাইয়াছিলেন। কিন্তু অনুকরণকারীদের কাহারও হস্তে উক্ত বহুমূল্য ঔষধ দেখা যাইতেছে না।

রবীন্দ্রনাথ এখন পূর্ব্বাবস্থা হইতে প্রকৃত কবিত্বে উন্নীত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের উপাসক। তাঁহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা প্রেমের কবিতা। সেই প্রেম [illegible] ও অগভীর ছিল। এই সময়ে প্রবীণ বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রভাবে, [illegible] আশ্চর্য্য মূর্ত্তিতে

ভানুসিংহের পদাবলীতে পরিস্ফুরি[illegible]। ইহাতেই দেখা যায়, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রকৃতি বর্ত্তমান কা[illegible]ত হইয়াও কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছে। "রাধিকা" বঙ্গসাহিত্যে সমস্ত [illegible]র প্রেমোন্মাদের ও ভাবোন্মাদের প্রতিমূর্ত্তি, সাধারণ প্রেমিকার পক্ষে [illegible] ভাববিহ্বলতা নিতান্ত অস্বাভাবিক মনে হয়, রাধিকার পক্ষে তাহা পূর্ণমাত্রায় স্বাভাবিক। কবির যাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে দোষ ছিল, তাহা বিষয়-নির্ব্বাচন-মাহাত্ম্যে গুণে পরিণত হইয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকৃত শক্তি অপেক্ষা কুশলতা কিরূপ ফলপ্রসূ হয়, ভানুসিংহের পদাবলী তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এই প্রেম বারে বারে নানারূপ প্রেম-সঙ্গীতে ও কড়ি ও কোমলের ক্ষুদ্র কবিতায় স্ফূর্ত্তি ও অবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং "চিত্রাঙ্গদায়" একাধারে কবির সমস্ত পূর্ব্বভাবের সন্নিবেশ করিয়াছে। মানসীর

১ প্রেমকাব্য।

ধ্যান ধারণার রাজ্যে নিগূঢ় অন্তর্লীনতা প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা দিয়াছে। পরিশেষে কবিকে সোনার তরীতে ভাসাইয়া চিত্রার ভিতর দিয়া এমন এক রাজ্যে উপনীত করিয়াছে, যাহাকে 'যোগ' বলিলেও বলা যায়। তিনি মানবীর প্রেমের ভিতর দিয়া জগৎলক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার "মানস-সুন্দরী", "চিত্রা"; "উর্ব্বশী", 'অন্তর্যামী' প্রভৃতি কবিতায় পরিস্ফুট। ভাবোন্মত্ততা হইতে যোগে উন্নতি, জগতে অল্প কবির ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। এইরূপে বৈষ্ণবকবিদের প্রেম, কবির মৌলিক প্রতিভায় ও ইয়ুরোপীয় প্রভাবে, ক্রমে পরিণত হইয়া, বঙ্গসাহিত্যে সমুন্নত প্রেম-কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে বহুরূপী; তিনি কত রূপে কত ভাবে দেখা দিয়াছেন, এবং দিতেছেন; এখনও তাহার বিরাম নাই। অতএব তাঁহার দোষ দুর্ব্বলতার আলোচনা বর্ত্তমানে সম্ভব নহে, সহজও নহে।

রবীন্দ্রনাথ কায়া অপেক্ষা ছায়ারই অধিক পক্ষপাতী। রক্তমাংসময় শরীরী জীব অপেক্ষা তিনি ভাবময়ী প্রকৃতির অঙ্কনে অধিক অনুরাগী। এই এক কথাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত দোষ গুণ

রবীন্দ্রনাথের দোষ।*

বুঝিতে পারা যাইবে। ইংলণ্ডে এই ভাবাপন্ন কবি শেলী। শেলী আকাশে উড়িতেন, অতি উর্দ্ধে উঠিয়া এই কুহেলিকাময়,

* রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কথা, কাহিনী, ক্ষণিকা, [illegible] ও নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্ব্বকার রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করিয়া।—লেখক।

ছায়াময়, অবিভক্তাবয়ব পৃথিবীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া সেই সৌন্দর্য্যের উপভোগ করিতেন। কায়া অপেক্ষা ছায়ার কোনও কোনও বিষয়ে মাহাত্ম্য অনেক অধিক; সুতরাং কবি সেখানে অপ্রতিহতপ্রভাবে আপনার ঐন্দ্রজালিক জগতের সৃষ্টি করিয়া, পরমানন্দে বিচরণ করিতে পারেন। এই রাজ্যে দাঁড়াইয়া কবি একটা সম্পূর্ণ অলীক কথা বলিলেও, মর্ত্তবাসীর তাহার অস্তিত্বনাস্তিত্ব বিষয়ে দ্বিধা বাক্য প্রয়োগ করিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং এই রাজ্যের কবি সৌভরাজের ন্যায় অদৃশ্য দুর্গে অবস্থান করিয়া যথেষ্ট দম্ভ ও অভিমানে স্ফীত হইতে পারেন। এ দিকে মর্ত্তবাসীও তাঁহাদের কথাকে তুচ্ছ করিয়া জলীয় বাষ্পের মত উড়াইয়া দিতে পারেন। এইরূপ কবি একদেশ-দর্শী, সন্দেহ নাই। শুধু আকাশপথে উড্ডীন হইয়া শ্যেনের মত তীব্রগামী হইলে চলে না। এই পাষাণকঠোর ধরণীর উপর দিয়াও তুরঙ্গের মত দ্রুতপদে ছুটিতে হইবে, এবং অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় রসাতলে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপ্রবাহিণী ভোগবতীর পাবনী ধারা মর্ত্ত্যমানবের জন্য উৎসারিত করিতে হইবে। অন্যথা, তিনি একশ্রেণীর পাঠকের হৃদয়চারী কবি হইতে পারেন, "কবির কবি" হইতে পারেন, কিন্তু সমগ্র মানবজাতির কবি হইতে পারেন না।

ইদানীং রবীন্দ্রনাথের ভাষা ভাবকে আবৃত ও আচ্ছন্ন করিতেছে। "চিত্রা"র কবিতাগুলি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ছন্দের নৃত্যে, ভাষার ঝঙ্কারে, আকুলতার আবেগে, ভাবের সুচিক্কণ স্বর্ণরশ্মি ডুবিয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করা দায় হইয়াছে। ভাষা ও ছন্দোবন্ধের উপর অতিমাত্রায় দখল জন্মিলে, সচরাচর অনেক কবির যে দোষ ঘটিয়া থাকে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তাহার বিপর্য্যয় ঘটে নাই। তাঁহার অনেক কবিতা বাহুল্যময়, অতিরঞ্জিত ও অতিভূষিত। তিনি মহৈশ্বর্য্যশালী চিত্রকর; তাঁহার বর্ণনার ভাণ্ডার অপরিমেয়; কিন্তু তিনি সুদক্ষ চিত্রকর নহেন। আঁকিতে আঁকিতে তিনি ভাববশে এমন আত্মহারা হইয়া পড়েন যে, স্থানে স্থানে বুঝি তুলিকা দূরে নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত ভাণ্ডটি রিক্ত করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করেন। শুধু ধন থাকিলে হয় না, মিতব্যয়িতা, সংযম ও নিপুণতাও আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অনেক স্থলে গ্রামের সরলতা অপেক্ষা নগরের ভদ্রতাই অধিক। তিনি শিশুজীবনের অধিকাংশ কাল নগরে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন, সুতরাং উন্মুক্ত প্রকৃতির হৃদয়রাজ্যে তাঁহার সচ্ছন্দগতি হয় নাই। রাজধানীতেও

তিনি প্রথম প্রথম বিশুদ্ধ কাঞ্চন লাভ করিতে পারেন নাই, "মলমা অম্বরযুক্ত" তারই পাইয়াছিলেন। এখন তিনি অল্পে অল্পে স্বভাবের রাজ্য অধিকার করিতেছেন। তাঁহার ক্ষুদ্র গল্পগুলিতে ও "চৈতালি"র কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতায় তাহার আভাষ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও তাঁহার রাজার সাজ। রাজবেশে প্রকৃতির মন্দিরে প্রবেশ করা যায় না। ভীরুস্বভাবা পল্লীবালিকা রাজৈশ্বর্য্য দেখিয়া ভয়ে সম্ভ্রমে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়,—অপরিচিতের নিকট সহজে ধরা দিতে চাহে না।

পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির সমবায়ে রবীন্দ্রনাথ এ দেশের সাধারণ পাঠকের নিকট অধৃষ্য ও দুর্জ্ঞেয় হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার শত শত কবিতা পড়িয়াও অনেক সময় একবিন্দু অশ্রুবর্ষণের অবকাশ ঘটে না। ভাষার রাজবেশের পারিপাট্যে নয়ন ঝলসিয়া যায়, তাঁহার সহিত সহানুভূতি স্ফূর্ত্ত হইবার অবকাশ ঘটে না। তাঁহার কবিতার সুখ দুঃখ নিতান্ত সন্নিষ্ঠ লোক ভিন্ন অন্যের অন্তরঙ্গ সহানুভূতি হইতে সহস্র হস্ত দূরে অবস্থান করিতেছে।

এই সুযোগে একবার বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করা যাউক। সূর্য্যের চারি দিকে অনেক গ্রহ উপগ্রহ থাকে। তেমনই প্রকৃত কবির চারি দিকে অনেক 'উপ-কবি'র আবির্ভাব হয়। বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যের এখন বহুপরিমাণে সেই অবস্থা।

বর্ত্তমান বঙ্গসা হিত্য।

এখন অনেক কবি রবীন্দ্রনাথের আলোকে আলোকিত ও তাঁহার শক্তিতে শক্তিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই; স্থানে স্থানে স্বাতন্ত্র্যের আভাষ পাওয়া গেলেও তাহা রবীন্দ্রনাথের অসতর্ক অনুকরণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের দ্বারা অপরিচিতের নিকট রবীন্দ্রনাথেরও সম্মানের লাঘব হইতেছে।

একালের সাহিত্যিকগণের যেন নিজের কথা বলিবার প্রয়াস নাই। তাই তাঁহাদের ভাষা স্থানে স্থানে নিতান্ত কপট ও গর্ব্বিত। তাঁহাদের ছন্দ বাঙ্গালী বড়মানুষের ছেলের ন্যায় আপন শরীরের ভার বহন করিয়াও চলিতে পারে না। উহার পেশীসমূহে অণুমাত্র স্বাস্থ্য বা কর্ম্মনিষ্ঠার আভাষ নাই। অনুকরণ, ভাবোন্মত্ততা, অসহিষ্ণুতা ও অতিরিক্ত যশোলিপ্সাই এই সমস্ত দোষের মূল কারণ। যে পর্য্যন্ত না তাহা দূর হয়, সে পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিপথে [illegible] অন্তর্হিত হইবার আশা নাই।

রবীন্দ্রনাথের শিষ্যগণের মধ্যে কাব্যক্ষেত্রে "আলো ও ছায়া" রচয়িত্রীর কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা রমণীজনসুলভ অস্বচ্ছ কমনীয় সুরে বাঙ্গালীর হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে। এই কবি ও স্বর্ণকুমারী বঙ্গসাহিত্যে রমণীপ্রভাব স্থায়িভাবে মুদ্রিত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অক্ষয়কুমার বড়ালের দুই একটি দীর্ঘনিশ্বাস ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের কয়েকটি তরল আমোদপূর্ণ গার্হস্থ্য কবিতা সাহিত্যে স্থায়িত্বলাভের যোগ্য হইয়াছে। প্রভাতকুমারের প্রথম কয়েকটি কবিতা, মনে এক নব আশ্বাস জাগাইয়াছিল; কিন্তু তিনি এখন গল্প-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অপরাপর কবিতা-লেখকগণ।

এতদ্ভিন্ন বঙ্গসাহিত্যে সম্প্রতি এক নূতন জাতীয় খাঁটী দেশী কবিতা জন্মলাভ করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের গোবিন্দচন্দ্র দাস এই জাতীয় কবিতার স্রষ্টা। "স্বরস্বতী-পূজা"য় আমরা তাঁহার শক্তির পরিচয় পাই। রসের প্রাবল্য ও ভাবুকতাই এই জাতীয় কবিতার প্রধান লক্ষণ। প্রায় প্রত্যেক শ্লোকের শেষেই বাক্যবিশেষের পুনরুক্তি আছে, এবং ছন্দের গতির মধ্যে এক প্রকার পুরাতন "এক-টানা"'র ভাব বর্ত্তমান। মানকুমারী প্রভৃতি ইহার অনুকরণে কবিতা লিখিতেছেন। এই সকল লেখক যে ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া কবিতা লিখিতে বসেন, কবিতার গতিতে তাহার কোনও উন্নতি, বিবর্ত্তন, বা পরিবর্ত্তন ঘটে না। নিরন্তর চক্রভ্রমীর ন্যায় একই ভাব বিভিন্ন শব্দ-সহকারে বারংবার আবর্ত্তিত হইতে থাকে। চক্রের ঘর্ঘরে, উৎপতনে, নিপতনে বিস্তর কোলাহল উপস্থিত হয়। মনে হয়, প্রভূত পরিশ্রম ও আকুলতার ব্যয় হইতেছে, তথাপি উপযুক্তপরিমাণে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহতই থাকিয়া যাইতেছে।

এইরূপ কবিতার অবলম্বিত ছন্দ অতি প্রাচীন, বহু কষ্টে যাহা পাওয়া যাইত, প্রাচীনেরা তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতেন। যখন মানব শব্দ-শক্তিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তখন এই ব্যাবৃত্তি-বহুল বাক্য-বিন্যাসের বিশেষ প্রচলন ছিল। আবার এই সব কবিতার কোনও সাহিত্য-সঙ্গত উচ্চ আদর্শ নাই। একমাত্র নিজ হৃদয়কে আদর্শ ধরিয়া, নিজের সুখ দুঃখ বিপদ আপদ প্রভৃতিকে মূল উদ্দীপনা স্বরূপ রাখিয়া কবিতা লিখিতে বসিলে, সে কবিতা কদাচিৎ সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই জন্য এই সকল কবিতা প্রায় অসম্পূর্ণ ও অসংযত।

যেমন কাব্যে সূক্ষ্ম শিল্প-গীতিকবিতা, তেমনই উপন্যাসের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম

শিল্প ক্ষুদ্র গল্প। এই ক্ষুদ্র গল্পও ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যের সৃষ্টি। ইহার মধ্যেও গীতিকবিতার ন্যায় ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে ভাবের অসীমতা ফুটিয়া উ[illegible] মানব-জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহার ভিতর সমস্ত জীবনের দায়িত্ব, নির্ভর ও বীজস্বরূপ কারণ দেখা যায়। এক কথায়, ইহার আদর্শ লক্ষ্য ও বিষয়ও পূর্ব্বকথিত গীতিকবিতার ন্যায় অসীমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ গল্প মানবের নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের উন্নতির সহিত দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।

ক্ষুদ্র গল্প।

এই ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি উপন্যাস-রচনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি ক্ষুদ্রের ভিতর মহত্ত্ব-দর্শনে বিশেষ পটু। ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে ও মানবচরিত্রের অধ্যয়নের ফলে তাঁহার অনেক গল্প সাহিত্যে উচ্চশ্রেণীস্থ হইবার উপযুক্ত। এই সমস্ত গল্পে বঙ্গভাষার বর্ত্তমান শক্তি ও গতি বুঝিতে পারা যায়।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মাসিকপত্রে এই জাতীয় ক্ষুদ্র গল্প লিখিতেছেন। তাঁহাদের রচনাতেও স্থানে স্থানে প্রতিভার বিদ্যুৎস্ফুরণ লক্ষিত হয়; সুতরাং আশা হইতেছে, বাঙ্গলা ভাষাও কালে গীতিকবিতার ন্যায় এইরূপ গল্প সাহিত্যের অধিকারী হইতে পারে।

ক্ষুদ্র গল্পের পর বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গীতের দিকেই সর্ব্বাগ্রে মন আকৃষ্ট হয়। বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গীত-সম্পদ্‌ও নিতান্ত অল্প নহে। প্রাচীন বৈষ্ণবকবিগণের সঙ্গীতকবিতা ও রামপ্রসাদ ও নিধুবাবুর সঙ্গীতের কথা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান কালে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রেমসঙ্গীত দিয়াছেন। এই সমস্ত সঙ্গীত ইয়ুরোপীয় গীতিকবিতার আদর্শে রচিত। সুতরাং রসোদ্রেক অপেক্ষা ভাবোদ্রেকেই তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি ভাবের উদ্দীপক ও বিরাট পুরুষের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক; তাই সঙ্গীত-সাহিত্যে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু, ব্রহ্মের প্রাচীন যোগমূলক ধারণায় ও আন্তরিকতায় রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত চিরঞ্জীব প্রভৃতি সাধু সাধকগণের সঙ্গীতকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। রাজকৃষ্ণ রায়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি রঙ্গালয়ের নেতৃগণের নিকট হইতেও আমরা কয়েকটি

সঙ্গীত।

[illegible] পাইয়াছি। এই সমস্ত গান পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব, মিশ্রসুর, মৌলিকতা ও ভাবের ছায়াত্মক অবভাবে বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাসির গানে বঙ্গীয় সঙ্গীত-সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। বিশুদ্ধ হাস্যরসে ভাষার চপলগতি ও আকস্মিক বিস্ফুরণ, উভয়ই আবশ্যক। হাস্যরস-প্রকাশের উপযোগী হইলেই, ভাষা কত দূর উন্নত হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ও মনসার ভাসানে কবিগণ হাস্যরস উদ্রিক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার পর, কবিওয়ালাগণ, বিশেষতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, নানা অস্বাভাবিক উপাদানের সাহায্যে হাস্যরস-সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্গীয়সাহিত্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রথমতঃ দীনবন্ধুর উচ্চহাস্য উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। তাহার পরে সেই হাস্য বহুপরিমাণে মধুর ও মসৃণ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রে ও রবীন্দ্রনাথে ভদ্রসমাজের উপযোগী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় সর্ব্বপ্রথম প্রকৃত হাস্যরসের কবিতা রবীন্দ্রনাথ "মানসী"তে লিখিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিভাবলে তাহাকে সঙ্গীতে প্রতিফলিত করিয়াছেন।

হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত।

বর্ত্তমান কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিভাই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে। শুধু হাসির গানে বা রস-রচনায় নহে; অন্যত্রও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্প্রতি "পাষাণী" নামে যে নাটক লিখিয়াছেন, সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে, তাহাকে বঙ্গভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক বলিতে পারা যায়। 'পাষাণী'র চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনার সন্নিবেশ, ভাষার প্রয়োগ ও নাটকীয় সমাধান বিবেচনা করিলে, এই উক্তির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। বঙ্গসাহিত্যে কোনও নাটকে ইতিপূর্ব্বে একাধারে এই সমস্ত গুণ দৃষ্ট হয় নাই।

নাট্যকাব্য।

বঙ্গসাহিত্যে পূর্ব্বে নাটক রচিত হয় নাই, এমন নহে। দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, মতি রায় প্রমুখ যাত্রাওয়ালাগণ ও গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি রঙ্গাধ্যক্ষগণ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি অনেকেই নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহাদের নাটক কোনও কোনও অংশে সুখপাঠ্য হইতে পারে; কিন্তু সংস্কৃত, গ্রীক, বা ইউরোপীয় নাটকাদির সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে না। প্রকৃত নাট্যকাব্যের আদর্শ, গতি, বা পরিণতি, এই সমস্ত নাটকে নাই। সর্ব্ববিধ রচনা অপেক্ষা নাটক-রচনা কঠিন।

নাটকে কবিশক্তি, সকল জাতীয় মানবের সহিত অপরিসীম সহানুভূতি, লোক-চরিত্র-জ্ঞান, হৃদয়ের উদারতা, [illegible] তন্ময়তা, ভাব-প্রকাশের শক্তি ও সংযম, ঘটনা-সৃষ্টির [illegible], ঘটনা-[illegible] নৈপুণ্য ও [illegible] নাটকের উৎকৃষ্ট সমাধানে চমৎ[illegible]বিধায়িনী [illegible] আবশ্যক। এইরূপ বহুমুখী প্রতিভার অভাবে আমাদের সাহিত্যে নাটক পুষ্টিলাভ করে নাই।

ইয়ুরোপের অনেক বড় বড় কবি এই নাটক লিখিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথও নাটক লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাটকগুলি আমাদের দুর্গাপ্রতিমার মত। সুন্দর রং, বিচিত্র গঠন, রাঙ্গতার চাকচিক্য,—সকলই আছে, নাই কেবল প্রাণ। এত জাঁক জমক, এত বর্ণনার পারিপাট্য সাহিত্যে অন্য নাটকেই আছে। কিন্তু সেই সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম পদার্থের অভাবে সমস্ত বিফল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির সহিত আমাদের অণুমাত্র সহানুভূতি হয় না; মনে হয়, একটাও যেন প্রকৃতিস্থ নহে। সকলেই অভিনয়ের জন্য ব্যস্ত, আলঙ্কারিক বাক্যবিন্যাসের জন্য একান্ত ব্যাকুল। বাঙ্গালার অন্য সমস্ত নাটক কবিত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না। পরন্তু তাহাদের মধ্যেও উক্ত সমস্ত দোষ অল্পাধিকপরিমাণে বর্ত্তমান।

আমাদের রঙ্গালয়গুলি নৃত্য গীত ও আমোদ বিলাসের গৃহ। সেখানে অভিনয়ার্থ প্রস্তুত নাটকগুলিও সেইরূপ বিকৃত রুচির পরিচায়ক। তাহাদের মধ্যে ভাষার সৌন্দর্য্য, গঠনের কারুকার্য্য, বা জীবিত চরিত্রের সমাবেশ, কিছুই নাই। দেশের লোক পুতুলের নাচ দেখিয়া তৃপ্ত হয়। জীবিত মনুষ্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে না। তাহারা ভাব অপেক্ষা সুর বেশী ভালবাসে। সহজ, কোমল, স্বভাবানুগত দেহলীলার পরিবর্ত্তে, কষ্টশিক্ষিত অঙ্গবিভ্রম ভালবাসে। হৃদয়ে অনুভব না করিয়া 'বাহবা' দিবার জন্য লালায়িত হয়। তাই আমাদের নাটক অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের হাস্যরসাত্মক নাটকগুলিও ভাল আদর্শ [illegible] নাই। বিশুদ্ধ হাস্যরসে সামাজিকের মর্ম্ম [illegible]; তাই অমিশ্র ঠাট্টা, পরের কুৎসা, [illegible] নও নবপ্রচলিত রীতি-নীতির অবলম্বনে বিপ-হাসর[illegible] [illegible] মি' সৃষ্টি হয়, এবং তাহাই দর্শকগণকে অধিক আমোদ দিয়া [illegible]। [illegible]ভৎস রসের অবতারণা করিয়া হাস্যোদ্রেক করাই রঙ্গাল[illegible] [illegible]কেগণের 'আর্ট' বা কলাকৌশল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই শ্রেণীর নাটকের প্রকৃত হাস্যরসের উদ্রেক করিয়া প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

সাময়িক পত্রিকাগুলি যেমন [illegible] সমালোচনায় [illegible] করিয়াছে, ও বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস [illegible] করিয়া বাঙ্গালীকে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, [illegible] সাময়িক পত্রের দ্বারা কবিতার প্রভূত অপকার হইতেছে। কবিগণ আপাতরম্য-যশো-লোলুপ হইয়া আপন হৃদয়ের গূঢ়-তপোবন ছাড়িয়া, বাজারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা-পাঠে মনে হয়, কবিতা-সুন্দরী যেন নিতান্ত তাড়াতাড়ি অসংযত ও অসংলগ্ন বেশে গৃহের বাহির হইয়া আসিয়াছেন। পাঠকগণ তাহা দেখিয়া তুষ্ট হন না, এবং কবিরও গৌরব নষ্ট হয়।

সাময়িক পত্রিকা।

পক্ষান্তরে, এই সকল সাময়িকপত্রে প্রকৃত সমালোচনার একান্ত অভাব ঘটিয়েছে। সমালোচনা সাহিত্যের গতিনির্দ্দেশ করিতে পারে না, এবং কোনও কবিকে সৃষ্টিকার্য্য শিক্ষা দিতে পারে না, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু সমালোচনা সাহিত্যকে দূষিত পথ হইতে নিবর্ত্তিত করে। সমালোচনার দ্বারা সাহিত্য প্রভূত উপকার লাভ করে। দীনেশচন্দ্র সেন প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা-সংবলিত একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র, সাধনায় রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, এবং সময় সময় 'সাহিত্য' যে ভাবে সমালোচনা করিয়া থাকেন, সেই আদর্শের সমালোচনা এখন আর হইতেছে না। এখন মাসিকপত্রের সমালোচনার কোনও মূল্য নাই। আমাদের দেশের সমালোচকগণের কথা বিশ্বাস করিতে গেলে মনে হয়, এই দেশ সেক্সপীর ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, মিল ও বেকন, পিট ও শেরিডানে 'কাণায় কাণায়' পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহাদের ভাষা ভয়ানক অতিশয়োক্তিপূর্ণ। তাঁহাদের প্রশংসা বা নিন্দা সীমাহীন ও সর্ব্বগ্রাসী। আবার এদেশের কোনও কোনও প্রবীণ সমালোচকও গ্রন্থের সাহিত্যগত দোষ গুণের বিচার না করিয়া, অমুক কাব্য 'হিন্দু কাব্য' কি না, অমুক রচনা 'মনুসঙ্গত' কি না, [illegible] বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং সেই ভাবে সমালোচনা করেন। [illegible], উক্তরূপ সমালোচনায় সাহিত্যের আদর্শ জীবন্ত সমাহিত হয়।

সমালোচনা।

বাঙ্গালা উত্থানে, ক্ষুদ্র গল্প, জীবনবৃত্ত, সমালোচনা, [illegible], ঐতিহাসিক,

সামাজিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে যে ভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে মন পুলকিত হয়। বাঙ্গালা গদ্য ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছে। কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নিভৃতচিন্তা' প্রভৃতিতে গদ্য নদীর গম্ভীর নাদ শ্রুত হয়। রবীন্দ্রনাথের পাঞ্চভৌতিক সভায় ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশের সংমিশ্রণে যে ভাষা বহিয়াছে, তাহা বঙ্গভাষায় রত্নৈশ্বর্য্যস্বরূপ সাহিত্য-ভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত থাকিবে। সত্য বটে, বাঙ্গলায়, ধর্ম্ম সমাজ, বা দর্শন সম্বন্ধে কোনও মৌলিক গ্রন্থ এখনও বাহির হয় নাই। তাহার কারণ, আমাদের ধর্ম্ম, দর্শন, সমাজের মূল সংস্কৃত-সাহিত্যেই নিহিত। তাহারই অনুবাদ, ব্যাখ্যা, টীকা, টিপ্পনী করিয়া সম্প্রতি বুঝিতে হইতেছে। কালে আপনার জিনিস সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে, বাঙ্গালী তাহার সাহায্যে জগতের সমাজতত্ত্ব ও দার্শনিক কূটতত্ত্বের মীমাংসায় অগ্রসর হইতে পারিবে, এরূপ আশা অসঙ্গত নহে।

বাঙ্গালার গদ্য।

জাতীয় স্বাধীনতা জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জননী। পরাধীন দেশের সাহিত্য সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করা দূরে থাকুক, তাহা পদে পদে উপেক্ষিত, বিধ্বস্ত ও হীনতাগ্রস্ত হয়। আমাদের সাহিত্যের আশা, উদ্যম ও পরিপুষ্টির সহিত রাজার অণুমাত্র সহানুভূতি নাই। রাজার সহানুভূতি ব্যতিরেকে সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি হয় না। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন এদেশের অন্য কোনও সাহিত্যসেবক সাহিত্যের জন্য সমগ্রভাবে প্রাণ মন উৎসর্গ করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তরায়।

পক্ষান্তরে, আমাদের দেশের ভূমিতে 'বড়লোকে'র অভ্যুদয় বড় বিরল। আমাদের জীবনের রঙ্গভূমি অতি ক্ষুদ্র; সমাজ সংকীর্ণ, এবং সহস্র বৎসরের আবর্জ্জনায় ও জঞ্জালে পরিপূর্ণ। এ সমাজ ব্যক্তিবিশেষের উন্নত জীবনের উপযোগী নহে। আমাদের সমাজ কেবল সাধারণের জীবনধারণেরই উপযোগী। বাঙ্গালীর দারিদ্র্য, বাঙ্গালীর সমাজ-জীবন, বাঙ্গালীর একান্নভুক্ত পরিবার নিশিদিন তাহাকে নিপীড়িত নিষ্পিষ্ট করে, এবং তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে উদরের সংবাদ জাগাইয়া রাখে। বঙ্গদেশের অনেক প্রতিভা এইরূপে সমাজের ও পরিবারের অতি প্রাচীন দেবমন্দিরের সম্মুখে উৎসর্গীকৃত হইতেছে। তাই সাত কোটী নর নারীর মধ্যে প্রতিভার এত 'আকাল' ও এমন দুর্ভিক্ষ।

[illegible]য় আমরা শিক্ষার জন্য যাহাদিগকে বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাই,

বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে। সংসারে ডিপ্লোমার বিজয়নিশান উড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে, আমাদিগের শরীর মন ও কলেজগৃহের উত্তপ্ত বদ্ধ বাতাসে নিঃশেষ হইয়া যায়, এবং কেবল কঙ্কাল কয়টি লইয়া আমরা মধ্যজীবনে জগতের মাধ্যাহ্নিক কোলাহলে আসিয়া দাঁড়াই। বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে আশ্বস্ত করে নাই। বহু বৎসর হইল, এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে সেই বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গীয় সাহিত্যে কেবল একখানি ছিন্ন 'ক্যালেণ্ডার' পাঠাইয়া দিয়াছে, তাহাতে ধূলিরাশির মত অসংখ্য সংজ্ঞাহীন নাম পড়িয়া আছে।

তথাপি এই দুঃখদৈন্যের মধ্যে বঙ্গভাষা যাহা সৃষ্টি, উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাও অল্প আশাপ্রদ নয়। বাঙ্গালীর শক্তি কোথায়, বাঙ্গালী জগতের মধ্যে কোথায় দাঁড়াইবে, কি উপায়ে আপন পদবী খুঁজিয়া লইবে, সাহিত্যের এই নগণ্য বিকাশ হইতে অন্ততঃ তাহাও বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালীর শক্তি সাহিত্যে। বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র এই উত্তর দিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা কার্য্যে দেখাইয়াছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আকস্মিক প্রতিভার প্রণোদনে "বাল্মীকির জয়ে" তাহার উত্তর অনুপম ভাবে বাঙ্গালীকে দিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যের আশা ও শক্তি।

বঙ্গসাহিত্য কলগানে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে:—

"কোমল কণ্ঠে কুলু কুলু স্বর
বাজে অবিরল তরল মধুর
সদা শিঞ্জিত মাণিক নূপুর
বাঁধা চঞ্চল চরণে।"

বঙ্গসাহিত্যের স্বরূপ নির্দ্দেশের পক্ষে এই উক্তিই পর্য্যাপ্ত। অধিক বাক্যব্যয় অনাবশ্যক। এখন বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে কোন পথ অবলম্বনীয়, তাহা অতীত ও বর্ত্তমানকালের সাহিত্যিকগণের গ্রন্থাদির আলোচনায় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের স্থানে স্থানে যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই প্রবন্ধে বঙ্গসাহিত্যের গ্রন্থাদি জগতের সাহিত্য ও তাহার আদর্শের হিসাবে সমালোচিত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় অনেক গ্রন্থ বহুমূল্য; অনেক গ্রন্থকার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞার প্রকাশ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বুদ্ধিতে যাহা

সাহিত্যের সার্ব্বভৌমিক আদর্শ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, তাহার আলোকেই এই আলোচনা করিয়াছি।

বঙ্গসাহিত্য এখনও সমুদ্র খুঁজিয়া পায় নাই। সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে মাত্র। মধুসূদন, হেমচন্দ্র. বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যে সমুদ্রের কল্লোল ও আশ্বাস আনিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের তুষারগিরির সহিত অভিন্ন ধারাপ্রবাহ স্থির রাখিয়া, দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন উপাদান প্রাপ্ত হইয়া, সম্প্রতি বাঙ্গালার সজল সমতল প্রান্তরের মধ্য দিয়া, নানা বক্র পথে, জগতের সাহিত্যসমুদ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ইহা ভাগীরথীর ন্যায় শতমুখে সমুদ্রে পতিত হইবে—যাহার আপূর্য্যমান অচলপ্রতিষ্ঠ ঐশ্বর্য্যে জগতের সমস্ত উৎকৃষ্ট সাহিত্য-নদী-প্রবাহ আসিয়া মিলিয়াছে, যাহার সঙ্গে তাহাদের দিবানিশি আদানপ্রদান চলিতেছে।

পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধুঃ।

বঙ্গসাহিত্য সমুদ্রের নিকট যে উপহার লইয়া যাইতেছে, তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। বঙ্গসাহিত্যের মহিমায় দৃপ্ত প্রবন্ধলেখকের বিশ্বাস, বেদ ও উপনিষদের যে নিগূঢ় পাবনী ভাবধারা বাঙ্গালীর হৃদয়ে ওতপ্রোতভাবে এ যাবৎ প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, বাঙ্গালা এখনও তাহা জগৎসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিতে পারে নাই; তাহা করিতে পারিলে বঙ্গসাহিত্য জগতের প্রলুব্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে। কবি Wordsworth তাহার কণিকামাত্র আবিষ্কার করিয়া ইংলণ্ডের বিক্ষিপ্ত সমাজে অচিন্তনীয় সংযত শান্তি বিতরণ করিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যেও সেই শক্তির কবি, সেই ধ্যানের কবি, সেই যোগের কবির অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী,—তাহার প্রাণে দিগন্তব্যাপিনী প্রসারতার সহিত অতল গাম্ভীর্য্য ও সর্ব্বাভিভাবী বেগ থাকিবে; আমরা তাহারই আশা করিয়া আছি। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার শুভাগমনের নান্দীপাঠ হইয়া গিয়াছে।

জগতের সমস্ত সাহিত্য-নদী নানা দিগ্দেশ হইতে ভাবের উপহার আনিয়া মানবজাতির হৃদয়সিন্ধুমধ্যে এক গুপ্ত মহাদেশের সৃষ্টি করিতেছে। মানব এখনও তাহা সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারে নাই, এখনও আপনাকে জাগ্রত করিতে পারে নাই। অমর কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—

— —মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজিত হতেছে পলে পলে,

আপনি সে নাহি জানে। শুধু অন্ধ অনুভব তারি
আকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়াছে সঞ্চারি'
আকার-প্রকার-হীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা,
প্রমাণের অগোচর প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্কভারে পরিহাসে মর্ম্ম তারে সত্য বলি মা'নে;

* * * *

জননী যেমন জানে জঠরের আপন শিশুরে
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পু'রে।

যখন এই দেশ মানবের সমক্ষে আবিষ্কৃত হইবে, তখন সম্মিলিত মানব-হৃদয়ের সমস্ত কবিতা, এক অখণ্ড মহাকাব্যে পরিণত হইয়া, পবিত্র প্রার্থনার মত, আকাশের দিকে উত্থিত হইবে। বঙ্গসাহিত্য মানবের এই মহনীয় আশায় উদ্বোধিত হউক।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

দেহতত্ত্ব।

খাদ্যপরিপাক

দেহ একটা প্রকাণ্ড রাজ্য। ইহার প্রণালীও ও ৃ। যাহাকে আমরা দেহ বলিয়া থাকি, সেটা একটা কল। কলটা চালাইতে হইলে প্রথমতঃ উপাদান চাই। সেই উপাদানের নাম খাদ্য।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, খাদ্য নামক উপাদানের মৌলিক ভাগ জগতে প্রচুরপরিমাণে বর্ত্তমান। অথচ পয়সা নহিলে খাদ্য পাওয়া যায় না। ইহার উত্তর, মূল্যবান দেহ সংগ্রহ করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম আবশ্যক, এবং পরিশ্রমের মূল্য আছে। অনেক খাদ্য সহজে প্রাপ্য। যেমন ঘাস ও ফল মূল। কিন্তু ঘাস ও ফল মূল খাইলে যে দেহ হয়, তদ্দ্বারা বক্তৃতা, অভিনয় প্রভৃতি মনোহর কর্ম্মাদি সম্পন্ন করা যায় না। কেশকলাপ ঘোড়া ও গাভীর ন্যায় স্থূল ও কদর্য্য হইয়া পড়ে। জিহ্বা মোটা হয়। এই জন্য ঘাস ছাড়িয়া আমরা অন্ন ব্যবহার করিয়া থাকি।

এ সব কথা বলা বাহুল্য। কেবল কেশবিন্যাস করিতেই আমাদিগের মাসে দশ বার টাকা ব্যয় হইয়া যায়। দেহটাকে যেমন ভাবে রক্ষা করিলে আমরা আপাততঃ সুখী হই, তাহার মূল্য আছে। সেই মূল্যের পরিবর্ত্তে প্রাণের অনেকটা ব্যয় করিতে হয়। ইহার কোনও চারা নাই। "সখের প্রাণ"—সেকালের কথা।

তবে আমরা দেখিতে পাই যে, খাদ্য যতই মনের মতন হউক না কেন, শরীরের ব্যবহারে লাগিতে গেলে তাহারা পুনরায় মৌলিক উপাদানে পরিণত হয়। একটা গোটা সন্দেশ গলাধঃকরণ করা গোটা মনুষ্যের পক্ষে অতীব সুখকর, কিন্তু দেহের মধ্যে গোটা সন্দেশ দ্বারা কোনও কাজ হয় না। সন্দেশটা আবার মৌলিক অংশে পরিণত হইয়া দেহের নানা স্থানে নানা রূপে বণ্টিত হয়। দেহের কোনও অংশ তাহার মিষ্টভাগ গ্রহণ করে। কোনও অংশ তাহার অম্লজানটুকু লয়। কোনও অংশ তাহার যবক্ষারজানেই সন্তুষ্ট। ইহার নাম পরিপাক, এবং রক্তসঞ্চালন-প্রণালী।

অর্থাৎ, বৃহৎ মনুষ্যের শরীরে অগণন ক্ষুদ্র মনুষ্য আছে। এই সকল ক্ষুদ্র মনুষ্য একত্র হইয়া বৃহৎ মনুষ্য। ক্ষুদ্র মনুষ্যের তাড়নায় বৃহৎ মনুষ্যের ক্ষুধা পায়। বৃহৎ মনুষ্য একটা জটিল বস্তু খায়, এবং তাহাতে সে সুখী হয়। সেই জটিল বস্তু পাকস্থলীতে পৌছিয়া ক্ষুদ্র মনুষ্যগণের ব্যবহারে লাগে।

যেটুকু কেহ লয় না, তাহার নাম মল। তবে মলমাত্রই যে অসার, তাহার কোনও অর্থ নাই। আমরা অনেক বক্তৃতা শুনিয়া তাহার সার ভাগ গ্রহণ করি না। সেটুকু আমরা ফেলিয়া দিই। ছেলেবেলায় অনেক উপন্যাসের কেবল "প্লট"টুকু লইয়া আমরা ব্যস্ত হইতাম। যৌবনাবস্থায় নায়কের সহিত নায়িকার কি হইতেছে, তাহাই দেখিতাম। নায়িকার সুন্দর [illegible] হইলে আনন্দিত হইতাম, এবং কদর্য্য মুখ হইলে চটিয়া যাইতাম। ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিলে উপন্যাসের ধর্ম্মভাবটুকু আমরা লইয়া থাকি। অতএব, ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, যাহা আমরা ফেলিয়া দিই, কিংবা গ্রহণ করি না, সেটা যদিও মল বলিয়া তখন গণ্য; কিন্তু তাই বলিয়া অসার নহে। শুক্র, অ্যালবুমেন প্রভৃতি অনেক সার ভাগ আমাদের শরীর হইতে মলমূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়। থাকিলে তাহারা অনেক উপকারে লাগিতে পারিত।

পরিপাক করাটা বৃহৎ মনুষ্যের অর্থাৎ লোকটার সাধ্যাতীত। শ্রীধর

ভট্টাচার্য্যের লুকাইয়া কাবাব (খাসীর, মুর্গীর নহে) খাইয়া পরিপাক করিতে তিনশত বাহান্ন টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তাঁহার পাকস্থলীর যন্ত্র কাবাব পরিপাক করিবার উপযোগী ছিল না, অথচ লোভে পড়িয়া কাবাব খাইয়া ভট্টাচার্য্যের বিলক্ষণ বিপদ হইল। গরুকে মাংস খাওয়াইলে যেমন হয়, ভট্টাচার্য্য তেমনই হইলেন। গৃহিণী ও পুত্রকলত্রের ত্রাস হইল। অবশেষে অক্ষয় ডাক্তার আসিয়া অনেক চেষ্টায় ভট্টাচার্য্যকে শয্যা হইতে তুলিয়া যমলোক হইতে মানবলোকের হস্তে দিতে পারিয়াছিলেন।

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, যদিও দেহ ক্ষুধাগ্রস্ত হইলে আমাদিগকে খাইতে বলে, কিন্তু আমরা কি খাইব, তাহা বলে না। পিপাসা হইলে জল হইতে আরম্ভ করিয়া সোডা ও চা খাওয়া যায়। ক্ষুধা লাগিলে দুগ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁঠার মুণ্ডটা পর্য্যন্ত খাওয়া যায়। ক্ষুধাটা স্বভাবের। ক্ষুধানিবারণের উপাদানটা বৃহৎ মনুষ্যের হস্তে। যদি বৃহৎ মনুষ্য দেহস্থ ক্ষুদ্র মনুষ্যগণকে তাহাদিগের উপযোগী খাদ্যমাত্র দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন, তবে জানিলাম যে, পরিপাক ঠিক হইয়াছে। যদি এমন বস্তু পাকস্থলীতে যায় যে, তাহা দেখিয়া ক্ষুদ্র মনুষ্যগণ ভীত হয়, বা সন্তপ্ত হয়, তাহা হইলে একটা বিলক্ষণ বিপ্লব ঘটিয়া থাকে। এমন কি, উদরস্থ ক্ষুদ্র মনুষ্যগণের স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে আরম্ভ করে। ঘরে ঘরে কলসী কাঁখে করিয়া সেই বস্তুটাকে ধুইয়া ফেলিতে চাহে। অনেকে চটিয়া যায়, এবং একটা দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। এ সব আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারি। যেমন অরুচি ইত্যাদি।

অথচ পরিপাক কার্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ইহা জানিতে হইবে যে, উভয় পক্ষ হইতে, অর্থাৎ বৃহৎ মনুষ্যের পক্ষ হইতে, এবং ক্ষুদ্র মনুষ্যের পক্ষ হইতে এই কার্য্যে কোন্ কোন্ অংশ সাধিত হয়। আমি সখ করিয়া একটা জিনিস খাইলে উদর যদি না গ্রহণ করে, তবে তাহার উপায় কি? উদর কোন্‌টা কোন্ সময়ে পরিপাক করিতে চাহে, তাহার কোনও সঙ্কেত আছে কি না? এবং যদি কার্য্যগতিকে পরিপাক না হইয়া পদার্থটা থাকিয়া যায়, তবে সুকৌশলভাবে বাহির করিবার কিংবা অন্য কোনও কাজে লাগাইবার উপায় আছে কি না?

এ সব বিষয় আমরা কিছু কিছু জানি, এবং সচরাচর পরীক্ষা করিয়া থাকি। অগস্ত্য মুনি এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন। ইহা সকলে বিশ্বাস

করিত না। কিন্তু এখন এটা সকলে বিশ্বাস করে; কারণ, আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, মহর্ষির উদর ও সমুদ্রের আয়তন সমান ছিল; কাজেই তিনি এ কর্ম করিতে পারিয়াছিলেন।

বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিপাককার্য্য বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য দেহতত্ত্বের (Physiology) গোটা কতক কথা সরল ভাষায় বলিলে হানি নাই। জীবের শরীরে দুইটা ভাগ আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণভাগটা তাহার আয়ত্তাধীন নহে। ইহার মধ্যে পরিপাকক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, নিশ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাপার সম্পন্ন হয়। যে শক্তি দ্বারা প্রত্যেক ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহার মূল কোথায়, আমরা জানি না। অথচ দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে প্রত্যেকের একটি করিয়া স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। পরিপাকের শক্তি Solar Plexus নামক স্নায়ুচক্রের মধ্যে নিহিত। রক্তসঞ্চালনের শক্তিকেন্দ্র Medulla নামক স্থানে অবস্থিত। ইহা মস্তিকের নিম্নভাগে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের শক্তিকেন্দ্রও তাহারই সন্নিকটে। শাস্ত্রমতে এই সকল কেন্দ্র-স্থলে এক একটি করিয়া দেবতা বিরাজমান। দেবতাই হউন, বা শক্তিই হউন, ইহাদিগের চাল চলন ও কর্ম্মকলাপ রহস্যময়। জড়প্রকৃতি ইহাদিগের সাহায্যে এই দেহভার নির্ম্মাণ, রক্ষা ও ভরণপোষণ করে। আমরা যে মনে করি, আমরাই শরীরটাকে রক্ষা করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ সত্য কথা নহে।

প্রথমতঃ, অন্ন উদরে উপনীত হইলে, উদরস্থ অগ্নিদেব সেটাকে পরিপাক করেন। উদরস্থ বায়ু কিংবা শক্তি সেই অগ্নিটাকে প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। অতঃপর খাদ্য রক্তে পরিণত হইয়া রক্তবাহিনী নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, এবং হৃদয়ের অভিমুখে যায়। সেখানে গিয়া নিশ্বাসপ্রশ্বাস-যন্ত্রের সাহায্যে তাহা সংস্কৃত হয়। সংস্কৃত রক্ত আবার হৃদয়-যন্ত্রের শক্তি দ্বারা বামভাগের রক্তবাহী নাড়ী (artery) অবলম্বন করিয়া শরীরের সর্ব্বস্থানে প্রবাহিত হয়। শরীরস্থ প্রত্যেক পরমাণু সেই রক্ত পান করিয়া ক্ষুধানিবারণ করে, এবং পুষ্ট হয়। এই ভরণপোষণ নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করিবার ভার দেবতাগণের হস্তে।

দক্ষিণভাগটার ব্যাপার আমাদিগের আয়ত্তাধীন না হইলেও, আমাদিগের সহিত যে তাহার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মানব নামক জীবটি উত্তর দিকে অর্থাৎ মস্তিকে বাস করে। সেখানে

থাকিলেও নিম্নদেহস্থ সংবাদ তাহার নিকট অহরহঃ পৌঁছিয়া থাকে। অর্থাৎ, স্নায়ুমণ্ডলী তাহাকে শরীরের নানাবিধ অবস্থা প্রতি মুহূর্ত্তে জানাইয়া দেয়। মস্তিষ্কে দ্বাদশ জোড়া স্নায়ু আছে, তাহারা নিম্নদেহস্থ বত্রিশ নাড়ীর সহিত জড়িত। ইহারই মধ্যে ঊনপঞ্চাশ কিংবা ততোধিক পবন প্রবাহমান। ইহারা যে সর্ব্বদাই ঘোরতর গোলযোগ করিতেছে, তাহার আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি।

গোলযোগের বিশেষ কারণানুসন্ধান করিয়া শাস্ত্রকারগণ জানিতে পারি-যে, (Cranial nerve মস্তিষ্কের) স্নায়ু নিম্নস্থ (spinal nerve) মেরুদণ্ডের স্নায়ুমণ্ডলীর সহিত সম্বদ্ধ হইয়া জীবকে একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থে পরিণত করিয়াছে। মেরুদণ্ডস্থ রাজ্যকে যদি জড়প্রভৃতি বলা যায়, এবং মস্তিষ্কদেশকে যদি মানবপ্রকৃতি বলা যায়, তবে জড়প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-নির্ণয় সহজেই হইতে পারে। অথচ এটা একটা জটিল বিষয়।

মানবের দুরবস্থার কারণ এই যে, তাহাকে চতুর্দ্দিকে নজর রাখিতে হয়। আমরা যদি অহরহঃ বাটীর মধ্যে দৃষ্টি রাখিতাম, তবে হয় ত গৃহিণী ও পুত্রকলত্র কষ্টদায়ক হইত না। কিন্তু আমাদিগের মানবত্বের স্ফুরণার্থ অন্য দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হয়, এবং আমাদিগের স্বাধীন মতামত আছে; সে মতামত বাটীর মধ্যের মতামতের সহিত এক নহে।

অর্থাৎ, আমাদিগের পাঁচটা ইন্দ্রিয়-দ্বার আছে, তাহাই আমাদিগের কর্ম্মস্থল। সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মস্থলে ব্যাপৃত থাকায় বাটীর মধ্যের খবর আমাদিগের পক্ষে জাপানের যুদ্ধসংবাদের ন্যায় হইয়া পড়ে। যদিও আমরা সংবাদটা জানিবার জন্য ব্যস্ত, অথচ কাজে কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না।

এই যে জটিল সম্বন্ধ, ইহাই আমাদিগের আয়ুর ভিত্তি। গৃহিণী ও তাঁহার পুত্রকলত্র ক্ষুদ্র মনুষ্যগণকে নিম্নদেহে দেবতাগণের কৃপায় স্বাধীন হইয়াও অনেকটা আমাদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়। খাদ্য আমরা যোগাইয়া না দিলে, অবশ্য পাকস্থলীতে, অন্য কোনও প্রকারে পৌঁছিতে পারে না। এবং যেরূপ খাদ্য আমরা মনোনীত করি, তাহাই পাকস্থলীর দেবতাগণ পরিপাক করিতে বাধ্য। আমরা ইচ্ছা করিলে স্বচ্ছন্দে বিষ আনিয়া দেহটাকে মুহূর্ত্তেই নষ্ট করিতে পারি। আবার গৃহিণীর অসাবধানতাবশতঃ বহিঃপ্রকৃতি হইতে নানাবিধ কীটাণু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অজীর্ণ

দেহটাকে অধিকতর জর্জরিত করিতে পারে। কিন্তু চারি দিক ঠিক রাখা আমাদিগের আয়াসসাধ্য নহে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, বাটীর মধ্যের কর্ম গৃহিণীর হস্তে দিয়া কর্ত্তা ধর্ম্ম-সঞ্চয় করিতে পারেন। কিন্তু কর্ত্তা ধর্মসঞ্চয় না করিয়া যদি অধর্ম্ম সঞ্চয় করেন, তবে কাযেই সেটা গৃহিণীর মনোমত হয় না। ইহার মূলে একটি সামান্য সত্য দেখা যায়। কর্ত্তার অধর্ম্মপ্রবৃত্তিতে শক্তির হ্রাস হয়, এবং কাজেই গৃহের মূলধন পর্য্যন্ত টানিতে হয়। গৃহিণীর কাপড় চোপড় ও গহনাটা পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়া আমরা যদি গুলি খাই, তবে অবশ্যই ইহা রক্ষণ-শীলা প্রকৃতির পক্ষে কষ্টকর হয়। যদি আমরা শক্তির অপব্যয় করি, তবে দেবতাগণের পক্ষেও আমাদিগের শরীররক্ষা করা অসাধ্য হইয়া পড়ে। যেমন মানবসমাজের নিয়ম, তেমনই দেহরাজ্যের নিয়ম। রাজার সংস্কার বেতর হইলে রাজ্যটা পড়িয়া যায়। রাণী নিজের পক্ষ দেখিতে থাকেন, এবং প্রজাগণও নিজের উপায় দেখে। যাহাতে উভয় পক্ষ নির্ব্বিবাদে দিন-যাপন করিতে পারে, তাহারই নাম ধর্ম্ম। উভয় উভয়কে ধারণা করিয়া একই আদর্শে কর্ম্ম করিতে থাকিবে, ইহাই ধর্ম্মের মূল।

পরিপাক করাটা দেহধর্ম্মের প্রথম অঙ্গ। ধর্ম্ম বজায় রাখিতে হইলে প্রথমতঃ এমন পদার্থ পাকস্থলীতে প্রদান করা উচিত, যাহা গৃহিণী ও দেবতা-গণের প্রিয়, এবং সহজেই পাচ্য। বৃদ্ধবয়সে সখ করিয়া অভিনব একটা খাদ্য উদরে প্রবিষ্ট করাইলে অবশ্য তাহার ফল সবল হয় না।

কোন্ সময় উদর কোন্‌টা গ্রহণ করিতে চাহে, সেটা একটু বিরলে বসিয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। মনোজগতের খাদ্য (চিন্তা) আমাদিগের সর্ব্ব-সময়ে এক নহে। অনেক কথা সব সময়ে এক নহে। অনেক কথা সব সময় ভাল লাগে না। অনেক গানও অনেক সময় বিরক্তিজনক হইয়া পড়ে। উদরও সেই নিয়মের অধীন। মনও যেমন চঞ্চল, উদরও তাহাই। আমা-দিগের অভ্যাস ও সংস্কার শরীরটাকে নিজের মত করিয়া তুলিতে চাহে। কিন্তু উভয়েই বেতরভাবে উভয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে, উভয়ে সখ্যতাভ্রষ্ট হইলে, উভয়ে উভয়ের সহায়তা না করিলে, ফলে উভয়েই নষ্ট হয়।

কার্য্যগতিকে একটা সজীন পদার্থ উদরে গেলে সকলেই ব্যস্ত হইতে পারেন। মদ খাইলে আমাদিগেরও নেশা হয়, এবং শরীরের যে হয় না, এমন কথাও বলা যায় না। তবে শরীরের পক্ষে অসহ্য হইলে, সে আমাদিগের

অভিসন্ধা হইলেও, উদগার করিয়া ফেলে। অবশ্য জগতে এমন পদার্থ নাই যে, শরীরকে ক্রমে ক্রমে তাহার পরিপাকোপযোগী না করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের মতামত যত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয়, শরীরের গ্রহণ করিবার শক্তির তত শীঘ্র পরিবর্ত্তন হয় না। শরীর কিছু অলস, এবং নারীভাবগ্রস্ত। ধাঁ করিয়া অত কাঁচকলা ও কল্য মদ খাইলে, শরীর সহিতে পারিবে না।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ একটা আদর্শ সম্মুখে রাখা উচিত। আদর্শ সম্মুখে রাখিলে ও তদুপযোগী কর্ম্মের সঙ্কল্প মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিলে দেহটা জানিতে পারে যে, কর্ত্তার বাস্তবিক ইচ্ছা কি। আমি কৃষ্ণ হই, বিষ্ণু হই, কিংবা জাম্বুবান হই, প্রথমতঃ একটা ঠিক করা উচিত, এবং অন্ততঃ কিছু দিন তাহারই মত কর্ম্ম করা উচিত। কিন্তু এক দিনে কৃষ্ণ বিষ্ণু ও জাম্বুবান হইলে দেহের সাধ্য নাই যে, তাহার অনুগামী হয়। কাজেই ঘোরতর একটা বিপ্লব বাধে, এবং দেহের ক্ষয় হইতে থাকে।

ফিরিঙ্গি বণিক্।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রথম পরিচয়।

When Vasco da Gama Landed in 1498, the old order of things alike in Northern and in Southern India was passing away, the new order had not yet emerged.—*Sir W. Hunter.*

এক সময়ে সমগ্র কেরল রাজ্যই হিন্দু নরপতির অধীন ছিল। সে পুরাতন হিন্দুরাজ্য কিরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহার কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ বিষয়ে দাক্ষিণাত্যে অদ্যাপি যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা নিরতিশয় কৌতুকাবহ। লোকে বলে,—খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে কেরল রাজ্য যে হিন্দু নরপতির অধীন ছিল, তিনি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরিণতবয়সে বিষয়ানুরাগ শিথিল হইলে, তিনি মদিনা যাত্রা করেন; আরব দেশেই তাঁহার অন্তকাল উপস্থিত হয়। তাঁহার রাজ্য এই সূত্রে বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। অধিকাংশ স্থান বিজয়নগরের হিন্দু

সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, কোন কোন স্থান কালে মুসলমানের অধীন হইয়া, বাহ্মণী-রাজ্য গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই সকল রাষ্ট্রবিপ্লবেও মালাবারের সমুদ্রোপকূল স্বতন্ত্র থাকিয়া, হিন্দু রাজন্যবর্গেরই অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই সকল বাণিজ্য-বন্দর-বহু রাজার অধীন হইলেও, কাহারও সহিত কাহারও বাণিজ্য-কলহ উপস্থিত হইত না; সকলেই আপন আপন ক্ষুদ্র বন্দরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, যথাসাধ্য বাণিজ্যশুল্ক সংগ্রহ করিতেন। কালিকটের হিন্দু রাজা বাহুবলে পরাক্রান্ত না হইলেও, বাণিজ্যগৌরবে জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সমগ্র সভ্যদেশেই সুপরিচিত ছিল। ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিবার সময়ে, পর্তুগাল-রাজের নিকট হইতে কালিকটের সামুরীর নামে পত্র লইয়া পোতারোহণ করিয়াছিলেন।

গামা যখন কালিকটের বাণিজ্য-বন্দরে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন ভারতবর্ষ একরূপ অরাজক অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। তখনও মোগল-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তখনও দিল্লীর শাসনক্ষমতা দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্ববিস্তারে অগ্রসর হয় নাই। তখন পাঠান শাসন ক্রমে ক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছিল। কালিকটের সামুরীর সহিত পাঠান-সম্রাটের সংস্রব ছিল না। তিনি স্বতন্ত্রভাবেই রাজ্যশাসন করিতেন। ফিরিঙ্গি-বণিকের আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া কালিকট-রাজ ভাস্কো ডা গামাকে সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিলেন না। ভাস্কো ডা গামা [illegible]দিন ভারতবর্ষের পুলিনতটে প্রথম পদবিন্যাস করেন, সেদিন তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না। এত কাল যাহা কেবল কবিকল্পনায় অনুরঞ্জিত হইয়া পর্তুগালের জনসাধারণের নিকট বিস্ময়বিজড়িত স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় প্রতিভাত হইত, সে রাজ্যে প্রথম পদন্যাস করিবার সময়ে পর্তুগালের রাজপ্রতিনিধি সমুচিত সমারোহের ত্রুটি করিলেন না। সর্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে আপাদমস্তক সুশোভিত করিয়া, ভাস্কো ডা গামা হেমমালা-উপঢৌকন-হস্তে রাজসন্দর্শনে বহির্গত হইলেন। রাজপথের নাগরিকগণ কালিকটের বাণিজ্য-বন্দরে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব অভিনব দৃশ্য দর্শন করিল। গামার দৃঢ়োন্নত বীর-কলেবর জনস্রোতের মধ্যে আলোকস্তম্ভের ন্যায় প্রতিভাত হইল। জনসাধারণ ফিরিঙ্গি-বণিকের যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ত্রুটি করিল না।

সামুরী গামাকে দর্শন করিবামাত্র সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বাণিজ্য-বিস্তারের এইরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব উপায় উপস্থিত হইল বলিয়া

কালিকট-রাজ ফিরিঙ্গি বণিকের উৎসাহবর্দ্ধন করিবামাত্র, তাঁহার সরল ব্যবহারে পরম পরিতৃপ্তিলাভ করিয়া ফিরিঙ্গি বণিক পণ্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহারা পণ্যবিক্রয়ে অর্থোপার্জ্জন করিত, তাহারাও নূতন ক্রেতার দর্শনলাভ করিয়া নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু আরব দেশের যে সকল বিচক্ষণ বণিক্ রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ফিরিঙ্গি বণিককে সর্ব্বান্তঃকরণে অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না। নূতন জল-বাণিজ্যপথের আবিষ্কার-কাহিনী তাঁহাদের হৃদয়ে এক অপরিজ্ঞাত আশঙ্কা উদ্রিক্ত করিয়া দিল। তাঁহাদের মনে হইল,—কলহপ্রিয় খৃষ্টানগণ ভূমধ্যসাগর ছাড়িয়া আরবসাগরে সমর-কোলাহল উত্থাপিত করিবার জন্যই এত ক্লেশে এরূপ দূরদেশে উপনীত হইয়াছেন। বাণিজ্য কেবল কথার কথা,—ব্যপদেশমাত্র! ফিরিঙ্গি-বণিকের বাণিজ্যতরণীতে আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারা যে সকল যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্রের সন্ধানলাভ করিলেন, তাহাতে সেই আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

সেকালে যে সকল জলপথে বা স্থলপথে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য নানা দিগ্দেশে প্রেরিত হইত, সেই সকল বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গ শুল্করক্ষার জন্যই বাণিজ্য রক্ষা করিতেন। কোন দেশে সমরকলহ বিদ্যমান থাকিলেও, উভয় পক্ষই বাণিজ্যরক্ষার্থ চেষ্টা করিতেন। দস্যু ভিন্ন অন্য কেহ বাণিজ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা করিত না। এই সকল কারণে, মধ্য-এসিয়ার বিবিধ বিপ্লবের মধ্যেও ভারতবাণিজ্য অব্যাহতগতিতে প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্য সাম্রাজ্যে প্রবাহিত হইত। বণিগ্বর্গের পক্ষে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমনাগমন করিবার প্রয়োজন হইত না। এরূপ অবস্থায় ফিরিঙ্গি বণিকের সামরিক বেশ নিরীহ বণিগ্বর্গের হৃদয়ে সহজেই আতঙ্ক উপস্থিত করিতে লাগিল। সে কথা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

বণিক্ ভিন্ন অন্য কেহ কালিকটে উপনীত হইত না। কালিকট-রাজ ফিরিঙ্গি বণিককে বণিক্ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ তাহাতে নিরুদ্বেগে আস্থাস্থাপন করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহারা ফিরিঙ্গি-বণিকের প্রকৃত স্বভাব অবগত ছিলেন। তাঁহারা যে ভূমধ্যসাগরে ধর্ম্মকলহের সহিত বাণিজ্যকলহ সংযুক্ত করিয়া মুসলমানের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সে কথা ভারতবাসী মুসলমানদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল না। সরলস্বভাব কালিকট-রাজ তাঁহাদের এই সকল আশঙ্কাকে অমূলক বলিয়াই

বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ রাজার চিত্তবিকার উপস্থিত করিতে অসমর্থ হইয়া, ফিরিঙ্গি বণিকের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত করিবার আশায়, এক অভিনব কৌশলের অবতারণা করিতে বাধ্য হইলেন।

মুসলমানগণের উপদেশে কালিকটের পণ্যবিক্রেতৃগণ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য পণ্যদ্রব্য অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিল; অনভিজ্ঞ ফিরিঙ্গি বণিক্ তাহাই সহাস্যবদনে ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মুসলমানগণ রাজাকে বুঝাইলেন, নবাগত ফিরিঙ্গি বণিক্ বাণিজ্য-ব্যপদেশে দস্যুবৃত্তি করিতে আসিয়াছে; বণিক্ হইলে, অকর্ম্মণ্য পণ্যদ্রব্য অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিত না! ইহাতে কালিকটের প্রজাবর্গের লাভ হইতেছে বলিয়া, কালিকট-রাজ মুসলমানগণের প্ররোচনায় কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু মুসলমানগণ কলহের সূত্রপাত করিলেন। এই কলহে উভয়পক্ষেই রক্তপাতের আয়োজন হইয়াছিল; রাজা কলহনিবারণ না করিলে, প্রথম সন্দর্শনেই অনর্থ উৎপন্ন হইত। মুসলমানগণ আপাততঃ নিরস্ত হইতে বাধ্য হইলেও, মনে মনে বুঝিতে পারিলেন,—ফিরিঙ্গি বণিককে নির্ব্বাসিত করিতে না পারিলে, ভারতবাণিজ্যে মুসলমানের আধিপত্য বিলুপ্ত হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। ফিরিঙ্গি বণিকও মনে মনে বুঝিলেন,—মুসলমানকে পরাভূত করিতে না পারিলে, ভারত-বাণিজ্যে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠালাভ করিবে না। যেখানে হিংসাদ্বেষ অপরিচিত ছিল, সেখানে হিংসাদ্বেষ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল; যেখানে বাণিজ্যে বাহুবলের সংস্রব অপরিজ্ঞাত ছিল, সেখানে বাহুবলই প্রবল হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। তাহার জন্য রাজা প্রজা কেহই প্রস্তুত ছিলেন না; কেবল ফিরিঙ্গি বণিক্ তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন!

অল্পদিনের মধ্যেই ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যতরণী পণ্যভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে কালিকট-রাজের নিকট উপঢৌকনদ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন; মৌখিক শিষ্টাচারের কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না; পর্ত্তুগালরাজের নামে কালিকট-রাজ স্বর্ণপত্রে যে প্রীতিসম্ভাষণ লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেন, ভাস্কো ডা গামা তাহা সর্ব্বসমক্ষে মস্তকে ধারণ করিয়া পোতারোহণ করিলেন। তথাপি এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব আশঙ্কা ভিন্ন অন্য কোনও কথা ভারতবর্ষে পরিজ্ঞাত হইল না। কোথায় পর্ত্তুগাল, কোথায় বা তাহার রাজধানী,—লোকে তাহার কোন কথাই বুঝিতে পারিল না। সমুদ্র-

গর্ভ হইতে অকস্মাৎ ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যতরণী দৃষ্টিপথে সমুদিত হইয়াছিল; তাহা আবার অকস্মাৎ সমুদ্রগর্ভেই বিলীন হইয়া গেল!

অনুসন্ধানবিমুখ ভারতবাসিগণ নানা অলীক কল্পনার অবতারণা করিয়া নিরস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই অল্পকালের অসম্পূর্ণ পরিচয়লাভেই ফিরিঙ্গি বণিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। এ দেশে যে সকল সেণ্ট-টমাস-সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান প্রজার বসতি ছিল, তাহারা হিন্দু রাজার উদার শাসননীতির কল্যাণে বিধর্ম্মী হইয়াও প্রভূত প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল। তথাপি সে কথা বিস্মৃত হইয়া, ভারতপ্রবাসী খৃষ্টানগণ প্রথম সন্দর্শনেই ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষভুক্ত হইয়াছিল। গামা তাহাদের নিকট ভারত-বাণিজ্যের বিবিধ তথ্য লাভ করিয়া, বাণিজ্যবিস্তারের উপায়-উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন। ভারতবর্ষে সেণ্ট-টমাস-সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টানদিগের বসতি না থাকিলে, ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষে গৃহচ্ছিদ্রের সন্ধানলাভের সম্ভাবনা উপস্থিত হইত না!

মালাবারের বিবিধ বন্দরে বিবিধ রাজা প্রতিষ্ঠিত ছিল; সকল রাজ্যই ক্ষুদ্র রাজ্য; সকল রাজ্যই স্বতন্ত্র রাজ্য; সকল রাজ্যই বাণিজ্যলিপ্ত। উপকূল প্রদেশের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্যের মধ্যে কলহ উত্থাপিত করিয়া, এক রাজাকে আশ্রয় করিয়া অন্য রাজাকে পরাভূত করিবার সম্ভাবনা ছিল। প্রথম সন্দর্শনেই ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষের এই গৃহচ্ছিদ্রের সন্ধানলাভ করিলেন!

অধ্যবসায়ে ও অকুতোভয়তায় বিশ্ববিজয় সাধিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস কেবল অধ্যবসায়ের ও অকুতোভয়তার ইতিহাস। ফিরিঙ্গি বণিকের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় কেবল তাহার কথাই পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়া রহিয়াছে। অধ্যবসায় ও অকুতোভয়তা ভিন্ন রাজকুমার হেন্‌রীর অন্য সম্বল অধিক ছিল না। তিনি সেই সম্বলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, অভিনব জলপথের আবিষ্কারসাধনের জন্য যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত করিয়া ইহলোক হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে উন্মত্ত হইয়াই তাঁহার স্বদেশের নাবিকরাজ ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। এই অভিনব জলপথের আবিষ্কারসাধন সুসম্পন্ন হইবামাত্র, প্রাচ্যসাগরে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া ভারতবাণিজ্যে প্রভুত্বলাভের আশায়, অভিনব অধ্যবসায় ও অকুতোভয়তা উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল। ভাস্কো ডা গামা তাহার জন্যই মালা-

বারের উপকূলের অন্যান্য বন্দরের সন্ধানলাভ না করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না।

ভাস্কো ডা গামার বাণিজ্যতরণী কলিকট হইতে পশ্চিমাভিমুখে আফ্রিকার দিকে চালিত হইল না; তাহা দক্ষিণাবর্ত্তে পরিচালিত হইয়া, মালাবার উপকূলের অন্যান্য ক্ষুদ্র বন্দরের নিকট দিয়া কোচীন বন্দরে উপনীত হইল। এই বন্দরেও ফিরিঙ্গি বণিক্ যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন। কোচীনরাজ শক্তিসামর্থ্যে কালিকট-রাজের সমকক্ষ না হইলেও, বাণিজ্য-গৌরবে আপনাকে কালিকট-রাজের সমকক্ষ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। তিনি স্বজাতিপ্রিয় ফিরিঙ্গি বণিকের সৌভাগ্যবর্দ্ধনের জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া পর্ত্তুগালরাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া, পর্ত্তুগালের বাণিজ্যোন্নতিসাধন করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। এই বন্দর হইতেও বিবিধ পণ্যদ্রব্য ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যতরণীতে পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। অধিক বাণিজ্যশুল্ক লাভ করিবার লোভে মালাবারের বাণিজ্যবন্দরের রাজন্যবর্গ এইরূপে ফিরিঙ্গি বণিকের উৎসাহবর্দ্ধন না করিলে, প্রথম বাণিজ্যযাত্রাতেই ফিরিঙ্গি বণিক্ আশাতীত সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন না। আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইবার পক্ষে বাধা বিঘ্নের অবধি ছিল না; তরঙ্গসংকুল অকূল সাগরে ক্ষুদ্র তরণী জলমগ্ন হইবার আশঙ্কা ছিল; অপরিজ্ঞাত প্রাচ্য-সাগরে উদ্ধতস্বভাব মুসলমানগণের অত্যাচারে ফিরিঙ্গিগণের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইবার আশঙ্কা ছিল. সুদূর সমুদ্রপথে সুদীর্ঘকাল পোতচালনা করিতে গিয়া পরিশ্রান্ত নাবিকগণের পক্ষে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিবার সম্ভাবনা ছিল; এরূপ বাণিজ্যযাত্রায় লাভ না হইলে, ব্যয়বাহুল্যে পর্ত্তু-গালের পক্ষে ক্রমশঃ সর্ব্বস্বান্ত হইবারও অসম্ভাবনা ছিল না। এরূপ অবস্থায় প্রথম বাণিজ্যযাত্রায় পণ্যসংগ্রহে অসমর্থ হইলে, ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষে পুনরায় ভারতযাত্রার আয়োজন করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। অশিক্ষিত কুসংস্কারান্ধ জনসমাজ ব্যর্থ বাণিজ্যযাত্রার নানা কাল্পনিক বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া, ফিরিঙ্গি বণিকের অধ্যবসায় অবসন্ন করিয়া দিত; ক্ষতিলাভ-গণনা-নিপুণ ধনকুবেরগণ অল্প দিনের মধ্যেই ভারতবাণিজ্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেন! প্রথম বাণিজ্যযাত্রা সফল হইল বলিয়াই, পর্ত্তুগালের পক্ষে বাণিজ্য-বিস্তারের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইল!

প্রথম পরিচয়ে ফিরিঙ্গি বণিক্ লাভের লোভে অন্ধ হইলেও, প্রকাশ্যভাবে

বাহুবলের প্রয়োগ করিতে সাহসী হন নাই। মুসলমান বণিগ্‌বর্গের বিদ্বেষ যত বলীভূত হইতে লাগিল, বাহুবলপ্রয়োগের প্রয়োজন ততই প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষে বাহুবলে বিজয়লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। ভারতবর্ষ হইতে আফ্রিকার উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র সাগরপথে মুসলমানের আধিপত্য, সে আধিপত্য চূর্ণ করিবার শক্তি না থাকায়, ভাস্কো ডা গামা যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়াই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে নিরন্তর প্রবল ঝঞ্ঝায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যতরণী নানারূপে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। পরিশ্রান্ত নাবিকবর্গ একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে দেখিয়া, গামার বীর-হৃদয়ও বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সহোদর মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন! চারি মাস পোতচালনা করিবার পর, গামার তরণীসমূহ যখন আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী হইল, তখন অন্নজলের অভাবে উপকূলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। উপকূল সকল মুসলমানের অধিকারভুক্ত; তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহস হইল না। অবশেষে অনেক ইতস্ততঃ করিয়া গামা মেলিন্দা নামক বন্দরে উপনীত হইলেন। সেখানে প্রচুর অন্নজল সংগ্রহ করিয়া, উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিবার আশায়, দক্ষিণাভিমুখে পোত-চালনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে দীর্ঘকালব্যাপী সমুদ্রভ্রমণের পর ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৯ আগষ্ট তারিখে ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যতরণী পর্ত্তুগালে উপনীত হইল। যাহারা যাত্রাকালে দুই হাত তুলিয়া পর্ত্তুগালরাজকে অকথ্যভাষায় ভৎসনা করিয়াছিল, তাহারা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল,— গামার বিজয়তরণী সগর্ব্বে টেগস-নদের জলস্রোত অতিক্রম করিয়া বন্দরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে! দেশের লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল, পণ্যবিক্রয়ের কোলাহলে পর্ত্তুগালের বন্দর মুখরিত হইয়া উঠিল। ভারত-বাণিজ্য পর্ত্তুগালের করতলগত হইয়াছে বলিয়া রাজা প্রজা সকলেই আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। ভারত যাত্রার জন্য যাহা কিছু ব্যয় হইয়াছিল, পণ্যবিক্রয়ে তাহার ষাটগুণ লাভ হইল! এত লাভের কথা কেহ কখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে সাহস করে নাই। সমগ্র ইউরোপ যেন সাহসা পুলকিত হইয়া উঠিল; ভারতবর্ষ যে রত্নপ্রসবিনী, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। ভাস্কো ডা গামা বিবিধ রাজপ্রসাদ ও সম্মানসূচক উপাধি লাভ করিলেন। রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া পুনর্ব্বার ভারত-যাত্রার আয়োজন

করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন। পোপের শাসনপত্রে ভারত-যাত্রার নবাবিষ্কৃত জলপথে কেবল পর্ত্তুগালেরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন পর্ত্তুগাল হইতে পণ্যক্রয়ের জন্য নানা দেশের বণিবর্গ পর্ত্তুগালে উপনীত হইয়া, পর্ত্তুগালকে ইউরোপীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করিল। ভারতবর্ষ কোথায়, ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ,—সে কথা আর কাহারও অপরিজ্ঞাত রহিল না। সমগ্র ইউরোপে কেবল ভারতবর্ষের কথাই আলোচিত হইতে লাগিল। স্পর্শমণির স্পর্শমাত্রে লৌহখণ্ড সুবর্ণখণ্ডে পরিণত হয়,—ভারতবর্ষকে স্পর্শ করিয়া, পর্ত্তুগালের ক্ষুদ্র রাজ্য ইউরোপীয় সমাজে বৃহৎ বলিয়াই প্রতিভাত হইল। বাণিজ্যলুব্ধ নাগরিকগণ অভিনব রত্নখনির সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন; ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টানগণ মুসলমান-দলনের অভিনব যুদ্ধক্ষেত্র সম্মুখে বর্ত্তমান দেখিয়া, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তরবারি শাণিত করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

The eyes of the Malabar Princes were at length opened. Up to this time they had seen in their visitors only men urged by the desire of wealth, and anxious to gratify it in trading with India. Experience tore away the veil, and exposed the secret machinery of Portuguese policy.—*Portuguese Conquests in India.* *

উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া, ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে গমনাগমন করিবার অভিনব জলপথ আবিষ্কৃত হইবামাত্র, পর্ত্তুগালের অধীশ্বর "ইথিওপিয়া, আরেবিয়া, পারসিয়া ও ইণ্ডিয়ার বিজয়বিধাতা" এই অভিনব উপাধি [illegible] করিলেন। পোপ এই উপাধি প্রদান করায়, পর্ত্তুগাল-রাজের ভারত-বিজয়ের অদ্বিতীয় অধিকার সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইল। পর্ত্তুগালের অধীশ্বর এইরূপে অধিকারলাভ করিয়া, ভারত-বিজয়ের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োদশ অর্ণবপোত সজ্জীভূত হইল; তাহাতে গোলা, বারুদ ও কামান উত্তোলিত হইল; যাহারা সুবিখ্যাত নাবিক,—সুশিক্ষিত সৈনিক,—তাহারাই ভারত-যাত্রার জন্য নির্ব্বাচিত হইল।

---

* Lord of the conquest, Navigation and commerce of Ethiopia Arabia, Persia and India.—*Danvers's Portuguese in India.* Vol I. 64.

খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারের জন্য সপ্তদশ ধর্ম্মপ্রচারক সজ্জীভূত হইলেন। পিড্রু আল্‌ভারেজ কেব্‌রাল এই নৌবাহিনীর অধিপতি হইয়া ভারত-যাত্রায় বহির্গত হইলেন। ৮ই মার্চ্চ ১২০০ আরোহী লইয়া ত্রয়োদশ অর্ণবপোত যখন বিজয়-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন পর্ত্তুগালের অধীশ্বর স্বহস্তে নৌসেনাপতির হস্তে এক মন্ত্রপূত বিজয়পতাকা সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন,—"ধর্ম্মপ্রচারকগণ যে সুসমাচার প্রচার করিবেন, তাহা গ্রহণ না করিলে, বিধর্ম্মিগণকে নিহত করিতে হইবে!" * খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারের এরূপ অমোঘ উপায় যাঁহাদের ইতিহাস চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা কিরূপ নিষ্ঠুর প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

স্যার উইলিয়ম হণ্টার ভারতবর্ষের ইতিহাস-সংকলন করিবার সময়ে পর্ত্তুগাল-রাজের এই নিষ্ঠুর রাজাজ্ঞার উল্লেখ করেন নাই। পর্ত্তুগালের ইতিহাস-লেখকগণ সগর্ব্বে ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণও ইহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই!

আফ্রিকার পশ্চিমতটের নিকট দিয়া দক্ষিণাভিমুখে পোতচালনা করিবার সময়ে, ঝটিকাবেগে পোত সকল পথভ্রষ্ট হইয়া, অন্য পথে ধাবিত হইতে লাগিল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনাই পর্ত্তুগালের পক্ষে এক নূতন সৌভাগ্যলাভের কারণ হইয়া উঠিল। এপ্রিল মাসের শেষে নৌ-সেনাপতি দেখিলেন,—সম্মুখে এক নিবিড় বন;—তাহা ভারতবর্ষের তালবন নহে,—এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন রাজ্যের সমুদ্রসীমা! পর্ত্তুগাল এইরূপে যে রাজ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইল, তাহা এক্ষণে ব্রেজিল দেশ নামে সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছে। একদিনে এই নূতন রাজ্য পর্ত্তুগালের অধিকারভুক্ত হইল, কেবল বায়ুপ্রবাহের উচ্ছৃঙ্খল গতি এইরূপে অকস্মাৎ পর্ত্তুগালের সৌভাগ্যবর্দ্ধন করিল! †

---

* On the 8th of March, the king, having heard Mass, in the Convent of Belem, placed a consecrated banner in the hands of Cabral, who accompanied by eight Fanciscan Missionaries was instructed to destroy all infidels, refusing to listen to the christianity which the Friars preached.—*Portuguese Discoveries, P. 23-24*

† Thus the immense Empire of Brazil, the brightest jewel in the Portuguese Crown, was won in a single day, Providence requiring merely to invoke the winds.—*Portuguese Discoveries, P. 24.*

বিজয়-যাত্রার প্রথম উপক্রমে নবরাজ্যে পর্ত্তুগালের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নৌ-সেনাপতি পুনরায় উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভাস্কো ডা গামা যে পথে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা নাবিকগণের অপরিচিত ছিল না। অল্পদিনের মধ্যেই পোতসমূহ তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, ভারতবর্ষাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। চারিখানি অর্ণবপোত পথভ্রষ্ট হইয়া অকূল সাগরে আত্মসমর্পণ করিল; অবশিষ্ট অর্ণবপোত সেপ্টেম্বর মাসে কালিকটে উপনীত হইল।

এবার ফিরিঙ্গি বণিক্ বীরবিক্রমে অগ্রসর হইয়াছেন; এবার কালিকটের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র কামান সকল ভীমগর্জ্জনে নাগরিকগণের ভীতি-উৎপাদন করিয়া, ফিরিঙ্গি বণিকের আগমনবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত করিয়া দিল। ইহারা যে দুর্দ্দান্ত জলদস্যুমাত্র, মুসলমানগণ রাজাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রাজাজ্ঞায় কালিকটের বন্দরে ফিরিঙ্গি বণিকের একটি কুঠী সংস্থাপিত হইল। মুসলমানগণের উপদেশে পণ্যবিক্রেতৃগণ সাবধান হইল, তাহারা পুরাতন ক্রেতৃগণকেই পণ্যবিক্রয় করিতে লাগিল। কেব্রাল ইহাতে অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়া, একখানি মুসলমানের বাণিজ্যতরণী লুণ্ঠন করিলেন। মুসলমানগণ রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিতে ত্রুটি করিলেন না; ফিরিঙ্গি বণিক যে সত্য সত্যই জলদস্যুমাত্র, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিলেন না। কিন্তু রাজা তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি মুসলমানগণকে বলিলেন,—"তোমরাও যাহা করিতে পার, কর।" মুসলমানগণ এইরূপে স্বাধীনতালাভ করিয়া, নাগরিকবর্গের সহিত মিলিত হইয়া, ফিরিঙ্গি বণিকের কুঠী আক্রমণ করিয়া, কুঠীয়ালগণকে নির্দ্দয়রূপে নিহত করিলেন। তখন আর শান্তিসংস্থাপনের সম্ভাবনা রহিল না। ফিরিঙ্গি বণিক্ অর্ণবপোত হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া, নগর আক্রমণ করিলেন; মুসলমানের বাণিজ্যতরণী লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; জলে স্থলে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

নাগরিকগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন না। ফিরিঙ্গি বণিক্ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। বাহুবলের পরিচয়প্রদান করিবার উপযুক্ত অবকাশ উপস্থিত হইবামাত্র যুদ্ধ আরব্ধ হইল। মুসলমানগণের দশখানি পণ্যপূর্ণ বাণিজ্যতরণী লুণ্ঠিত হইল। ফিরিঙ্গি বণিক্ সেই সকল অর্ণবপোতে অগ্নিসংযোগ করিলেন; অসহায় নাগরিকগণ তীরে দাঁড়াইয়া এই সর্ব্বনাশ দর্শন করিতে লাগিল;

তখন তীরের দিকেও প্রচণ্ডবিক্রমে গোলাবর্ষণের সূত্রপাত হইল। কত লোক প্রাণত্যাগ করিল, কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইল; কত লোক নগরত্যাগ করিল; নগরের একাংশ ভস্মীভূত হইয়া গেল! তখন ফিরিঙ্গি বণিক্ কালবিলম্ব না করিয়া, পলায়ন করিলেন; তাঁহাদের তরণীসমূহ কালিকট ছাড়িয়া কোচীন বন্দরে উপনীত হইল। কালিকট-রাজ এত দূর ভাবিয়া দেখেন নাই। এখন বন্দর-রক্ষার জন্য তাঁহাকেও আয়োজন করিতে হইল। জলদস্যু-দমন করিতে না পারিলে, বাণিজ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইবে; তাহা বুঝিতে পারিয়াই কালিকট-রাজ রণতরণী সজ্জীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ফিরিঙ্গি বণিকের প্রবল প্রতাপের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, কোচীনরাজ সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। কোচীন বন্দরে ফিরিঙ্গি বণিকের কুঠী সংস্থাপিত হইল; তাহাতে কুঠীয়ালগণ বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কোচীন-রাজকে কালিকটের সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া দিবেন বলিয়া কেব্রাল স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সংবাদ আসিল, কালিকট-রাজের রণতরণী কোচীন আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছে! ফিরিঙ্গি বণিক্ এই সংবাদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, কুঠীয়ালগণকে কোচীনে রাখিয়া, কোচীনের অনেক ব্রাহ্মণকে অর্ণবপোতে তুলিয়া লইয়া স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন! * নানা ক্লেশে ছয়-খানিমাত্র অর্ণবপোত পর্ত্তুগালে উপনীত হইল।

ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষে শান্তভাবে বাণিজ্যব্যাপারে অর্থোপার্জ্জন করিবার অসুবিধা ছিল না। ফিরিঙ্গি বণিক্ সে পথে অগ্রসর না হইয়া যে পথের পথিক হইয়াছিলেন, তাহা পর্ত্তুগালের জনসাধারণের নিকট নিরতিশয় আপৎসংকুল বলিয়াই প্রতিভাত হইল। যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারিলেন,—ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের আশা আকাশকুসুমে পরিণত হইবে। কিন্তু পর্ত্তুগালের অধীশ্বর তাহাতে ভীত বা বিচলিত হইলেন না;—তিনি বাহুবলকেই প্রকৃত বল বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। সুতরাং পুনরায় বাহুবলে কালিকট ধ্বংস করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। জলে স্থলে সমরঘোষণা না করিলে,

* The Admiral, 'judging discretion the better part of valour', and avoiding the [illegible] sailed for Lisbon, and left the Raja of Cochin to his fate.—[illegible] Discoveries P. 25 26.

ভারতবাণিজ্যে পর্ত্তুগালের অধিকার সংস্থাপিত হইবে না। এই বিশ্বাসে পর্ত্তুগালের অধীশ্বর বাহুবল-প্রয়োগের জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন।

এ দিকে কালিকট-রাজের রণতরণীসমূহ কোচীন বন্দরের নিকটবর্ত্তী হইলে, ফিরিঙ্গি বণিকের পলায়নবার্ত্তা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তখন কালিকট-রাজের নৌ-সেনাপতি কোচীন-রাজের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া ফিরিঙ্গি কুঠীয়ালগণকে ধৃত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কোচীন-রাজ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন কোচীন ও কালিকটের বাণিজ্য-কলহ সমর-কলহে পরিণত হইল। মালাবারের উপকূলে এইরূপে যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহাতেই বাণিজ্যলক্ষ্মী ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইল। জলে স্থলে হিংসাদ্বেষ ও পরস্বাপহরণ প্রবল হইতে লাগিল। এই সময়ে পর্ত্তুগাল হইতে যে সকল বাণিজ্যতরণী সমাগত হইয়াছিল, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কোচীন-রাজ যত্ন করিতে লাগিলেন; কালিকট-রাজ তাহাদের ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। পর্ত্তুগালের বাণিজ্যতরণী কোনরূপে পর্ত্তুগালে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র পর্ত্তুগালরাজ কালিকট-ধ্বংস করিয়া অন্যান্য বন্দরের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য কৃত-সংকল্প হইলেন।

১৫০২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ভাস্কো ডা গামা সসৈন্যে ভারতযাত্রা করিলেন। এবার কেবল ভারতবর্ষে যাতায়াতের অভিনব জলপথের আবিষ্কারকামনা তাঁহাকে ভারত-যাত্রায় উৎসাহযুক্ত করে নাই। এবার বৈরনির্য্যাতনের প্রবল উত্তেজনায় পার্ত্তুগীজ সেনাপতির ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গেল। গামা ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, কালিকট আক্রমণ করিয়া, নগর-প্রাচীরের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন; বন্দরের মুসলমান বণিগ্‌বর্গের বাণিজ্য-তরণী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন, মালাবারের অন্যান্য বন্দরে উপনীত হইয়া, কুঠী সংস্থাপিত করিয়া, একটি কুঠীতে গোপনে গোলা, বারুদ ও কামান ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন; এবং তীররক্ষার্থ রণতরণী সংস্থাপিত করিয়া, কালিকটের রণতরণীসমূহ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাস্কো ডা গামা যেন দুর্দ্দান্ত জলদৈত্যের মত সর্ব্বত্র ধাবিত হইতে লাগিলেন। কালিকটের রণতরণী পরাভূত হইল। কালিকট-রাজের নৌসেনা গামার নিকট বন্দি-বেশে আনীত হইল। গামা ৮০০ বন্দীর নাসা কর্ণ ও হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া, তাহা উপঢৌকনস্বরূপ কালিকট-রাজকে প্রেরণ করিলেন!

[illegible]গণ [illegible] মুক্তিলাভ করিল না। কাষ্ঠফলকের আঘাতে [illegible]দের দন্তপংক্তি উৎপাটিত হইতে লাগিল! এক জন [illegible]ণদূত উপনীত হইবামাত্র, গামা তাঁহার কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া, তাহার স্থলে কুক্কুরের কর্ণ সংযুক্ত করিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণদূতকে কালিকট-রাজের নিকট প্রেরণ করিলেন! এই সকল পাশব অত্যাচারের প্রতিবাদ করায়, গামার প্রধান পোতাধ্যক্ষ জনৈক মুসলমান বণিকের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিতে করিতে তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়া, তাঁহার মুখে শূকরের মাংস বাঁধিয়া দিলেন! ইতিহাসে এরূপ লোমহর্ষণ অত্যাচারকাহিনী অধিক লিপিবদ্ধ হয় নাই। এরূপে দিগ্বিজয় সুসম্পন্ন করিয়া, ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। ফিরিঙ্গি বণিকের নামে কালিকটের নাগরিকগণ শিহরিয়া উঠিল। কালিকট-রাজ বুঝিতে পারিলেন,—কোচীন-রাজের সহায়তা লাভ করিয়াই গামা এত দূর স্পর্দ্ধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন কোচীন বন্দর আক্রান্ত হইল;—কালিকট ও কোচীনের মধ্যে চিরশত্রুতা প্রতিষ্ঠিত হইল!

ভাস্কো ডা গামার স্বদেশীয় লেখকবর্গ তাঁহার এই সকল পাশব অত্যাচারের পক্ষসমর্থন করিয়াই ইতিহাসের রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উত্তরকালের খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ ইহার পক্ষসমর্থনের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা ইহাকে কালধর্ম্ম বলিয়াই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।[*]

কালিকট-রাজের অপরাধ ছিল না, মুসলমান বণিকবর্গেরও বিশেষ অপরাধ ছিল না। কালিকট-রাজ ফিরিঙ্গি বণিকের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়া মিত্রতারক্ষার্থ আপন প্রজাবর্গের প্রকৃত অভিযোগেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মুসলমান বণিকবর্গ প্রথমে ফিরিঙ্গি বণিককে আক্রমণ করেন নাই, তাঁহাদের বাণিজ্যতরণী লুণ্ঠিত হইবার পর, তাঁহারা রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। রাজা সে অভিযোগে কর্ণপাত না করায়, তাঁহারা ফিরিঙ্গি বণিকের কুঠী আক্রমণ করায় কুঠীয়ালগণ নিহত হন। বিচার

---

[*] It is unnecessary to multiply these frightful recitals, but it was requisite to give some idea of the arrogance and cruelty of the Portuguese conquerors. Of course, every attempt is made by their fellow countrymen to justify or palliate such atrocities as we have described. But though the bad faith of the Hindu monarchs and the perfidious insinuations of the Moors may explain the conduct of the Admiral, the spirit of his age can alone excuse it.—*Portuguese Discoveries, P. 32.*

করিয়া দেখিলে, ইহার জন্ত কালিকট-আক্রমণের পক্ষ সমর্থন করা যায় না। কিন্তু যে যুগে এই সকল ঘটনা সংঘটিত হয়, সে যুগে ইউরোপের বিচারবুদ্ধি মার্জ্জিত হয় নাই ;—তখনও বাহুবলই সকল তর্কের মীমাংসা করিয়া দিত,—তখনও পাশব অত্যাচারই বাহুবলের পরাকাষ্ঠা বলিয়া পরিচিত ছিল।

দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে উপনীত হইবামাত্র গামা কালিকট-রাজকে বলিয়া পাঠাইলেন,—মুসলমানগণকে চিরনির্ব্বাসিত না করিলে, কালিকট ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। হিন্দুনরপতি মুসলমান প্রজাবর্গের বাণিজ্যরক্ষার্থ সর্ব্বস্বান্ত হইতে প্রস্তুত না হইলে, কালিকট ধ্বংস হইত না। কিন্তু কালিকট-রাজ রাজধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া নগররক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। ইহাতেই অনর্থ উৎপন্ন হইল। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে,—যাহা চরিত্রগুণ, তাহার জন্তই কালিকটের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।

হেমচন্দ্র।

হে কবি, হে পূজ্য কবি, চির-দুঃখিনীর
ভক্তিমান কীর্ত্তিমান কৃতজ্ঞ সন্তান।
অন্ধ আঁখি আজীবন ঢালি' অশ্রুনীর
ক্রীতদাসী জননীর হেরি' অসম্মান।
অক্ষরে অক্ষরে তব হৃদয়-রুধির
কি গৌরবে মহাযজ্ঞে করিছে আহ্বান!
নিরাশা নির্ভীক আজ—বিশ্বাস গভীর,
অন্ধ বর্ত্তমান হেরে ভবিষ্য মহান!

হে দরিদ্র, একদিন ক্ষোভে শোকে দুখে,
আলোড়িলে জীবনের উদ্দেশ্য অতল!
হে জয়ন্ত, তব যশো-মুকুট-ময়ূখে
জটিল কর্ত্তব্য আজ সরল উজ্জ্বল!
স্বর্ণ-সিংহাসনে নৃপ দুদিন জীবনে,
মরণে প্রতিষ্ঠ তুমি চির হৃদাসনে!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

প্রাচীন মিশরের ক্ষত্রিয়।

একদিন আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়া অনার্য্যদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সেই সমরক্রীড়ায় বেদ-কথিত 'দস্যু'গণ পরাজিত হইয়াছিল। আর্য্যগণ অপ্রতিহতবিক্রমে দেশের পর দেশ, গ্রামের পর গ্রাম অধিকার করিয়া দোয়াবখণ্ডে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা অধিক বলশালী ছিলেন, তাঁহারা ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া কালক্রমে অযোধ্যায়, কোশলে, উত্তর-বিহারে, বিদেহে ও বারাণসীতে কাশী-বংশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তখন ভারতের সর্ব্বত্র আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্য আচার-ব্যবহার, আর্য্য রীতিনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত ও অনার্য্যদিগের উপর আর্য্যদিগের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল।

বিজিত বিধ্বস্ত অনার্য্যগণ তখন আর্য্যদিগের দাসত্ব-শৃঙ্খল ধারণ করিয়া ভিক্ষাপাত্রকরে আর্য্যদিগের কৃপাপ্রার্থী হইয়া দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতে লাগিল; আর দাসত্ব-শৃঙ্খল হেয় জ্ঞান করিয়া যাহারা প্রান্তরে, কান্তারে, শৈলে, সাগরে আশ্রয়গ্রহণ করিল, তাহারা প্রতিষ্ঠিত আর্য্যজাতির উপর অত্যাচার করিয়া, তাঁহাদিগের ধনরত্ন, গো, বৎস লুণ্ঠিত করিয়া 'দস্যু'-আখ্যায় পরিচিত হইল। পৃথিবীর ইতিহাসে এ কাহিনী চির-পুরাতন ও সদা সত্য। স্যাকসন-দিগের শুভাগমনে ব্রিটনের যে অবস্থা হইয়াছিল, ব্রিটনের শুভাগমনে এক কালে আমেরিকাবাসীদিগের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, লেসি-ডিমোনিয়নদিগের অনুগ্রহে স্পার্টার আদিম অধিবাসিবৃন্দের যে দশা হইয়াছিল,—আর্য্য-অনার্য্য-বিপ্লবে অনার্য্যদিগের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

যুদ্ধকলহ চিরদিন থাকে না; চিরদিন ছিল না। আর্য্য ও অনার্য্যের তপ্ত শোণিতে একদিন যে সকল ভূমি সিক্ত হইয়াছিল, কালক্রমে সে সমুদয় শুষ্ক হইল। বিজেতা আর্য্যগণ শান্তির স্নিগ্ধ শুভ্র আলোকে মঞ্জুকুঞ্জবনবেষ্টিত গৃহাদির নির্ম্মাণ করিয়া, উর্ব্বরা ভূমিতে শস্যের উৎপাদন করিয়া, গৃহধর্ম্মপালনে মনো-নিবেশ করিলেন। 'দস্যু'দিগের উপদ্রব তখনও তিরোহিত হয় নাই। কানন সংস্কৃত হইয়া গ্রামে পরিণত হইল, গ্রাম সমৃদ্ধিশালী নগরে উন্নত হইয়া আর্য্যগৌরবের ঘোষণা করিতে লাগিল,—দেশে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতির সূচনা হইল; কিন্তু পলায়িত অনার্য্য-দস্যুদিগের অত্যাচার উপদ্রব তখনও কমিল

না। আর্য্যগণ আত্মরক্ষার উপায়-অবলম্বনে অবহিত হইলেন। তখনও আর্য্যসমাজের সকলেই যোদ্ধা।

তখন কতকগুলি সবলকায় সাহসী বীরপুরুষ অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আর্য্য জাতির গ্রাম ও জনপদ, ধন ও রত্নের রক্ষার্থ জীবন উৎসর্গ করিলেন। যখন আর্য্যগণ পঞ্চনদে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখনও রাজপদের তেমন সম্মান হয় নাই; তখন সকলেই বীর, সকলেই যোদ্ধা, সকলেই অস্ত্রধারণক্ষম। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান ছিলেন, সমরাঙ্গণে যাঁহাদের তূর্য্যাভ-নিনাদে সমগ্র আর্য্য-বাহিনী পরিচালিত হইত, তিনি জেতার স্বাভাবিক সম্মান ও গৌরব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। এইরূপে, 'দস্যু'র অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইবার জন্যই এক সময়ে যাঁহারা অস্ত্রে শস্ত্রে কৃপাণে কার্ম্মুকে সর্ব্বদা সজ্জিত হইয়া সামাজিক শান্তি-সংস্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহারাই কালক্রমে ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন; 'ক্ষত' হইতে আর্য্যকুলকে ত্রাণ করিতেন বলিয়া, তাঁহারা ক্ষত্রিয়-নামে পরিচিত হইয়াছিলেন

দেখিতে পাওয়া যায়, মিশর-রক্ষার্থই মিশরের ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধৃজাতির উত্থান হইয়াছিল। পুরোহিতগণ ভারতের ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের ন্যায় ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, সুতরাং স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের রক্ষার্থ বেতনভোগী সৈনিকের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু মিশরীয়গণ বুঝিয়াছিলেন, সন্তান যেমন জননীর বেদনা দূর করিবার জন্য ব্যাকুল হইবে, অর্থলুব্ধ বৈদেশিক-তনয় তেমন হইবে না,—তাই মিশরের ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু সর্ব্বদা সংগ্রাম-রণক্ষেত্রে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের যে রূপ আত্মবলিদানে প্রস্তুত তাহাদিগের ভরণপোষণের ভার স্বদেশের উপর, তাহাদিগের অধিকার অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকার অপেক্ষা স্বতন্ত্র ছিল। তাহারা ঋণের দায়ে কখনই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইত না। মিশরাধিপতি সেসষ্ট্রিস (Sesostris) অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন যে, মিশরের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি ক্ষত্রিয়সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যাহাদিগের কিছুই নাই, তাহারা তস্করের ভয়ে ভীত নহে; যাহার ধন আছে, তাহারই হারাইবার শঙ্কা অধিক। সুতরাং ভূম্যধিকারী হইয়া ক্ষত্রিয়দিগের অন্তরে মিশরের প্রতি মায়া ও স্নেহ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল,—পাছে হারাইতে হয়, এই ভয়ে তাহারা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত; মিশরের অরাতিকুল তাহা দেখিয়া নিরুৎসাহ হইত।

মিশরের সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ধর্ম্মে কর্ম্মে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার বিধান ছিল। মানবের চিত্ত বৃত্তিবিশেষ যদি বংশানুক্রমে উন্নতিমার্গে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে কালে সেই বিষয়ে তাহার বংশধরগণের শ্রেষ্ঠত্ব জন্মে, এই দার্শনিক তত্ত্ব মিশরীয়গণ অনেক দিন পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা প্রত্যেকে আপন আপন জাতিনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়েই লিপ্ত থাকিতেন। পুরোহিত-তনয় পুরোহিত হইত, ক্ষত্রিয়-সন্তান ক্ষত্রিয় হইত,—সে অস্ত্রধারণ করিয়া অক্লেশে সমরাঙ্গণে সুখ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সৌভাগ্যবান্ বলিয়া সুপরিচিত হইত, কিন্তু অন্য কর্ম্ম করিত না। তবে ভারতেও যেমন, মিশরেও তেমনই কখনও কখনও গুণ-কর্ম্মানুসারে নিম্ন শ্রেণী উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইত; সে কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি। মনুর বাক্য,—

> শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্
> ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাত্তথৈব চ । ১০।৬৫

অথবা মহাভারতের,—

> ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ
> ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ।—শান্তিপর্ব্ব ।

ভারতে যেমন, মিশরেও তেমনই প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

ক্ষত্রিয়ের শিক্ষার জন্য মিশরে রণ-বিদ্যালয় ছিল কি না, তাহা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু ক্ষত্রিয়সন্তান পিতার অসি সগৌরবে ধারণ করিয়া স্বদেশের জন্য প্রাণপাত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। ইহা পূর্ব্বশিক্ষার ফল, সন্দেহ নাই। শৈশব হইতে শিক্ষা না পাইলে এরূপ ইচ্ছা বলবতী হয় না; অনেক সময় হৃদয়ের সাহসও কমিয়া যায়। তাই মনে হয়, মিশরে নিশ্চয়ই রণ-বিদ্যালয় ছিল। সেই সকল 'আকড়া'য় ক্ষত্রিয়সন্তানগণ অসি-চালন, সায়ক-নিক্ষেপ, লোষ্ট্র-চালন, ভল্লযুদ্ধ প্রভৃতি নানা বিদ্যা শিক্ষা করিত।

রাজকীয় বিধি এইরূপ ছিল যে, প্রত্যেককেই সর্ব্বদা যুদ্ধাভিযানার্থ আবশ্যক দ্রব্যাদির সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইত, এবং প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ই নিজ ব্যয়ে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার উপযোগী স্বদেশীয় অস্ত্রাদিও রাখিত। মুহূর্ত্তমাত্রে তাহারা যাহাতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারে, অথবা অভিযানে যাত্রা করিতে পারে, প্রত্যেক সৈনিকই সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিত। এই সকল কারণে ক্ষত্রিয় অলস হইবার অবসর প্রাপ্ত হইত না। তাহারা সর্ব্বদাই কর্ম্ম-লিপ্ত থাকিত।

সে কালে সমগ্র মিশরে Calasiries এবং Hermotybies এই দুই ভাগে বিভক্ত ৪১০০০০ জন যোদ্ধ্ পুরুষ ছিল। ইহাদিগের মধ্যে প্রতি বৎসর ১০০০ জন মিশরাধিপের শরীর-রক্ষক-স্বরূপ কার্য্য করিত।

প্রত্যেক সৈনিক ১২০০০০ হস্ত পরিমিত ভূমি জায়গীরস্বরূপ ভোগ দখল করিত; তাহারা যখন প্রকৃত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত, তখন প্রত্যেকে পাঁচ মিনি* রুটী, দুই মিনি পরিমিত গোমাংস ও দুই পাইণ্ট সুরা রাজসরকার হইতে প্রাপ্ত হইত। শান্তির সময়ে সৈনিকগণ স্ব স্ব জায়গীরে বসবাস করিত। সমৃদ্ধিশালী নগরের নানা প্রলোভনে ও কষ্ট-হীনতায় মানুষ অলস ও অমিতাচারী হয়, তাহাদের শারীরিক ও নৈতিক অবনতির পথ উন্মুক্ত হয়, তাই ক্ষত্রিয়গণ নগরে বাস করিতে পাইত না। কুচ্‌কাওয়াজ, মল্লযুদ্ধ, সন্তরণ, যষ্টিক্রীড়া, লম্ফ ঝম্ফ প্রভৃতি নানাবিধ ব্যায়ামে সদা ব্যাপৃত থাকিয়া মিশরের ক্ষত্রিয় সৈনিকগণ মহানন্দে [illegible]জীবন অতিবাহিত করিত।

মিশরে সেকালে বিবিধ প্রকার পতাকা ব্যবহৃত হইত। প্রত্যেক সৈনিক-দলের পতাকা ভিন্নপ্রকার ছিল, স্ব স্ব পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহারা অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জন করিত,--এক জন যোদ্ধা জীবিত থাকিতে মিশরের পতাকা শত্রুহস্তে নিপতিত হইত না। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আপনাদের বিজয়পতাকারক্ষার্থ সৈনিকগণ অসংখ্য অসমসাহসিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইত। একবার একটি যুদ্ধে মিশরের সেনাদল ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, সেনাপতি কৌশলে স্বীয় জাতীয়পতাকা শত্রুব্যূহমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন; সৈনিকগণ যখন দেখিল, বিজয়লক্ষ্মী শত্রুকরতলগত, তখন তাহারা অমিতবিক্রমে অরিকুল ধ্বংস করিবার মানসে প্রমত্ত ভৈরবের মত ছুটিতে লাগিল, এবং অচিরে মিশরের জয়লাভ ঘটিল।

তখনকার যুগে নরহত্যার উপকরণ এখনকার মত এত অধিক ছিল না, এমন ভীষণও ছিল না। মিশরীয়গণ অসি, ধনুর্ব্বাণ, ভল্ল, ছুরি, ছোরা, কুঠার, যষ্টি প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিত; ধাতুনির্ম্মিত বর্ম্মে দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ আবৃত করিয়া, ধাতুনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণে মস্তকরক্ষা করিয়া, অসি-চর্ম্ম-হস্তে মিশরের ক্ষত্রিয় বীরগণ যখন সমরপ্রাঙ্গণে স্ব স্ব বিজয়পতাকামূলে সমবেত হইত, তখন মনে হইত, অসীম বীর্য্যের জীবন্ত মূর্ত্তি যেন মিশরের রাজসিংহাসনতলে

---

* 1 Mine = 1 lb 1 Oz. 4 gros

আত্মবলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তীক্ষ্ণ বল্লমহস্তে পদাতিকগণ, অসি-করে অশ্বসাদিগণ ও বাণপূর্ণ তূণ ও সুদৃঢ় কার্ম্মুকে সুশোভিত হইয়া নেতৃবর্গ দারুবিনির্ম্মিত দৃঢ় রথে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইত।

ভারতের ক্ষত্রিয়ের ন্যায় মিশরের ক্ষত্রিয়কুলও ক্ষমাগুণে ভূষিত ছিল। তাহারা অযথা শোণিতপাত করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইত। অধুনা আমরা সভ্যতার পথে যতই অগ্রসর হইতেছি, নরহত্যার স্রোত ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে যখন জাপান হত্যাকাণ্ডের অভিনয়ে অপটু ছিল, তখন ইতিহাস তাহাকে 'অসভ্য' বলিয়াছে; কিন্তু আজ সেই জাপান সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে সুপ্রতিষ্ঠিত! মানুষ যত দিন অসভ্য থাকে, বর্ব্বর থাকে, তত দিনই অকারণে সকারণে শোণিতপাত করিয়া তৃপ্ত হয়; তত দিনই প্রতিশোধ অর্থে চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু, কর্ণের পরিবর্ত্তে কর্ণ, শোণি-তের পরিবর্ত্তে শোণিত লইতে চায়, ইহাই ইউরোপীয় অভিমত; কিন্তু সেই অসভ্যতা বর্ব্বরতার যুগেও, সেই তমসাতিমিরের মধ্যেও, আমাদিগের ভারতেও যেমন, প্রাচীন মিশরেও তেমনই, দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনে, ও সমরক্ষেত্রে আদৃত হইয়াছে। শত্রু বিপর্য্যস্ত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে বিজয়ী ক্ষত্রিয় তাহার সহিত আর যুদ্ধ করে নাই; শরণাগত হইলে শুশ্রূষা করিয়া তাহার রক্ষা করিয়াছে,—প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ত্রত্যাগ করিলে বিজয়ী বীর নিরস্ত্রের দেহে আর কখনই অস্ত্রাঘাত করে নাই। মিশরের ন্যায় ভারতেও ক্ষত্রিয় বহুকাল পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের আচার রক্ষা করিয়াছে।

শত্রুপক্ষের কত জন হত হইয়াছে, যুদ্ধান্তে তাহার সংখ্যা-নির্ণয় সর্ব্বদাই জেতার প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে;—তাই প্রত্যেক যুদ্ধের পর মিশরীয় সৈনিকগণ নিহত অরাতির হস্তচ্ছেদ করিয়া লইয়া আসিত। রাজা স্বয়ং সেই সকল ছিন্ন হস্ত গণনা করিয়া দেখিতেন। যাহাতে সংখ্যা-নির্ণয় নির্ভুল হয়, সেই জন্যই এই উপায় অবলম্বিত হইত,—শত্রুর অপমানের জন্য এই বিধান কল্পিত হয় নাই। যুদ্ধান্তে মৃত শত্রুর অঙ্গচ্ছেদ, আনুষ্ঠানিকবোধে মিশরবাসিগণ অন্যায় বলিয়া মনে করিত না। কিন্তু যে সেনাপতি যত অধিক বন্দী সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তাঁহার প্রশংসা তত অধিক হইত। মিশরে ধর্ম্মভাব এত প্রবল ছিল যে, রণক্ষেত্রেও সেনাপতির পটবাসের নিকট শুদ্ধভাবে দেব দেবীর মূর্ত্তি রক্ষিত হইত,—ক্ষত্রিয়গণ ভক্তিভরে দেবতার চরণকমলে প্রণত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সমরে প্রবৃত্ত হইত।

যুদ্ধ শেষ হইলে, সুবিধা ও সুযোগ অনুসারে, পরস্ব-লুণ্ঠন ও নাগরিকদিগের উপর উপদ্রব চিরপ্রচলিত। মিশরেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিত না;—রীতিমত লুণ্ঠন চলিত। কিন্তু অত্যাচার উপদ্রবের মাত্রা অনেক অল্প ছিল। বিজয়োন্মত্ত সৈনিকগণ দলে দলে অরাতিগণকে বন্দী করিত, এবং কখনও কখনও অযথা যন্ত্রণাও যে না দিত, এমন নহে। কিন্তু সুসভ্য ইউরোপীয়দিগের তুলনায় এরূপ অত্যাচারের সংখ্যা সেই অসভ্যতা ও অন্ধকার যুগেও মিশরে অনেক অল্প ছিল। তাই এক জন ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন,

"But when we remember how frequently instances of harsh treatment have occurred, even among *Civilised Europeans*, at an epoch which deemed itself much more enlightened than the 14th Century before our era, we are disposed to excuse the *Occasional insolence of an Egyptian soldier.*

সমরে বিজয়লাভ করিয়া যখন মিশরের ক্ষত্রিয়বাহিনী মহোল্লাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, তখন সমগ্র মিশর যেন আনন্দে সজীব হইয়া বীরের যথোচিত সম্মানবিধানে অগ্রসর হইত। বহুমূল্য উপঢৌকন সমভিব্যাহারে নাগরিকগণ বিজয়ী নৃপতির অভিনন্দন করিত; পুরোহিতগণ সমবেত হইয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেন,—এবং নৃপতির গুণবর্ণনায় ব্যাপৃত হইতেন। বিজয়ী নরপতি রাজধানীতে উপনীত হইয়া প্রধান প্রধান দেবমন্দিরে যথাবিহিত পূজার ব্যবস্থা করিতেন; লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ও বন্দিগণ তাঁহার সম্মুখে আনীত হইত;—তিনি ভক্তিভরে দেবতার পাদমূলে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া মন্দিরদ্বারে প্রণত হইতেন। ক্ষত্রিয়গণও সমবেত হইয়া সমরে বিজয়লাভের জন্য ও অক্ষত-সুস্থদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিয়াছে বলিয়া, কৃতজ্ঞহৃদয়ে দেবপূজায় যোগদান করিত। পুরোহিতগণ প্রফুল্লহৃদয়ে সকলকে দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া, উল্লসিত সৈন্যগণমধ্যে দেবপ্রসাদ-বণ্টনে নিযুক্ত হইতেন। বন্দীকৃত অরাতিকুল মিশরে আসিয়া কৃতদাসস্বরূপ রাজসেবায় জীবনপাত করিত। তাহারা মন্দিরাদি-নির্ম্মাণ, পরিখা-খনন, প্রাচীর-গঠন প্রভৃতি নানাবিধ সাধারণ হিতকর কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিত।

অপরাধীকে সংশোধন করিবার জন্যই মিশরের বিচারকগণ অপরাধের দণ্ডবিধান করিতেন, অপরাধীকে যন্ত্রণা দিবার জন্য নহে। কোনও যোদ্ধৃপুরুষ অপরাধী হইয়া বিচারার্থ আনীত হইলে, দণ্ডস্বরূপ তাহাকে অপমানসূচক একটি বিশেষ পরিচ্ছদ সর্ব্বদা পরিধান করিয়া থাকিতে হইত—উহাই দণ্ডস্বরূপ গণ্য হইত। সেই হীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অপরাধী সৈনিক

যখন তাহার সঙ্গিগণের নিকট গমন করিতে বাধ্য হইত, তখন অপমানে, ঘৃণায়, লজ্জায় তাহার চিত্ত দগ্ধ হইত। সেই পরিচ্ছদ ধারণ করিবার কোনও নির্দিষ্ট কাল ছিল না। অপরাধী যত দিন তাহার সদ্ব্যবহারে, কর্ত্তব্যপালনে ও আত্মানুশোচনায় উদ্ধতন কর্ম্মচারীকে তুষ্ট করিতে না পারিত, তত দিন শাস্তি ভোগ করিত। কিন্তু স্বদেশদ্রোহী ক্ষত্রিয়ের দণ্ড ভয়াবহ ছিল। রাজার বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হইত না! যে কলুষিত জিহ্বা অক্লেশে স্বদেশের গুপ্তমন্ত্রণা শত্রুশিবিরে ব্যক্ত করিয়াছে, কঠোর রাজবিচারে সেই হীন জিহ্বা কর্ত্তিত হইত; জিহ্বাবিহীন হতভাগ্য তখন প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করিত।

ভারতে রাজন্যজাতির সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, —

পঞ্চনদে প্রাদুর্ভাবের সময় রাজগণের তত সম্মান হয় নাই। সকলেই যোদ্ধা, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, যাঁহার অধিনেতৃত্বে দেশ প্রদেশ করায়ত্ত হইত, তিনি নেতার স্বাভাবিক সম্মান পাইতেন, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু গাঙ্গাপ্রদেশে প্রাধান্যলাভসময়ে আর্য্যদের এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। সাধারণ লোকেরা রাজাদের আড়ম্বর এবং স্ব স্ব অবস্থা হইতে তাঁহাদের ভোগবিলাসাদি বিষয়ে অত্যন্ত প্রভেদ দেখিয়া, তাঁহাদিগকে এক শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল। এক দিকে সাধারণ লোকের অবনতি—অন্য দিকে রাজাদের আড়ম্বরপ্রিয়তা, তাহার উপর পুরোহিতদিগের কল্পনা— এই তিনে মিলিয়া ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিল।

গঙ্গাবারিবিধৌত শ্যামল সুন্দর গাঙ্গ্যপ্রদেশ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে করিতে অকুতোভয় আর্য্যগণের সাহস কমিয়া গিয়াছিল, শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে কৃপাণপাণির শৌর্য্যের, বীর্য্যের, তেজস্বিতার লক্ষণগুলি তাঁহাদিগের চরিত্র হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাই রামায়ণ-পাঠে সামাজিকতার, সদ্বিচারের, মার্জ্জিত রুচির যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, মহাভারত-বর্ণিত সেই অসীম বীরত্বের প্রাণোন্মাদকারী দৃষ্টান্ত আর তেমন দেখা যায় না; —তাই তখনকার যুগে কাশী ও বিদেহ মহা মহা পণ্ডিতে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু সে যুগের ইতিহাসে বীরত্বের পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়।

পঞ্চনদের সেই সকল বিজয়ী আর্য্যগণ যে সকল সরল ঋক্ উচ্চারণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে, সরলহৃদয়ে, ভক্তিভরে দেবতাদিগের আবাহনগীত গাহিয়া পুলকিত হইতেন, গাঙ্গ্যপ্রদেশের শান্ত সুপ্ত কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় হিন্দুদিগের হৃদয়ে সে সমুদয়ের স্থান ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড-

প্রিয় হইয়া উঠিলেন ; ধীরে ধীরে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, সংখ্যার ও প্রতাপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, বংশানুক্রমিক পৌরোহিত্যের সৃষ্টি করিলেন।

মিশরেও কতকটা তাহাই ঘটিয়াছিল ; কিন্তু সাম্রাজ্যের সমগ্র-শক্তি যাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল, কালক্রমে তাহাদিগেরই প্রাধান্য ঘটিল ; ধর্মভাব প্রবল থাকায় ব্রাহ্মণভক্তি তখনও পূর্ব্ববৎ ছিল, কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ সিংহাসনারোহণ করিতে লাগিলেন—তাঁহাদিগকে বাধা দিবার আর কেহ রহিল না।

ভারতের ন্যায় মিশরেও কেবল যোদ্ধৃপুরুষ লইয়া দ্বিতীয় বর্ণের সৃষ্টি হয় নাই। যোদ্ধা, কৃষিব্যবসায়ী, মৃগয়াজীবী, নাবিক প্রভৃতিও এই দ্বিতীয় বর্ণের (ক্ষত্রিয়ের) অন্তর্গত ছিল। কৃষিজীবীরা ভূম্যধিকারী ছিল না ;—তাহাদিগের মধ্যে যাহারা অর্থশালী ছিল, তাহারা দেশের জমীদারদিগের নিকট হইতে ইজারা-স্বরূপ জমী লইয়া শস্য উৎপাদন করিত। তাহারা ভূম্যধিকারী ছিল না বটে, কিন্তু জমীদারের জমীতে আপন ইচ্ছামত যে কোনও প্রকার ফসল উৎপন্ন করিতে পারিত ; জমীর অবস্থা, সারের অবস্থা, ফসলের অবস্থা, বীজের শক্তি প্রভৃতির পরীক্ষায় তাহারা এত দূর উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল যে, তৎকালে পৃথিবীমধ্যে তাহাদিগের সমকক্ষ আর কেহ ছিল না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মৃগয়াজীবিগণ ধনাঢ্যের আশ্রয়ে বাস করিত, এবং তাঁহাদিগের মৃগয়াকার্য্যের সহায়তা করিত ; মৃগয়াকালে শিক্ষিত সারমেয় লইয়া তাহারাই অগ্রে অগ্রসর হইয়া শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করিত। কেহ কেহ বা নানাবিধ বনবিহঙ্গম ধরিয়া বাজারে বিক্রয় করিত। কখনও কখনও অষ্ট্রিচ পক্ষী ধরিয়া বহুমূল্যে বিক্রয় করিত। নাবিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কতক বা সখের তরণী বাহিয়া ধনীদিগকে সন্তুষ্ট করিত, আর কতক দেশ হইতে দেশান্তরে পণ্যদ্রব্যাদি বহন করিয়া বেড়াইত। মিশরে যখন নৌ-বাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন দ্বিতীয় বর্ণের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নাবিকদিগের সম্মান অল্প ছিল না।

মিশরে যখন ক্ষত্রি[illegible]র্ণ সৌভাগ্যসম্পদে গৌরবান্বিত, তখন সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যের [illegible]দ তাহারাই গ্রহণ করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণও একেবারে বঞ্চিত হইতেন না। এরূপ অবস্থা চিরদিন ছিল না। শাসনসংযমের ছায়াতলে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি ধীরে ধীরে আবির্ভূত হইতে

লাগিল; আত্মোৎসর্গ স্বার্থপরতাকে নিজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নীল নদীর নীরে নির্ব্বাণ লাভ করিল; স্বদেশহিতৈষণা ভীষণ স্বদেশদ্রোহের আবির্ভাবে ভীত চকিত হইয়া শৈলসমাকুল বনশ্রেণীমধ্যে লুক্কায়িত হইল; সিংহাসনপ্রার্থী ব্যক্তিবিশেষের লোভ ও স্বার্থের মন্দিরে সমাজের কল্যাণ আত্মবলিদান করিল। তখন শাসনদণ্ড আর পরহিতের জন্য উদ্যত হইল না, পরপীড়ায় নিযুক্ত হইল; অর্থলুব্ধ বৈদেশিক যোদ্ধৃপুরুষগণ অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় মিশরের ক্ষত্রিয়কুলের সহিত যোগদান করিয়া অধিবাসীদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিল; ব্রাহ্মণে ভক্তি, তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যায় ও ধর্ম্মজ্ঞানে অসীম নির্ভর, তাঁহার উপদেশ আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ শিরে গ্রহণ ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল; তখন কেবল রহিল বাহ্যাড়ম্বর-পূর্ণ কতকগুলি ক্রিয়া-পদ্ধতি। যে ব্রাহ্মণ একদিন গুরুর উচ্চাসনে আসীন হইয়া দেশের কল্যাণকামনায় প্রাণমন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যাঁহার অঙ্গুলি-সঞ্চালনে এক দিন মিশরের সিংহাসন পরিচালিত হইত, ব্রাহ্মণের সেই অসাধারণ শক্তির চিতাভস্মের উপর শক্তিহীন তেজোহীন ব্রাহ্মণ্যের অস্নেহ প্রদীপ যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া জ্বলিতে লাগিল।

কেন এমন হইল? যে অখণ্ড ব্রাহ্মণ-প্রতাপ একদিন আসমুদ্র হিমাচল শাসন করিয়াছিল, যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা পরহিতব্রতে ব্যাপৃত থাকিয়া পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তকে স্বর্গাদপি গরীয়সী করিয়াছিল, যে ব্রাহ্মণ-শক্তির সম্মুখে একদিন রাজসিংহাসন অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিত, যে ব্রাহ্মণ একদিন সংযমে, বিনয়ে, শিক্ষায়, জ্ঞানে সকলের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল, যাঁহার সৌম্য শান্তমূর্ত্তি এক দিন জীবন্ত দেবতাসদৃশ ভারতভূমে বিচরণ করিয়াছিল, তাঁহার এ দশা কেন হইল? যে পুরোহিত-সম্প্রদায় একদা মিশরের শিক্ষাগুরু ছিলেন, যাঁহার আশীর্ব্বচন লাভ করিয়া মিশরবাসী একদিন মৃত্যুকেও ভয় করিত না, যাঁহার আজ্ঞা একদিন ধর্ম্মগ্রন্থের ঈশ্বরাদেশস্বরূপ গণনীয় ছিল,- সেই সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, সর্ব্বগুণে বিভূষিত, নির্লোভ, সাধু, সংযমী পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কেন এ দশা ঘটিল?

কুক্ষণে ভারতে গুরুদেব শিষ্যের উপর আস্থাশূন্য হইলেন, কুক্ষণে হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি আসিয়া গুরুর হৃদয় অধিকার করিল;—তিনি মনে করিলেন, সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত তত্ত্ব, সমস্ত বিধান আপনার মুষ্টিমধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিবেন, অন্ধ শিষ্য-সম্প্রদায় নির্ব্বাক্ নিশ্চল হইয়া

তাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেতে পরিচালিত হইবে। ক্রমে ক্রমে তিনি শিষ্যের প্রতিভায় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন, অথচ প্রতিভার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতে বিরত হইলেন। গুণকর্ম্ম প্রভৃতি যে জাতিবিভাগের ভিত্তি, তাহা তিনি বিস্মৃত হইলেন। উদারতা যে ধর্ম্মের মূল, তাহা ভুলিয়া গিয়া তিনি ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দিলেন। তিনি সর্ব্বদাই শঙ্কিত হইতে লাগিলেন, যদি তাঁহার পুণ্যাসিংহাসন সেবক কর্ত্তৃক অপহৃত হয়; তাই প্রতিভাবান্ ব্রাহ্মণেতর বর্ণ তাঁহার সন্দেহ-ভাজন হইল। এইরূপে সহস্র চেষ্টায় আত্মপ্রতিষ্ঠাকে সবলে টানিয়া রাখিতে চাহিয়া প্রতিষ্ঠার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে চিরদিনের মত পতিত হইলেন। সে পতন কি ভয়ানক! আকাশের সূর্য্য যেন ভূমিতলে খসিয়া পড়িল! তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ভাসিয়া গেল, সংযম লুপ্ত ও সংসার উৎপাতে পূর্ণ হইল! আর মিশরে, শিষ্য গুরুর শিরে আঘাত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিতে উদ্যত হইল! বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া যে দিন উন্মত্ত শিষ্য, সেবকের ধর্ম্ম ভুলিয়া, গুরুর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে চাহিল, সেই দিনই মিশরের জ্ঞান-গরিমায়-বিমণ্ডিত পৌরোহিত্য পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল; আর সেই ভস্মরাশির উপর শক্তিশালী, গর্ব্বিত, শিষ্য নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিল। কিন্তু হায়! সে প্রাসাদ কত দিন অটুট ছিল? *

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

---

* স্নেহাস্পদ শ্রীমান রামকমল চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:— জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাহিত্যে" "প্রাচীন মিশরের পুরোহিত" নামক প্রবন্ধে দেখিলাম "পুরোহিতগণ Papyrus বৃক্ষের (পেঁপে গাছ) বল্কলে পাদুকা ব্যবহার করিতেন।" প্যাপিরস্ "পেঁপেগাছ" নহে। ইজিপ্টে Papyrus Egypticus নামে এক রকম Reed জন্মে হয়, এখানে Royal Botanical Garden এ পুকুরে দেখিতে পাইবেন। পেঁপেগাছকে Carica Papaya (Pepiya) বলে পেঁপেগাছের কেন প্যাপায়া নাম হইল, তাহা লিখিতে গেলে চিঠি বাড়িয়া যায়। বোধ হয়, লেখক Papaya থেকে Papyrus কে পেঁপেগাছ করিয়াছেন। John Hunter Balfour এর Elements of Botany 1869. P. 5. তে পড়িয়াছিলাম, Papyrus antiquorum, the bulrush of scripture. It grows in the Nile, and is used for making light boats." In Lucan's Pharsalia IV. 136, we meet with the Following—"Conseritur bibula Memphitis cymba Papyro." We may conclude that the ark in which the infant moses was laid in the Nile-an ark of bulrushes, daubed with slime and with pitch-was a small boat constructed with Papyrus. In Abyssinia, according to Bruce, boats are made of this Plant." * *

সহযোগী সাহিত্য।

জীবোৎপত্তি বিষয়ে নূতন মত।

কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিস রসায়নাগারের অধ্যক্ষ অধ্যাপক জে-বটলার বার্ক [illegible]তিপথ্যে ম্যাগ্নেসিয়ম হইতে জীবাণু সকলের বিনাশসাধন সম্পন্ন করিয়া, তাহার উপর নবাবিষ্কৃত র্যাডিয়ম্ রশ্মি প্রক্ষেপ দ্বারা যে অপূর্ব্ব ভূতোৎপত্তির সমাধান করিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞান-জগতে জীবোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে তুমুল তর্ক বিতর্কের সূত্রপাত হইয়াছে। অধ্যাপক "বটলার" ডেলি ক্রণিকল্ নামক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রচারিত করিয়াছেন; তাহা পাঠে আমরা জানিতে পারি, তিনি যে ভূত-কণার আবিষ্কারক, তাহা ঠিক ক্রিষ্টালও (Crystal) নহে, এবং তাহাকে ব্যাক্টিরিয়াও (Bacteria) বলা যায় না। অধ্যাপক বার্কের মতে, এই কণা সকল এমন একটি পদার্থ, যাহা খনিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী স্তরে অবস্থিত। ফল কথা, তাঁহার বিবেচনায়, এই নবাবিষ্কৃত পদার্থ জীব ও জড়ের সীমান্ত প্রদেশে সন্নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

জীবের স্বতঃ-প্রবৃত্তি বলিয়া যে কথা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, পণ্ডিত বটলার বার্ক বলেন, তাহার অর্থ আর কিছুই নহে, জড় হইতে, অর্থাৎ জড়কে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়া, জীবের প্রকাশ।

অধ্যাপক বটলার বার্ক আরও বলেন, তিনি যে ভূত-কণা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহার স্থাননির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমে জানা উচিত, জীব ও জড় বলিতে আমরা কি বুঝি। রসায়ন-বিৎ পণ্ডিতগণ 'অ্যাটম'কে atom এই নিত্যপরিবর্ত্তনপরায়ণ জগতের আদ্যভূমি বলিয়া এত দিন স্থির করিয়া আসিতেছিলেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বেও পণ্ডিত ম্যাক্সওয়েল বলিয়া গিয়াছেন, এই প্রবৃত্তিপরায়ণ জগতে একমাত্র 'অ্যাটম' সকল খাঁটিবস্তু, বিধাতার টাঁকশাল হইতে যেমন বাহির হইয়াছে, তাহারা এ পর্য্যন্ত ঠিক সেই ভাবেই আছে, পূর্ব্বেও ছিল পরেও থাকিবে। ইহাদিগের উপর কালের বিক্রম পরাহত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই কথা আজকাল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আর স্বীকার করিতেছেন না। আট বৎসর হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিতেছেন, 'অ্যাটম' হইতেও ক্ষুদ্রতর পদার্থ এ জগতে বিদ্যমান আছে। এই পরম সূক্ষ্ম পদার্থ সকল শক্তির দিক হইতে ইলেক্ট্রন্স (Electrons), এবং ঘটাবয়বের দিক হইতে 'আইয়নস্' (ions) এই নামে অভিহিত হইতেছে। সার অলিভার লজ বলেন, একটি জলজানের 'অ্যাটম' ৭০০ ইলেক্ট্রনের সমষ্টি। যদিও প্রাকৃতিকবিজ্ঞানবিদ্‌গণ রসায়নবিজ্ঞানের এই দীর্ঘকাল-সমাদৃত মতকে পরিত্যাজ্য বলে মনে করিতেছেন না, তথাপি ইহারা পরস্পর আর বিদ্বেষভাবাপন্ন নহেন। বরং মিলিত হইয়া বন্ধু ভাবে এক তত্ত্ব বস্তুর নির্ণয়ে আজ উভয়ে ব্যাপৃত।

যেমন ইহাদের মিলন সহজসাধ্য হইয়াছে, তেমনি জীবতত্ত্ববিদ্‌দিগের সহিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মিলন কি কখন সম্ভবপর হইবে না? পণ্ডিত বার্ক বলেন, আমার মনে হয়,

মিলনের একমাত্র বিঘ্ন,—পরস্পরকে বুঝিতে না পারা। রসায়নবিদ পাস্তুর, টিন্‌ড্যাল্‌ ও মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি—আমরা সকলেই কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সেবক নহি? কিন্তু আমরা কেন জীবতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত? জীবতত্ত্বের মধ্যে এমন সকল গম্ভীর রহস্য আছে, যাহা প্রত্যেক প্রাকৃতবিজ্ঞানবিদের পরিজ্ঞাত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। আমি যে ভূত-তত্ত্বের কথা বলিতেছি, আমার মনে হয়, তাহা জীবাণুও নহে, ক্রিষ্ট্যালও নহে, তাহা ইহাদিগের মধ্যবর্ত্তী সীমান্ত-প্রদেশস্থিত কোনও পদার্থ। বরং জীবাণুর সহিত ইহার সৌসাদৃশ্যই অধিক। ক্রিষ্ট্যালের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মৎ-আবিষ্কৃত রশ্মিকণা এতদুভয় বস্তু হইতে বহু পরিমাণে পৃথক্‌।

যত দিন পর্য্যন্ত না উচ্চশক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র মিলিতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত এই সকল রশ্মিকণার প্রকৃত পরিচয় সুকঠিন; তবে এরূপ অনুমান করিতে আর বাধা নাই যে, ইহা জীবাণু ও ক্রিষ্ট্যাল্‌ হইতে বিভিন্ন পদার্থ হইলেও, কতক কতক বিষয়ে উভয়েরই সদৃশ। আর ইহাও বলা অযৌক্তিক নহে যে, যদি জড় হইতে জীবের আবির্ভাব বাস্তবিক সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে, এইরূপ প্রণালীতেই জড় হইতে কোনও অবিজ্ঞাত শক্তির জীব রূপে প্রকাশ ঘটিয়া থাকে।

বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার অধিক আর বলা যায় না। বাষ্প ও জলের মধ্যবর্ত্তী একটি অবস্থা যেমন বিকল্পিত হয়, সেইরূপ, জীব ও জড়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা এই রশ্মিজাতকণা (Radiobes) জড় ও জীবের মধ্যবর্ত্তী সীমান্ত সংগঠন করিয়া দণ্ডায়মান। র‍্যাডিয়ম আমার মতে, বিশিষ্ট অবিশিষ্ট-শক্তিসম্পন্ন জড় ও জীবের মধ্যবর্ত্তী কোন পদার্থ। আমি স্পষ্টভাবে না হউক, সঙ্কেতে এইরূপ জানাইতেছি যে, যাহাকে আমরা প্রাণ বলি, তাহার মূল তত্ত্বের অন্বেষণ করিতে হইলে এই রশ্মি-বিকীরণ ও তাহা হইতে উৎপন্ন কণা সমূহকে সেই অনুসন্ধানের ভূমি বলিয়া পরিগ্রহ করিতেই হইবে। আমাদের বাসভূমি এই বসুন্ধরা যখন দহ্যমান অবস্থায় অবস্থিত ছিল, সেই সময়ে এই রশ্মিজাত কণা ব্যতিরিক্ত অন্য এমন কোনও আধারের কল্পনা করিতে পারা যায় না, যাহাতে প্রাণপ্রবাহ পরিলক্ষিত হইবার সম্ভাবনা। যে জীব-প্রবাহ আমরা এখন দেখিতেছি, এই জীব-প্রবাহ তদানীন্তন সেই অনন্ত অগ্নিকুণ্ডকে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিল, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। যখন ইহা হইতে তেজোবিকীরণ আরম্ভ হইয়াছিল, তখনই সম্ভবতঃ জীব-প্রবাহ ইহাতে আবির্ভূত হয়।

এখন যদি আমরা এই কথা বলি যে, পরীক্ষিত কাচ-কূপীর অভ্যন্তরাহিত মাংসরস উত্তাপাতিশয্যে জীবাণুবিহীন করিলে, আর তাহাতে কোনরূপেই জীবাণুর আবির্ভাব হইতে পারে না, তাহা হইলে, ইহা বলাও অযৌক্তিক নহে যে, এই জগৎরূপী বৃহৎ কাচ-কূপী উত্তাপাতিশয্যে একবার জীবশূন্য হইলে, আর তাহাতে জীবপ্রবাহ সমুৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু যখন আমরা বুঝিতেছি, এই জগতে এক সময় নিকৃষ্টতর জীবরূপে জীবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন আমাদের পরীক্ষিত কাচ-কূপীতে যে জীবাণুর জন্ম হইতে পারে, আমরা এরূপ আশা করিব না কেন? কিন্তু যদি কোনও কারণে এই জীবোৎপত্তি না ঘটে, তাহা হইলে আমরা মনে করিব, পাস্তুর, টিন্‌ড্যাল, প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পরীক্ষায় কোনরূপ বিশেষ জ্ঞানের অভাব ঘটিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণের পরীক্ষা সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হয় নাই, এই কথা বলিতে গিয়া, রশ্মি-বিকীরণ যে জীবোদ্ভবে অসমর্থ, এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক।

রশ্মি-বিকীরণ কোন স্থান ও সময়বিশেষে ঘটে এবং ঘটে না ইহা ঠিক নহে। অন্ততঃ ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই যে, যে সময়ে এ জগতে জীব-প্রবাহ ছিল না, সেই উত্তাপের পর্য্যায়সময়ে যে এই তেজোবিকীরণ স্থগিত হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। অধ্যাপক হক্সলির সময় হইতেই জড় পদার্থের এই তেজের বিকীরণশক্তি, এই জন্ম, বৃদ্ধি, অপক্ষয়াদি ভাব সকল, জীবের উৎপত্তি হইতে বিনাশের মত, সকলেই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

আমি যাহাকে রশ্মিজ কণা (Radiobes) বলিতেছি, তাহাতেও এই প্রবৃত্তি-শক্তি ত আছেই, তাহা ছাড়া জীবকোষের উৎপত্তিক্রমে যেমন অন্তঃবিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, ইহাদিগের ভিতরও সেই ধর্ম্ম বিদ্যমান দেখা যায়।

জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ যে ব্যাপার স্থির করিতে না পারিয়া হতাশ ভাবে তাহার অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের সাহায্যে আবার বিশ্লেষিত হইবার উপক্রম ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে যতই কেন তর্ক বিতর্ক বা বিরুদ্ধ মত থাকুক না, পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার যেমন মনে করিতেন, এক দিন এমন সময় আসিবে, জীব ও জাতির অভিন্নতা যখন পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইবে, আমরা এখন দেখিতেছি, সেই সময় সমাগত প্রায়। অধ্যাপক হক্সলি যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেই মহাজনবাক্য, যাহা পুনঃপুনঃ সাহিত্যক্ষেত্রে উদ্ধৃত ও উচ্চারিত হইয়াছে, এখন আমরা দেখিতেছি, তাহা আর স্বকপোলকল্পিত নহে।

অধ্যাপক হক্সলি বলিয়াছেন, যদিও এখন রসায়ন শাস্ত্র, প্রাকৃতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের কেবলমাত্র প্রারম্ভ, কিন্তু এমন এক দিন আসিবে, যখন পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইবে, জড় হইতে জীব-প্রবাহ কিরূপে আরম্ভ হয়। অধ্যাপক হক্সলির এই ভবিষ্যদ্বাণী এখন কতকপরিমাণে আমরা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

অতীত কালের যবনিকার অন্তরালে কি প্রণালীতে জীব-প্রবাহ উঠিয়াছিল, যখন আমরা তাহার কোনও নিদর্শন পাইতেছি না, তখন কোন একটি বিশেষ প্রণালীর অনুগত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তবে একটা যুক্তিসঙ্গত অনুমান করা অন্যায় নহে। এই জন্য না হয় বলিলাম, এমোনিয়ম কার্ব্বনেট, অক্‌জেলেট, টারটারেট এলকালাইন, ফস্‌ফেট ও জল হইতে, আলোকের সান্নিধ্য ব্যতিরেকে শৈবালের উৎপত্তির মত, হয় ত ইহা নিকৃষ্ট ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল। না হয় স্বীকার করিলাম, সে সময় র‍্যাডিয়ম ছিল; কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, মাংস-রস-এরূপ কাচ কিম্বা কূপীর মত কোনও আধার ছিল কি? ইহার উত্তরে না হয় বলিলাম, যখন জীব-কোষ এখনও আছে মূলে জীবকোষের উপাদান সমান নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও প্রশ্ন হইতেছে, আমরা যে মাংস-রস হইতে ভূতোৎপত্তির পরীক্ষা করিতেছি, তাহার মধ্যে সেই সমস্ত উপাদানের প্রত্যেকটি বর্ত্তমান আছে কি? এইরূপ বহু বহু প্রশ্নের সমাধান করা দুরূহ। তবে মূলতঃ এই কথা বলা যায় যে, রশ্মিবিকীরণ জীব ও জড় উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান, এই রশ্মি বা তেজোবিকীরণ রাসায়নিক ব্যাপার নহে, প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের ভিতরকারও কোন ব্যাপার নহে। যাহাকে লোকে জীবশক্তি বলে, ইহা তৎসদৃশ কোনও ব্যাপার। সুতরাং এই

শক্তির নামকরণ করেন Vital force প্রাণ বলিতে আমরা বুঝি বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের বিচ্ছেদহীন সামঞ্জস্য। এই শরীর যেমন অবিরত শীর্ণ হইতেছে, তেমনি সংস্কৃত হইতেছে। ইহা এক অনিত্য বিকার বা পরিণামপরায়ণ সংহনন। একবার গড়িতেছে, একবার ভাঙ্গিতেছে। সার্ অলিভার লজও এই কথায় অধিক শ্রদ্ধা স্থাপন করেন। এই কারণবশতঃ অবিকারী অপরিণামী ক্রিষ্টাল হইতে জীবকোষ বিভিন্ন। যাঁহারা ক্রিষ্টালকে জীবশ্রেণীতে গণ্য করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এখন প্রশ্ন হইতেছে, জলে দ্রব হইলে ইহাদের তেজ বা শক্তি বিনষ্ট হয় কি না?

জলের সহিত ইহাদের যেরূপ সম্বন্ধ, সে হিসাবেও ইহারা স্বতন্ত্র পদার্থ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বেলী দেখাইয়াছিলেন যে, কার্ব্বনেট্ অব্ লাইম্ ক্রিষ্টাল জলে অদ্রবণীয়, সুতরাং র‍্যাডিয়ম-নিক্ষিপ্ত কণা সকল জলে দ্রবণীয় বিধায় কখন উক্ত ক্রিষ্টাল নহে। কার্ব্বনেট অব লাইম্ ক্রিষ্টাল না হউক, ইহা হয় ত আর কোনরূপ ক্রিষ্টাল, এ কথা বলিলে তাহার উত্তর কি? উত্তর এই যে, এরূপ বস্তুর কথা আমি ত জানি না এবং এ সম্বন্ধে যাঁহাদের কথা প্রামাণ্য, তাঁহাদের নিকট হইতে এরূপ কোনও অস্তিত্বের বিষয় এ পর্য্যন্ত শুনি নাই।

জলে দ্রবণীয়তা যে প্রাণসত্তার জীবের ধর্ম্ম হইতে পারে না, তাহা কে বলিল? এই দেখুন ক্রিষ্টালের পেপ্‌টন্ জলে দ্রবণীয়, এবং উত্তাপে জমিয়া যায় না। সুতরাং ইহা এই দৃষ্ট প্রবৃত্ত অন্যান্য albumins বা proteid পদার্থ, যাহা পেপ্‌সিন বা অন্য কোনরূপ কিন্ব সংযোগে peptonএ পরিণত হইতে পারে, তাহা হইতে বিভিন্ন র‍্যাডিয়ম অদ্রবণীয় বলিয়া proteidকে জলের সাহায্যে দ্রবণীয় pepton রূপে পরিণত করিতে সমর্থ।

লেঙ্ক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে কণা সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, দৃশ্যতা হিসাবে তাহারা আমার এই কণা সকলের সদৃশ, এই পর্য্যন্ত। অন্য কোনও বিষয়ে ইহাদের পরস্পরের মিল নাই।

এখন ষ্টারিলাইজেসনের সম্বন্ধে আপত্তি। প্রথম কথা টিউব সম্বন্ধে। টিউব রীতিমত Sterilized করা হয় নাই। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, হইয়াছে কি না হইয়াছে, তাহা কালেই সপ্রমাণিত হইবে।

দ্বিতীয় কথা, না হয় মনে করিলাম, টিউব Stirilized হইয়াছে, কিন্তু মাংসরস ভাল করিয়া Stirilied হয় নাই যদি না হইবে, তাহা হইলে ব্যাক্‌টিরিয়ার আবির্ভাব অবশ্যই হইত। যদি বলা যায় যে, ইহা এক প্রকার নূতন ব্যাক্‌টিরিয়া যাহা র‍্যাডিয়মের উত্তাপেও বিনষ্ট হয় না তাহা হইলে, আমার উপপত্তিতে কোনও ক্ষতি হইতেছে না। আমি বলিতেছি, ইহারা ব্যাক্‌টিরিয়া নহে। আর অন্য কোনরূপ ব্যাক্‌টিরিয়া যে আছে, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। জড় হইতে জীবোৎপত্তি যিনি বুঝিলেও বুঝিবেন না, তাঁহাকে বুঝান আমার পক্ষে অসম্ভব। বিজ্ঞান বলেন, উত্তাপ যতই কেন তীব্র হউক না, কোনও বস্তুই একেবারে জীবাণু-পরিশূন্য হয় না, জীবাণু অদাহ্য পদার্থ, এ প্রকার তর্ক দার্শনিকদিগেরই উপযুক্ত, কিন্তু ইহাতেও আমার কথা অপ্রমাণিত হইতেছে না। আমি স্বতঃপ্রবৃত্তি অর্থে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে, জড় হইতে অপ্রকাশিত জীব-প্রবাহের প্রকাশ এইরূপ অর্থই মনে আসে। জীবের উৎপত্তি কিংবা প্রাণের আবির্ভাব কেমন করিয়া হয়, তাহা বলা আমার অভিপ্রেত নহে, জড় হইতে কেমন করিয়া

[illegible] প্রকাশ হয়, ইহাই দেখান আমার উদ্দেশ্য। সেই জন্য আমি পুনঃপুনঃ [illegible] কোনও বিষয় বর্ণনা করিব, তখন প্রথমতঃ, ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা [illegible] নির্দ্দিষ্ট করা চাই, নতুবা ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আষাঢ়। এক "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুম্" দেখিয়া প্রবাসী যক্ষের বিরহ উথলিয়া উঠিয়াছিল, আর সন ১৩১০ সালের এই আষাঢ়ে এক জন প্রচ্ছন্ন কবির যশোহর-বিরহ উথলিয়া উঠিয়াছে। সেই বিরহের কাব্য "যশোহর" এবারকার ভারতীর মুকুটে পরিণত হইয়াছে। কবিরা নিরঙ্কুশ সুতরাং ভারতীর কবি ব্যাকরণের দাস হইতে পারেন না, নিজেই সমাস ও সন্ধির নূতন নিয়ম উদ্ভাবন করিয়া লিখিয়াছেন—"তাহারই মহিমাস্তুতি যশোপ্রভোজ্জ্বল।" কি উৎকট শব্দচয়ন! অবশ্য ঈষৎ পরিবর্ত্তিত মেঘদূত হইতে নজীর তুলিয়া অনায়াসে কবির পক্ষসমর্থন করা যায়,—"কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনা-চেতনেষু।" মারাঠী সাধু তুকারাম একটি 'অভঙ্গে' আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই 'অভঙ্গ'টির অনুবাদ ও তুকারামের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনুবাদের অমিত্রাক্ষর ম্যালেরিয়া রোগীর মত দুর্ব্বল। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্যের "পাণিনিতত্ত্ব" প্রবন্ধে পাণিনি ব্যাকরণের পরিচয় আছে, কিন্তু প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য,—পাণিনির সময়ে লিপিপ্রণালী ছিল কি না, আমরা [illegible] প্রবন্ধের অরণ্যে তাহার প্রমাণ খুঁজিয়া পাইলাম না। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল "ভারতের কলকারখানা" প্রবন্ধে বাঙ্গলা ভাষা লইয়া অনেক কারখানা করিয়াছেন, যথা,—"সুয়েজ খাল উন্মুক্তের পর হইতে" ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্তের "শিগো-সুহে" একটি সঙ্কলিত প্রবন্ধ। ভারতীর কুঞ্জে "শিগো সুহের" বাসা কেন? এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "মহানাটকে"র অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর অটল অধ্যবসায় প্রশংসনীয়, কিন্তু অনবরত পরিশ্রমে বোধ করি তাঁহার লেখনী শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাই অনুবাদের ভাষা এত দুর্ব্বল ও ছন্দোবন্ধ এমন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। 'কৈলাসে'র পরিবর্ত্তে 'কইলাসে', সৌরভের পরিবর্ত্তে 'সউরভ' প্রভৃতি অত্যন্ত অশোভন মনে হয়। যে কালে ঠাকুরপুকুরের জন্য চ বে তু হি চারি ভাই ছিল, এ অনুবাদে একলা 'সো' চারি জনের খাটুনি খাটিতেছে। "আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে" শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার মুখোপাধ্যায়ের "[illegible]বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস" উল্লেখযোগ্য। "খেয়াল খাতা"য় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের "কৃষক ও পলিটিসিয়ান্" পড়িয়া আমরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। যতীন্দ্রবাবুর ন্যায় চিন্তাশীল সুলেখক ব্যক্তি একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হইলেন কেন? মৈমনসিং মুক্তাগাছা হইতে আমাদের এক জন সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত জমীদার বন্ধু "বহু সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধে" এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যে

পত্র লিখিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—"আষাঢ় মাসের ভারতীর খেয়ালি-খাতায় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় 'কৃষক ও পলিটিসিয়ান' শীর্ষক একটি অদ্ভুত চিত্র আঁকিয়া ফেলিয়াছেন। খেয়ালীর চিত্র যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা হয় ত ঠিকই হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে নিরপরাধ সম্ভ্রান্ত লোককে অযথা হাস্যাস্পদ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা দেখিয়া কেহ কেহ অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ যতীন্দ্রমোহন বাবু গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়া থাকেন, তাঁহার এ সকল বিষয়ে অধিক আলোচনা না করিলেও তত দোষের হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন না। গায়ে পড়িয়া জোর করিয়া কতকগুলি তথাকথিত রসিকতার চর্ব্বিতচর্ব্বণ না করিলেও খেয়ালী লোকের খেয়ালের অভাব হইবার সম্ভাবনা নাই; এবং ভারতীর প্রবীণা সম্পাদিকাও স্থান পূর্ণ করিবার জন্য আবর্জ্জনার অভাবে পড়িতেন না। পৃথিবীর সমস্ত কাজই সকলের অনুমোদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। সমালোচনাও সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। কিন্তু মাসিক বা স্থায়ী সাহিত্যে দায়িত্বহীন অর্ব্বাচীনতার স্থান হওয়া সঙ্গত বোধ হয় না।" ইহার উপর আর টীকা অনাবশ্যক।

বঙ্গদর্শন। আষাঢ়। এই সংখ্যায় "নৌকাডুবি" সমাপ্ত হইল। অধ্যাপকের "ইং-লিং" সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "পৃথিবী ও সূর্য্যের তাপ" নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর "আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র" নামক সুলিখিত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ত্রিবন্ধুর' সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের "নবজীবনের আদর্শ" কালের 'ফেশ্যান' অনুসারে বেওয়ারিশ বেদান্তের উত্তুঙ্গ শিখরে প্রতিষ্ঠিত, অত্যন্ত উচ্চ, গুরু গম্ভীর গবেষণায় পূর্ণ, সাধারণ পাঠক পরিপাক করিতে পারিবে না। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর "উপাধি ব্যাধি" প্রবন্ধে নানা রসের অবতারণা করিয়াছেন। বিশেষতঃ ঠাকুরজীর নিজের আত্মসম্মানজ্ঞানের আলোকে ও তাঁহার পরিচিত বড়লোকদিগের আত্মসম্মানপরাঙ্মুখতার ছায়ায় "উপাধি ব্যাধি"র চিত্রগুলি পরম রমণীয় হইয়াছে। "শেষ খেয়া" কবিতাটির—

ঘরেই যারা যাবার তারা গিয়েছে চলে ঘর পানে,
পারেতে যারা যাবার গেছে পারে;
ঘরেও নয় পারেও নয় যে জন আছে মাঝখানে,
সন্ধ্যা বেলায় কে ডেকে নেয় তারে।

ঠিক হেঁয়ালীর মত মনে হয়।

প্রবাসী। আষাঢ়। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী "স্বদেশী যুগ" প্রবন্ধে বাঙ্গালীকে সভা করিয়া স্বাবলম্বন শিখিতে বলিতেছেন। উত্তম। ইহার পর তেল মাখিবার, স্নান করিবার, [illegible] খাইবার, হাই তুলিবার, নিদ্রা দিবার জন্যও ভিন্ন ভিন্ন সভার প্রতিষ্ঠা না [illegible] শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "উত্তরবাহিকতা" ও শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "[illegible]" বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। রচনাদ্বয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের অভাব নাই। শ্রীযুক্ত [illegible] "খোদকার মাসেহীন" উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত রামলাল সরকারের "চীন দেশের" নাট্যাভিনয় সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "মুক্তি" নামক গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

[illegible]মোহন বাবু "প্রবাসী বাঙ্গালী" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে এবার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত [illegible]জিত্তারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকসমাজকে উপকৃত ও আনন্দিত করিয়াছেন।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে চট্টগ্রামের প্রভাব।

বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে লোকের অত্যন্ত বিরূপ ধারণা ছিল। বটতলায় প্রকাশকগণের প্রকাশিত কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি কয়েকখানি পুঁথি ব্যতীত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আর কোনও গ্রন্থ আছে, তাহা সাধারণের স্বপ্নের অগোচর ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালায়ও একটা সাহিত্য ছিল, এরূপ কল্পনাও কাহারও মনে উদিত হয় নাই। আধুনিক সাহিত্যের মত প্রাচীন সাহিত্যেও যে সহস্র সহস্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা জানা দূরে থাকুক, অনেকে বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাদিগকেই বঙ্গভাষার জন্মদাতা বলিয়া মনে করিতেন। এখন আর সে দিন নাই। এখন আমাদের মাতৃভাষা প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত,—মেঘমুক্ত তপনের ন্যায় কিরণমালায় বঙ্গীয় সাহিত্য-গগন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে!

বর্ত্তমান কালে বহুতর মনস্বী ও পণ্ডিত বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলনে নিযুক্ত হইয়া এক দিকে ইহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব-বর্দ্ধনে একান্ত যত্নপর; অপর দিকে বিলুপ্ত-প্রায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়া ভাষার অঙ্গ-বৈকল্য-দূরীকরণে বদ্ধ-পরিকর! ইতিপূর্ব্বে অবহেলা ও অনাদরে আমরা প্রাচীন সাহিত্যের বহুল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। সে দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতেই প্রাচীন সাহিত্যে লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। এখন প্রায় সকল জেলাতেই প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা হইতেছে। অনেক জেলায় সাহিত্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সকল সভায় বর্ত্তমান সাহিত্যের সহিত প্রাচীন সাহিত্যেরও অনুশীলন হইতেছে। দুঃখের বিষয়, কেবল দুর্ভাগ্য চট্টগ্রামই এই বিষয়ে আজও নিশ্চেষ্ট।

প্রাচীন সাহিত্যে এত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল যে, আরও দুই যুগ অব্যাহতভাবে অনুসন্ধান কার্য্য চলিলেও, সমস্ত গ্রন্থের উদ্ধার হইবে কি না, বলা যায় না। কত গ্রন্থ এখনও গৃহস্থের নিভৃত নিকেতনে কাষ্ঠচাপে আবদ্ধ থাকিয়া কীটকুলের ও হুতাশনের আহার ও আহুতি যোগাইতেছে, তাহা কে বলিবে? চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীন তুলোট কাগজে

লিখিত অসংখ্য পুঁথি বিরাজ করিতেছে, কে তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেশের গৌরববর্দ্ধনে প্রয়াসী হইবেন? চট্টলে অধুনা শিক্ষিত লোকের অসদ্ভাব না থাকিলেও, মাতৃভাষার সেবায় কাহারও অনুরাগ নাই। আমাদের দেশের শিক্ষিতগণ অর্থের মায়ায় এত বিমুগ্ধ যে, তাঁহারা যেন মনে করেন,—অর্থ ভিন্ন এ জগতে অপর কোনও কাম্য বস্তু নাই। আমাদের একমাত্র সাপ্তাহিক "জ্যোতিঃ" পত্রিকাখানিও লেখকের অভাবে সুচারুরূপে চলে না; সম্পাদক মহাশয়ের অসুখ হইলে প্রবন্ধাভাবে পত্রিকার প্রকাশ স্থগিত হয়। ইহা কি দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য ও কলঙ্কের কথা নহে? অধুনা লোকান্তরিত প্রতিভাশালী নবীন যুবক নলিনীকান্ত সেনের অকাল-বিয়োগে তাঁহার সাধের "আলো"খানি প্রবল দৈব বাতায় নিভিয়া গেল। এত দিনেও তাহার পুনরুজ্জীবনে কেহই অগ্রসর হইলেন না।

প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে আমরা অনেক দূরে গিয়া পড়িতেছি। বর্ত্তমান কালে চট্টগ্রামে বহুসংখ্যক শিক্ষিত লোক থাকিলেও, সাহিত্য-জগতে আমাদের প্রতিনিধির সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয়। মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছা কিরূপ, জানি না; কিন্তু অবস্থা দেখিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিতান্ত নিরাশ হইতে হয়।

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে আমাদের চট্টগ্রামের প্রভাব কত দূর, তাহার বিচারের আজও সময় হয় নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, আমাদের একমাত্র নবীনচন্দ্রের উজ্জ্বল মধুর স্নিগ্ধ আলোকেই সমগ্র পূর্ব্ব গগন সমুদ্ভাসিত। কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট নহে। প্রাচীন সাহিত্যে চট্টগ্রামের প্রভাব কিরূপ, তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে, এমন কি, ঘরে ঘরে প্রাচীন সাহিত্যের প্রভৃত উপকরণ বিদ্যমান থাকিলেও, তাহার প্রতি দুর্ভাগ্য দেশের কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। কেবল স্বর্গীয় নলিনী বাবুর দৃষ্টিই সে দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন, এমন সময়ে নিষ্ঠুর কাল আমাদের আশালতার মূলোৎপাটন করিল। চট্টগ্রামে এত সাহিত্যোপকরণ আছে যে, এক জন কেন, বহু জনের চেষ্টাতেও সে সকল সংগৃহীত হইতে অনেক দিন লাগিবে। এই সকল উপকরণ হস্তগত না হইলে, প্রাচীন সাহিত্যে চট্টগ্রামের প্রভাব কিরূপ, তাহা নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি এ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে, আমরা তাহারই কতকটা আভাষ দিবার চেষ্টা করিব।

পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, আমি,—ক্ষুদ্রশক্তি দরিদ্র সাহিত্য-সেবক,—কেবল স্বীয় চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত পাঁচ শতের অধিক বাঙ্গালা হস্তলিখিত পুঁথি, সন্দর্ভপুস্তক ও প্রায় ১৩০ জন কবির পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে অবশ্য অনেকগুলি বিদেশীয় কবি আছেন; কিন্তু অবশিষ্ট সকলে চট্টগ্রামবাসী না হউন, অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসী, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

প্রাচীন সাহিত্যে বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পরম মনোজ্ঞ। কিন্তু চট্টগ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্ম ততটা অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে নাই বলিয়া, চট্টগ্রামে বৈষ্ণব কাব্য সংখ্যা অল্প। অন্য জেলার সহিত তুলনায় এ কথা বলা যাইতেছে। নতুবা যত জন বৈষ্ণব কবি এখানে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহাই চট্টগ্রামের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থ ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থই চট্টগ্রামে অধিক।

বলা বাহুল্য, প্রাচীন কবিগণ ধর্ম্ম-জগৎ পরিত্যাগ করিয়া অন্য ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিতে চাহিতেন না। বোধ হয়, তাঁহাদের সে সাহসও ছিল না। এই কারণেই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রায় সমস্ত [illegible]। প্রাচীন সাহিত্যে এক এক বার এক এক জন দেবতার প্রভাব [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, মনসা ও চণ্ডীর প্রভাবই যে প্রাচীন সাহিত্যে অধিক, তাহা দীনেশ বাবু প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অন্যান্য দেবতাগণের প্রভাব অল্প বটে, কিন্তু তাঁহাদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গ্রন্থও বাঙ্গালায় [illegible] নাই [illegible]। এ দেশে অনেকগুলি দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক গ্রন্থ বা কবিতা [illegible] [illegible]। তাহা হইতে জানা যায়, চট্টগ্রাম এক সময়ে ধর্ম্মের [illegible] আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা মানবমনে যে সংস্কার-বীজ [illegible] করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন এরূপ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে [illegible], তাহার উচ্ছেদসাধন অসম্ভব। কুসংস্কার কি ভয়ানক [illegible] না। হিন্দুগণ মুসলমানের পীরের, মুসলমানগণ হিন্দুর দেবতার, পূজা করিতে কুণ্ঠিত বা বিরত হন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আজও চট্টগ্রামে মুসলমানের মধ্যে কেহ কেহ কাত্যায়নীর ব্রত পালন করে, অনেক হিন্দুও সত্যপীর, মাণিক-পীর ইত্যাদির সিন্নি দিয়া থাকে। অতি অল্প দিন হইল, মুসলমান-সমাজ হইতে 'মনসা-পূজা' লোপ পাইয়াছে, এবং হিন্দুসমাজ হইতেও 'গাজী-কালু'র সম্মাননা উঠিয়া যাইতেছে। সেকালে শিক্ষার প্রসার এত অধিক না থাকিলেও, হিন্দু মুসলমানে বর্ত্তমান কালের মত এমন অহি-নকুল-ভাব

ছিল না। দুঃখের বিষয়, শিক্ষাবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই অধুনা এই দুই জাতির মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইতেছে।

প্রাচীন কাল হইতেই চট্টগ্রাম ঐতিহাসিক লীলাক্ষেত্র। এ দেশে কতবার কত রাজবিপ্লব ঘটিয়াছে। মগে মুসলমানে, ইংরেজ পর্টুগীজে, চট্টগ্রামে আত্ম-প্রাধান্য-স্থাপনের চেষ্টায়, কতবারই সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নিরন্তর এইরূপে সংঘর্ষে পীড়িত হইয়াও চট্টগ্রামবাসিগণ ভুবনদুর্লভ কাব্যামোদের উপভোগে কখনও বঞ্চিত হয়েন নাই। সাহিত্যামোদ-উপভোগে তাঁহাদের প্রবৃত্তি প্রবল ছিল বলিয়াই, প্রাচীন কালে চট্টগ্রামে বহুসংখ্যক কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। এখানে প্রাচীন সাহিত্যের সন্ধান এখনও রীতিমত হয় নাই। রীতিমত ও ভালরূপ সন্ধান হইলে আরও কত কবি অজ্ঞাতবাস হইতে লোকলোচনের গোচরীভূত হইবেন, কে জানে? যে সকল কবিকে আমরা খাঁটি চট্টগ্রামবাসী বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই তালিকায় দৃষ্ট হইবে, আমরা অকারণে চট্টগ্রামকে সাহিত্য-জগতে অগ্রগণ্য বলি নাই। স্থানের সংকীর্ণতা হেতু এখানে কোনও কবির বা কাব্যের বিস্তৃত বিবরণ দিলাম না।

১। কবি শঙ্কর দাস।

ইঁহার রচিত কাব্যের নাম 'জাগরণ'। ইনি পটীয়া থানার অন্তর্গত 'ছনহরা' গ্রামের বিশ্বাস-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থে তাঁহার পারিবারিক ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড,—প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। 'জাগরণ' আজও অপ্রকাশিত ও অজ্ঞাত। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে স্থানীয় 'জ্যোতিঃ' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একবার আলোচনা হইয়াছিল। সাহিত্য-রাজ্যে এই গ্রন্থের স্থান অতি উচ্চ বলিয়া মনে হয়।

২। কবি মুক্তারাম সেন।

ইঁহার রচিত কাব্যের নাম 'সারদা-মঙ্গল'। ইহা একখানি চণ্ডী-কাব্য। ১৩৬৯ শকাব্দায় সারদা-মঙ্গল রচিত, একটি শ্লোকে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। তাহা সত্য হইলে, ইহাকে বাঙ্গালার আদি চণ্ডীকাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর; কিন্তু কবিকঙ্কণ ইত্যাদির কাব্য অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। কবির জন্মস্থান আনোয়ারা। গ্রন্থে কবির বিস্তৃত বিবরণ

আছে। আনোয়ারার প্রসিদ্ধ সেন-বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পরিত্যক্ত বাস্তভিটা আজও শূন্য পড়িয়া আছে। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজলাল সেনও এক জন কবি ছিলেন। 'সারদামঙ্গল' আকারে তেমন বৃহৎ নহে।

৩। কবি ভক্তরাম দাস।

রচিত গ্রন্থের নাম 'গোকুল-মঙ্গল'। ইহা ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ, বা অবলম্বনে লিখিত। প্রথম ও শেষ পাওয়া না গেলেও, ইহার বৃহত্ব দেখিলে ভয় পাইতে হয়। কবির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া না গেলেও, তিনি যে চট্টগ্রাম-বাসী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ভাষা দেখিয়া ইহাকে ২০০।২৫০ বৎসরের প্রাচীন মনে করা যায়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্যে' একবার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

৪। কবি ব্রজলাল সেন।

ইনি 'চণ্ডী-মঙ্গল' নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, কাব্যখানি সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় নাই। ইনি পূর্ব্বোক্ত কবি মুক্তারাম সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অদ্যাপি তাঁহার বংশ বর্ত্তমান। কাব্যখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু সুন্দর।

৫। কবি ফকীর চাঁদ।

'সত্যপীরের পাঁচালী' নামক গ্রন্থ ইঁহার প্রণীত। ইহাতে সত্যপীরের (হিন্দুর মতে 'সত্যনারায়ণে'র) মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। পটীয়া থানার অন্তঃপাতী 'সুচিয়া' গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্রাবয়ব।

৬। কবি দ্বিজ রতিদেব।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'মৃগলুব্ধ'। তাহাতে এক মৃগ ও লুব্ধের (ব্যাধের) প্রসঙ্গচ্ছলে শিব-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। নানা কারণে ইহা প্রাচীন সাহিত্যে একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রায় ৬০০ বৎসর হইল, ইহা বিরচিত হইয়াছে। কবির নিবাস,—পটীয়া থানার পার্শ্ববর্ত্তী 'সুচক্রদণ্ডী' গ্রামে। ইনি আমাদের স্বগ্রামবাসী হইয়াও, অতি প্রাচীন কালের লোক বলিয়া,

তাঁহার বিবরণ-সংগ্রহ এখন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ, তিনি তথাকার প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ভট্টাচার্য্য-বংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন।

৭। কবি বলরাম দেব।

ইনি 'স্বপ্নাধ্যায়' রচনা করিয়াছেন। ইহাতে স্বপ্ন-দর্শনের ফলাফল বর্ণিত আছে। কবির জন্মস্থান 'নবগ্রাম', এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহার পিতার নাম কমলাপতি। অধুনা নবগ্রাম নাম বিলুপ্ত হইয়া 'খিলপাড়া' হইয়াছে। এই 'খিলপাড়া' গ্রাম আনোয়ারার অতি নিকটবর্ত্তী। কবির বংশ আজও বর্ত্তমান। কবির বাড়ী আজও 'কমলাপতির বাড়ী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

৮।* কবি তারিণী দেবী।

এই মহিলা-কবির নিবাস কোথায়, তাহা ঠিক জানা না গেলেও, তাঁহাকে চট্টগ্রামবাসিনী বলিয়া বোধ হয়। চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ' পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়ের বাড়ীতে ইহাঁর রচিত একটি মাত্র শক্তিসঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে। গীতটি উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের পিতৃদেবের স্বহস্ত-লিখিত। প্রাচীন সাহিত্যে আরও কয়েক জন মহিলা-কবি আছেন। তাঁহার 'সুবচনী-ব্রত' নামক একখানি গ্রন্থও আমারা দেখিয়াছি। নিম্নে ঐ গীতটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শিব দুর্গা নাম লও না কেন মন রে আমার। ধু।
অন্তিম কালে তরাইবে ভবনদী পার।
দুর্গার নামটী মকরন্দ, শ্রবণে বহে আনন্দ,
নিরানন্দ নিতান্ত কপাল মন্দ যার।
দুর্গার নামটী গুণনিধি, পান কর নিরবধি,
তার ভয় কাল চিন্তে নাহিক তোমার।
তারিণী [illegible] বোলে, দুর্গা নামটি লইলে,
শমন ভবনে [illegible] দোহাই দিবে কার।

৯। কবি রা[illegible]জীবন বিদ্যাভূষণ।

ইহাঁর রচিত '[illegible]মঙ্গল' ও '[illegible] পাঁচালী' নামক দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। '[illegible]'খানি [illegible]। কবি বাঁশখালী থানার অন্তর্গত

'বাণী-গ্রামে' জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গারাম ভট্টাচার্য্য। ১৬১১ শকাব্দায় 'সূর্য্যব্রত পাঁচালী' ও ১৬২৫ শকাব্দায় 'মনসামঙ্গল' বিরচিত হয়। ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্যে' মনসামঙ্গলের পরিচয় দিয়াছি।

নূতন ঝি।

১

আষাঢ়ের রাত্রি। নিবিড় অন্ধকার। আকাশে বিদ্যুৎ হানিতেছিল। গুরু-গুরু মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিন্তু জোরে নহে; গাছের পাতা চোয়াইয়া বৃষ্টির জল আস্তে আস্তে পড়িতেছিল; টপ্ টপ্ শব্দ শোনা যাইতেছিল। শিশিরকুমার পালঙ্কে শুইয়া গল্প শুনিতেছিল। নূতন ঝি তাহার পাশে শুইয়া পাখা নাড়িতেছিল; গল্প বলিতেছিল। হঠাৎ শিশির জিজ্ঞাসা করিল,—"ঝি! তোমার নাম কি?" ঝি বলিল, "আমায় অমা বলে ডেকো।" গল্প শুনিতে শুনিতে শিশির ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার বয়স ৭ বৎসর।

২

ঝি নূতন হইলে কি হয়, আচরণে সে ইহারই মধ্যে ছেলে-মেয়ে-মানুষ-করা, সুখ দুঃখের ভাগিনী, জীবনে মরণে নিত্যসহচরী বহু পুরাতন ঝির স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। তাহার ব্যবহারে ছেলে বুড়া সবাই সমান বশ হইয়া পড়িয়াছে। ছেলে মেয়েরা মায়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না। শরৎ বাবুর অলস অকর্ম্মণ্য স্ত্রীও বাঁচিয়াছেন, তাঁহাকে আর কিছুই দেখিতে হয় না, কিছুই করিতে হয় না। তিনি এখন মনের সাধ মিটাইয়া নানা অবাস্তর প্রসঙ্গের আলোচনা ও অলস গল্পে প্রতিবেশিনীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার বিলক্ষণ অবসর পাইয়াছেন।

ঝি আবার এ দিকে নিতান্ত সাধারণ ইতরশ্রেণীর ঝির মত নয়। ঝি অনেক বইয়ের গল্প জানে, সীতারাম পড়ে, ঝির হাতের লেখা বেশ।

ঝি হিসাব রাখে, ধোবার বাড়ীর কাপড় লেখে, পাড়ার অনেক স্ত্রীলোকের চিঠি লিখিয়া দেয়। ঝি শিশিরকুমারকে বোধোদয়ের পড়া মুখস্থ করায়, এবং পাটীগণিতের অঙ্ক কসায়।

ঝি উলের কাজ জানে, রেশমের ফুল তোলে, জরীর জুতা বুনিতে পারে। শরৎ বাবুর স্ত্রী হার্মোনিয়ম টিপিবার সময় যখন বেসুরো হইয়া পড়েন, তখন ঝি বেশ বুঝিতে পারে।

বলিতে ভুলিয়াছি, ঝি কায়েতের মেয়ে, সধবা। মাথায় সিঁদুর পরে, পাড়ওয়ালা কাপড় পরে; হাতে শাঁখা ও দু'গাছা সোনার পাতলা বালা আছে। ঝি দেখিতে কুশ্রী। মুখে বিশ্রী বসন্তের দাগ। একটা চোখ একটু কাণা। ঝির রং ফরসা, বয়স চব্বিশ, পঁচিশ। ঝি ভয়ঙ্কর গম্ভীর এবং একটু রাগীও, কিন্তু অত্যন্ত কাজের লোক, সুতরাং শরৎ বাবুর স্ত্রী সরযূ তাহাকে ভয় করেন। ঝি তাঁহার অপেক্ষা বয়সেও বড়।

৩

একটি একটি করিয়া সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কন্যার বিবাহ দিবার জন্য শরৎ বাবু মক্কেলদিগকে থামাইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। শরৎ বাবু কানপুরে ওকালতী করেন।

বিবাহের আর বড় বিলম্ব নাই। পাকা-পত্র হইয়া গিয়াছে। পরশু দিন গায়ে হলুদ। এমন সময় এক বিপদ উপস্থিত হইল। হঠাৎ দেখা গেল, ঝির অত্যন্ত ব্যারাম। এত দিন জানা যায় নাই যে, তাহার পাকস্থলীতে cancer হইয়াছিল। ডাক্তার আসিয়া বুঝিলেন, সুবিধার নয়। পাড়ার লোক পরামর্শ দিল, হাঁসপাতালে দাও। শিশির তাহাদের গালি দিল। সরযূ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করিবে?" শরৎ বাবু কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। ঝি বলিল, "আমার পয়সা আছে, আমায় গঙ্গায় দিও।" আরও এক দিন কাটিল।

৪

সাত বৎসর পূর্ব্বে ঝি কাছে শুইয়া যেমন এক রাত্রে শিশির গল্প শুনিয়াছিল, আজও আষাঢ়ের তেমনই এক রাত্রি। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঝিকে তীরস্থ করা হইয়াছিল। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। পৃথিবী

ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। জীবিত ও মরণোন্মুখ,—উভয়েই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিয়া মরণের আগমনপথে আলো দেখাইতেছিল। মৃত্যু আসিতে বিলম্ব করিতেছিল। মুক্ত বায়ু মুমূর্ষুর পক্ষে সঞ্জীবনীর কাজ করিল। সে যেন কিছু সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। নিবিবার আগে প্রদীপ একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ঝি ডাকিল, "বাবা শিশির! তোর একে একবার ডেকে দে ত।" অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া শিশির ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, শুনিতে পাইল না। কথাটা শরৎ বাবুর কানে গেল, তিনি নিকটে আসিলেন; বলিলেন, "ঝি ডাকচো?" "ঝি উত্তর করিল, "হাঁ; আলোটা উস্কে দাও, মুখে একটু গঙ্গাজল দাও, কাছে ব'স।" শরৎ বাবু দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া নিকটে বসিলেন, ঝির মুখে একটু গঙ্গাজল দিলেন। ঝি বলিতে লাগিল,—"আমি মরিলে মাথায় সিঁদুর দিও; নখে আলতা ছোঁয়াইও। স্বামীর কাজ ক'রো। সেই ছাদে জ্যোৎস্না-রাত্রে কি বলেছিলে,—মনে পড়ে? আমার মুখের দিকে চাও। ফুলশয্যার রাত্রে—" শরৎ বাবু ভাবিলেন, প্রলাপের লক্ষণ দেখা দিতেছে। বলিলেন, "ঝি! কি বকছো? কলিকাতায় তোমার কেউ আছে? কাউকে খবর দেব?" ঝি বলিল "এঁা, আমার স্বামী আছে, পুত্র আছে,—তুমি—শিশির—সেই!" ঝি চুপ করিল। শরৎ বাবুর মুখের দিকে চাহিল, সে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল, তাহার অন্ধ-চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। শরৎ বাবু উঠিতে যাইতেছিলেন, ঝি তাঁহার হাঁটু ধরিল; বলিল, "ব'স, আমি—মা শীতলা—হাত দেখ—শিশিরের মা—ঝি সরযূর—ভুল করো না—চিনতে পারলে না।"

শরৎ বাবু হঠাৎ যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজের হাতের মধ্যে ঝির হাত তুলিয়া লইলেন। এমন সময় ঘরে যেন কাহার ছায়া পড়িল। তিনি ঝির হাত ত্রস্তে নামাইয়া রাখিলেন। কেন?

শিশির আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঝির মুখের কাছে গিয়া বলিল, "অ-মা, একটু দুধ খাবে? ঝি উত্তর করিল, "না,—আমি—খোকা নাকি? তুই—তোর বাব—হাতে কেন?" প্রলাপ শুনিয়া শিশির মুমূর্ষুর শিয়রে বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষে অশ্রুর প্রস্রবণ। শরৎ বাবু বিশেষ চিন্তাযুক্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আবার যখন শিশির ডাকিল, "অ-মা, অ-মা, একটু জল খাবে?" তখন ঝিয়ের চেতনা লুপ্ত হইয়াছে। শিশির ভাবিল, একটু ঘুমাইয়াছে।

৫

মৃত্যু বড়ই বিলম্ব করিতে লাগিল। যাহারা সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এ সকল কার্য্যে পটু প্রাচীনেরা লক্ষণ দেখিয়া বলিল, "আজ কিছু হচ্ছে না রে বাপু! কাল নাগাৎ সন্ধ্যা, কি হয় বলা যায় না।"

রাত্রি ১১টার পর শিশিরকে সঙ্গে লইয়া শরৎবাবু বাড়ী ফিরিলেন। দরওয়ানকে বলিয়া গেলেন, "রাত্রে যদি কিছু হয়, তবে খবর দিস।" ঘাটের অনতিদূরেই তাঁহার বাসা।

গৃহে ফিরিলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি গো! সব চুকে গেল এরি মধ্যে'?" "উঁ হুঁ। আমি আজ বৈঠকখানায় শুইগে" বলিয়া শরৎ বাবু বাহিরে চলিলেন। "আমিও একটু সামনের বারাণ্ডাটায় বসিগে, আজ বড় গরম। শিশির! ঝিয়ের বাক্স খুলে দেখ্‌ত কি আছে না আছে" বলিয়া তিনিও শরৎ বাবুর অনুবর্ত্তিনী হইলেন। ঝিয়ের আর কতই আছে! যাত্রাকালে ঝি শিশিরের হাতে চাবি দিয়া গিয়াছিল।

শিশির ঝির বাক্স খুলিল। ঝির ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। শিশির দেখিল. বাক্সের মধ্যে থান কয়েক দেশী ও বিলাতী ধোপার বাড়ীর কাপড়, একটা সুতার কাটিম, ঝিনুকের ও সিংএর কতকগুলা বিভিন্ন মাপের বোতাম, একখানা কাঁচী, রেশম ও পশমের দুটো বাণ্ডিল, একটা ভাঙ্গা সিঁদুরের কৌটা, এক শিশি কর্পূরের আরক—তার তলাটা জমিয়া গিয়াছে, এবং আরও দুটা শিশিতে কি ঔষধ। একটা ভারী খেরোর থলি ও সেই থলি চাপা একখানা ছোট নীল রঙ্গের খাতা। কত টাকা, গণিবার জন্য শিশির থলির ভিতরে যাহা ছিল, তাহা ঢালিয়া ফেলিল। থলির ভিতর হইতে পড়িল একখানা মোটা কাগজ, টাকা, থান ৩।৪ অলঙ্কার ও একটা আংটী। শিশির টাকা গণিল; তার পর মোটা কাগজখানা কি দেখিল। দেখিল, সেখানা পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ। তাহাতে কতকগুলা নাম। শিশির সেই নামের মধ্যে তাহার নিজের নাম, তাহার পিতার নাম, সুবাসিনী দাসী ও আরও দুটা অপরিচিত নাম দেখিতে পাইল। সে কিছু বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে পড়িল, ঝির মুখেই শুনিয়াছিল,—তাহার নামে কোম্পানীর কাগজ আছে। কিন্তু সে কাগজ ঝির বাক্সর মধ্যে কেন? ভাবিল, ছিঃ! আমার ঝি চোর। ঝি আসিবার পর তাহাদের

কোনও গহনা কখন চুরি যায় নাই ; শিশির ভাবিল গহনা ঝিরই। ঝিকে চোর ভাবিতে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল।

শিশির টাকা কড়ি থলির মধ্যে তুলিয়া রাখিল। বালকসুলভ চপলতা-বশে আংটিটা একবার আঙ্গুলে পরিয়া দেখিল। পরক্ষণেই আবার খুলিয়া ফেলিল। খুলিবার সময় আংটীর উপরকার হরতনের টেকা যে বেড়টার উপর ছিল, সেটা দুখানা ছাপার মত ভাগ হইয়া দু পাশে সরিয়া গেল। শিশির দেখিল, তাহার মধ্যে কাহার চেহারা। আলোর কাছে গিয়া দেখিল, তাহার পিতার প্রথম যৌবনের! ছবির ফ্রেমের উপরে খোদা—"শরৎ", নীচে "সুবাসিনী"! শিশির হাতের মধ্যে আংটী মুঠা করিয়া ধরিল ; ভাবিল, সুবাসিনী কে ? তার মার নাম সরযূ!

শিশির অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। সে বিনা উদ্দেশ্যে নীল খাতাখানা খুলিয়া ফেলিল। প্রথম যে পাতাখানা নজরে পড়িল, দেখিল, তাহাতে ঝির হাতের অক্ষরে তাহার নাম-সংযোগে কি সব লেখা! বিস্ময়ের আধিক্য শিশিরের কিশোর মস্তিষ্ক বিহ্বল করিয়া তুলিল। সে আবিষ্টের মত উঠিয়া পড়িল। কোম্পানীর কাগজ, খাতাখানা ও আংটীটা পকেটে ফেলিল। বাক্স চাবি শুদ্ধ লইয়া গিয়া তাহার মার ঘরে গেল। সরযূ তখন নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। শিশির বলিল, "এই নাও। কিছু কম আড়াই-শ টাকা আছে, আর খান চার গয়না আছে। আমি শুইগে।" শিশির নিজের শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। সরযূ ঝির বাক্স লইয়া পড়িলেন।

শিশির ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বাতী জ্বালিল। তখনও তার শরীর ঝিম ঝিম করিতেছে। পকেট হইতে খাতা বাহির করিয়া শিশির গোড়া হইতে পড়িতে লাগিল।—

"এখানে ত আছি বেশ। নিজের ঘরের নিজে গিন্নির মত। সরযূ ঘুণাক্ষরেও জানে না, সুতরাং তারও কোনও বালাই নাই। সে আমায় ঝির মতন দেখে না ; যত্ন করে, আমায় সমীহ করিয়াও চলে। বাবুও বোধ হয় আমায় সেই জন্যে নিতান্ত ঝির মতন ভাবেন না। ঝির মতন ত ভাবেন না, কিন্তু যা ভাবা উচিত, তা ভাবেন কি ? হা আমার কপাল! তাই যদি ভাবিবেন, তবে আমি আজ নিজের ঝি নিজে হইব কেন ? প্রয়াগে বসন্তের হাতে ত সকল জ্বালাই জুড়াইতেছিল জুড়াইল না কেন ?

পত্নীর খাতিরে যাহারা তীর্থের সঙ্গী হইয়াছিল, তাহারা একে একে ফেলিয়া পলাইয়াছিল। সন্ন্যাসিনী হইয়া তীর্থে তীর্থে ফিরিতেছিলাম। আমার ত সকলই গিয়াছিল তবে আবার মায়ায় পড়িলাম কেন? যে নিষ্ঠুর আমার বুক-ভরা ধন কাড়িয়া রাখিয়া আমায় অন্যায় শাস্তি দিয়াছিল, মন বাঁধিবার মুখে অতকাল পরে প্রারব্ধের কোন বিধানে সে আবার আমার চক্ষে পড়িল?

"ভুলে যাওয়া স্বপ্ন সকল দেখিলে মনের অবস্থা কি হয়? বাবুকে এলাহাবাদ ষ্টেশনে হঠাৎ দেখিয়া আমার তাই হইয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্তেই আত্মসংযম করিয়াছিলাম, ঘোমটা টানিতে গিয়া মনে পড়িয়া গেল, বসন্তের পর আমি নিজেকেই নিজে চিনিতে পারি না। কথা কহিবার লোভ দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল, কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল, তবু কথা কহিলাম, দেখিলাম, বাবু চিনিতে পারিলেন না, পারিলে আমার পক্ষে ভাল ছিল। এখানে আসা হইত না, যে পথ ধরিয়াছিলাম সেই পথে চলিতে চলিতেই পঞ্চভূতে দেহ মিলাইতাম। এ দারুণ সংশয় সঙ্কটে পড়িতাম না। কিন্তু, আমার ভোগের অবসান হয় নাই, অদৃষ্ট পরিহাস করিতে ছাড়িবে কেন? সে আমাকে দিয়া বলাইল,—

'বাবু, আপনি বাঙ্গালী. কোথা যাবেন গা? আমায় একখানা টিকিট করিয়া দিবেন?'

'কেন? আমি কাণপুরে যাব। তুমি কোথায় যাবে? দাও—পয়সা দাও।'

'আমিও ঐখানেই যাব' বলিয়া টাকা দিলাম। তিনি টিকিট কিনিয়া দিলেন। গাড়ী ছাড়িতে তখনও বিলম্ব ছিল। অদৃষ্ট আবার বলাইল, 'বল্ হ্যাগা বাবু, আপনার ঝির দরকার আছে?' আমি তাহাই করিলাম, এবং ঘোমটা আরও একটু টানিয়া দিলাম। বুঝি মনে হইয়াছিল, তিনি চিনিতে পারিলেন না।

'হাঁ, বাঙ্গালী ঝি আমার এক জন চাই বটে, তা তুমি কি তিন টাকায় থাকবে? তোমার দেশ কোথা? তুমি ত দেখছি সধবা, ছ মাস অন্তর দেশে যেতে চাইবে ত? কত দিন হ'ল তোমার বসন্ত হ'য়েছিল?'

এ সকল প্রশ্নের উত্তরে অদৃষ্ট সবেমাত্র আমাকে দিয়া বলাইয়াছে, 'আমার স্বামী নিরুদ্দেশ, দেশে'—এমন সময় বাঁশী দিল। বাবুর গাড়ীতেই উঠিতে যাইতেছিলাম, পরে সামলাইয়া লইয়া মেয়ে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তার পর সেই হইতেই আমি ঝি।

"কিন্তু যার জন্ম এত করিলাম, সে কই? এই শিশিরই কি আমার সেই ছ' মাসের খোকা? জানিবার কোনও উপায় নাই। এ বিদেশে এদের ঘরের কথা কেউ জানে না; কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? সরযুকে? না। সে জানে, তার এক সতীন ছিল, কিন্তু তাহার বিবাহের পূর্ব্বেই তার সেই সতীন কলেরায় মারা গিয়াছিল। বাবুর মুখেই সে এ কথা শুনিয়াছে। আমার কলেরা হইয়াছিল বটে, বাবু তাহা জানিতেন। সেই সময়েই ওকালতী করিতে তিনি বিদেশে যান। আমি যে মরি নাই, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই, তার পর আমাদের আরও কত কি হইয়া গিয়াছে তাহাও জানেন না। তিনিও সেই অবধিই বিদেশে। আমিই যে তাহার সেই সতীন, সরযুর সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই। থাকিলে সে আমায় এমন সর্ব্বে-সর্ব্বা করিয়া রাখিত না। কিন্তু তাহার সতীনের ছেলে ছিল কি না, তাহা আমাকে জানিতে দেয় নাই। আমিও জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পাই না। যদি বলে, 'না, ছিল না', তবে আমার দশা কি হইবে! শিশিরের বিষম মায়ায় পড়িয়া নিজের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তাহার উপায় কি হইবে?

"সরযূর ব্যবহারেও ত কিছু বোঝা যায় না। সে সময়ে সময়ে শিশিরের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করে বটে, কিন্তু তাহার মেয়েদের প্রতিও ত সেইরূপ করে। ওটা কি ওর মেজাজের দোষ? স্বামীর ব্যবহারে ত একেবারেই কিছু বুঝিবার বো নাই। বরং শিশিরের প্রতি তাঁহার যেন একটু বেশী টান দেখিতে পাই। সে হয় ত প্রথম সন্তান, এবং পুত্র বলিয়া। অথবা তার মা নাই বলিয়া? তাই বা কে বলিবে?

"শিশিরের, আমার, সরযূর ও তাহার বড় মেয়ের বয়স ধরিয়া হিসাব করিয়াও দেখিয়াছি। তাহাতেও ঠিক পাই না। সামান্য এ দিক ও দিক হয় বটে, কিন্তু খোকা তেমন আমার কিছু অধিক বয়সে হইয়াছিল।

"তবে একটা বিশেষ সন্দেহ আছে। সরযূ যখন তখন তার মেয়েদের 'তুই তোকারি' করে, কিন্তু রাগের অবস্থায় বা সহজে ভুলিয়াও ত শিশিরকে কখনও 'তুই' বলে না; নিজের পেটের সন্তানের প্রতি এ ব্যবহার কি স্বাভাবিক? কিছুতেই নয়। আরও এক কথা, আমার প্রতি শিশিরের যে মায়া পড়িয়াছে, বুঝিতে পারি, সে রক্তের টান ছাড়া সম্ভব নয়। তাকে অ-মা (ও মা) বলিতে শিখাইয়াছি। সে তা ছাড়া কখনও আমায় ঝি বলে না। তাই ভাবি, হয় ত শিশির আমারই সেই খোকা।

"সময়ে সময়ে ভাবিয়াছি,—স্বামীকে সকল কথা খুলিয়া বলি। চীনের কালি দিয়া ছুঁচের কলমে আমার বাঁ হাতে তাঁহার নাম লিখিয়াছিলেন, সেইটা দেখাই; তা হলেও ত চিনিতে পারিবেন। "ও কিছু নয়, উল্কির দাগ" বলিয়া শিশিরকে কতদিন ভুলাইয়াছি। বসন্তের দাগে একটু ঢাকা পড়িয়াছে বটে, তবু এখনও বেশ বুঝা যায়। তাঁর ডান হাতে আমার যে নাম লেখা ছিল, সেটাও একবার দেখিতে সাধ যায়।

"কিন্তু নানা কারণে তাতে কাজ নাই। সরযূ এখন সুন্দরী একছত্র রাণী। বাবু তার অতি নিরীহ নির্ব্বিরোধী ভক্ত প্রজা। রাজত্ব বেশ চলিতেছে। আমি ঝি সহায়সম্পদহীন। বাবা মরিয়াছেন, তাঁহার যে ঐশ্বর্য্য তাঁহার একমাত্র মাতৃহীনা হৃতসর্ব্বস্ব কন্যার জীবন্ত স্বামীর অভাব পূর্ণ হইতে পারে ভাবিয়া বড় জোর করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, 'ভয় দেখাবার দরকার নাই, বিয়ে করতে বলগে,' সে ঐশ্বর্য্যও গিয়াছে, থাকিলে কি হইত, বলা যায় না। হয় ত সরযূসুন্দরীর মত এক ঝি পাইতাম। পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ পাইয়াছিলাম মাত্র। তাতে যার এদেশের কামিনী সাজের তুফান তুলিতে ভরসা করা যায় না। সে পাঁচ হাজার টাকাই বা আর আমার আছে কই? সে ত শিশিরকে দিয়াছি। বাবার পরামর্শমত তাকে সাক্ষী করিয়া বাবর মা—"

বাহিরে যেন কার পদশব্দ শোনা গেল। শিশির চট্ করিয়া খাতা বন্ধ করিল। আলো নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সে অবস্থায় বেশী ক্ষণ থাকিতে পারিল না। উঠিয়া খাতা, আংটী ও কোম্পানীর কাগজ তাহার ডেস্কের মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিল। তার পর নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। রাত্রি তখন প্রায় ২টা।

বহুদিন পূর্ব্বে কোনও এক ঘটনা উপলক্ষে শিশির একবার সন্দেহ করিয়াছিল, সে হয় ত সরযূর গর্ভজাত নয়। আজ তাহার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় অন্ধকার জনহীন পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে সে কথা হঠাৎ মনে পড়িল। বাহিরের মেঘের মত তাহার মনের অন্ধকারও যেন আকাশের বিদ্যুতে চিরিয়া তফাৎ হইয়া গেল। সে সেই নিমেষের আলোকে স্পষ্ট দেখিল,—সরযূ তাহার বিমাতা।

শিশির ঘাটে গিয়া মুমূর্ষুর ঘরের স্তিমিত আলোকে দেখিল, সে ঘুমাইতেছে। নিকটে গিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "মা! মা!" কোনও উত্তর

পাইল না। আলো নিকটে আনিয়া সে তখন অ-মার বাম হাত তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল। বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, আস্ত পানের আকারের একটি রেখার মধ্যে দুটা অক্ষর 'শ' ও 'র'। বসন্তের দাগে মাঝের অক্ষর যে ঢাকা পড়িয়াছে, সে তাহা বুঝিল। সে লুপ্ত অক্ষরটা কি, তাহাও তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন সে ব্যাকুলভাবে কাতর-উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে আবার ডাকিল, "মা! মা! দেখ, এই দেখ, তোমার সেই খোকা, চাও, দেখ মা!" অ-মার তখন নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে।

৬

প্রাতে আসিয়া শরৎ বাবু দেখিলেন, সব শেষ হইয়া গিয়াছে! মুখাগ্নি করিয়া শিশির একদৃষ্টে চিতার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কাচের মত স্বচ্ছ চক্ষু শুষ্ক, বারিহীন। নিজের চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক বালকের এই নিশ্চল মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

৭

ইহার তিন দিন পরে সরযূ শিশিরকে ডাকিয়া বলিলেন, "কাছা ছাড়, জুতা জামা পর। দু' এক দিনের মধ্যেই বুড়ীর বিয়ের নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইতে হইবে। হবিষ্য করাই বা কেন?" শিশির পিছন ফিরিয়া বলিল, "আমার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। আমার এক মাস অশৌচ।" "আর অত বাড়াবাড়ি জ্যাঠাপনাতে কাজ নাই, যা বলা যাচ্চে, কর!" বলিয়া সরযূ পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া মাথার কাপড় সরাইয়া দিলেন। শরৎ বাবু সেখানে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিলেন, তিনি কলম হাতে শিশিরের দিকে চাহিলেন। কোনও কথা না কহিয়া শিশির সেখান হইতে চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া সেই নীল খাতা, আংটী ও কোম্পানীর কাগজ শরৎ বাবুর সামনে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। শ্লেষপূর্ণস্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া সরযূ বলিলেন, "কি গো! আমি ঝি কি না, তাই বুঝি কথাটা গ্রাহ্য হ'ল না।" ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শিশির বলিল, "অমন করো না, থাম। বাবাকে জিজ্ঞাসা কর, অ-মা আমার কে।"

তাহার কণ্ঠে বজ্র; চক্ষে আষাঢ়ের বর্ষণোন্মুখ মেঘ।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত।

মৃত্যু।

মৃত্যু একটা পরিষ্কার পথ। কারণ, ১। এটা নিঃসন্দেহ। ২। জন্মের ন্যায় ইহা গর্ভ অবলম্বন করে না। ৩। ইহাতে কাহারও মুখ চাহিতে হয় না। তিনটি প্রমাণই যথেষ্ট।

জন্মকে আমরা ঘৃণা করি, মৃত্যুকে ভালবাসি। ভেদ-জ্ঞানই ঘৃণা। সংসার জঞ্জালসঙ্কুল। সংসারকে আমরা ঘৃণা করি। কতকগুলা আলাই, বালাই, জঞ্জালের সংখ্যা কমিয়া গেলেই শান্তি। আবার যাহাকে ভালবাসি, সে মরিয়া গেলেই আমরা মরিতে চাহি। ইহাও ভগবানের অপূর্ব্ব চালাকী। তিন হইতে দুই হয়, দুই হইতে এক হয়। সুতরাং মৃত্যু সর্ব্বতোভাবে ভাল।

রামের ইচ্ছা, শ্যামের মৃত্যু হয়; শ্যামের ইচ্ছা, রামের মৃত্যু হয়। দেখা যাউক, কে আগে মরে। রাম শ্যামকে ভয় করে, এবং শ্যাম রামকে ভয় করে। ইহা প্রথম চালাকী। যদি রাম শ্যামের অবলম্বন হয়, কিংবা রাম শ্যামকে ভালবাসে, তাহা হইলেও পরস্পরের মৃত্যুতে ভয় আছে। ইহা চালাকী নং ২। প্রকৃতির কি চমৎকার কৌশল!

মৃত্যুভয় কি পূর্ব্বজন্মের প্রমাণ? আত্মার আবার ভয় কি? বাবা! কোন ভয় নাই, দুর্গা নাম করিয়া মরিয়া পড়। উত্তর,—"বাবা! আমার ভয় নাই, কিন্তু তোমাদের জন্যই ভয়!"

আহা! কি গুরুবাক্য! আমরা তাহার অর্থ বুঝি না!

সেজন্যেই আত্মার একটু গুরুত্ব আছে। গুরুপাক দ্রব্য সহজেই উদ্গিরিত হয়। বোধ হয় (শাস্ত্রেও বচন* আছে) দেবতারা মৃত্যুকালে জীবগুলাকে খান, কিন্তু গুরুপাক সহজে হজম হয় না। পিণ্ড দেওয়া সহজ, কিন্তু হজম করা শক্ত।

মৃত্যু দুই প্রকার। সাধারণ মৃত্যু এবং অপমৃত্যু। জলে ডুবিলে, আগুনে পুড়িলে, বাঘে খাইলে অপমৃত্যু হয়। দেবতারা টানিলে সাধারণ মৃত্যু। আত্মহত্যা অপমৃত্যু। কিন্তু শুনিয়াছি, ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া বাহির হইলে সে মৃত্যু অসাধারণ।

যদিও ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া বাহির হওয়ার কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু বিচার

করা উচিত। কথাটা বেশ মনে লাগে। ব্রহ্মরন্ধ্র, হুঁকার ছিদ্রের মত। জাতিবিচার না থাকিলেও, কেহ শীঘ্র অপরের হুঁকার ছিদ্রে মুখ দিতে সাহস করে না। কি জানি যদি কোন ব্যামোহ থাকে, কিংবা পোকাটা, মাকড়টা ভিতরে থাকে। জীব অদ্ভুত পদার্থ কি না।

কিন্তু শুনা গিয়াছে, এ পথেও বাধা আছে। নসীরামের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া পলায়নতৎপরতার লক্ষণ নসীর মা টের পাইয়াছিল। কাজেই মৃত্যুকালে নসীর মা নসীর ব্রহ্মরন্ধ্রে চুম্বন করিয়া বলিল, "বাবা নসী, এ পথ দিয়া আসিও না।" মায়ার কি গুণ! স্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! আপনারা জানেন, হুক্কা-রন্ধ্রে মুখ দিয়া বায়ুর চাপ দিলে জল মস্তক দিয়া বহির্গত হয়, এবং অগ্নিও নিভিয়া যায়। (সাবধানে দিলে গুড়্ গুড়্ করিয়া ডাকে, কিন্তু তাহা আকস্মিক)। নসীর মা কিঞ্চিৎ চাপ দেওয়াতে নসীর অস্তিত্ব অগ্নিজলে সম্মিলিত হইয়া একটা জগা-খিচুড়ীর ন্যায় হইয়া গেল। ইহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে, মায়া একটা ব্রহ্মরন্ধ্রের বাধা। কিন্তু বোধ হয় উহাই মুক্তির পথ।

মৃত্যুতে যদি মুক্তি না হয়! ইহাই ভয়ের কারণ। সুতরাং নিশ্চিত জানিতে না পারিলে কেহ শীঘ্র মরিতে চাহে না। অনেক বিচক্ষণ পুরুষ এই শরীরেই অনেকবার মরিয়া (অর্থাৎ জীবন্ত অবস্থায়) পরখ করিয়া লন। শুনিতে পাই, ইহার নাম যোগ। ইহা সজ্ঞানে অভ্যাস করিতে হয়, এবং অভ্যাসের গুণে মৃত্যু সহজ হইয়া পড়ে। একবার চেষ্টা করা মন্দ নয়।

কোনও কবি গাহিয়াছিলেন,—

"মরণ রে! তুঁহু মম শ্যাম সমান,
* * * মেঘবরণ জটজুট।"

বোধ হয়, কবি একবার মরিয়া দেখিয়াছিলেন, নচেৎ এমন সুন্দর ভাব আমরা পূর্ব্বে কভু দেখি নাই। কথাটি শাস্ত্রসঙ্গত। চিতানলে জীব ধূম্রের ন্যায় বাষ্পাকারে উপরে উঠে, এবং দেখিতে অনেকটা মেঘের মত। উপনিষদেও ধূম, অর্চ্চির কথা আছে। তবে ব্রজের শ্যামের জটা ছিল কি না, আমরা জানি না। বোধ হয়, মরণকালে (ব্যাধ-শর-বিদ্ধ হইবার পূর্ব্বাহ্ণে) যদুবংশধ্বংসকালে তৈল মাখেন নাই। কিংবা হরিহর একাধারে কল্পিত হইয়াছে। যাহাই হউক, কবিতার ভাবটি সুন্দর।

অজ্ঞানে মরিলে অন্ধকার দেখে, সজ্ঞানে আলোক দেখে। এ আলোক জ্ঞানালোক। ইহার কোনও বর্ণ নাই, অথচ আলোক। ইহা তলোয়ার নহে,

অথচ তীক্ষ্ণ। আমরা জড়বাদী, ইহার মর্ম্ম বুঝি না; কিন্তু কথাটা চিরপ্রচলিত। অনেক চিরপ্রচলিত কথার সত্যতা অধুনা সাব্যস্ত হইয়াছে, যেমন "মা ষষ্ঠীর কৃপা", "বাঞ্ছারাম কল্পতরু" প্রভৃতি।

এখন মরণের প্রণালীটা ভাল করিয়া দেখা উচিত। বিজ্ঞান কি বলেন? আয়ু পরিমিত। যদি কোনও শক্তি, পদার্থে সংযোজিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় (যেমন একটা গোলা), তাহা হইলে সেটা চিরকালই চলিতে থাকিবে, যদি না বাধা পায়। একটা ক্ষুদ্র শক্তিকণাও এই হিসাবে অমর (Newton's Second Law of Motion.) অথচ বাধা পায় বলিয়া আয়ু পরিমিত। এই প্রথম বাধার নাম Natural Law (বিধান)। মনুষ্যের মনুষ্যত্বই বাধা। মনুষ্যদেহে এই বাধা সংক্রামিত হইয়া জীবনকে শতবৎসররূপী পরিচ্ছিন্ন গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলে। নচেৎ একটা মনুষ্যে নির্ব্বিবাদে বহুকাল চলিয়া যাইত। কোথায় যাইত, তাহা জানি না, কিন্তু যাইত, সেটা নিশ্চয়। চতুর্দ্দিকের একটা দিকে যাইত। পরস্পরের নাকের মধ্যে, কাণের মধ্যে এবং সুবিধা পাইলে কাপড়টা জুতাটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িত। কিন্তু ইহা কি বাঞ্ছনীয়? এই বিরক্তিজনক গতির পক্ষে অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরই যথেষ্ট।

ইহার মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের কথা আছে। যদি বরাবর না চলিয়া মাঝে মাঝে থামে? এটুকু ভগবানের ইচ্ছা, কিন্তু এই ইচ্ছা মানুষের বুদ্ধি দিয়া আসে। অনেকে ধীরভাবে চলিয়া বেশী দিন বাঁচে। জীবনে অনেক বাধা আছে। ঝড়টা, বৃষ্টিটা, মারীভয়টা, কোনটা নয়? কাজেই সারমেয়-তাড়িত শৃগালের ন্যায় মনুষ্যজীবন কখনও কখনও এ দিক ও দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া, কখনও ঝোপের মধ্যে কখনও গহ্বরে লুক্কায়িত হইয়া প্রাণরক্ষা করে। ইহাও চালাকী।

প্রাণটা বুদ্ধিরূপে আত্মরক্ষা করে। বুদ্ধিরূপে ছোট কালটাকে বড় করে। যদি দ্রুত চলিলে পঞ্চাশ বর্ষে আয়ুঃক্ষয় হয়, তবে ধীরে চলিলে শত বর্ষ কাটান যাইতে পারে। আপাততঃ এই ভাবে দেখিলে নিউটনের গতিসম্বন্ধীয় আইন খাটে না। কিন্তু কথাটা এই, জীবনসংগ্রামে দ্রুতগতিতে বাধার বহুলভাবে উৎপত্তি হয়, এবং ধীরগতিতে কিংবা কৌশলযুক্ত গতিতে বাধা কম হয়। সুতরাং বাধাটাই আসল। বাকি যেমন তেমনই।

মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবনের এত মূল্য। মৃত্যু না থাকিলে জীবনের কদর কেহ বুঝিত না। মৃত্যুই জীবনের ভূষণ। মৃত্যুই জীবনের মূল্য। সারা জীবন খাটিয়া যাহা পুরস্কার পাওয়া যায়, তাহাই মৃত্যু। মরিতে হইবে বলিয়াই

আমরা খাটি। মরিয়াই আমরা জগতের হিতে আসি। তুমি আমার জন্যে মর, তাই তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসা মৃত্যুর সহচরী। তুমি মরিলে আরও ভালবাসিব। জগৎও ভালবাসিবে। মৃত্যু মহা-সুনিদ্রা।

বেদান্তবাগীশ বলেন, জীবই ব্রহ্ম। জ্ঞান মরিয়া গেলেই, শুষ্ক হইলেই, একটা অখণ্ড অদ্বৈতবাদরূপে দণ্ডায়মান হয়। কিন্তু একটু পেটে ব্যথা ধরিলেই অদ্বৈতবাদী অস্থির। উদাহরণ, যেমন তৈল-শলিতা-যুক্ত দীপশিখা।

উদাহরণটি অনেক কালের। অগ্নি দীপাকারে জ্বালাইতে হইলে তৈল ও শলিতা চাহি। অগ্নি অমর। কিন্তু তৈলের মাত্রা পরিচ্ছিন্ন। শলিতাটা কাঠাম, কিংবা স্থূলদেহ। অথচ অগ্নি সাক্ষিগোপাল। অগ্নি নহিলে শলিতা জ্বলিবে না। কিন্তু তৈলসংযুক্ত না হইলে অগ্নির অগ্নিত্ব থাকে না। কোনটা সৎ, কোন্‌টা অসৎ? সাক্ষিগোপাল প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়াও সৎ। তৈল বেচারা অসৎ। শলিতার ত কথাই নাই। অথচ তৈল নহিলে চলে না। বংশে অনেক বাতি দিতে গেলে অনেক তৈল চাহি, অনেক শলিতা চাহি। তৈল অন্ন। অন্ন সঙ্কীর্ণ।

তৈলটা কিংবা অন্নটাকে বহুলভাবে রক্ষা করিতে হইলে, দেবতাগণকে ঠকাইতে হয়। পঞ্চপ্রাণ এক একটা দেবতা। প্রাণ, অপান, উদান, সমান, ও ব্যাণ। অন্ন গিলিতে বসিয়া প্রথমতঃ পাঁচটি ভাত শ্রীমানদিগের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে হয়। নচেৎ সর্ব্বনাশ! কিন্তু ইহাতে একটা সুবিধা আছে। দেবতাগণ মনুষ্যের ন্যায় শীঘ্র খাইতে পারেন না। দেবতা-গণের অহোরাত্র আমাদিগের সংবৎসর, কিন্তু খাইবার বেলা দেবতাদিগের সংবৎসর আমাদিগের একদিন। একটি দেবতা শত বর্ষে একটা মানুষ খান, সুতরাং পাঁচটি ভাত খাইতে অন্ততঃ পাঁচ ঘণ্টা লাগা সম্ভব। কাজেই তাঁহাদিগের উৎসর্গীকৃত অন্ন-আক্রমণের পূর্ব্বেই আমরা একথাল ভাত সাপটে খাইয়া ফেলিতে পারি।

পুনর্জ্জন্মের কথা আমরা জানি না, কিন্তু ইহা সম্ভব, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জ্ঞান নামক প্রাণের একটা সূক্ষ্ম রূপ না কি বাঁচিয়া থাকে। তাহা মনের মধ্যে বহুকাল নানাবিধ লোকে ঘুরিয়া বেড়ায়। মনের বৈধব্যদশা হইলে, অর্থাৎ মনের মানুষটা মরিয়া গেলে, মন প্রথমতঃ পিত্রালয়ে কিংবা চন্দ্রলোকে যায়। যদি সতী হয়, তবে শুক্ল বসন (পক্ষ) পরিধান করিয়া যায়; যদি অসতী হয়, তবে কৃষ্ণ পক্ষ পরিধান করিয়া যায়। আমরা যেমন নরলোকে

যেখানে যাই, চন্দ্রলোকে দেবযানে যাইতে হয়। অসতী হইলে দেবতারা স্পর্শ করেন না। পিতৃযানে যাইতে হয়। পথিমধ্যে মশকের দৌরাত্ম্য হইলে ধূম প্রভৃতির সাহায্য লইতে হয়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, বাস্তবিক মনোদেবী বিধবা হন না, কারণ, আত্মা (তাঁহার স্বামী) অমর। কিন্তু আত্মা আপাততঃ অদৃশ্য হওয়াতে তাহার সন্ধান করিতে স্বর্গলোক পর্য্যন্ত ধাবিত হইতে হয়। পরে পুনর্ব্বার জন্মিলে হুবহু পূর্ব্বজন্মের জীবটাই আসে, কিন্তু কচি খোকার বেশে।

দেবতারা জীবদ্দশা হইতেই মানুষ খাইতে আরম্ভ করেন। সাপে ব্যাং ধরিলে ব্যাং সহজে মরিতে চাহে না। শুনিয়াছি, যোগিপুরুষগণ ভেকের মত, দেবগণ দ্বারা আক্রান্ত হইলেই মহামুদ্রা প্রভৃতি করিয়া থাকেন। এমন কি, অনেকে তপস্যা করিয়া অমর হন।

মৃত্যুর কথা তুলিলেই অমরত্বের কথা উঠে। আত্মা অমর। তবে তপস্যার দরকার কি? আমার বোধ হয়, বারংবার না মরিতে হইলে, তাহাকেই অমরত্ব কহে। প্রমাণ, হনুমান অমর কিন্তু ইহলোকে নাই;—সেই প্রকার, বিভীষণ প্রভৃতি। কাজেই অমর শব্দের অর্থ মুক্তি।

মুক্তির দুইটি পথ আছে। ১। সাধনা দ্বারা; যেমন, ব্রহ্মরন্ধ্র প্রভৃতি দিয়া। ২। জগতের হিতসাধন করিয়া, এবং আত্মোৎসর্গ করিয়া। শেষোক্ত পথ প্রশস্ত। প্রথম পথ সঙ্কীর্ণ। তাহার মধ্যে মোটা বুদ্ধি ঢুকিতে পারে না। এটা Private entree; যে জগতের জন্য প্রাণ না দিয়াছে, তাহার মুক্তির অর্থ কি? উত্তর, ঈশ্বরের চরণে লুকাইয়া প্রাণ দিলেও, সেটা ভগবান জগতের হিতার্থ ব্যয় করেন। সুতরাং যোগিগণের মতে গুপ্ত পথ দিয়া আত্মমুক্তিটাই ভাল পথ। ফল একই।

তবে মৃত্যুর পরে বাস্তবিক কি হয়, আমরা জানি না; এই জন্য জগতের হিতার্থ প্রাণ দিয়া জীবদ্দশায় মুক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া ভাল।

যাঁহাদের মরণের সম্বন্ধে বিশেষ চর্চ্চা করিবার ইচ্ছা, তাঁহারা থিয়সফি সাহিত্য পাঠ করুন। অনেক বহি বাহির হইয়াছে। নির্জীব বাঙ্গালীর দেহেতে প্রাণ বড় নাই। যাহা আছে, তাহা মাথায়। সুতরাং মাথা দিয়া প্রাণ দিতে হয়। বহি পড়া ইহার একটা সোজা উপায়।

শেষ কথা, মৃত্যু ভয়াবহ নহে। ইহা অতি সুন্দর ও সোজা পথ। জীবন ব্যয় করার নামই মৃত্যু। যখন ব্যয় করিয়া আসিয়াছি, এবং নূতন

পুঁজি নাই, তখন ফল অবশ্যম্ভাবী। মহাজন সকলেই ঐ পথে গিয়াছেন। মৃত্যুর লক্ষণও পবিত্র। মরিবার পূর্ব্বে দেহ শুক্লবর্ণ ধারণ করে, ক্ষুধা কম লাগে, তীব্র বাসনাগুলিও কমিয়া আসে। দ্বন্দ্ব, তৃষ্ণা, আশা প্রভৃতি কমিয়া গেলে শান্তির সূচনা হয়। এই সময় কল্পনা ভাল লাগে। "ঐ দেখা যায় আনন্দধাম ভবজলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়"। সকলে মিলিয়া দেখ!

আর শুনা গিয়াছে, মৃত্যুকালে যাহাতে তন্ময় হইয়া মরে, মৃত সেই আকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বিন্দুতে তন্ময় হওয়াই ভাল। যত সূক্ষ্ম লক্ষ্য, ততই সূক্ষ্ম আকার। ইহার সুবিধা এই যে, বিন্দুভাবে যথা তথা যাওয়া যায়, এবং যদি কেহ জগতে ভালবাসিয়া থাকে, তবে বিন্দুভাবে তাহার অশ্রুবারি অবলম্বন করিলে বড় সুখ হয়। বিন্দু কিংবা কণাই মধুর। হাসিকণা মধুর, অশ্রুকণা মধুর। যদি হাসিয়া থাক, তবে জানিও, বহুকালের ভালবাসার ধনগুলি আমার মুখ দিয়া হাসিতেছে। যদি কাঁদিয়া থাক, তবে জানিবে, জগতের দুঃখশোকাতুর যাহাদের জন্য কাঁদিয়াছিলে, তাহারাই তোমার অশ্রু দিয়া কাঁদিতেছে। তুমিই ঈশ্বর। জীবই ঈশ্বর। তাঁহার হাসি কান্নার স্থান আমাদিগের দেহে। অতএব তোমরা সকলেই পবিত্র। এ দেহমন্দির অপবিত্র করিও না। মৃত্যু দ্বারা সংস্কার করিও।

গান।

ছায়ানট্; একতালা।

কেন এত সুন্দর শশধর, ও সে তার মুখ-অনুকারী।
কেন এত সুবর্ণ শতদল, ও সে তাহারি বর্ণহারী।
কেন এত সুললিত পিক-সঙ্গীত—
তারি কলবাণী করে ঝঙ্কৃত;
এত সুগন্ধ স্নিগ্ধ মলয়, পরশ বাহিয়া তারি'।
আকাশে ভুবনে ব্যাপ্ত শুধুই তাহারি রূপের আলো;
তার পদযুগ ধ'রে হৃদে ব'লে ধরারে বেসেছি ভালো।
জীবনের যত দুঃখ ও ত্রুটি,
নিয়তির যত ছলনা ভ্রূকুটি,
তাহার আঁখির কিরণের তলে সকলই ভুলিতে পারি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

মালদহের চারি পীর।

গৌড় নগরে প্রথমে মুসলমান রাজত্বের আরম্ভ হয়। মালদহ জেলায় গৌড় নগর অবস্থিত; এ জন্য মালদহ জেলায় কতিপয় মুসলমান সাধুর সমাগম হইয়াছিল। সেই সকল সাধুপুরুষের মধ্যে শাহ জালালউদ্দিন তব্রেজী, আখি সেরাজউদ্দিন, ওসমান, আলাউলহক্ ও নূর কুতব আলম, সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এ জেলার আপামর সাধারণ ইঁহাদের নাম জানে, এবং হিন্দু মুসলমান ইঁহাদিগকে ভক্তি করে।

(১) শাহ জালালউদ্দিন তব্রেজী।

শাহ জালালউদ্দিন সর্ব্বপ্রথমে এ দেশে আগমন করেন। শেখশুভোদয়া নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে; উহা হলায়ুধ মিশ্রের রচিত বলিয়া কথিত হয়। গ্রন্থখানি অশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত। রাজমন্ত্রী মহাপণ্ডিত হলায়ুধ যে অশুদ্ধ সংস্কৃতে একখানি গ্রন্থ লিখিবেন, ইহা সম্ভব নয়। মোগল-রাজত্বকালে যখন নিষ্কর ভূমির অনুসন্ধান হইতেছিল, তখন এই গ্রন্থ রচিত হয়। মোগল কর্ম্মচারিগণকে দেখান হইয়াছিল যে, শাহ জালালউদ্দিনকে পাঠান রাজগণ ভূমিদান করেন নাই, পাঠানের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন ভূমিদান করিয়াছেন। শাহ জালালউদ্দিনের সম্পত্তির রক্ষকগণ জানিতেন যে, মোগলেরা পাঠানদের প্রচণ্ড শত্রু। এই গ্রন্থে লিখিত আছে, শাহ জালাল-উদ্দিন, রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় গৌড়ে আগমন করেন। লক্ষ্মণ সেন উক্ত শেখকে অর্থাৎ শাহ জালালউদ্দিনকে উপাসনামন্দির-প্রতিষ্ঠার্থ বাইশ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি দান করেন। লিখিত আছে, ১১২৪ সংবতে (১০৬৮ খৃঃ) শাহ জালালউদ্দিন গৌড়ে আগমন করিয়া রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভায় চারি বৎসর অবস্থান করেন। রাজা, শেখের ধর্ম্মভাবে মোহিত হইয়া ও শেখের সদ্বিবেচনায় পরিতুষ্ট হইয়া, শেখকে এ দেশে রাখিবার চেষ্টা করেন। শেখের প্রতি রাজার অধিক প্রীতি দর্শন করিয়া অমাত্যগণ ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। শেখশুভোদয়ায় শাহ জালালউদ্দিনের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার এ দেশে আগমনের যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইতিহাসের সঙ্গে তাহা মিলিতেছে না। শাহ জালালউদ্দিন মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেই এ দেশে আগমন করেন।

হজরৎ মোকদম শাহ জালালউদ্দিন, পারস্যের অন্তর্গত তব্‌রেজ সহরে জন্ম-গ্রহণ করেন। শাহ জালালউদ্দিন জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভের জন্য একাধিক গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। আবুসয়দ্ তাঁহার প্রথম গুরু। আবুসইদের পরলোকগমনের পর তিনি শেখ শাহাবুদ্দিনের শিষ্য হন। শাহাবুদ্দিন প্রতি বৎসর মক্কায় যাইতেন, শাহ জালালউদ্দিন তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। গুরু অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। কথিত আছে, গুরুকে টাটকা গরম খাদ্য খাওয়াইবার জন্য সর্ব্বদা মাথার উপর চুল্লা জ্বালাইয়া গুরুর সঙ্গে ফিরিতেন। গুরুর মৃত্যুর পর শাহ জালালউদ্দিন দিল্লীতে আগমন করেন। সেখানে তাঁহার শত্রু জুটিল। শত্রুরা তিনি স্ত্রীসংসর্গী বলিয়া কাজীর নিকট অভিযোগ করে; কিন্তু বিচারে তিনি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হন। যে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে জালালউদ্দিনের অপবাদ, সে উপস্থিত হইয়া শত্রুগণের চক্রান্তের কথা কাজীর নিকট প্রকাশ করেন। শাহ জালাল, দিল্লী ত্যাগ করিয়া, বাঙ্গলায় আগমন করেন। বাঙ্গলায় তিনি বিস্তর সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন, এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় বাইশ হাজার টাকা, এ জন্য ইহা বাইশ-হাজারী নামে প্রসিদ্ধ। শাহ জালাল এই সম্পত্তি দীনদুঃখী ও ফকীরদের সেবার্থ উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডুয়া নগরে মোকদম শাহ জালালউদ্দিনের দরগা আছে; মুসলমানদের চক্ষে পাণ্ডুয়া পবিত্র স্থান। এখানে শাহ জালালের দরগা ও নূর কুতবুল আলমের সমাধিস্থান রহিয়াছে। মুসলমানেরা পাণ্ডুয়াকে হজরৎ পাণ্ডুয়া বলিয়া থাকে। [illegible] ১২৪০ খৃষ্টাব্দে শাহ জালালের মৃত্যু হয়। কিন্তু এ মৃত্যু-তারিখ নির্দ্ধারণে স্বীকৃত হয় নাই; এ দেশে শাহ জালালের মৃত্যু হয় নাই। শাহ জালালের দরগা দেখিলে বোধ হয় উহা কোনও প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবাদ যে, শাহ জালাল বিস্তর হিন্দু দেবালয়ের ধ্বংস করেন।

(২) আখি সেরাজ্‌উদ্দিন ওস্‌মান।

এই সাধু পুরুষের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গৌড়ের উত্তরস্থ উপনগর সাদুল্লাপুরে ইঁহার সমাধিস্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে। আখি সরাজুদ্দিন, দিল্লীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন। নিজামুদ্দিন, আখি সেরাজকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আখি সেরাজ অধিক বয়সে গুরুর নিকট অধীতবিদ্যা হন। গুরুর মৃত্যু হইলে তিনি গৌড়ে আগমন করেন। গৌড়ের পাঠান রাজগণের অনেকে ইঁহার শিষ্য ছিলেন। ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইঁহার [illegible] সমাধিমন্দির গিয়াসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের নির্ম্মিত। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, এই সমাধিস্থানের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। আখি সেরাজুদ্দিন "পীরান্‌পীর" অর্থাৎ পীরের পীর নামে এ দেশে আখ্যাত হইয়া থাকেন্।

(৩) আলাউল্ হক্।

এই সাধু পুরুষ, নূর কুতব আলমের পিতা। কোন কোন ইংরেজী গ্রন্থে লিখিত আছে, ইনি আখি সেরাজের পুত্র। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ইঁহার পিতার নাম আসাদুল্লাহোরি। আলাউল্ হক্, খলিফা খালেদ-বিন্‌ওয়ালিদের বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহার কোনও পূর্ব্বপুরুষ এ দেশে আগমন করেন। ইঁহার আত্মীয় স্বজন রাজসরকারে বড় বড় কার্য্য করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন। আলাউল্ হকের নিজের অবস্থাও ভাল ছিল। গৌড়, পাণ্ডুয়া ও সুবর্ণগ্রামে ইঁহার প্রচুর সম্পত্তি ছিল। ইনি বংশমর্য্যাদা, ধন ও বিদ্যার গৌরবে অত্যন্ত অহঙ্কৃত হইয়া উঠেন। আখি সেরাজ যে সময়ে বাঙ্গলায় আগমন করেন, তখন তাঁহার গুরু নিজাম্‌উদ্দিন আউলিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, কোন সময়ে আলাউল্ হক্ তোমার শিষ্য হইবে। অহঙ্কারের জন্ত নিজাম্‌উদ্দিনের অভিশাপে আলাউল্‌হক বোবা হন। আখি সেরাজের শিষ্য হইলে তাঁহার মূকত্ব দূর হয়। আখি সেরাজ অশ্বপৃষ্ঠে বহুদূরে ভ্রমণ করিতেন; আলাউল্‌হক্ নগ্নপদে তাঁহার সঙ্গে ফিরিতেন ও গুরুর জন্ত সর্ব্বদা উষ্ণখাদ্য মস্তকে ধারণ করিয়া থাকিতেন। আখি সেরাজ এই অবস্থায় শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া শিষ্যের আত্মীয় স্বজনের নিকট গমন করিতেন। শিষ্যের অহঙ্কার দূরীভূত হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা করাই বোধ হয় আখি সেরাজের উদ্দেশ্য ছিল। সর্ব্বদা উষ্ণখাদ্য মস্তকে ধারণ করার জন্ত শিষ্যের মস্তকে টাক পড়িয়াছিল।

আলাউল্‌হক্ অত্যন্ত দাতা ছিলেন। এতদূর উদার ছিলেন যে, কোন লোককে নিজের পৈতৃক সম্পত্তি আট হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের দুইটি বাগান ছাড়িয়া দেন; ঐ বাগানে উক্ত লোকটির কোন স্বত্ব ছিল না। তাঁহার দান দেখিয়া সুলতান সেকেন্দর শাহের ঈর্ষ্যার উদয় হয়। সেকেন্দর আলাউল্‌হক্‌কে সোনারগাঁয় পাঠাইলেন। সোনারগাঁয় তখন সেকেন্দরের পুত্র গিয়াসউদ্দিন রাজত্ব করিতেছিলেন; পিতাপুত্রের সদ্ভাব ছিল না। আলাউল্‌হক্ গিয়াসউদ্দিনের নিকট আশ্রয় পাইলেন। এখানে গিয়া দ্বিগুণ

পরিমাণে দান করিতে লাগিলেন। সুলতান্ সেকেন্দরকে যুদ্ধে নিহত করিয়া গিয়াস্উদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করিলে, আলাউল্হক্ তাঁহার সঙ্গে পাণ্ডুয়ায় আগমন করিলেন। তথায় ৮০০ হিজ্রিতে পরলোক গমন করেন। পাণ্ডুয়ায় ইঁহার কবর রহিয়াছে। পিতাপুত্রের কবর দূরবর্ত্তী নয়।

(৪) নূর কুতব আলম।

নূর কুতব আলম, আলাউল্হকের পুত্র। ইনি রাজকুমার আজম শাহের (ইনি পরে সুলতান্ গিয়াস্উদ্দিন নামে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন) সঙ্গে বীরভূম জেলার নাগর নগরে হামিউদ্দিনের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। রাজা গণেশের সময় ইনি পাণ্ডুয়ায় ছিলেন। রাজা গণেশের সঙ্গে ইঁহার সম্প্রীতি ছিল কি না, জানা যায় না। রাজা গণেশের ন্যায় এক জন রাজ-নীতিজ্ঞ পুরুষ, এমন এক জন ক্ষমতাপন্ন সর্ব্বজন-মান্য সাধুপুরুষকে যে অসন্তুষ্ট করিবেন, ইহা বোধ হয় না। জনরব যে, রাজা গণেশ প্রথমতঃ মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিতেন; এমন কি, কুতব আলমের পুত্র আনোয়ারউদ্দিনকে ধনলোভে সুবর্ণগ্রামে লইয়া গিয়া উৎপীড়িত করেন। সুবর্ণগ্রামে আলাউল্-হকের পূর্ব্বপুরুষদের প্রচুর সম্পত্তি আছে বলিয়া লোকসাধারণের বিশ্বাস ছিল। আনোয়ারউদ্দিনকে ধনলোভে বধ করা হইল বটে, কিন্তু সম্পত্তি পাওয়া গেল না। কুতব আলম, গণেশের দৌরাত্ম্যদমনের জন্য জৌনপুরের সুলতান্‌কে বাঙ্গালা আক্রমণের জন্য অনুরোধ করেন। জৌনপুরের সুলতান, বাঙ্গালার সীমান্তে উপস্থিত হইলে, গণেশ, কুতব আলমের শরণাগত হন। জৌনপুরাধিপতি কুতবের আদেশে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। অন্যরূপ জনরব যে, রাজা গণেশ মুসলমানদিগের অপ্রিয় ছিলেন না; এমন কি, মুসল-মানেরা মৃত্যুর পর ইঁহাকে সমাহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

গণেশের মৃত্যুর পর তৎপুত্র যদু সিংহাসনে আরোহণ করেন। যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দিন নাম ধারণ করেন। মুসলমান না হইলে হয় ত তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিতেন না। রাজ্য লোভে মুসলমান হইয়াছিলেন, কি কুতব আলমের ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মুসল-মান হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। ইনি মুসলমান হইয়া পিতার নির্ম্মিত সমুদয় দেবমন্দির চূর্ণ করেন, এবং মুসলমানধর্ম্ম-প্রচারের জন্য পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় অত্যন্ত অত্যাচার করেন। বাঙ্গালার কোনও মুসলমান রাজা ধর্ম্মপ্রচারের

অন্ত এত অত্যাচার করেন নাই। ৮৫১ হিজিরিতে কুতবের পরলোক হয়। কুতব আলমের সমাধিমন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ছয় হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সম্পত্তির নাম ছয় হাজারি।

শাহ জালালের দরগার নাম বড় দরগা। কুতব আলমের দরগার নাম ছোট দরগা। যে দরজা দিয়া বড় দরগার দিকে যাইতে হয়, তাহার নাম সলামি দরজা। প্রবাদ যে, শাহ জালাল এখানে আসিয়া প্রথমে উপবেশন করেন। যে দরজা দিয়া ছোট দরগার দিকে যাইতে হয়, তাহার নাম বেহেস্ত দরজা। পাঠান রাজগণ শাহ জালাল ও কুতব আলমের অত্যন্ত সম্মান করিতেন। হুসেন শাহ একদালা দুর্গ হইতে প্রতিবৎসর হাঁটিয়া পাণ্ডুয়ায় আসিয়া এই দুই দরগার সম্মানপ্রদর্শন করিতেন। প্রতিবৎসর রজব মাসের ২২শে তারিখে পাণ্ডুয়ায় শাহ জালালের উৎসব হইয়া থাকে। নানাস্থান হইতে মুসলমান ফকীর ও গৃহস্থ এই মেলায় আসিয়া থাকে।

এ অঞ্চলে শাহ জালালের বড় নাম ও মান। হজরৎ শাহজালাল মোকদমপীর নামেও পরিচিত। প্রবাদ যে, শাহ জালাল হিন্দু সন্ন্যাসীদিগকে ভালবাসিতেন। লোকে বলে, তিনি মহানন্দার গর্ভ হইতে বহুবর্ষ ধরিয়া ধ্যানমগ্ন এক হিন্দু যোগীকে উত্তোলন করেন। হিন্দু ও মুসলমানদের সাধারণ-লোকে বলে যে, হজরৎ মোকদমপীর বাঘে চড়িয়া এক হিন্দু সাধুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন; সন্ন্যাসী প্রাচীরে চড়িয়া প্রত্যুদ্গমন করিতে যাইতেন; নদীর মাঝখানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইত। শাহপুর, মোকদমপুর ও কুতবপুর নামের বহু গ্রাম এ জেলায় বিদ্যমান আছে সে সব গ্রামের সঙ্গে ইঁহাদের কি সম্পর্ক ছিল, তাহা অনুসন্ধানের যোগ্য।

শাহ জালালের সময় হইতে মোকদম সন নামে একটি অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে এই সনের উল্লেখ দেখিয়াছি।

কুতব আলমের বংশীয় মোকদমশাহ নামক ব্যক্তি পাণ্ডুয়ার সোনামসজিদের নির্ম্মাতা। এই সোনামসজিদের অপর নাম কুতুবসানি মসজিদ। ইহা ছোট দরগার সংলগ্ন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

দয়াশীলা নর্ত্তকী—বালামণি।

মাদুরা নগরে একটি নর্ত্তকী আছে,—সে যেমন রূপলাবণ্যের জন্য—সেই-রূপ বদান্যতার জন্যও প্রখ্যাত। এই শ্রেণীর রমণীদিগের চিরপ্রথা-অনুসারে, বালামণি প্রথমে এক জন নবাবের রক্ষিতা ছিল। নবাব, মৃত্যুকালে, তাঁহার সমস্ত হীরা জহরৎ তাহাকে দিয়া যান। তাই পুত্তলীর ন্যায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ মণিরত্নে বিভূষিত। এখন সে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারিণী ও স্বাধীনা। কিন্তু তাহার ধন ঐশ্বর্য্য শিল্পকলার অনুশীলনে ও দানধর্ম্মেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। বালামণি একটা নাট্যশালা স্থাপন করিয়াছে;—আমাদের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, ভারতে যে সব নাটক রচিত হয়, সেই নাটকগুলি, নিজ মনোহর অভিনয়ের দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে।

আমি আজ রাত্রে, সমুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে, তালীবনের মধ্য দিয়া, সেই দয়াশীলা নর্ত্তকী বালামণির নাট্যালয় অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তাল তরুর শাখাগুলি, সুদীর্ঘ ভঙ্গুর বেতসের ন্যায় অবনত হইয়া আছে, এবং সেই শাখা-প্রান্তবর্ত্তী কৃষ্ণকায় পত্রপুঞ্জ, মৃদুল অনিলে সঞ্চালিত হইয়া, পরস্পরের সহিত সংঘর্ষিত হইতেছে।

আমি যখন আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলাম, তখন বালামণি রঙ্গপীঠে অধিষ্ঠিতা;—চিত্রিত পুষ্পোদ্যানের পশ্চাদ্‌ভাগে, পরী-প্রাসাদের ক্ষুদ্র একটি স্বর্ণময় চূড়াগৃহের মধ্যে বন্দিভাবে অবস্থিত হইয়া, গবাক্ষের সম্মুখে বসিয়া, বীণা বাজাইতে বাজাইতে গান গাহিতেছিল। বালামণি এক জন রাজকুমারী, পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের কোনও রাজার সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হয়, এবং সেই রাজা তাহার উদ্দেশে এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে। প্রথম আরম্ভ হইতেই, তাহার বীণা-বাদনে, তাহার কণ্ঠস্বরে, শ্রোতৃবর্গের চিত্ত বিমোহিত। পুরাতন উৎকীর্ণ চিত্রাদি হইতে তাহার সাজসজ্জা অনুকৃত হইয়াছে। তাহার পার্শ্বমুখের ছায়া-ছবিটি অপূর্ব্ব সুন্দর। এই গায়িকার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গিতে, তাহার ভূষণ-সমাচ্ছন্ন অঙ্গের হীরক মাণিক্যগুলি ঝিক্ মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। অঙ্গ নাট্য সজ্জাগুলিতে, এমন একটি অবোধ শিশুসুলভ সারল্য প্রকটিত

যে, দেখিলে একটু আমোদ বোধ হয়; এবং সেই সঙ্গে, বিদেশভূমির ভাব, দূরত্বের ভাব, মানস পটে অঙ্কিত হয়। নাট্যশালাটি অতীব বিশাল; উহাতে সহস্রাধিক লোক ধরিতে পারে; কিন্তু উহার গঠনে কোন প্রকার মার্জ্জিত-রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না;—মন্দিরের ধারে, ধর্ম্ম-মহোৎসবের সময়ে যেরূপ গৃহ এখানে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ কাঠ দরমা বাঁশ দিয়া হাল্‌কা ধরণে নির্ম্মিত। রঙ্গপীঠের দুই পার্শ্বে, পুরাতন রাজবংশীয় রাজকুমারী-দিগের বসিবার কক্ষ। কিন্তু, আজ তাঁহারা আসিবেন না, আজ তাঁহাদের "আসিবার দিন" নহে। আর সর্ব্বত্রই, নাট্যশালার সমস্ত আসনগুলিই প্রেক্ষকবর-মণ্ডলীর দ্বারা অলঙ্কৃত। ঘরের ভিতরটা খুব গরম, এবং ফুলের গন্ধে আমোদিত।

সেই লুপ্ত ভাষা—যে ভাষা হিন্দু ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মাতৃস্থানীয়া,—সেই সংস্কৃত ভাষায় বালামণি গান গাহিতেছে, এবং সেই ঘোর পুরাকালে নাটকটি যে ভাবে লিখিত হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবে সমস্তটা অভিনীত হইবে; শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে, আমি ছাড়া আর সকলেরই এতটুকু পাণ্ডিত্য আছে যে, উহা শুনিয়া বুঝিতে পারে।

আখ্যানবস্তুটি মোটামুটি এইরূপ, আজ রাত্রে, বালামণি যাহার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, সেই রাজকুমারীকে, সাত জন রাজকুমার—সকলেই সহোদর ভ্রাতা—এক সঙ্গে ভালবাসে। পাছে কোন ভ্রাতার মনে কষ্ট হয়, এই জন্য তাহারা সকলেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, কেহই উহাকে বিবাহ করিবে না; এমন কি, তাহাদের পিতা, যে ভ্রাতার জন্য এই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, সেও উহাকে বিবাহ করিবে না, এইরূপ শপথ করিয়াছে। প্রথম প্রথম, তাহারা সকলেই সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছিল, রাজকুমারীর বন্ধুত্ব ও তাহার স্মিত-হাস্যেই তাহারা সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু একদিন যখন তাহারা মৃগয়ার্থ কোন বনে গমন করে, কতকগুলা দুরাত্মা দৈত্য, শুদ্ধসত্ত্ব শুভ্রকেশ মুনির রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে ছলিতে আসিল। তাহাদের প্রত্যেকের মনে কামজ লালসা উদ্বোধিত করিয়া দিয়া, এবং নানা প্রকার মিথ্যা কথা রটনা করিয়া, পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে উত্তেজিত করিয়া দিল। তখনই বিদ্বেষবুদ্ধি ও দুর্ভাগ্য প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু কোনও দুষ্কর্ম্ম আচরিত হইবার পূর্ব্বেই, দেবযোনিরা এ দিকে, অনেক যুঝাযুঝির পর, তাহাদের আত্মাকে আবার অধিকার করিল। তখন আবার রাজকুমারগণ

স্বকীয় চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিল, এবং সেই রাজকুমারীর সহিত ভগিনী-সম্বন্ধ পাতাইয়া, কোনপ্রকারে কালযাপন করিতে লাগিল। পরে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, যখন তাহাদের সমস্ত বাসনা নির্ব্বাপিত হইল, তখন তাহারা কর্ত্তব্য-পালনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল; এবং তাহাদের গৃহ আবার সুখশান্তিতে পূর্ণ হইল। প্রত্যেক অঙ্কের শেষে, কিছু কালের জন্য যে সময়ে বিরাম হয়, সেই বিরামকালে, আমি বালামণির নেপথ্য-কক্ষে গমন করিলাম, আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব—এ সংবাদ পূর্ব্বেই তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। আমি তাহার রূপ লাবণ্যের প্রশংসা করিলাম, এবং বলিলাম, তাহার গৃহীত রাজকুমারীর ভূমিকাটি বিশুদ্ধরূপে অভিনীত হইয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র কক্ষটি নিতান্ত সাদাসিধা ধরণের—মেজে সপ্ দিয়া মোড়া। তাহার ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হীরক-অলঙ্কার ও অঙ্গভূষণাদি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়,—মনে হয়, দাবার কুটীরে কোনও ঔপন্যাসিক দৈত্য আসিয়া এই সকল বিচিত্র উপহার বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছে। কক্ষদ্বারে আসিবা-মাত্রই, তাহার ভ্রাতারা, চিরপ্রথানুসারে, জরি-বিজড়িত একটি স্থূল ফুলের মালা সহজ-শোভন শিষ্টতা সহকারে, আমার গলায় পরাইয়া দিল। বালামণি বিনম্রভাবে আমার নিকট প্রকাশ করিল,—পুরাতন উৎকৃষ্ট নাটকগুলি যাহাতে পুনরুজ্জীবিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছে। আমি যখন বলিলাম, [illegible] বঙ্গদেশের নিকট আমি তাহার কথা বলিব, [illegible] কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

তাহার পরদিন, কোন একটা সাধারণ স্থানে, তাহার সহিত পুনর্ব্বার আমার সাক্ষাৎ হইল;—মান্দ্রাজ-রেলপথের ষ্টেশনে;—দুঃখের বিষয়, এই রেল-পথ মাদুরা পর্য্যন্ত গিয়াছে। বালামণির সঙ্গে দুই জন ভৃত্য। মফস্বলের ভূসম্পত্তি পরিদর্শন করিতে যাইবে, তাই ট্রেণ ধরিতে এখানে আসিয়াছে। এখানকার দীন-বসনা জনতার মধ্যে বালামণিকে পরীক্ষার মত দেখাইতেছিল। দূর হইতে মনে হইতেছিল, যেন একটি তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তাহার কাণে হীরক, তাহার কণ্ঠে হীরক, তাহার বক্ষে হীরক। কর-প্রকোষ্ঠ হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত—তাহার সমস্ত বাহুতে হীরক-অলঙ্কার। তাহার চারু ক্ষুদ্র নাসিকা হইতে একটি নথ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে;—তাহাতে যে হীরকগুলি রহিয়াছে, তাহা আরও দুর্লভ ও উজ্জ্বল। তাহার জরির-পাড়-ওয়ালা হলদে শাড়ী ও তাহার রেশমি কাঁচুলি—এই উভয়ের মাঝখানে,

গাত্রের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে—আর এই গাত্র সুন্দর ধাতু-স্তম্ভের ন্যায় সুচিক্কণ—সেই সঙ্গে স্তনযুগলের অকলুষিত তলদেশও অল্প অল্প দেখা যাইতেছে; আর একটু ঊর্দ্ধে, আঁটা সাঁটা পাতলা কাপড়ের মধ্য দিয়া, সলজ্জ স্তনযুগলেরও একটু আভাস পাওয়া যাইতেছে। (সায়ংকালে আমাদের রমণীরা বক্ষের ঊর্দ্ধভাগটি খুলিয়া রাখে; কিন্তু নিম্নভাগটি খুলিয়া রাখায় যে কি অসুবিধা, তাহা আমি ত বুঝিতে পারি না;—উহাতে বেশী কৌশল খাটাইবার আবশ্যক হয় না—এইমাত্র) তা ছাড়া, এই নর্ত্তকীর সাজসজ্জায় বেশ একটু সংযম ও গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হইল। বারাঙ্গনাদিগকে যে ধরণে নমস্কার করিতে হয়, সেই ধরণে আমি উহাকে নমস্কার করিলাম। রত্ন-ভারাক্রান্ত করযুগলে ললাট স্পর্শ করিয়া ভারতীয় ধরণে সে আমাকে প্রতিনমস্কার করিল। তাহার পর, পরিজন-সমভিব্যাহারে গাড়ীতে উঠিল * * * কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে কক্ষটি রক্ষিত, সেই কক্ষে গিয়া বসিল।

ষ্টেশনের সমস্ত কদর্য্য সাজসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, যখন আমি দেবী-মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম, তখনও আমার নেত্রমুকুরে বালামণির ছবিটি প্রতিবিম্বিত। আরও কত সৎকার্য্য সে করিয়াছে, তাহার বিবরণ আজ অনেকের মুখে শুনিলাম। তাহার একটি সৎকার্য্যের উল্লেখ করি;—গতমাসে, কতকগুলি য়ুরোপীয় মহিলা, হিন্দুবালিকা-অনাথাশ্রমের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়া, একটা গৃহের নিকটে আসিয়া যখন দ্বারে আঘাত করিলেন, তখন বালামণি, স্মিতমুখে, এক হাজার টাকার নোট তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিল। বালামণি জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকেই সাহায্য করিয়া থাকে, তাহার গৃহের পথটি দরিদ্রমাত্রেরই সুপরিচিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তন্ত্র।

উৎপত্তিকাল প্রস্তাবনা।

তান্ত্রিক বিধি প্রথমতঃ কোন্ সময়ে এবং কি অবস্থার অনুকূলতায় প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা স্থির করা সহজ নহে। তন্ত্র নামে এখন যে

গ্রন্থগুলি পাওয়া যায়, অথবা ইতিপূর্ব্বে যে ২৮ খানি তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি, যদি কেবল সেইগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই একটি সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে মীমাংসাটা সহজ হইতে পারে বটে। প্রচলিত তন্ত্রগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই স্বর্গীয় মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, "তন্ত্রশাস্ত্র প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই প্রকটিত হয়। এ বিষয়ে সংশয় করিবার প্রয়োজন নাই।" তিনি আরও লিখিয়াছিলেন যে, "তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ় প্রকৃতি এরূপ যে, ...কীয় অধিকারের প্রভাব দেশের উপর পতিত না হইলে সেরূপ হইতে পারিত না।"

নীলতন্ত্রে অনেক খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ আছে; উড্ডীশ, ক্রিয়োড্ডীশ ও ফেৎকারিণীতেও অনেক বাঙ্গলা ছড়া মন্ত্ররূপে রহিয়াছে; রাধাতন্ত্রের "ঢলঢলেতি লোচনায়" বঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ পাই, বৃহন্নীল তন্ত্রে "কালীঘট্টং গুপ্ততীর্থং" আছেন; কামধেনু তন্ত্রে বাঙ্গালা ক-কারের বর্ণনা আছে; কুমারী তন্ত্র ও রুদ্রযামলে বৈদ্য বলিয়া স্বতন্ত্র জাতির নাম আছে, এবং প্রায় সকল-গুলিতেই বর্ণানুক্রমে স্তোত্র-রচনায় অন্তাস্থ ও বর্গীয় ব-এর প্রভেদ উপেক্ষিত হইয়াছে। এই অতিস্থূল আলোচনাতেও প্রচলিত তন্ত্রগুলি যে অর্ব্বাচীন, এবং বঙ্গদেশে প্রকটিত, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রচলিত তন্ত্রগুলি ব্যতীত আরও তন্ত্রগ্রন্থ ছিল কি না, এবং এখনও অনেক অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে কি না, তাহা যখন জানা নাই, তখন উল্লিখিত গ্রন্থগুলি দেখিয়া ভূদেব বাবুর মত সাবধানে বলা যাইতে পারে যে, তন্ত্র শাস্ত্র প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই প্রকটিত হয়। প্রকটিত হয়, কথা দ্বারা, উৎপত্তিস্থান বা সময়ের সিদ্ধান্ত হয় না।

ভূদেব বাবুর বিবিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তির স্থান সম্বন্ধে একটি প্রবাদবচন উদ্ধৃত আছে। তাহা এই :—

> গৌড়েনোৎপাদিতা বিদ্যা, মৈথিলী প্রবলীকৃতা।
> কচিৎ কচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে প্রলয়ং গতা।

এই প্রবাদটির বয়স কত, না জানিলে, স্থাননির্ণয় সহজ হইবে না। সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্ব্বে গৌড় বলিয়া কোন স্থান বা দেশের নাম পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে যে গৌড় বলিলে বঙ্গদেশ বুঝাইত না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গৌড় তখন মিথিলার উত্তর-পশ্চিমে ছিল; সম্ভবতঃ

অযোধ্যা প্রদেশের [illegible] গৌড় নামের চিহ্ন। মৎস্যপুরাণে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, ইক্ষাকুবংশীয় রাজা যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত, গৌড়দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এবং সেই শ্রাবস্ত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, "নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ"। তাহা হইলেই নেপালের অংশ লইয়া কোশল পর্য্যন্ত গৌড়দেশ ছিল। অন্য প্রমাণের এখানে প্রয়োজন নাই। নেপালে তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিশেষ প্রচার আছে; বঙ্গ অপেক্ষাও অধিক। প্রবাদটি প্রাচীন হইলে উৎপত্তিস্থান বঙ্গ হয় না।

ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের [illegible] মহারাষ্ট্র নাম পায় নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ডাক্তার ভাণ্ডারকর মহাশয়ের গ্রন্থ পড়িতে পারেন। মরু প্রদেশের দক্ষিণে ও মালবের পশ্চিমে সৌরাষ্ট্রাদি দেশ, ষষ্ঠশতাব্দীর শেষভাগে "লাট" নামে পরিচিত ছিল। ঐ দেশের গুর্জ্জর নাম আরও পরবর্ত্তী। গুর্জ্জরদেশে যে তান্ত্রিক ধর্ম্মের বামাচার অনুষ্ঠান খুব প্রবল হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক কথা। "গুর্জ্জরে প্রলয়ং গতা" পড়িয়া মনে হয় যে, প্রবাদ শ্লোকটির রচয়িতা এক জন বিশেষজ্ঞ [illegible]; এবং সম্ভবতঃ গৌড় শব্দ বঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত নহে।

প্রচলিত তন্ত্রগ্রন্থগুলির রচনাকাল হইতে [illegible] সাধনবিধির উৎপত্তির সময় জানা যাইতে পারে না। প্রাচীন সাহিত্য ও অন্যান্য প্রাচীন আচারাদির চিহ্ন হইতে দেখিতে পাই যে, তান্ত্রিক সাধনার যেগুলি বিশেষত্ব, সেগুলি কত দিন হইতে প্রচলিত ছিল। তন্ত্রের বিশেষত্বগুলি এই :—(১) মাতৃরূপে শক্তিরূপিণী দেবীর স্বতন্ত্র পূজা; এবং পরে দেবতার উপর শক্তির প্রাধান্যস্থাপন। (২) তান্ত্রিক সাধনার দীক্ষায় সর্ব্বজাতির অধিকার। (৩) মন্ত্রবলে মারণ উচাটন বশীকরণাদি। (৪) পতঞ্জলির যোগ হইতে ভিন্ন নূতন এক যোগসাধনারবিধি; উহাতে ঈড়া পিঙ্গলাদি নাড়ী আছে, কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন; শরীরের নানা স্থানে পদ্মের বর্ণন আছে, ইত্যাদি। (৫) কুমারীপূজা, (৬) ভৈরবীচক্র। (৭) শ্মশানে পূজা ও শবসাধনা। (৮) ভৈরবীচক্রে জাতিভেদ পরিত্যাগ। (৯) সংসর্গবিশেষকে মোক্ষসাধনার অঙ্গীভূত করা। (১০) সাধনাপ্রণালীগুলি গুহ্যাতিগুহ্য করিয়া গুপ্ত সাধনা

এই বিশেষত্বগুলির উৎপত্তির সময় ও কারণনির্দ্দেশের পর দেখিতে হইবে যে, ঐগুলি এক সঙ্গে যুক্ত হইয়া নূতন তন্ত্রশাস্ত্র কখন প্রবর্ত্তিত হইল?

১০ দেবী বা দেবশক্তির পূজা।

বেদে উষা আছেন, পৃথিবী আছেন; ইঁহারা স্বতন্ত্রভাবে পূজিতা হইতেন; কিন্তু ইঁহারা কেহ তন্ত্রের শক্তিরূপিণী দেবী নহেন। ঋগ্বেদে কোন কোন দেবতার পত্নীর কথাও আছে, কিন্তু ঐ পত্নীরা স্বতন্ত্ররূপে দেবী বলিয়া গণিত হয়েন নাই; পূজাও পান নাই। ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই লিখিলাম।

বেদে যে দেবপত্নীদিগের ক্বচিৎ উল্লেখমাত্র আছে, শতপথ ব্রাহ্মণের (বিলাতের প্রাচ্যধর্ম্মগ্রন্থাবলী সংস্করণে) সময়ে তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র পূজা-বিধির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এখানে তাঁহারা কেহ জগন্মাতা নহেন, অথবা শক্তি বলিয়া পূজিতা নহেন।

বেদত্রয়ে যাহা নাই, অথবা বেদের ব্রাহ্মণভাগে যাহা নাই, তাহাই যে এ দেশে ছিল না, এ কথা বলা যাইতে পারে না। বেদাদি ছিল প্রাচীন আর্য্যদিগের গ্রন্থ; এবং আর্য্যেরা এতদ্দেশবাসী অনার্য্যজাতির মধ্যে সংখ্যায় অল্প ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে অনার্য্যেরা বহুপরিমাণে আর্য্যসমাজে স্থান পাইয়াছিল; এবং আর্য্যেরা এই অনার্য্যদিগের অনেক ধর্ম্মবিশ্বাসও আত্মস্থ করিয়াছিলেন। এ কথার প্রমাণ অন্যান্য প্রবন্ধে অনেকবার দিতে হইয়াছে; এখানে আবার তাহা লইয়া দীর্ঘভূমিকা করিতে গেলে সুবিধা হইবে না। অনার্য্যের যখন কোনও সাহিত্য নাই, তখন এই শক্তিপূজার বীজ তাহাদের মধ্যে ছিল কি না, এবং ঐ ধর্ম্মভাব বেদের মত পুরাতন কি না, তাহা বলা যায় না। আর্য্যেরা ত্রয়ী বলিয়া বেদের বর্ণনা করিয়া অথর্ব্বকে উপেক্ষা করিতেন। উপেক্ষা করুন; কিন্তু ঐ অথর্ব্ববেদ আর্য্যের ভাষায় লিখিত অতি পুরাতন গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের অনেক মন্ত্র দেখিয়া অনুমান হয় (বোম্বাই সং; এবং ডাক্তার ম্যাক্‌ডোনেলের বেদবৃত্তান্ত) যে, এ দেশে শক্তিময়ী দেবীপূজা পুরাতনকালে অজ্ঞাত ছিল না। তবে সে কোন্ সমাজের ধর্ম্মের কথা, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে।

প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে এ দেশে বেদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল, বেদ কি, কেহই জানিত না। তাহার পর ঐ লুপ্ত বেদের উদ্ধার হয়, এবং উদ্ধার বিভাগ বা ব্যাস হইয়া, সংহিতা রচিত হয়। প্রাচীনতম আর্য্যগ্রন্থেও এই প্রবাদ আছে; ইহার সত্যতায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না।

এরূপ স্থলে অতিপ্রাচীন বেদের কালনির্ণয় করা, অথবা উহার মন্ত্রগুলি হইতে সঠিক প্রাচীন ইতিহাস বাহির করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

বৈদিক যুগের পর, পৌরাণিক যুগের সর্ব্বাধিক পূজ্য (প্রথম গ্রন্থ বলিলেও ক্ষতি হয় না) মহাভারতসংহিতার আলোচনা করিব। মহাভারতে প্রায় সকল দেবতাকেই সপত্নীক দেখিতে পাই। এই প্রবন্ধের প্রয়োজনের মত কয়েকটি নামের উল্লেখ করিতেছি। মহেশ্বরের একটি অশরীরিণী মাহেশ্বরী শক্তির পরিবর্ত্তে মহাদেবের পত্নীর নাম পাই পার্ব্বতী, বা উমা ; মহাদেব হইতে স্বতন্ত্ররূপে আদিত্যস্বরূপ রুদ্রের পত্নীর নাম ব্যাকরণনিষ্পন্ন রুদ্রাণী। তাহার পর বরুণের পত্নীর নাম গৌরী, এবং সাগরের পত্নীর নাম জাহ্নবী। এই দেবীগুলি যখন দেবপত্নী, তখন ইঁহাদের পূজা থাকা অসম্ভব নহে ; কিন্তু মহাভারতে উঁহাদের নামে স্তবস্তুতির সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, ভূতপ্রেতিনী বলিলে যাহা বুঝায়, সেই অর্থে অনেকগুলি মাতৃকার নাম পাওয়া যায়। ঠিক পূজা না হউক, উহাদের শান্ত করিবার বিধি ছিল। পুরাণে মাতৃকার তালিকায় কালী আছেন, এবং মনুসংহিতায় কুলদেবতার (মাতৃকা) পূজায় ভদ্রকালীর পূজা বিহিত আছে।

মহাভারতে সর্ব্বত্রই দেববর্গের নামে পূজা ও স্তুতি, এবং ঐ দেববর্গের মধ্যে বিষ্ণু (তদ্ভেদে কৃষ্ণও বটেন) এবং মহেশ্বর প্রধান। দেবীর আরাধনা ও পূজা নাই লিখিয়াছি, কাজেই এ স্থলে আমি ভীষ্মপর্ব্ব ও বিরাটপর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত "দুর্গাস্তোত্র" সম্বন্ধে কিছু বলিতে বাধ্য। পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন যে, সকল দেশের মহাভারতে ঐ স্তোত্র পাওয়া যায় না। বঙ্গবাসী যে বৰ্দ্ধমান রাজবাড়ীর মহাভারত অনুবাদ করিয়া বহুপরিমাণে বিতরণ করিয়াছেন, উহাতেও দেখিতে পাইবেন যে, ঐ গ্রন্থের বিরাটপর্ব্বের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দুর্গাস্তোত্র নাই। দুর্গাস্তোত্র না করিয়াই যুধিষ্ঠির বিরাটরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। যে গ্রন্থে ঐ স্তোত্রটি আছে, তাহা হইতে উহার মর্ম্ম অবগত করাইতেছি। দেবী দুর্গার বর্ণনায় সর্ব্বপ্রথমেই আছে যে, ইনি "যশোদাগর্ভসম্ভূতা" ; তাহার পর, "নন্দগোপকুলে জাতা" ইত্যাদি। যুধিষ্ঠির স্তোত্র-সম্বোধনে বলিয়াছেন :— "নমোঽস্তু বরদে কৃষ্ণে, কুমারি ব্রহ্মচারিণি,...চতুর্ভুজে, চতুর্বক্ত্রে,...ময়ূর-পিচ্ছবলয়ে" ইত্যাদি। তাহার পর আবার "কৃষ্ণচ্ছবিসমা কৃষ্ণা, সঙ্কর্ষণসমা-ননা"..."কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পালিতং ত্বয়া", "বিন্ধ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্।"

প্রথমতঃ দেখুন, ইনি দশভুজা গৌরী নহেন; ইনি চতুর্ভুজা ও কৃষ্ণবর্ণা। অর্থাৎ, ইনি দুর্গা নহেন। ইনি কালীও নহেন; কলনা চতুর্বক্ত্রা; দশমহাবিদ্যার মধ্যে কোথাও চতুর্ব্বক্ত্রা নাই। দ্বিতীয় কথা, ইনি হিমালয়ের দুহিতা নহেন, এবং মহাদেবের পত্নীও নহেন, ইনি ব্রহ্মচারিণী কুমারী। কখনও কুমারী ছিলেন বলিয়া ঐ প্রকার সর্ব্বকাল বোধক বিশেষণ প্রদত্ত হয় না; ঐটিই এখনও বিশিষ্টভাব। তৃতীয়তঃ দেখুন যে, ইঁহার পরিচয় যশোদার গর্ভে নন্দগোপকুলে জাতা বলিয়া। কৃষ্ণ-জন্মের সময়ে দেবী কাত্যায়নী-রূপে যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, ইনি তিনি। ইনি যদি পার্ব্বতী হইতেন, তাহা হইলে গোপকুলের পরিচয়টি প্রথম, প্রধান ও একমাত্র পরিচয়ের স্থল হইতে পারিত না। এই কাত্যায়নী যেন জাতিবিশেষের একটি স্বতন্ত্র কুলদেবতা। ইঁহার অস্তিত্ব যেন প্রথমতঃ ঐ ভাবেই ছিল, এবং পরে উমার সহিত অভেদত্ব ইনি লাভ করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ, ইনি বিন্ধ্যবাসিনী দেবী; ইঁহার খাঁটি আবাস হিমালয় প্রভৃতি স্থানে নহে, কেবল বিন্ধ্যপর্ব্বতে।

মহাভারতে বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গার স্তোত্র আছে, এই কথাটি ভুলিয়া গিয়া যদি একবার প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত কোন সাহিত্যে উঁহার উল্লেখ নাই। কনৌজপতি যশোবর্ম্মা যখন গৌড়দেশ (এখানেও গৌড় অর্থে মগধদেশ, বঙ্গ নহে, গৌড়ে মগধপতিকে পরাজয় করিয়া পরে বঙ্গ-জয়ের কথা আছে) জয় করেন, সেই সময়ে তাঁহার সভাকবি গৌড়বহো (গৌড়বধ) কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থ সপ্তম শতাব্দীর শেষ ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত। এই প্রাকৃত কাব্যে বিন্ধ্যবাসিনীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। রাজা যশোবর্ম্মা যাইতে যাইতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের তীরে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন যে, হলুদের পাতা মাত্র পরিহিত অনার্য্য শবরেরা বিন্ধ্যবাসিনী নামক তাহাদের কালীকে নরবলি প্রভৃতি অনার্য্য অনুষ্ঠানে পূজা করিতেছে; আর অনার্য্য রমণীরা সেই ভীষণ বলিদান দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া চাহিয়া আছে। এ ঠাকুরাণীও ময়ূরপিচ্ছবসনা। (শ্লোক-সংখ্যা—২৮০—২৮৪, ৩১৯, ৩২৯, ৩৩৮)। রাজা বলিলেন যে, ইনি অনার্য্যের কালী হইলেও দেবীত বটেন; অতএব পূজা করা উচিত। তখন তিনি কয়েকটি স্তোত্র পাঠ করিলেন।

স্তোত্রগুলিতেও দেবীর ভীষণতার ও অনার্য্যাশ্রিতা বলিয়া অনেক কথার বিশেষ বর্ণনা আছে। (২৯৭—৩১০)।

ইহা দেখিলে আর সন্দেহ থাকে কি যে, বিরাট পর্ব্বের দুর্গাস্তোত্র অনেক পরবর্ত্তী সময়ের প্রক্ষিপ্ত রচনা? যখন ঐ স্তোত্রটি যোজিত হইয়াছিল, তখনও এই দুর্গা জাতিবিশেষের কুলদেবতা, কিন্তু পার্ব্বতী নহেন। দুর্গা-স্তোত্র বাদ দিয়া মহাভারত পড়িয়া দেখিবেন যে, অন্য কুত্রাপি এই দুর্গার নাম গন্ধ নাই; এবং ইনি মহাদেবের পত্নী-স্থানীয়া ত নহেনই, উপরন্তু মাতৃকাবর্গের কোনও মাতৃকা বা প্রেতিনীও নহেন।

বিরাট পর্ব্বের দুর্গাস্তোত্র সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ভীষ্ম পর্ব্বের দুর্গাস্তোত্রে প্রায় তাহার সকল কথাই খাটে। বিরাট পর্ব্বে যেমন, এখানেও তেমন; এই স্তোত্রটি তুলিয়া দিলে কোনও অধ্যায়ের ভাবের সহিত অন্য অধ্যায়ের ভাবে গোল পড়ে না। বরং এই স্তোত্রটি নিতান্ত খাপছাড়া। এখানেও দেবীটি কুমারী, কৃষ্ণপিঙ্গলা, গোপেন্দ্রানুজা ও নন্দকুলোৎপন্না। পুনশ্চ ইহাকে কৌশিকী (কুশিক-কুলোৎপন্না, ইতি নীলকণ্ঠ টীকা) বলা হইয়াছে; কিন্তু হিমালয়নন্দিনী বলা হয় নাই। এখানে আর একটি বিশেষণ আছে,—কোকমুখা। কোকমুখা শব্দের অর্থ, [illegible] চক্রাকার [illegible]। "নিত্যং বসসি পাতালে" দ্বারাও পার্ব্বতীর স্বরূপ মনে পড়ে না। কিন্তু এই স্তোত্রটিতে শিবপত্নী বলিয়া একটু উল্লেখ আছে, [illegible] বলা হইয়াছে। ইহাতে কুমারী কন্যার সহিত বিরোধ হয়। স্তোত্র দুইটি যখন পরবর্ত্তী সময়ের প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়, তখন এই দুর্গা গোপকুলের কোনও কাত্যায়নীবিশেষ কি না, তাহার বিচার অনাবশ্যক। অক্লেশে বুঝিতে পারা যায় যে, ইনি মূলতঃ পার্ব্বতী নহেন।

মনুর স্মৃতিতে যখন ভদ্রকালীর পূজার কথা আছে, এবং অপবিত্র গ্রামযাচকেরা গণ বা ভূতাদির পূজা করিয়া নিন্দিত হইত বলিয়া উল্লেখ পাই, তখন সর্ব্বপ্রাধান্যরূপে না হইলেও, এ দেশে মাতৃকাদিপূজা বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। মহাদেবের অনুচর অনুচরীরা হইলেন, গণ ও মাতৃকা। মাতৃকা শব্দের মূলে যে অর্থই থাকুক, উহাতে মাতা অর্থের আরোপ করা ও মাতৃকাবর্গকে শিবপত্নী করা অতি সহজ ছিল। শৈব ধর্ম্মের বিশেষ প্রবলতার সময়ে উঁহাদের বিশেষ পূজাসনে স্থাপিত হইবার কথা। তাহা হইলে চতুর্থ শতাব্দী হইতে দেবী-

পূজায় বিশেষ ভাব উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না, পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বের কোনও প্রাচীন প্রস্তরলিপি প্রভৃতিতে 'কাত্যায়নী' নাম পাওয়া যায় না, এবং ঐ যুগে কোনও আরাধ্যা শক্তির মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

২—তান্ত্রিক দীক্ষায় সর্ব্বজাতির অধিকার।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবলতার পর, অনেক অনার্য্য জাতি হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, এবং ঐ জাতীয়েরা তাহাদের বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজা লইয়াও আসিতে ভুলে নাই। এ কথা বিশেষভাবে শিবপূজা প্রবন্ধে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলাম।

পুরাণ-কর্ত্তারা স্বীকার করেন যে, শিশুনাগ বংশের রাজত্বের শেষ হইতেই ক্ষত্রিয় রাজত্বের লোপ, এবং শূদ্রের রাজত্বের আরম্ভ। এ হইল খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর কথা। তাহার পর হইতে যে ভারতবর্ষ একেবারে শূদ্রপ্রায় হইয়াছিল, এবং সর্ব্বত্রই শূদ্রের রাজত্ব বিশেষ প্রবলতা লাভ করিয়াছিল, এ কথা পুরাণকর্ত্তারাও বলেন, এবং তৎসাময়িক অন্যান্য ঐতিহাসিক উপাদান হইতেও যথার্থ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

মৌর্য্যেরা শূদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আদি কুল ও কৌলিক প্রথা হিন্দু ও বৌদ্ধ নীতিতে আবৃত্ত। তাহার পর যবন, শক, পহ্লব, চীন প্রভৃতি বিদেশীয় শূদ্রেরা এ দেশে আসিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে সমাজশরীরে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। বৈদিক ব্রাহ্মণে অন্ধ্রেরা নীচ অনার্য্য জাতি বলিয়া উল্লিখিত; কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতেই উঁহারা রাজাধিরাজ হইয়া সর্ব্বাশ্রমের প্রতিপালক হিন্দু ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। তাহার পর আধাল, আভীর, রট্ট, গর্দ্দভিল, ভোজ প্রভৃতি এ দেশের উন্নতিশীল অনার্য্য বা শূদ্রেরা রাজত্বগৌরবে ক্ষত্রিয় বা রাজপুত হইয়া উঠিলেন; এবং বিদেশাগত হূনেরা সুকান্তি ও প্রভুতার বলে কুলীন ক্ষত্রিয় হইয়া গেলেন। পুরাণে এ কথাও পাই যে, কলির দুরাচারে পুলিন্দ, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতিও রাজা হইয়া রাজন্য-সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

একে ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সর্ব্বজাতির ধর্ম্মদীক্ষায় অধিকার ঘোষিত হইয়াছিল, তাহার পর আবার অনার্য্যেরা স্বীয় স্বীয় জাতীয় বিধি ব্যবস্থা লইয়া সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িল। যে জাতির যে দেবসেবী ছিলেন, তাঁহারা

সমাজেই রাজার সহায়তায় সর্ব্বজনপূজিত হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের দেবতাগুলিকে আপনার প্রাচীন দেববর্গের সহিত অভেদ ঘটাইয়া দিয়া, নিজ হস্তেই পৌরোহিত্য গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চেষ্টা সফলও হইয়াছিল; কিন্তু কুলরীতি-অনুসারে দেবপূজার স্বীয় স্বীয় অধিকার ও রীতি পরিত্যক্ত হয় নাই। প্রথমতঃ যখন অনার্য্য সমাজগত 'গণ' ও 'মাতৃকার' পূজায় ব্রাহ্মণেরা অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন যে তাঁহাদিগকে অপাংক্তেয় হইতে হইয়াছিল, তাহা মনুসংহিতায় পাই। মধ্যপ্রদেশে ও ওড়িষায় এখনও দেখিতে পাই যে, গ্রামদেবতাদিগের পূজার জন্য হিন্দুরা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু গ্রামের অনার্য্য ঝাঁকর ঐ সকল দেবতার পূজারী।

বিন্ধ্যবাসিনী ছিলেন অনার্য্যের দেবী; অনার্য্য শবরেরাই রুধিরাদি দ্বারা নিজে উঁহার পূজা করিত। দেবী যখন আর্য্যপূজ্যা হইয়া কালী-নাম পাইলেন, তখনও প্রাচীন বনিয়াদী উপাসকদিগকে ভুলিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণেরা যখন অনার্য্যের দেবদেবীগুলি অধিকার করিয়া লইয়া সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন, তখন পূজাদীক্ষার অধিকারটুকু হইতে প্রাচীন অধিকারী-দিগকে বঞ্চিত করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণত্বের গৌরবের দিনে ব্রাহ্মণ পুরোহিত-লাভ, শূদ্রাদির পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। ব্রাহ্মণেরা উহাদিগকে ঐ উপায়ে বাধ্য ও বশীভূত করিয়া রাষ্ট্রোন্নয়নে সহায়তা করিয়াছিলেন। ঠিক্ কোন্ দিনে, কোন্ মুহূর্ত্তে এই অবস্থার উদয় হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। মোটামুটি ২য় হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ে এগুলি ঘটিতেছিল।

শ্মশানে দেবীপূজা, শবরদিগের সনাতন ধর্ম্ম। বাণভট্ট, ভবভূতি ও দণ্ডী তাহার সাক্ষী। সপ্তম শতাব্দীতে উহা উচ্চশ্রেণীর আর্য্যদের গ্রাহ্য না হইলেও যে সমাজের স্তরে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহাও কবিদের বর্ণনা হইতে উপলব্ধ হয়। শবরেরা এ কাল পর্য্যন্তও কুলরীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। দেবী "হেরিব্বো" যে সময়েই আর্য্যের পুরাণে গণপতিত্ব লাভ করিয়া থাকুন, উঁহার পূজা যে গণদিগের পূজার বিশেষ প্রতিষ্ঠার পরবর্ত্তী, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ভদ্রকালী একটু প্রাচীন; কিন্তু মাতৃকাগুলির পক্ষে, স্বতন্ত্রভাবে দেবী সাজিয়া পূজা পাইতে কাল-বিলম্ব হইয়াছিল। যখন বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের দেবী,

মহাদেবী হইয়া উঠিতেছিলেন, তখনই দেবীপীঠ ও দশমহাবিদ্যার পুরাণ হইয়াছিল। প্রাচীনকালে পুরাণ বলিয়া যাহা আর্য্যসমাজে স্বীকৃত ছিল, তাহা পরিপূর্ণরূপে মহাভারত-সংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছিল। এ কথা মহাভারতেই অঙ্গীকৃত। সে পুরাণে এ সকল কথা নাই; অনেক পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্তও নাই। সাহিত্য দেখিয়া বিচার করিতে গেলে, এ পুরাণ অন্ততঃ সপ্তম শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

দশমহাবিদ্যার ধ্যানের প্রতি লক্ষ্য করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, অনেক দেবীই নবাগতা, এবং শিবপত্নী বলিয়া পরিচয় দিয়া পূজিতা। কালীর একটি নাম কুল্লা। এই কুল্লা শব্দ প্রাচীন কোষকারের নিকট অজ্ঞাত। প্রাচীন মাতৃকা-নামেও কালীর এই নাম পাওয়া যায় না।* কাহাদের শ্মশানবাসিনী ললৎজিহ্বা কুল্লা কালী হইয়া উঠিলেন, কে জানে! তারার কথা পরে বলিব, এবং সেই সঙ্গে ছিন্নমস্তার কথাও আলোচনা করিব। ত্রিপুর জাতি চেদি ও হৈহয় রাজার শাসিত দেশে বাস করিত। মালব দেশের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং এই মালব দেশের অনার্য্যদিগের মধ্যে বহু মাতৃকার পূজা প্রচলিত থাকিবার কথা ৫ম শতাব্দীর প্রস্তরলিপিতে পাওয়া যায়। মহাকাল, ভৈরব ও ভৈরবীর সহিত মালব দেশের উজ্জয়িনীতে আমাদের প্রথম পরিচয়। তন্ত্রে ভৈরবীর যথার্থ নাম ত্রিপুর-ভৈরবী বলিয়া উল্লিখিত।

দশমহাবিদ্যা হইলেন পার্ব্বতীর রূপান্তর। হরপার্ব্বতী যে নিত্য-সংযুক্ত দেহধারণ করেন, এবং দেবী যে সতী, এ কথা সর্ব্বপুরাণে স্বীকৃত। অতএব পার্ব্বতীর কোনও রূপান্তরেই তাঁহাকে বিধবা বলা যাইতে পারে না। ধূমাবতী কিন্তু বিধবা। বিধবা অর্থ যে বস্ত্ররহিতা, তাহা কিন্তু নয়। কারণ, ধ্যানে আছে যে, তিনি মলিনবস্ত্রপরিহিতা। এই শূর্পহস্তা বৃদ্ধা কুরূপা কলহাস্পদা বিধবা, সম্পূর্ণরূপে অনার্য্যদের ডাইনার চিত্র। এখনও মধ্যপ্রদেশের সর্ব্বত্র, এই শ্রেণীর স্ত্রীলোককে গ্রামের লোক ডাইনী বলিয়া মনে করে। ইঁহার ধূম্রপান, কট্ কট্ করিয়া হাড় চর্ব্বণ ও প্রেতমধ্যে বিচরণ, অতি ভয়ঙ্কর। অন্যত্র হইতে আনীতা বলিয়াই ইঁহার কল্যাণে বুড়া শিবের কপালে একটা বিধবাবিবাহ জুটিয়া গেল। যিনি মূলতঃ "দুরাচারা" এবং "দুর্জ্জন

* তারা প্রকৃতির কথা এখন বলিব না। কারণ, নেপালের তান্ত্রিক ধর্ম্মের কথা একেবারে স্বতন্ত্রভাবে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে না লিখিলে চলিবে না।

প্রীতিকারিণী বলিয়া স্বীকৃতা, তিনিও সুযোগবিশেষে আর্য্যপূজ্যা হইয়া গেলেন।

মহাদেবের পত্নীর প্রাচীন নাম পার্ব্বতী ও উমা। অন্য কোনও নাম নাই। মাতৃকা-দলের প্রেতিনী ব্যতীতও তাঁহার কপালে দশমহাবিদ্যা জুটিয়া গেল। কিন্তু দশভুজা দুর্গাকে, মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত স্তোত্রেও পাই না; এই দশমহাবিদ্যার পর্য্যায়েও পাই না। ইহাতেই মনে হয় যে, দেবীগুলি ধীরে ধীরে আর্য্যসমাজে আসিয়াছেন; এবং নীচজাতীয়েরা তাহাদের নিজের দেবতার পূজা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। শূদ্রাদির পূজার অধিকার যে কারণেই ঘটিয়া থাকুক, ঐ অধিকারটি মঙ্গলজনক।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখি। মহাদেব প্রাচীনকালে দাম্পত্য প্রণয়ের আদর্শস্বরূপ ছিলেন, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে তাঁহাকে অনেক পত্নী গ্রহণ করিতে হইল। মাতৃকা ও প্রেতিনীগুলিত পার্ব্বতীর নামান্তর বলিয়া উল্লিখিত হইয়া, শিবনামে কলঙ্ক দিতে পারে নাই; কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দেখিতে পাই যে, গঙ্গা পার্ব্বতীর সপত্নী। মহাভারতাদিতে গঙ্গা সাগরপত্নী; অর্থাৎ, একটু রূপক। সেই জন্যই গঙ্গার পক্ষে শান্তনুর পত্নী হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। মহাদেবী পার্ব্বতী, রূপান্তরে হউন, বা রূপকে হউন, কুত্রাপি পরভোগ্যা নহেন; পরমপূজ্য মহাদেবের সঙ্গে সংস্রব থাকিলেও, গঙ্গাই হউন, আর যিনিই হউন, পরভোগ্যা হইতে পারিতেন না।*

পঞ্চম শতাব্দীর মহিমায় মহাদেবকে সাগরপত্নী জাহ্নবীকে লইয়া পরদার-পাপ করিতে হইল। ভবানীপতির চিরদিনের সুখ্যাতি নষ্ট করিয়া এমন নূতন পুরাণেরও সৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাঁহাকে বহুপরিমাণে পরকলত্রগামী করা হইয়াছে। দশকুমারচরিতে অপহার বর্ম্মার গল্পে শিব-কলঙ্কের পুরাণ উপযুক্ত হইয়া লিখিত হইয়াছে,—"ভবানীপতের্নিপত্নীসহস্রসন্দর্শনম্"। এত গুণেই তাহার পরে ইনি নূতন তন্ত্রের দেবতা হইতে পারিয়াছিলেন।

৩ ও ৪—মন্ত্রবল ও নবযোগ।

মন্ত্রবল ও নবযোগের কথা বলিতে হইলে, যোগের ইতিহাস লিখিতে হয়। বঙ্গদর্শনে ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেছি; এখানে সবিস্তর সকল কথা

---

* গঙ্গাগর্ভে মহাদেবের বীর্য্য নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, প্রায় ৩য় শতাব্দীতে স্কন্দের নামে যে নূতন পুরাণ হয়, তাহারই সুবিধার, সপ্তম শতাব্দীতে গঙ্গাকে পার্ব্বতীর সপত্নীরূপে পাই।

না লিখিয়া অতিসংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব। এক প্রবন্ধে সকল কথা লিখিতে গেলে পাঠকদিগের ধৈর্য্যচ্যুতির বিশেষ সম্ভাবনা। যাঁহারা সকল কথার বিচার করিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া অন্য প্রবন্ধগুলি পড়িলে অনুগৃহীত হইব।

অথর্ব্ববেদে মারণ উচাটনাদির মন্ত্র আছে; ঐ বেদ বহুকাল সদাচার্য্যের অগ্রাহ্য ছিল; উহার প্রভাব ছিল মগধাদি পূর্ব্ব প্রদেশে, এবং হিমালয়সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্য আর্য্যাবাসভূমিতে। ঐ দেশে আর্য্যেরা বহুপরিমাণে দ্রবিড়জাতি ও চীনজাতির সহিত মিলিত হইয়া সমাজস্থাপন করিয়াছিলেন। চায়না দেশ হইল মহাচীন, কিন্তু হিমালয় প্রদেশের অধিবাসীরা চিরকাল চীন-জাতীয় বলিয়া খ্যাত, এবং এ দেশের বহু পুরাতন অধিবাসী। দ্রবিড়েরা যে মন্ত্রতন্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ, তাহা কাদম্বরী, হর্ষচরিত, মালতীমাধব প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও জানা যায়। এখনও উহারা মন্ত্রতন্ত্র ও লিঙ্গ-উপাসনার জন্য বিখ্যাত। শিশ্নপূজক অনার্য্যেরা বৈদিক ব্রাহ্মণে ঘৃণিত বলিয়া বর্ণিত। চীনদেশীয়েরা যে অদ্ভুত ক্ষমতা, মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতির বিশেষ সাধক, তাহা তিব্বত, নেপাল, সিকিম ও ভুটানের অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার হইতে এখনও জানিতে পারা যায়। উহারা যে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে ঐগুলি ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছি[ল], তাহা নহে। ঐ বিষয়ের সংস্কারে চীনেরা—হিন্দুদিগের অনেক উপরে; ঐগুলি উহাদের জাতিগত। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত উহাদের মিশ্রণে নূতন রকমের বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরই সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সকল অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, অনেক তান্ত্রিক যোগ ও মন্ত্রতন্ত্র দ্রবিড় ও চীনদিগের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি। উহারা বৌদ্ধ হইয়া যখন ঐগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল, এবং অদ্ভুত আশ্চর্য্য ক্ষমতার লোভে যখন এ দেশের লোক উহার সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখনই উহার জন্য শাস্ত্র রচিত হইয়া উচ্চস্তরের হিন্দুর জিনিস হইয়া গিয়াছে।

প্রথমে মৃচ্ছকটিকে, তাহার পর দশকুমারচরিতে, চৌর্য্যবৃত্তির জন্য তন্ত্র হইয়াছিল, জানিতে পারা যায়। এই বিদ্যার দেবতা স্বয়ং কুমার পার্ব্বতী-পুত্র। মহাভারতের বনপর্ব্বে স্কন্দের যে মহিমার কথা আছে, (অর্থাৎ ২২২ হইতে ২৩১ অধ্যায় পর্য্যন্ত) সম্ভবতঃ উহা পরবর্ত্তী কালের রচনা। সে কথা থাকুক। লোহিত্যায়নী (রক্তসাগরবাসিনী) স্কন্দের ধাত্রী, এবং তাঁহার দেব-

চিহ্ন বা বাহন হইলেন কুক্কুট। (বনপর্ব্ব—২২৯, ২৩০। ২২২ হইতে ২৩১ অধ্যায় সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য।) তাহার পরে উনি ময়ূর পাইলেন, এবং পাকে চক্রে মহাদেবও পার্ব্বতীর পর হইয়া গেলেন। মাতৃকা হইতে স্কন্দ পর্য্যন্ত, মন্ত্রতন্ত্রের সকল দেবতাই যেন বাহির হইতে আসিয়াছেন।

নেপালে তন্ত্রমন্ত্র ও বহু ব্যভিচারময় সাধনা, শৈব ও বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত এমন সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত যে, নেপালীয়েরা উহা হিন্দুর কাছে ধার করিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আমার বিশ্বাস যে, নেপালের তারা, আমাদের দশ-মহাবিদ্যার এক দেবী। যখন নেপালের বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তান্ত্রিক ব্যভিচার যুক্ত দেখিতে পাই, তখন হিন্দুর তন্ত্রের প্রভাবে নেপালের বৌদ্ধধর্ম্ম বিকৃত হইয়া তথাগত গুহ্যকাদির সৃষ্টি হইয়াছিল, বলিতে পারি না। ঐগুলিই আমাদের ধর্ম্ম বিকৃত করিয়া তান্ত্রিক বামাচারের সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয়।

প্রাচীন সময়ের গৌড় দেশ এই নেপালের সন্নিহিত ছিল, এবং নেপালের দক্ষিণ অংশ গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। এই গৌড়েই যখন তান্ত্রিক আচারের উদ্ভবের প্রবাদ পাই, তখন সকল দিক দেখিয়া, এই মন্ত্র ও অলৌকিক ক্ষমতার শাস্ত্র নেপালাদি দেশে উৎপন্ন, এবং দ্রাবিড়ভাবে পরিপুষ্ট বলিয়া অনুমান করা অধিক সঙ্গত।

দক্ষিণাপথে যখন বাসব নামক এক জন শিশ্নপূজাদি সহ তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রচার আরম্ভ করেন, তখন চালুক্য রাজারা সাধকদিগের ভীষণ চরিত্রহীনতা ও ঐ শাস্ত্রের গভীর অপবিত্রতা লক্ষ্য করিয়া, সমূলে উহার ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলে কিন্তু রাজারাই হারিয়া গেলেন, এবং বাসব-প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠান নানা স্থানে জাগিয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রে তত প্রবল হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অন্যত্র খুব প্রবল হইয়াছিল। গুর্জ্জরের তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বা বামাচার, বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত। এই জিনিসটি বঙ্গদেশের বাউল সম্প্রদায়েও আছে। শ্রীপর্ব্বতের (হায়দরাবাদের কোনও পর্ব্বত কি ?) কাপালিক ও অঘোরীরাও কিন্তু গুর্জ্জরে প্রবলতা লাভ করিয়াছিল।

এ সকল কথার বিচার করিলে প্রথম তন্ত্রের উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে যে প্রবাদ-শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সত্যতা উপলব্ধ হইতে পারিবে। এখন বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রবাদ-শ্লোকের গৌড় বঙ্গ দেশ নহে।

৫—৯ কুমারীপূজা প্রভৃতি।

মহাভারতে যে দুর্গাস্তব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, চতুর্ভুজা ও চতুর্বক্ত্রা দুর্গা কুমারী ছিলেন। গোপকুলে কুমারীরা কাত্যায়নীর পূজা ছিল, পুরাণে তাহা জানিতে পারা যায়। কুমারীগণ কাত্যায়নীর পূজা করিতেন, ইহাও প্রাচীন কথা। এই কুমারী দুর্গা কত দিন কি ভাবে ও কোথায় সবিশেষ পূজা পাইয়াছেন, তাহা জানিতে পারি নাই। ইনিই যে এখন কৃষ্ণত্ব পরিহার করিয়া গৌরী হইয়া উঠিয়াছেন, এবং শিবপত্নী উমা বলিয়া পূজিতা, তাহা সকলই বুঝিতেছি। তন্ত্রের কুমারী-পূজা অথ এ দেবীর পূজা নহে, এ পূজা নারী কুমারীর। এই পূজা প্রাচীন পুরাণে নাই, অথচ এখনও বারাণসীতে উহা প্রচলিত আছে। কোথা হইতে কবে উৎপত্তি হইল?

শিশ্নপূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে যুক্তযোনির পূজা ছিল, এবং সম্ভবতঃ ঐ সম্প্রদায়ের শৈবমতের সঙ্গে বেদান্তের মিলিত হইয়া এ অনুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদান করিব। বলিয়া রাখি যে, শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থে দেখিতে পাই, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, এই শ্রেণীর শৈবদিগকে পরাস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পরাস্ত হইল কৈ?

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ যতই শুদ্ধ হউক, বা সত্য হউক, শিশ্নপূজকেরা কিন্তু উহার সোজাসুজি একটা অর্থ বুঝিয়া ফেলিয়াছিল। শিবোঽহম্, অর্থাৎ আমি উপাসক বা সাধকই শিব, এবং মুক্তিপ্রার্থিনী বা সাধনবলে মুক্তা রমণীরা ভবানী। ফল যাহা হইল, তাহা বুঝাইতে হইবে না। তন্ত্রেও দেখিতে পাই যে, পুরুষেরা সাধনার বলে শিব হইবেন, এবং রমণীরা ভবানী হইবেন; অতি গর্হিত সাধনা প্রক্রিয়ার সময়ের মধ্যেও আমি শিব ও আমি ভবানী উচ্চারিত হইত। হুতোমপেঁচার নক্সায় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরুর এই প্রকারের অনুষ্ঠানের ফলে কাঁধে দড়ি ব্যারামের গল্প আছে।

রমণীই ভবানীর মূর্ত্তি; অনাঘ্রাতপুষ্পা কুমারী আরও পবিত্র। হয় ত এইরূপ একটা কিছু হইতে এই পূজার উৎপত্তি। যে রুদ্রযামল ও কুমারীতন্ত্রে কুমারীগণের শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ তন্ত্রগুলি যে আধুনিক, তাহার পরিচয় দিয়াছি। সংসর্গবিশেষ যোগসাধনের অঙ্গীভূত হইবার পর কুমারীপূজার প্রচলন বলিয়া অনুমান হয়।

দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে এই প্রকার সাধনাজ্ঞবলম্বনকারী তান্ত্রিকের পরিচয় হিন্দু সাহিত্যে আছে কি না, বলিতে পারি না। নেপালের সাহিত্যে আছে, তাহা স্বীকার করি। সর্ব্বপ্রথম একটি আস্ত তান্ত্রিকের সহিত সাক্ষাৎলাভ করি, রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত সট্টকে। এ সময়ে মদ্যাদিপানের কৌলিকমার্গ নামক বিশেষ পরিভাষাও হইয়া গিয়াছে। তান্ত্রিক ভৈরবানন্দ মদ্যপান করিয়া পড়িতেছেন:—

> মন্তো ন তন্তো ন অকিং পি জাণং
> ঝাণং চ নো কিংপি গুরুপ্পসাদা।
> মজ্জং পিআমো মহিলং রমামো
> মোক্খং চ যামো কুলমগ্গলগ্গা॥

অর্থ এই,—"মন্ত্রেরও ধার ধারি না, তন্ত্রেরও ধার ধারি না; ধ্যানেই বা কয় কি? গুরুর প্রসাদে মদ্যপান করি, আর মহিলা ভোগ করি; এতেই কৌলিকমার্গে মোক্ষলাভ হয়।" তার পর আরও দুইটি শ্লোক আছে। তাহাতে আছে, "বিধবা হোক, কুমারী হোক্, কাহারও ধর্ম্মপত্নী হোক্, সকলকেই তন্ত্রধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করি, এবং মদ্য মাংস সেবা করি।" অপিচ,—"হরিব্রহ্মমুখাদি দেবতারা বেদপাঠ ও যজ্ঞ দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে বলেন, আমরা কিন্তু মুক্তিলাভ করি 'সুরতকেলি-সুরারসেহিং।' শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্পূরমঞ্জরীর বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

বর্ণনার প্রকৃতি হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কবি ভৈরবানন্দকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘৃণিত করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। তখন ইহাদের প্রাদুর্ভাবও হইয়াছিল, এবং সুধীগণ উহাদিগকে পরিহারও করিতেন। উহারা যে মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধন করিতে পারিত, তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। খাঁটি তন্ত্রের সৃষ্টি, কাজেই ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে বলিয়া মনে হয়।

কুমারীগ্রহণে জাতিবিচার নাই; সে যৌবনোন্নতা ও অনুরাগিণী হইলেই হইল। ইহাদের মধ্যে ভোজনেও জাতিবিচার নাই। কিন্তু জাতিভেদ-পরিত্যাগ, কেবল "প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে"। উহা দ্বারা ভৈরবীপূজায় প্রবৃত্ত সাধকমণ্ডলীকেই বুঝায় বটে, কিন্তু চক্র কথাটায় একটু বিশেষত্ব আছে। মন্ত্রপূত করিয়া একটা গণ্ডী দিয়া লওয়া, বহু প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই সাধনায় বিশেষভাবে একটি চক্র কাটিয়া

বসিলে, চট্‌ করিয়া আরাধ্য দেব দেবীর আবির্ভাব হয়। উহার জন্ম কতকগুলি মন্ত্রও আছে। এক দিকে গণেশ ও অন্য দিকে অম্বিকাকে কল্পনা করিয়া, কুশ দ্বারা গণ্ডী শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। এই প্রক্রিয়াটা শিবসংহিতা নামক একালের একখানি যোগগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশ ও একবিংশ শ্লোকের মর্ম্মের অনুরূপ। কে আগে, কে পরে, তাহা বলিতে পারিব না; কিন্তু দুইটিই অর্ব্বাচীন।

তন্ত্রে গুপ্তসাধনা কেন?

সাধনা গুপ্ত করিবার নাকি ভারি একটা অর্থ আছে, শুনিতে পাই। আমার কার্য্য ইতিহাস-সংগ্রহ, সাধনা নহে; কাজেই গভীর অর্থটার ঐতিহাসিকের মতই সমালোচনা করিব। সাধকেরা যেন আমার অপরাধ ক্ষমা করেন।

অধিকারিভেদে গুরু সাধনা দান করিয়া থাকেন, কাজেই সকলের কাছে সকল কথা বলা চলে না। বলা চলে না, এবং গুপ্তসাধনা একরকমের কথা নয়। অধ্যাপক গুরুর চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্র পড়ে; কেহ বা বর্ণপরিচয় করিতেছে, কেহ বা ব্যাকরণ পড়িতেছে, এবং কেহ বা ন্যায় শাস্ত্রের পাঠ লইতেছে। বর্ণপরিচয়-ওয়ালা ত ন্যায়শাস্ত্র বুঝিতেই পারিবে না; কিন্তু গুরু যদি তাহার সাক্ষাতে ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ দেন, তাহা হইলে গৌতমসূত্র পচিয়া যায় না, কিংবা বর্ণপরিচয়-ওয়ালার শিক্ষা নষ্ট হইয়া যায় না। এন্‌ট্রান্সের ছাত্রের জ্ঞানের অগোচর স্থানে গুপ্তভাবে বি. এ.র ছাত্রের জন্য বিজ্ঞানমন্দির করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রাচীন কালের বেদমন্ত্রাদির অধিকারে দেখিতে পাই যে, শ্রেণীবিশেষই ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজমানের কল্যাণসাধন করিবেন। অন্য লোকে উহা উচ্চারণ করিলে বেদমন্ত্র অশুদ্ধ হইয়া যায়,—এবং নিষ্ফল হয়। যে জন্য এ ব্যবস্থা ছিল, তাহার ইতিহাস আছে। এই গুপ্তসাধনবিধিতে মন্ত্রের শুদ্ধতা রাখিবার ভাবটা ত আছেই, তাহা ছাড়া আরও কিছু আছে।

যে সাধনায় কোনও ব্যক্তিবিশেষকে অলৌকিক শক্তিলাভের চেষ্টা করিতে হইবে, স্থির হইয়া বসিয়া নাকের ডগায় দৃষ্টিস্থাপন করিতে হইবে, তাহা নির্জ্জনেও করিতে হয়, গোপনেও করিতে হয়। তাহার পর যে সকল কৌলিক মার্গ আছে, তাহা ত নিতান্ত গুপ্ত না করিলে সাধনাই অসম্ভব।

বৈদিক মন্ত্র, কেবল শূদ্রাদি দ্বারা পঠিত বা শ্রুত হইয়া অপবিত্র হইবার ভয় ছিল; কিন্তু এ সাধনা গুহাতিগুহ না করিলে অনেক ভয়ের কথা। পুরাণগুলি সর্ব্ব শ্রেণীর পাঠ্য হইয়া রচিত হইয়াছিল; উহার কোন কথা গোপন করিবার বিধান নাই। পুরাণে তীর্থগমন, ব্রতধারণ ও সকল দেব দেবীর পূজা ও মোক্ষপথের কথা আছে। তবুও উহা গুহ্যশাস্ত্র নহে। কিন্তু গুহ্যশাস্ত্র এই তন্ত্রগুলি।

যে ধর্ম্মে ঈশ্বরদর্শনের অর্থ ঈশ্বরের অস্তিত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাসমাত্র নহে, তাহাকে ভূত নামাইয়া দেখার মত দেখিয়া লওয়া; যেখানে আস্তিক্যবুদ্ধি ও ভক্তির ফলে সুচরিত্র হইয়া সংসারধর্ম্ম করা মাত্র নহে, কিন্তু একটা অলৌকিক শক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া; সেখানে গায়ত্রী-জপ ও মনু-প্রদর্শিত চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা দ্বারা সংসারধর্ম্ম করায় মোক্ষপথলাভ হয় না। অলৌকিক শক্তির জন্য যোগ চাই; শত্রুনাশের জন্য মন্ত্রবল চাই। এ সকল কার্য্য গোপনে না করিলে চলিতেই পারে না।

ভূদেব বাবু বলিয়াছেন যে, তন্ত্রগুলির প্রকৃতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যখন এ দেশে অন্যজাতীয়েরা আসিয়া আমাদিগকে পরাধীন করিয়াছিল, এ শাস্ত্র সেই সময়ের। পূর্ব্ব হইতেই নানা বিভাগে ইহার বীজ উপ্ত ছিল, তাহা দেখিয়াছি। সম্ভবতঃ, মুসলমানের অধীন হইবার সময় হইতেই সকল রকমের বীজের অঙ্কুর এক সঙ্গে করিয়া এই তন্ত্র কাননের সৃষ্টি হইয়াছে। যখন হীনবল রাজা সৈন্যদিগের বলে কিছু করিতে পারিলেন না, তখনই কৌলিকমার্গাবলম্বীরা মন্ত্রবলে মারণ উচাটন করিতে পারা যায় বলিয়া, রাজাদিগকে খুসী করিয়াছিলেন; এবং নানা প্রকার সাধনার রসে অনেক ভক্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ফল যাহা হইয়াছে, তাহা সকলেই জানি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সহযোগী সাহিত্য।

তিব্বতে গার্হস্থ্যজীবন।

তিব্বতীয় কমসন জেনারল শ্রীযুক্ত এ. হোসাই, চেংটু নামক স্থানে তিব্বতের পূর্ব্বসীমান্ত-প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে যাইয়া তিব্বতীয় গৃহচিত্রের একটি হৃদয়গ্রাহী বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। একদা তিনি লিটাং জেলার কোন তিব্বতীয় গৃহস্থালয়ে দুই দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি গৃহস্থগণের আচার ব্যবহার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। গৃহস্থের পরিবারের মধ্যে একটি খর্ব্বাকৃতি কর্ম্মশীলা বিধবা রমণী; ২৮ ও ৩০ বৎসর বয়স্ক দুইটি পুত্র, এবং ১৪ ও ১৭ বর্ষীয়া দুইটি কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি পূর্ব্বে পুরোহিত ছিলেন। (কারণ তখন পর্য্যন্ত তিনি লামার পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন) তাঁহার স্ত্রী ও চারিটি সন্ততি সকলেই উক্ত পরিবারভুক্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রটির কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল না—তিনি অলসভাবেই সময় কাটাইতেন; যত দূর আমি জানি, তদনুসারে তিনি গৃহস্থালীর ভাণ্ডার-গৃহের অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং ভাণ্ডার-গৃহ ও উপাসনা-মন্দিরের চাবি সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে থাকিত। তিনি পারিবারিক উপাসনা ও ধর্ম্ম কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে চাবি খুলিয়া আমার কর্ম্মচারিগণকে ভাণ্ডার হইতে যবচূর্ণ বা ছাতু (Tsamba) প্রদান করিতেন। বোধ হয়, আমাদের অবস্থানবশতঃই তিনি সর্ব্বদা গৃহে থাকিতেন। কারণ, মদপূর্ণ বোতল লইবার জন্য তিনি সর্ব্বদা সতৃষ্ণ-নয়নে উৎসুক থাকিতেন। কিন্তু অধিকাংশ বোতলের জলপ্রবণতা হেতু আমিও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিতাম না। কনিষ্ঠ পুত্রের সে দিকে বড় লক্ষ্য ছিল না। তিনি কার্য্যার্থ বাহিরে যাইতেন। কিন্তু স্ত্রীলোক ও বালিকাগণ সর্ব্বদাই গৃহে ও বাহিরে কর্ম্মনিরতা থাকিত। ইহারা সকলেই লম্বিত কেশগুচ্ছ ধারণ করিত। সেই অলকাবলী তাহাদের বদনমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক নাসাগ্র পর্য্যন্ত বিলম্বিত থাকিয়া শৈবালানুবিদ্ধ সরসিজের বা পল্লবাবগুণ্ঠিত কুসুমের শোভা ধারণ করিত। বালিকাগণের চিকুরজাল নানা ভাগে বেণীবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠদেশে লম্বিত হইত। কিন্তু বর্ষীয়সীদিগের বেণীশ্রেণী কবরীকলাপে বেষ্টিত থাকে, কাহারও দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় না। একটি কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রগ্রন্থি শিরোভূষণরূপে কবরীর উপরে বিন্যস্ত থাকিয়া পৃষ্ঠদেশে অঞ্চলাগ্রের ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে। এবং ঐ অঞ্চলপ্রান্তে শ্বেত, লোহিত ও হরিদ্বর্ণের মালা সকল সংযুক্ত থাকিত। কবরীর বামে ও দক্ষিণে দুইটি এবং পশ্চাদ্ভাগে একটি রজতফলকিকা বিদ্ধ থাকিয়া পরম শোভা সম্পাদন করিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবালখণ্ডে খচিত রৌপ্যফলকিকা তাহাদের কবরীকে অপূর্ব্ব শ্রী প্রদান করিত। পশ্চাদ্ভাগের কবরীফলকী (রৌপ্যের ফিতা) বর্ত্তুলাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজতখণ্ডে খচিত থাকিত। এতদ্ভিন্ন বালিকাগণ শিরোভূষণরূপে কবরীপার্শ্বে দুইটি গোলাকৃতি রৌপ্যফুল ধারণ করিত, এবং খচিত প্রবালমালিকা তাহাদের কবরী বেষ্টন করিয়া থাকিত। তাহারা কেশবেশ

স্থানে নবনীত ব্যবহার করিত। তাহারা রজতনির্ম্মিত কর্ণভূষা, ও গৃহজাত ধূসর বর্ণের কার্পাসবস্ত্র সর্ব্বদাই পরিধান করিত। তাহাদের গৃহে একটি তাঁত ছিল; বালিকারা তথায় সর্ব্বদাই বস্ত্রবয়নে নিযুক্ত থাকিত।

আমি একটা ভোজনে এই পরিবারবর্গের সহিত যোগদান করিয়াছিলাম এবং আহার প্রস্তুত বিষয়ে সামান্য সাহায্য করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ যবগুলি অল্পকাল পর্য্যন্ত একটি কটাহে ভর্জ্জিত হইল, পরে সেই ভর্জ্জিত যব হস্তচালিত প্রস্তর-যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া শক্তুতে পরিণত হইল। এই যবচূর্ণ বা শক্তু একটি চর্ম্মপেটিকায় সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইষ্টকাকৃতি চা-স্তূপ হইতে মুষ্টিমেয় চা প্রথমে একটি সঙ্কীর্ণমুখ তাম্রপাত্রে নিক্ষিপ্ত হয়; পরে তাহাতে শীতল জল প্রদত্ত হয়। ঐ জল ফুটিয়া উঠিলে পুনরায় আরও জল প্রদত্ত হয়। জল পুনরায় ফুটিয়া উঠিলে চাগুলি তাম্রময় দর্ব্বী সহযোগে একটি মন্থনপাত্রে নীত হয়। এই সময়ে অর্দ্ধ পাউণ্ড মাখন তাহাতে প্রদত্ত হয়, পরে অল্প লবণ মিশ্রিত করিয়া উহা মথিত করিতে হয়। আমার প্রতি মন্থন করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল; আমি সহজেই তাহা সম্পাদন করিলাম। সেই মিশ্রিত দ্রব্য তৎপরে হাতার দ্বারা তাম্রময় চা-পাত্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া, পরে কাষ্ঠনির্ম্মিত বাটিতে ভোজনকর্ত্তার সম্মুখে প্রদত্ত হয়।

আমরা সকলে ভূ-তলে (মেজের) উপবেশন করিলাম। কারণ, তিব্বতীয় গৃহস্থের গৃহে কোনরূপ কাষ্ঠাধার বা কাষ্ঠাসন নাই। প্রথমতঃ প্রত্যেকেই নবনীত-মিশ্রিত চার এক তৃতীয়াংশ পান করিল; পরে মুষ্টিমেয় যবচূর্ণ লইয়া সেই পানপাত্রে নিক্ষেপ করিল, অঙ্গুলি দ্বারা শক্তুচূর্ণ নবনীতমিশ্রিত চার সহিত মর্দ্দিত হইয়া কর্দ্দমের ন্যায় হইল। ইহাদের কাঁটা চামচ প্রভৃতি কিছুই নাই। তৎপরে সকলেই ঐ পিষ্ট শক্তুচূর্ণ আহার করিতে লাগিল। ইহাই তিব্বতীয়গণের প্রধান খাদ্য। ভোক্তার ইচ্ছানুসারে পানপাত্র সকল পুনঃপুনঃ পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। মাসের মধ্যে কয়েক দিন প্রাতঃকালে বা প্রদোষে গোমাংস ও মেষমাংস ভক্ষিত হইয়া থাকে। এই মাংস লবণযোগে অর্দ্ধসিদ্ধ অবস্থায় ভক্ষিত হয়। কতকগুলি turnips উদ্ভিজ্জও অসিদ্ধ অবস্থায় ভক্ষিত হয়। অর্দ্ধপক্ব যবশস্য দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করাকে (হুড়াপোড়া) ইহারা বড় উপাদেয় মনে করে, এবং দগ্ধ যবগুলিকে অতি কৌশলের সহিত মুখে নিক্ষেপ করে।

দুষ্প্রবৃত্তিশীল অপরাধীদিগের সম্বন্ধে অভিনব মন্তব্য।

'আটলাণ্টিক' মাসিকপত্রে এক জন কারাগারের ধর্ম্মযাজক আপনার বহুদর্শিতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা লম্‌ব্রসো ও তাঁহার অনুবর্ত্তী লেখকগণের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। লম্‌ব্রসোর মতে, অপরাধী সাধারণ মনুষ্যজাতি হইতে যেন এক স্বতন্ত্র জীব। ধর্ম্মযাজক যে কারাগারের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ১৫০ জন অপরাধী ছিল। তিনি বলেন, কারাবাসী বন্দী সকলকে দুষ্প্রবৃত্ত্যাসক্ত মনুষ্যসমাজ এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় না।

কারাগারের বাহিরে লোকসমাজে যেমন মানুষে মানুষে নানা বিষয়ের পার্থক্য আছে, অপরাধীদের মধ্যেও সেইরূপ মানুষে মানুষে নানাবিধ পার্থক্য রহিয়াছে, একটা কোন নির্দ্দিষ্ট গুণ অপরাধিগণের মধ্যে আবিষ্কার করা যায় না। সমাজের বিভিন্ন স্তরে যেরূপ ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্য দৃষ্ট হয়, এই কারাভ্যন্তরেও সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ গুণবিশিষ্ট মনুষ্য দেখা যায়। ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, কারাবাসিগণের দুই তৃতীয়াংশ অপরাধী মাতলামির সময়ে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে।

সমাজে হাজার হাজার লোক হয় ত ইহাদের অপেক্ষা বেশী মাতাল হয়; তবে দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলে না। ইহারা তাহাদের সমান পদবীতে থাকিলেও অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছে মাত্র।

অবশিষ্ট তৃতীয়াংশের মধ্যে অনেকেই যে অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে, সে অপরাধ সমাজে উচ্চ নীচ উভয় শ্রেণীতেও বিদ্যমান। তবে সকলে ধরা পড়ে না; এই হতভাগ্যেরা ধরা পড়িয়াছে। অনেক অপরাধ সমাজে কোন শ্রেণীবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নহে।

এই অপরাধিগণ স্বাভাবিক অবস্থায় মিতাচারী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা কোন অংশে বিকৃতভাবাপন্ন নহে।

অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জনকতকমাত্র চুরিব্যবসায়ী অপরাধীর শ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য। ডাকাতি ও প্রবঞ্চনাদি কার্য্যই ইহাদের স্বাভাবিক ব্যবসায়। আর জনকতক চরিত্রের দৌর্ব্বল্য অথবা রিপুর উত্তেজনতায় দুষ্কৃত পাপে লিপ্ত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছে।

উক্ত ধর্ম্মযাজক বলেন যে, এই কারাবাসিগণ ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য বড়ই উৎসুক। বোধ হয়, পৃথিবীর কোনও উপাসনা-মন্দিরে, কোনও উচ্চ সমাজে ইহাদের ন্যায় মনোযোগী শ্রোতা নাই। তিনি আরও বলেন, ইহাদিগের হৃদয় যেরূপ সহজে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনায় বিচলিত ও বশীভূত হইয়া থাকে, কোনও সমাজের ব্যক্তিগণের চিত্ত সেরূপ ভাবে ভাববিগলিত হয় না। এই ধর্ম্মযাজক উক্ত কারাবাসিগণের জন্য আন্তরিক স্নেহ ও প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন, মনুষ্যসমাজে যেমন সহজ মানুষের সহিত বাতুলের কোনও জাতিগত পার্থক্য নাই, কোনও আকস্মিক কারণে সহজ মানুষের মস্তিষ্কের বিকার ঘটিলেই সে বাতুল হয়, সেইরূপ যাহারা দোষ করিয়া ধরা পড়িয়াছে এবং যাহারা ধরা পড়ে নাই, তাহাদের মধ্যেও কোনও জাতিগত ভেদ দেখা যায় না।

ফিরিঙ্গি বণিক্।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আত্মরক্ষা।

The Zamorin made every effort to rouse the apathetic sovereigns to take part in the common cause.—*Portuguese Conquest in India.*

কালিকট-রাজ আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে ক্রটি করেন নাই। তথাপি তাঁহার আয়োজন ব্যর্থ করিয়া ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষে বিভীষিকার সঞ্চার করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষের লোক এরূপ নিষ্ঠুরতার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এখন ভাস্কো ডা গামার নাম ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়াছে; তাঁহার চরিত্রদোষ বিস্মৃত হইয়া ইতিহাস লেখকগণ তাঁহার চরিত্রগুণেরই উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু সেকালের কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,—গামা বীর হইলেও দস্যু, ধর্ম্মোন্মত্ত হইলেও রাক্ষসের ন্যায় নিষ্ঠুর!

ফিরিঙ্গি বণিকের সহিত মালাবার-প্রবাসী যে সকল মুসলমান বণিকের কলহ ঘটিয়াছিল, তাঁহারা রাজা বা রাজপুরুষ ছিলেন না। সে কলহ কেবল ব্যক্তিগত বাণিজ্য-কলহ; তাহা জাতিগত ধর্ম্ম-কলহ নহে। গামা তাহাকে সে ভাবে গ্রহণ করেন নাই। তিনি তাহাকে মুসলমান ও খৃষ্টানের—এসিয়া ও ইউরোপের—কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের—জাতিগত কলহ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যখন ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখনই তাহার প্রমাণ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

মিশরের সুলতানের নিরীহ প্রজাবর্গ মক্কাতীর্থ দর্শন করিয়া একখানি অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলের নিকটে আসিয়া, গামার অর্ণবপোতের সহিত এই সকল তীর্থযাত্রীর অর্ণবপোতের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। তীর্থযাত্রী বলিয়া কেহ নিষ্কৃতিলাভ করিল না! যাহার নিকট যাহা ছিল, তাহারা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া কেবল প্রাণভিক্ষা করিল। কিন্তু তাহারা যে সকলেই মুসলমান! গামা মুসলমান তীর্থযাত্রীর কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া, তাহাদের অর্ণবপোত লক্ষ্য করিয়া গোলাবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পোতে অগ্নি

সংযুক্ত হইবামাত্র তীর্থযাত্রিগণ সাগরজলে তাহাকে নির্ব্বাপিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। গামা পুনরায় অগ্নিসংযোগে প্রবৃত্ত হইলেন। এক জন দর্শক লিখিয়া গিয়াছেন,—"মুসলমান তীর্থযাত্রিবর্গের অর্ণবপোতে যে সকল রমণী ছিলেন, তাঁহারা শিশু সন্তানগণকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া গামার দিকে কাতরনয়নে চাহিয়া বালক বালিকার প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিলেন;— গামা অবিচলিতচিত্তে স্ত্রীহত্যায় শিশুহত্যায় নিবিষ্ট হইয়া রহিলেন!" তাঁহার কেশাগ্রও কম্পিত হইল না। পৃথিবীর ইতিহাস অনেক লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডে কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার করিয়া ফিরিঙ্গিগণ অনেক সত্য মিথ্যা হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ হত্যাকাণ্ডের কথা মানবসমাজের ইতিহাসে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

কালিকটে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই কালিকট-রাজের সম্ভ্রান্ত রাজদূতগণ ভাস্কো ডা গামার অর্ণবপোতে উপনীত হইয়া, সন্ধিসংস্থাপনের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন; গামা তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"সমস্ত মুসলমান প্রজাকে কালিকট হইতে চিরনির্ব্বাসিত না করিলে সন্ধি হইবে না।" কালিকট-রাজের পক্ষে বাহুবলে কালিকট রক্ষার সম্ভাবনা ছিল না; তথাপি তিনি এরূপ প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে জানিয়া শুনিয়াই আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইল। তিনি আত্মরক্ষার্থ রাজন্যগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন; তাহাতে কেহ কর্ণপাত না করায়, কালিকট-রাজ একাকী সমরানলে আত্মাহুতি প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। যাহা চরিত্রগুণ, তাহার জন্যই কালিকটের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইল!

কোচীন-রাজ ফিরিঙ্গি বণিকের পৃষ্ঠপোষক না হইলে, গামা একাকী এত দূর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না। লাভের লোভে অন্ধ হইয়া কোচীন-রাজ স্বদেশদ্রোহে লিপ্ত হইলেন। তাহাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান কথা। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সকল রাজনৈতিক সন্ধিকালের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সকল কালেই স্বদেশদ্রোহীর অত্যাচারেই ভারতবর্ষ পরাভূত হইয়াছে! কাপুরুষ না হইলে কেহ স্বদেশদ্রোহে লিপ্ত হয় না। কোচীন-রাজ কাপুরুষের মতই আচরণ করিতে লাগিলেন। গামা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র, কোচীন-রাজ নগর ত্যাগ করিয়া বিপিন নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের দুর্গ মধ্যে পলায়ন করিলেন!

কোচীন বন্দরে আশ্রয়লাভ না করিলে,—কোচীন-রাজের প্রশ্রয় প্রাপ্ত না হইলে,—ফিরিঙ্গি বণিক্ সহসা সমরঘোষণা করিতে সাহসী হইতেন না। সে কথা উভয় পক্ষে কাহারও অজ্ঞাত রহিল না। কালিকট-রাজ বাধ্য হইয়া কোচীন বন্দর ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন; পর্ত্তুগাল-রাজও বাধ্য হইয়া কোচীন বন্দর রক্ষা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। যাহা কালিকট ও পর্ত্তুগালের কলহ, তাহা এইরূপে কালিকট ও কোচীনের কলহে পরিণত হইল;—যাহা হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের কলহ, তাহা কেবল হিন্দু মুসলমানের গৃহকলহে পরিণত হইল;—যাহা শ্বেতকৃষ্ণের চিরশত্রুতা, তাহা এইরূপে গৃহ-শত্রুতায় পর্য্যবসিত হইল! এক ভারতবাসী অন্য ভারতবাসীর কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া উভয়ে গতায়ু হইবামাত্র, ফিরিঙ্গি আসিয়া শূন্য সিংহাসন অধিকার করিল!

১৫০৩ খৃষ্টাব্দে আল্‌বুকার্ক নামক স্বনামখ্যাত পর্ত্তুগীজ সেনাপতি মালাবারে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—কোচীন বন্দর অবরুদ্ধ; কোচীন-রাজ পলায়িত; কোচীনের ফিরিঙ্গি কুঠিয়ালগণ জীবন্মৃত। আল্‌বুকার্ক উপনীত না হইলে, কোচীন বন্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। আল্‌বুকার্ক আসিয়া কোচীন-রাজের লজ্জা রক্ষা করিলেন। আবার কোচীন বন্দর আপদ্‌মুক্ত হইল; আবার কোচীন-রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ কোচীন-রাজ ফিরিঙ্গি বণিককে কোচীনে দুর্গনির্ম্মাণ করিবার অধিকার দান করিলেন। কোচীনের ন্যায় কুইলন বন্দরে ফিরিঙ্গি বণিকের কুঠী সংস্থাপিত হইল, এবং বন্দর-রক্ষার্থ ফিরিঙ্গি বণিকের রণতরণী মালাবারের নানা স্থানে গতায়াত করিতে লাগিল। পরাভূত কালিকট-রাজ বাধা প্রদান করিতে পারিলেন না; বরং বাধ্য হইয়া সন্ধিসংস্থাপনে সম্মত হইলেন।

পাকিও নামক সেনাপতিকে ভারতবর্ষে রাখিয়া, (১৫০৪) আল্‌বুকার্ক পর্ত্তুগাল অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতে, কালিকট-রাজ আবার কোচীন বন্দর আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফিরিঙ্গি বণিকের সেনাবল অধিক ছিল না; পাকিও অনন্যোপায় হইয়া নায়ার-বংশীয় সিপাহীগণকে পল্টন-ভুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সূত্রে ফিরিঙ্গির বাহুবলের সহিত ভারতবাসীর বাহুবল সংযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষের পরাজয়সাধনে অগ্রসর হইল। ভারতবর্ষের যে জাতি স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে ফিরিঙ্গির পল্টন-ভুক্ত হয়, তাহারা নায়ার নামে অদ্যাপি সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

নায়ারদিগের সঙ্গে সেণ্ট টমাস সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান ও কোন কোন মুসলমানও ফিরিঙ্গির পল্টন-ভুক্ত হইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা সমরশিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া, জলে স্থলে কালিকট-রাজকে পরাভূত করিয়া কোচীন বন্দরে ফিরিঙ্গি বণিকের প্রাধান্য সংস্থাপিত করিয়া দিল!

ভাস্কো ডা গামা ভারতবাণিজ্যের অভিনব জলপথের আবিষ্কার সাধন করিতে না করিতে, চকিতের ন্যায় ফিরিঙ্গি বণিকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। যাহারা প্রথমে বণিকের বেশে ক্ষুদ্রপোতে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিল, তাহাদের পক্ষে সমুদ্র ও সমুদ্রপোত ভিন্ন অন্য কোনও আশ্রয়স্থল বর্ত্তমান ছিল না। অল্প দিনের মধ্যে তাহারা কুঠী সংস্থাপিত করিল; অল্প দিনের মধ্যে তাহারা দুর্গনির্ম্মাণ করিল; অল্প দিনের মধ্যে তাহারা সেনাদল সংগ্রহ করিয়া বাহুবলে ভারতবাণিজ্যে আধিপত্যবিস্তার করিয়া মালাবারের রাজন্যবর্গের ভাগ্যবিধাতা হইয়া উঠিল। ইতিহাসে এরূপ আকস্মিক বিজয়-কাহিনী অধিক নাই!

মুসলমানগণ আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভারতবর্ষে আশ্রয়লাভ করিয়া বাণিজ্যব্যাপারে অর্থোপার্জ্জন করিতেন,—কখনও বাহুবলের পরীক্ষা প্রদান করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। সহসা সেই প্রয়োজন উপস্থিত হইবামাত্র মুসলমানগণ পদে পদে পরাভূত হইলেন। লোহিতসাগরমুখে ফিরিঙ্গি বণিকের রণতরী সজ্জীভূত থাকিয়া, আরব বা মিশর হইতে মুসলমানদিগের সহায়তা-সংগ্রহের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। অগত্যা মুসলমানগণ ধনরত্ন সংগৃহীত করিয়া পোতারোহণে পারস্যোপসাগর-পথে পলায়ন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

আয়োজন সমাপ্ত হইলে মুসলমানদিগের অর্ণবপোত কালিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। এই সময়ে সোয়ারেজ নামক ফিরিঙ্গি সেনাপতি ত্রয়োদশ অর্ণবপোত লইয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন। তিনি মুসলমানদিগের পলায়নপথে রণতরণী সংস্থাপিত করিয়া, তাহাদের ধনরত্নপূর্ণ সপ্তদশ অর্ণবপোত অধিকার করিবামাত্র, দ্বিসহস্র মুসলমান নিহত করিয়া মুসলমান-বিজয় সম্পন্ন করিলেন। যাহারা এইরূপে প্রাণবিসর্জ্জন করিল, তাহারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবারও অবসর প্রাপ্ত হইল না।

কালিকট-রাজের আত্মরক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। বাণিজ্যবলই কালিকট-রাজের একমাত্র বল; সে বল প্রবল পীড়নে চূর্ণ হইয়া গেল।

মুসলমান বণিকের পলায়ন কালিকট-রাজের পক্ষে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য স্বীকার না করিবার গত্যন্তর রহিল না।

ফিরিঙ্গি বণিকের বাহুবলের কথাই ইতিহাসে লিখিত হইয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছে। তাহাতে সকল কথার সুসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহাদের বাহুবল অপেক্ষা কুটিল কৌশলই যে বাণিজ্যবিস্তারের প্রধান সহায়, তাহা জানিতে না পারিলে, ফিরিঙ্গি বণিকের বিজয়কাহিনী আরব্যোপন্যাসের অলীক কাহিনীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে।

কি গুণে ফিরিঙ্গি বণিক সাত বৎসরের মধ্যে বহু শতাব্দীর মুসলমান-বাণিজ্যের প্রবল প্রতাপ পরাভূত করিয়া ভারতসাগরে প্রভুত্ববিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র মনে হয়,—হৃদয়বলই ফিরিঙ্গি বণিকের অভ্যুদয়লাভের মূল কারণ। অধ্যবসায় ও অকুতোভয়তা জয়যুক্ত হইল; তাহার সহিত নিষ্ঠুরতা মিলিত না হইলে, ইতিহাস কলঙ্কিত হইত না। স্বার্থপরতা ও গৃহকলহ পরাভূত হইয়া গেল; তাহার সহিত স্বদেশদ্রোহ মিলিত না হইলে, ইতিহাস কলঙ্কিত হইত না।

তথাপি এই স্বদেশদ্রোহের কলঙ্ককাহিনীর সম্যক আলোচনা না করিলে ফিরিঙ্গি বণিকের অসাধারণ অভ্যুদয়লাভের প্রকৃত কার্য্যকারণশৃঙ্খলা প্রকাশিত হইতে পারে না। ইউরোপীয় ইতিহাসলেখকেরাও ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ইতিহাসের মর্য্যাদারক্ষা করিয়া লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ফিরিঙ্গি বণিকের কলঙ্কঘোষণা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু কেহই কোচীন-রাজের স্বদেশদ্রোহের সমালোচনা করিবার চেষ্টা করেন নাই। ইহাতে ইতিহাসে ফিরিঙ্গি বণিকের নামই কলঙ্কযুক্ত হইয়া রহিয়াছে; ভারতবর্ষের স্বদেশদ্রোহীর নাম কলঙ্কযুক্ত হয় নাই।

কোচীন-রাজ দুর্ব্বল বলিয়া ফিরিঙ্গি বণিকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে, তাঁহাকে দুর্ব্বল বলিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক কৃপা করিতে পারিতেন। কিন্তু কোচীন-রাজ স্বার্থলুব্ধ হইয়াই ফিরিঙ্গি বণিককে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কালিকটের সিংহাসনে আরোহণ করিবার আশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এবং সেই জন্যই স্বদেশদ্রোহে

লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাসলেখক এরূপ চরিত্রকে কদাচ ক্ষমা করিতে পারেন না। পাপ চিরদিনই পাপ! স্বদেশদ্রোহ মহাপাপ!

ফিরিঙ্গি বণিক প্রথম সন্দর্শনেই কোচীন-রাজের এই পাপপ্রবৃত্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাকে বিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কোচীন বন্দরে উপনীত হইয়া ফিরিঙ্গি বণিক্ যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহাই ইউরোপের পক্ষে এসিয়া-বিজয়-কামনা পোষণ করিবার প্রধান প্রলোভন। ফিরিঙ্গি বণিক্ এ দেশে আসিয়া স্বদেশদ্রোহীর সহায়তা লাভ করিতে না পারিলে, কেবল বাহুবলে ভারত-বাণিজ্যে শক্তিবিস্তার করিতে পারিতেন না।

মালাবারের স্বাধীন বাণিজ্য ফিরিঙ্গি জলদস্যুর অন্যায় উৎপীড়নে এইরূপে বিপর্য্যস্ত হইবামাত্র, সমগ্র পাশ্চাত্য সমাজে আশঙ্কা উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল। যাঁহারা মুসলমান বণিক্‌বর্গের যোগে পারস্যোপসাগরের ও লোহিত সাগরের পুরাতন বাণিজ্যপথে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া, ইউরোপের নানা দেশে বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তাঁহারা সহসা ভাগ্যবিপর্য্যয়ে অশান্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যেও আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কারের জন্য উত্তেজনা অনুভূত হইতে লাগিল। একালের ন্যায় সেকালে অল্পক্ষণের মধ্যে সকল কথা জগদ্ব্যাপ্ত হইবার উপায় ছিল না; সুতরাং সকল কথা জগদ্ব্যাপ্ত হইতে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। অবশেষে ভূমধ্যসাগরের ইউরোপীয় বণিক্‌বর্গ যখন মুসলমান বণিক্‌বর্গের সর্ব্বনাশের প্রকৃত কারণ অবগত হইলেন, তখন মুসলমান-বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ উপস্থিত হইল। পর্ত্তুগাল হইতে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ভূমধ্যসাগরতীরের পণ্য-বীথিকায় বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা অপেক্ষা মুসলমান বণিকের নিকট পণ্য-সংগ্রহ করা সমধিক লাভজনক। সুতরাং মুসলমানগণকে অধিক প্রয়াস স্বীকার করিতে হইল না। ভূমধ্যসাগরের ইউরোপীয় বণিক্‌বর্গের মধ্যে তৎকালে ভিনিসীয়গণই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মুসলমানের সহিত একবাক্যে ভারত-বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এক দল খৃষ্টান মুসলমান-দলনে অগ্রসর, অন্যদল খৃষ্টান মুসলমান-রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর; এইরূপে ইউরোপের খৃষ্টানগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন।

উভয় দলই তখন পর্য্যন্ত পোপের শাসনক্ষমতা শিরোধার্য্য করিতেন। উভয় দলের কথাই পোপের কর্ণগোচর হইল। পোপ বিচলিত হইয়া

উঠিলেন। পর্ত্তুগালের অধীশ্বর বিচলিত হইলেন না। পোপ সকল সমাচার জানিতেন না বলিয়া বিচলিত হইলেন। পর্ত্তুগালের অধীশ্বর সকল সমাচার জানিতেন বলিয়াই কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

তখনও ইউরোপ হইতে মুসলমানাতঙ্ক সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয় নাই। আরব দেশের মরুমরীচিকায় জন্মগ্রহণ করিয়া যে মহাশক্তি বিশ্ববিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল, রোমক সাম্রাজ্যের অনেক প্রধান স্থান তাহার করতলগত হইয়া পড়িয়াছিল। খৃষ্টানগণ অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও প্যালেষ্টাইন ও ইউরোপীয় তুর্কিস্থান হইতে মুসলমানকে বিতাড়িত করিতে পারেন নাই। তখনও মিশর ও আফ্রিকার অন্যান্য সম্পন্ন জনপদ মুসললমানের অধিকারভুক্ত। তখন স্পেন পর্ত্তুগাল মুসলমানের কবল-মুক্ত হইলেও, আতঙ্কশূন্য হয় নাই। এরূপ সময়ে মিশরের মুসলমান সুলতান পোপকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন,—"পর্ত্তুগালকে শাসন না করিলে, সুলতান খৃষ্ট-জন্মস্থানের পবিত্র মন্দির ধূলিসাৎ করিবেন; খৃষ্টানগণকে নিহত করিয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে বাধ্য হইবেন।" ভিনিসীয় খৃষ্টানগণও পোপকে ভয় প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিলেন না। পোপ বিচলিত হইবামাত্র পর্ত্তুগালের অধীশ্বর, তাঁহাকে বিনীতভাবে বুঝাইয়া দিলেন,—ভারত-বাণিজ্য ব্যপদেশ মাত্র; সত্য-ধর্ম্ম প্রচারিত করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য;—তাহা সুসিদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। পোপ আশ্বস্ত হইলেন। পর্ত্তুগালের বাহুবল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। ইউরোপ ছাড়িয়া মুসলমান—খৃষ্টানের সমরকোলাহল এসিয়া সমুদ্রোপকূল মুখরিত করিয়া তুলিল।

মুসলমানের পক্ষে আত্মরক্ষার পথ পূর্ব্বেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। মুসলমানগণ মিশর ও মালাবার এই উভয় স্থান হইতে আক্রমণ করিয়া, ফিরিঙ্গি বণিককে সহজে পরাভূত করিতে পারিতেন। কিন্তু এই উভয় স্থান হইতেই মুসলমান-শক্তি পরাভূত হইবার পর মুসলমানের আত্মরক্ষার আয়োজন আরব্ধ হইল। সে আয়োজন যে সর্ব্বথা ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, পর্ত্তুগাল-রাজ তাহা জানিতেন বলিয়াই কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং ভারতবর্ষে ফিরিঙ্গি বণিকের বাহুবল প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হইলেন। এসিয়া নীরব থাকিতে জানিল না; যখন জাগিয়া উঠিল, তখন চাহিয়া দেখিল,—এসিয়ার সমুদ্রপথে ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্য-তরণী রণ-তরণীতে পরিণত হইয়াছে;—তাহার প্রবল পীড়নে এসিয়ার জল স্থল কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বাহুবল।

If the Portuguese feats of arms in India had been brilliant, the policy which directed and supported them at Lisbon was far-reaching and profound.—*Sir W. Hunter.*

সুলতানের নৌসেনাদল ফিরিঙ্গি বণিকের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য আয়োজন করিতেছে,—এই সংবাদে ভারতপ্রবাসী ফিরিঙ্গি বণিক্ নিতান্ত আতঙ্কযুক্ত হইয়া, পর্ত্তুগালে পত্র লিখিতে লাগিলেন। কোচীনের কুঠীয়াল লিখিয়া পাঠাইলেন,—"অবিলম্বে পর্ত্তুগাল [illegible] সেনা সমাগত না হইলে, সর্ব্বনাশ হইবে।"

পর্ত্তুগালের অধীশ্বর সৌভাগ্যশালী ইমানুয়েল [illegible]তিভাবলে ইতিহাসে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন,—অতঃপর দীর্ঘকাল [illegible] বাণিজ্যরক্ষা করিতে হইবে; তাহার জন্য ভারতবর্ষে এক জন সুযোগ্য রাজপ্রতিনিধি প্রেরণ করাই যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার আদেশে ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আল্মিডা নামক সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ পর্ত্তুগালের রাজপ্রতিনিধি হইয়া [illegible] করিলেন। তাঁহার সহিত উপযুক্ত সেনাদল প্রেরিত হইল।

প্রাচ্য-গগন ক্রমশঃ মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। জলে স্থলে বাহুবলের প্রবল প্রতাপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বাণিজ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইয়া গেল। জলদস্যুর অত্যাচারে উৎপীড়নে ভারতবাসিগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

সকলেই বুঝিতে পারিল,—বাহুবলই প্রবল বল। সুলতান বাহুবলে বাণিজ্যরক্ষা করিবার আশায়, আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে সমরসজ্জা করিলেন; পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধিও তদ্দেশে আত্মশক্তি প্রবল করিবার আশায় কুইলোয়া নামক স্থানে দুর্গনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহা মুসলমান ও খৃষ্টানের ধর্ম্ম-কলহরূপে এত কাল ভূমধ্যসাগরে বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিতে ব্যস্ত ছিল, যাহা কালক্রমে মালাবার-উপকূলে আসিয়া বাণিজ্য-কলহে পরিণত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে আফ্রিকার উপকূলে আসিয়া সাম্রাজ্য-কলহের আকার ধারণ করিল।

আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে উপনীত হইয়া, ফিরিঙ্গি বণিক্ তদ্দেশের আড়-কাটিগণের সহায়তায়, ভারতবর্ষাভিমুখে পোতচালনা করিতেন। আড়কাটিগণ

সুলতানের প্রভা। সুলতানের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষে মুসলমান আড়কাটির সহায়তা লাভ করা সহজ হইবে না। আল্‌মিডা এই কথা চিন্তা করিবামাত্র, একটি স্বতন্ত্র আড়কাটিদল গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতসমুদ্রে কাহার আধিপত্য প্রবল হইবে, তাহার উপরেই ফিরিঙ্গি বণিকের জয় পরাজয় নির্ভর করিতেছিল। আল্‌মিডা যে ভাবে আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে শক্তিবিস্তার করিলেন, তাহাতে সুলতানের নৌ-সেনাদলের পক্ষে ভারতসাগরে আধিপত্য রক্ষা করিবার সম্ভাবনা রহিল না। তথাপি তাঁহারা চেষ্টার ত্রুটি করিল না।

আল্‌মিডার অধীনে দ্বাবিংশ অর্ণবপোত বাহুবলে ফিরিঙ্গির বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য ভারতসাগরে সম্মিলিত হইয়াছিল। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল না; সাহসী সেনানায়কগণের অভাব ছিল না। সুতরাং জলে স্থলে বাহুবলের পরীক্ষা চলিতে লাগিল। সে পরীক্ষায় সুলতানের সেনাদল জয়লাভ করিতে পারিল না, আফ্রিকার উপকূলে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। চারি বৎসর ধরিয়া ফিরিঙ্গি বণিক আধিপত্যবিস্তারের চেষ্টা করিতে গিয়া, কালিকট-রাজকে বহুবার পরাভূত করিয়া, সিংহল-রাজের মিত্রতা লাভ করিলেন। ইহাতে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

কালিকট-রাজ আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিলেন না। তাঁহার ৮৪ খানি রণপোত ও ১২০ খানি ছিপ, ফিরিঙ্গি বণিকের সহিত জলযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। যখন কালিকট-রাজ পরাভূত হইলেন, তখন তাঁহার নৌসেনাদলের তিন সহস্র মুসলমান নিহত হইয়া গেল,—প্রাণ থাকিতে কেহ পরাভব স্বীকার করিল না।

সুলতান এই সকল পরাজয়বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া, ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে আমীর হোসেন নামক সুদক্ষ নৌসেনাপতিকে সেনাপতি-পদে বরণ করিলেন। আমীর হোসেন ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, কালিকটের সেনাদলের সহিত মিলিত হইবেন, এবং হিন্দু মুসলমানের সমবেত বাহুবলে [illegible] ফিরিঙ্গি বণিককে সমুচিত শিক্ষাদান করিবেন, এই আশায় সুলতান যথাযোগ্য রণসজ্জার ত্রুটি করিলেন না।

আমীর হোসেন পর্ত্তুগালের ইতিহাসে মীর হোসেন নামে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বোম্বাই প্রদেশে উপনীত হইয়া, ভারতীয় নৌ-

সেনাদলের সহিত মিলিত হইলেন। সমবেত নৌবাহিনী দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, কালিকটের ছত্রভঙ্গ সেনাদলের সহিত মিলিত হইতে পারিলে, ফিরিঙ্গি বণিকের সর্ব্বনাশ হইত। আমীর হোসেন কালিকটের নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই, ফিরিঙ্গির নৌবাহিনী কর্ত্তৃক মধ্যপথে আক্রান্ত হইলেন। আলমিডার দ্বাবিংশ বর্ষ বয়স্ক যুবা পুত্র লোরেঞ্জো এই জলযুদ্ধে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য-রক্ষার্থ প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। যুদ্ধের প্রথম উপক্রমেই গোলার আঘাতে তাঁহার পদদ্বয় ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি আহতকলেবরে মাস্তুলের নিকটে বসিয়া সেনাচালনা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। হিন্দু মুসলমানের নৌবাহিনী এই অসাধারণ আত্মত্যাগ দর্শন করিয়া, জয়-ধ্বনি করিয়া উঠিল; সমুচিত সমাদরে বীরপুরুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া, বীরপুত্রের অলৌকিক বীরত্বের জন্য আলমিডাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও, হিন্দু মুসলমান স্থায়ী ফললাভ করিতে পারিল না; পর বৎসরে তাহারা আবার পরাভূত হইয়া গেল। এই যুদ্ধ ডিউ নগরের সম্মুখে সংঘটিত হইয়াছিল। ইহা ভারতযুদ্ধের মধ্যে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই যুদ্ধে সমগ্র এসিয়াখণ্ডের ভাগ্যবিপর্য্যয় সম্পন্ন হইয়া গেল; এই যুদ্ধে সমস্ত ইউরোপের অভ্যুদয়লাভের পথ প্রশস্ত হইয়া পড়িল, এই যুদ্ধে এসিয়া আঁধারে, ইউরোপ সৌভাগ্যের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে এই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। পর্ত্তুগাল-রাজ ভারতসাগরে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য চিরসংস্থাপিত করিবার আশায় নৌসেনাবল বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ অর্ণবপোত সকল ভারতসাগরেই প্রেরিত হইয়াছিল, সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ পোতাধ্যক্ষগণ তাহার পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী নৌসেনাদল তাহাতে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিল। পুত্রশোকার্ত্ত আলমিডা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত অবসরকালের প্রতীক্ষায় দিনগণনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সিংহল হইতে কালিকট পর্য্যন্ত সকল স্থলে তাঁহার আধিপত্য প্রবল হইয়াছিল। ভারতীয় নৌবাহিনী উত্তরাংশে বোম্বাই বন্দরের নিকটবর্ত্তী সাগর-সলিলে বিচরণ করিয়া, কালিকটের উদ্ধার-সাধনের অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ফিরিঙ্গি বণিকের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেল। আলমিডা

স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এই যুদ্ধে তিন সহস্র মুসলমান প্রাণবিসর্জ্জন করে; এই যুদ্ধে মুসলমান-বাণিজ্য চিরদিনের মত পরাভূত হইয়া যায়; এই যুদ্ধেই ভারতসাগরে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য চিরপ্রতিষ্ঠিত ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল জলযুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহার অনেক যুদ্ধের তুলনায় এই যুদ্ধ সামান্য যুদ্ধ বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু পরিণামফলের কথা আলোচিত হইলে, ইহাকেই পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় জলযুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; ইহাতে প্রাচ্যের প্রতিষ্ঠা প্রতীচ্য সমাজকে আশ্রয় করিয়া দুর্ব্বলকে সবল ও সবলকে দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে; যাহারা সমগ্র সভ্যসমাজে পণ্য বিক্রয় করিয়া ধনগৌরবে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে দীনহীন কাঙ্গাল সাজাইয়া ভিক্ষাপাত্র-করে ইউরোপের দ্বারস্থ করিয়া রাখিয়াছে!

এই সময়ে সমগ্র ইউরোপে পর্ত্তুগালের অসাধারণ সৌভাগ্যবৃদ্ধির জন্য ঈর্ষ্যাদ্বেষ জন্মগ্রহণ করে নাই; বরং পর্ত্তুগালের বিজয়বার্ত্তা সমগ্র খৃষ্টান-সমাজের বিজয়বার্ত্তা বলিয়াই সর্ব্বত্র গৃহীত ও সমাদৃত হইয়াছিল। এসিয়ার অবস্থা সেরূপ ছিল না। এসিয়াবাসিগণ ইহাকে কালিকটের হিন্দু মুসলমানের পরাজয় ভিন্ন সমগ্র এসিয়ার পরাজয় বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। মুসলমান সমাজের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুদ্ধে উদীয়মান মুসলমান-প্রতাপ যে এসিয়া হইতে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইল, মুসলমানগণ তাহা ভাল করিয়া অনুধাবন করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তৎকালে মিশর ও ইউরোপীয় তুর্কিস্থানে দুই জন স্বতন্ত্র মুসলমান সুলতান বর্ত্তমান ছিলেন। ধর্ম্মে এক হইয়াও এই দুই সুলতান দুই সহচরের ন্যায় উভয়ের সাধারণ শত্রুর পরাজয়সাধনের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না; এক সুলতান অপর সুলতানের রাজ্য জয় করিবার জন্য অশান্ত হইয়া উঠিলেন। এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতার রাজ্যাপহরণের জন্য বাহু প্রসারিত করায়, মুসলমানের পক্ষে এই পরাজয় চিরপরাজয়ে পরিণত হইয়া, ফিরিঙ্গি বণিকের সমরবিজয়কে চিরবিজয়ে পরিণত করিয়া দিল। তুরস্কের সুলতান মিশরের সুলতানকে বাতিব্যস্ত করিয়া, কালক্রমে মিশর-বিজয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। স্বজাতি-

কলহে আত্মরক্ষার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া, মিশরের সুলতান আর ভারতবাণিজ্যে মুসলমানের আধিপত্য-রক্ষার আয়োজন করিতে পারিলেন না!

যে পর্ত্তুগীজবীর এইরূপে প্রাচ্যসাগরে প্রতীচ্য-শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিলে, প্রাচ্য সাগরে পর্ত্তুগালের আধিপত্য চির-প্রতিষ্ঠিত হইত। আল্‌মিডা ভারতসাগরে স্বদেশের একাধিপত্য সংস্থাপিত করিবার আশায়, দ্বীপে দ্বীপে দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া, নৌবাহিনীর উন্নতিসাধনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন; স্থলভাগে দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া পণ্যরক্ষা বা রাজ্য-সংস্থাপনের জন্য লালায়িত হন নাই। পর্ত্তুগালরাজ স্থলদুর্গের উন্নতিসাধন করিয়া, রাজ্যসংস্থাপনের জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইমান্যুয়েল প্রভু, আল্‌মিডা রাজপুরুষমাত্র। তাঁহাকে রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিতে হইল। কিন্তু ইতিহাস এখন মুক্তকণ্ঠে রাজা অপেক্ষা রাজপুরুষেরই প্রশংসাবাদ করিয়া আসিতেছে! ইমান্যুয়েল দূরে বসিয়া ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াই, তাঁহার রাজপ্রতিনিধির সমীচীন সৎপরামর্শে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন।

আলমিডা সহজে সম্মত হইলেন না। তিনি পুনঃপুনঃ প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন,—"স্থলদুর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া রাজ্যসংস্থাপনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রত্যেক দুর্গের সেনা সংখ্যা অল্প হইয়া পড়িবে; তাহারা সহজে পরাভূত হইয়া, ফিরিঙ্গি বণিকের সর্ব্বনাশসাধন করিবে, তাহার পরিবর্ত্তে জলদুর্গের উপর নির্ভর করিলে, ভারতসাগরে ফিরিঙ্গি বণিকের প্রবল প্রতাপ চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভারতবাণিজ্যে তাঁহাদের একাধিপত্য সংস্থাপিত করিয়া দিবে।" ভৃত্য প্রভুকে যত দূর সতর্ক করিতে পারে, আলমিডা তাহার ত্রুটি করিলেন না। তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন,—"ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান বণিক্‌কে চিরনির্ব্বাসিত করিবার প্রকৃত পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে; সেই পথে অগ্রসর হইলে, ঈশ্বরেচ্ছায় অচিরেই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিবে।" ইমান্যুয়েল এই সকল প্রতিবাদে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া মনে করিলেন,—আল্‌মিডা যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন; তিনি হয় ত রাজাদেশ গ্রাহ্য করিবেন না। সুতরাং ইমান্যুয়েল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, তাঁহার স্থল অধিকার করিবার জন্য আল্‌বুকার্ককে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলবুকার্কের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। তিনি

ভারতবর্ষে আসিয়া অতি অল্প সময়ে যেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজসদনে তাঁহার আধিপত্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আলবুকার্ক সম্মুখের লাভের লোভে অন্ধ হইয়া, আলমিডার ন্যায় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রাজ্যবিস্তার না করিলে ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যবিস্তারের অন্য পথ নাই। তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, রাজাকেও তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

আলবুকার্ক নৌবাহিনী সমভিব্যাহারে আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে উপনীত হইয়া, সোকোট্রা নামক বিখ্যাত বন্দর আক্রমণ করিলেন। এই বন্দর লোহিত-সাগরের প্রবেশদ্বার রক্ষা করিয়া, মিশরের সহিত ভারতবর্ষের জলবাণিজ্যের প্রধান সহায় বলিয়া সুপরিচিত ছিল। এখানে বাণিজ্যোপলক্ষে বহু দেশের লোকের বসতি ছিল। এই বন্দর অধিকার করিবামাত্র আলবুকার্ক মুসলমান-গণকে নির্ব্বাসিত করিয়া, তাঁহাদের ভজনালয়ে খৃষ্টানদিগের অধিকার সংস্থাপিত করিয়া দিলেন। সোকোট্রা অধিকার করিবার পর, আলবুকার্ক আরব দেশের উপকূলভাগ আক্রমণ করিলেন; মস্কট নগরের উপর গোলা [illegible] করিয়া, পারস্যোপসাগরেও ফিরিঙ্গি বণিকের প্রাধান্যসংস্থাপক সন্ধি সংস্থাপিত করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের শেষে ক্যানানোরে উপনীত হইয়া আলমিডাকে নিয়োগপত্র দেখাইলেন। আলমিডা তখন পুত্রশোকের প্রতিশোধকামনায় যুদ্ধের আয়োজন করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং ডিউ নগরের নিকটবর্ত্তী মহাযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আলমিডা পদত্যাগ করিলেন না; অগত্যা আলবুকার্ক যুদ্ধাবসানের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

জলযুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া আলমিডা যখন সগৌরবে মালাবারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি পদত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। আলবুকার্ক তাহার জন্য পুনঃপুনঃ তর্জ্জন গর্জ্জন করায়, আলমিডা তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন; এবং সেই ভাবেই তাঁহাকে পর্ত্তুগালে প্রেরণ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের "আশা" নামক কবিতায় কবিত্বের সৌরভ নাই; কিন্তু কবির স্বদেশভক্তির উচ্ছ্বাস যে পবিত্র সংকল্পে পরিণত হইয়াছে, আমরা তাহার প্রশংসা করি। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চীন দেশে" নামক গল্পটির আখ্যানবস্তু বড় উদ্ভট। ইহাতে কল্পনার সহিত সম্ভাবনার এত বিরোধ যে, গল্প-গত চরিত্রের সহিত সমবেদনা-রক্ষা একরূপ অসাধ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চারু বাবুর লিপিকৌশল প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মহানাটক" পূর্ব্ববৎ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ "কাশ্মীরের তান্ত্রিক বৌদ্ধ" স্রগ্ধরাস্তোত্রের রচয়িতা সর্ব্বজ্ঞমিত্রের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখক বলেন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীরে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রবল ছিল, এবং "এই তান্ত্রিক ধর্ম্মের আবির্ভাবেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলোপ ঘটে ও বৌদ্ধগণ হিন্দু সম্প্রদায়ে মিশিয়া যান।" বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিলে ভাল হয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল আচার্য্যের "ভারতবর্ষে ভাস্কো-ডা-গামা" প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। লেখক এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষে প্রতীচ্য বাণিজ্যের আদিম ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার "ইংরাজস্বার্থ এবং দেশের হিত" প্রবন্ধে প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। লেখক উপসংহারে বলিয়াছেন, "এ দেশের প্রত্নতত্ত্বে এবং জাতিতত্ত্বে যাঁহাদের জ্ঞান এত প্রখর, আমরা না থাকিলে যাঁহারা কোন তত্ত্ব উদ্ধার করিতে পারেন না, তাঁহাদেরই গবেষণায় যদি বঙ্গদেশের ভাষাবিচ্ছেদ এবং অঙ্গচ্ছেদ ঘটে, তবে উপায় কি? একমাত্র উপায়,—স্বাবলম্বন। বঙ্গদেশের ভাষাবিচ্ছেদ ও অঙ্গচ্ছেদ বিদেশী রাজার সাধ্য নয়। মানচিত্রের রেখায় অঙ্গচ্ছেদ সম্ভব, কিন্তু অন্তরের বিচ্ছেদ মানচিত্রের আয়ত্ত নয়। ইংরাজের দপ্তরে ভাষাবিচ্ছেদ স্বীকৃতিলাভ করিতে পারে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যে তাহাকে স্থান দিব না। আমরা যদি মানুষ হই, তাহা হইলে এই আঘাতের প্রতিঘাতেই আমাদের মিলনবন্ধন আরও দৃঢ় করিব।" "কোরিয়া-রহস্য" একটি ক্ষুদ্র সঙ্কলিত প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "তুকারামের আত্মকাহিনী" নাম দিয়া তুকারামের একটি অভঙ্গের অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর "ঘরের কথা" চলিত কথায় চিত্রিত নির্ভুল নক্সা। লেখকের পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও মানব-সহানুভূতি অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় রহস্যের অন্তঃস্তলে প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত হেমন্তনাথ মহলানবিশ "এক না অনেক" প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—"কোন প্রাণীকে আর একটি প্রাণী বলা চলে না। যাহাকে একটি প্রাণী বলিয়া নির্দ্দেশ করি, সেই জীবটি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর সমষ্টি। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর একত্র সমবায়ে একটি উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এক একটি প্রাণীকে প্রাণিপুঞ্জ বলা যাইতে পারে।" লেখক বোধ করি নূতন ব্রতী। কিন্তু তাঁহার ভাষা আশাপ্রদ

থাকিয়া মনে হয়। তাঁহার বুঝাইবার প্রণালীও সুন্দর। "আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে" এবার 'খারিয়ার মসজিদ ও কজেবরের শিবমন্দিরের' বিবরণ আছে। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরীর "তুষিতের আবাহন" নামক কবিতাটি বোধ হয় রূপক। রচনাটি রূপকের হিসাবে অস্পষ্ট, এবং কবিতার হিসাবে হয়, রহস্তময়, নয় অত্যন্ত চঞ্চলনই। কবির বক্তব্য কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। "সাময়িক কথায়" পুণা হিন্দু বিধবা-আশ্রমের বিবরণ আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "গ্রন্থ-সমালোচনায়" শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী প্রণীত 'দ্রৌপদী' নামক কাব্যের সমালোচনায় লেখিকার সংস্কৃত বহুল রচনার নিন্দা করিতেছেন। আমরা 'দ্রৌপদী' দেখি নাই, এবং সমালোচনার সমালোচনাও আমাদের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু এই উপলক্ষে দীনেশ বাবুকে একটি প্রাচীন প্রবাদ উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না,—"চিকিৎসক! আপনার রোগ আরোগ্য করুন।" দীনেশ বাবু প্রথমেই লিখিতেছেন,—"পেলব কোমল পদাবলী"। এক সঙ্গে পেলব কোমল ডবলব্যারেল বন্দুকের অপেক্ষাও ভয়ানক। অভিধান দেখিয়া যে গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়, দীনেশবাবু তাহার উপর বড় বিরূপ। কিন্তু অভিধান দেখিয়া না পড়িলে অনেক শব্দের অর্থ অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। দীনেশ বাবুর প্রিয় 'পেলব' শব্দই তাহার প্রমাণ। সমালোচক বলিতেছেন, "সমাস-কণ্টকিত কাব্যরাজ্য হইতে ফুল-পেলবের বনে যাইবার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা না হইয়া যাইবে না।" ফুলপেলবের বন ব্যাপারটা কি? উপসংহারে দীনেশ বাবু বলিতেছেন, "গ্রন্থকর্ত্রী যদি কাব্যশালা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রন্ধন-শালার ভার গ্রহণ করেন, তবে অনেক উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। সে স্বাভাবিক পন্থা ছাড়িয়া তিনি ভিন্ন উপায়ে লোকরঞ্জনের প্রয়াসী হইয়া মোটেই ভাল করেন নাই।" বলা বাহুল্য, অনেক পুরুষ লেখকের পক্ষেও এই উপদেশ সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে। তবে তাঁহাদের 'স্বাভাবিক পন্থা' কি, তাহার নির্দ্দেশ বড় সহজ ব্যাপার নয়। আর, কেবল 'লোকরঞ্জনই' কি রচনার উদ্দেশ্য?

বঙ্গদর্শন। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "দেশীয় রাজ্য" নামক প্রবন্ধে 'ভারতীয় উৎকর্ষের আদর্শ' উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রচারিত অনেক পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবুর ভাষার ব্যায়াম উপভোগের যোগ্য। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের "প্রতাপচন্দ্র মজুমদার" উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। লেখক নিপুণতার সহিত দার্শনিক ভাবে স্বর্গীয় মজুমদার মহাশয়ের চরিত্রবিশ্লেষণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "প্রাচ্য প্রতীচ্যের একটি বৈপরীত্যের" মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মোহিনী বাবুর বক্তব্য আমাদের অনধিগম্য; প্রবন্ধের ভাষাও আমাদের বোধশক্তির সম্পূর্ণ অতীত। "ইউরোপের ব্যবহার কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরমার্থ-অনাশ্রিত" প্রভৃতি বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত বটে, কিন্তু আমাদের পক্ষে গ্রীক। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "পহেলী ও মতিরাম" পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

বিচিত্র নিয়তি।
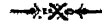
কেরাণী প্রকাশচন্দ্র কলিকাতা ছাড়ি'
দু' মাসের ছুটি নিয়ে আসিলা কটকে
বায়ু-বদলের লাগি'। সঙ্গে পরিবার,
পত্নী অমাময়ী আর তিন বছরের
শ্রীমান হরিশচন্দ্র। 'কাঠজুড়ী' তীরে
বাসা হ'য়ে ছিল ঠিক, কলরবহীন
নগরের উপকণ্ঠে। মুক্ত বন্দী-পাখী
ল'য়ে ক্ষুদ্র পরিবার লোকালয় ছাড়ি'
একান্তে বাঁধিল যেন সুখময় নীড়!

দুই মাস গেছে চলি'। পীড়িত প্রকাশ
হয়েছেন রোগমুক্ত। একদা প্রদোষে
স্বামী-স্ত্রীতে বসি ছাদে দেখিতেছিলেন
তটিনীর জললীলা; শীর্ণা কাঠজুড়ী
উঠেছে লাবণ্যে ভরি'। দৃষ্টি দোঁহাকার
মগ্ন ছিল নীল নীরে; যেন স্বপ্নে জাগি'.
মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে হ'তেছিল কথা।
কহিল প্রকাশ, 'সাধ যায়, সব গোল
চুকাইয়া বাঁধি এসে এই দেশে বাসা।'
উত্তর করিল অমা বিস্ময়ে, 'এখানে?
এই বর্ব্বরের দেশে?' কহিলা প্রকাশ,
'মিছে এ উড়িয়া-দ্বেষ! কভু ইতিহাস
ছুঁইলে না, কি বুঝিবে? দোষ নাই তব;
স্ত্রীপাঠ্য হয়েছে এবে উপন্যাস-পাশ!'
বিষাদগম্ভীর মুখে উত্তরিল অমা,
'জানি গো তা জানি, আমি যোগ্য নই তব,
যদি আহা, পেতে তারে, হ'তে কত সুখী!
সমানে সমানে তবে হ'ত না মিলন?

আমিই কণ্টক তব ; ইচ্ছা হয় মরি
তোমারে জন্মের মত করি' নিষ্কণ্টক !'
পরিহাস-হাসি হাসি' কহিলা প্রকাশ,
'লক্ষাহারা কেরাণীরে লক্ষ্মীছাড়া শেষে
করিতে কি চাও প্রিয়ে ?—না না, সত্য বলি,
যদি ভাগ্যে থাকে তা'ই, জানিও নিশ্চিত,
আর কারে করিব না শয্যাসহচরী।'
উত্তর করিল প্রিয়া সতেজে এবার,
'পুরুষের হেন দর্প শুনা যায় বটে
পত্নী যত দিন থাকে ! আছে বহু মূঢ়া
এ প্রবোধে অনায়াসে ভুলে যায় যারা।
বল দেখি সত্য ক'রে, আমি ম'লে, তারে
পাও যদি, কর না কি জীবনসঙ্গিনী ?
লজ্জাই বা কেন এতে ? সে যে গো ব্রাহ্মিকা ;
তারা শতগুণে শ্রেষ্ঠ হিন্দু মেয়ে হতে !'
কহিলা প্রকাশচন্দ্র, 'সেটা মিথ্যা নয় ;
কিন্তু ইহা নহে তব অন্তরের কথা !
এইমত হিন্দুধবে করে দিবারাতে
লজ্জাহীন অক্ষমতা বিদ্রূপ-বড়াই !'
এই শেষকথাগুলি বাজিল অমারে ;
বস্ত্রাঞ্চলে মুছি' আঁখি রহিল নির্ব্বাক্।
ব্যথিত প্রকাশ উঠি' অভিমানিনীরে
আদরে বুকের কাছে লইল টানিয়া ;
সোহাগে সোহাগে দিল রাগ ভুলাইয়া !
ক্ষণেক নীরব দোঁহে ; দেখিতে লাগিলা
আবার লহরীলীলা ! শুনিতে লাগিলা
কলকল্লোলিত তান। অদূরে মধুরে
সুরে সুর মিলাইয়া গাহিয়া উঠিল
উৎকলবালিকা কোন বৃন্দাবনগাথা।
স্থান-কাল নাহি গণি' দুই বৃদ্ধবাবু

করিতেছিলেন মাঝে রসভঙ্গ শুধু!
মায়ের এলান চুলে পিতার চাদরে
গ্রন্থি বাঁধি' চুপে চুপে, সহসা সজোরে
টানিয়া, অমনি হাসি' যেতেছিলা দূরে।
মনে এই ঝাঁক, মুখে ততোধিক হাঁক,—
হেন বাহাদুরী যেন দেখে নাই কেহ
আর্থারবন্দরে কিংবা লাহোর প্রান্তরে।

ক্রমে ঘনাইয়া এল সন্ধ্যার আঁধার,
চাকর ডাকের চিঠি কেরোসিন আলো
দোঁহার সম্মুখে রাখি' চলে গেল কাজে।
নারীজনোচিত ক্ষুদ্র খর কৌতূহলে
অমাময়ী একে একে চিঠিগুলি খুলি'
কোনটি অৰ্দ্ধেক পড়ি', কোন[illegible] না পড়ি'
দিতেছিলা রাখি' কাছে। শেষ-চিঠিখানি
ধৈর্য্য ধরি' বার বার করিলেন পাঠ;
বাড়ায়ে আলোক-শিখা, তার নীচে ধরি'
সাবধানে পড়িলেন, তবু যেন তার
নাহি হ'ল অর্থবোধ। দেখিলেন শেষে
ভাল ক'রে শিরোনামা, বাড়ীর ঠিকানা।
অকস্মাৎ শীতাধরে কম্পমানকরে
ছুঁড়িয়া ফেলিলা চিঠি স্বামীর সম্মুখে।
'বুঝিলাম, কেন মোরে এত অবহেলা!
বুদ্ধিহীনা আমি; ভাবি নাই অত শত!
তলে তলে চলে হেন পত্র-বিনিময়?
তোমায় সে কালামুখী ভালবাসে আজো?'
বিস্মিত প্রকাশচন্দ্র চিঠি কুড়াইয়া
পাঠ করি', উঠিলেন উচ্চহাস্য করি'!
কহিলেন, 'এই কথা? এরি লাগি এত?
সন্দেহেই এত দূর? সত্য হ'লে, বুঝি
ঘটিত প্রলয়কাণ্ড!—শান্ত কর মন;

এ চিঠি নলীর; কিন্তু এ নলী—সে নয়।
এ আমার বাল্যবন্ধু! জান তুমি তারে;
সে-ই এ নষ্টের গোড়া! দুই ছত্র লিখে
দুইটি প্রাণের মাঝে চিরদিন তরে
দিতেছিল দাগ! সহজে হবে না ছাড়া,
শাস্তি পেতে হবে এর! সশরীরে তারে
হাজির করায়ে হেথা তবেই ছাড়িব!
এবার তোমার সাথে করা'ব আলাপ।
বন্ধুপ্রীতি যতক্ষণ অন্তঃপুর হ'তে
নাহি পায় সমাদর, অসম্পূর্ণ তাহা।
তুমিও হইবে সুখী তার পরিচয়ে;
যেমনটি চাও তুমি, সেও সেইমত;
সুরসিক সহৃদয়; তাহাতে আবার
কাব্যপ্রিয় সুগায়ক। মিলে যাবে বেশ।
তখন এ অভাগারে র'বে কি স্মরণ?'
বুঝিয়া আপন ভ্রান্তি অনুতপ্ত অমা
মরমে মরিতেছিল। ছিল অন্যমনে
রহিল নীরব। গোপন অন্তর হ'তে
প্রার্থনা উঠিতেছিল, 'ওহে অন্তর্যামী,
স্বামীরে দিয়েছি ক্লেশ আজি অকারণে
মিথ্যা অভিমানবশে; দণ্ড দিও তারে।'
চক্রবাবু সেইক্ষণে ফুৎকারে ফুৎকারে
দীপের সে দীপ-জ্বলা দিলা ঘুচাইয়া!

প্রকাশ পরের দিন চিঠি দিয়ে ডাকে
কহিল অমারে এসে, 'কর আয়োজন
প্রিয় অতিথির লাগি'। লিখেছি নলীরে
এখানে আসিতে ত্বরা। এই চিঠি পেলে
যেমন থাকুক নলী, আসিবে নিশ্চয়।'
কহিল ব্যথিতা ধীরে, 'সত্য সত্য তবে
কর নাই ক্ষমা মোরে?' কেন এত। দাও

এ লজ্জাহীনারে আর!' প্রবোধি' পত্নীরে
কহিলা প্রকাশচন্দ্র, 'বহুদিন হ'তে
লিখিতেছে ননী মোরে, আসিবে হেথায়;
চিরকাল জানি তারে, অলসের শেষ;
গৃহকোণ হ'তে তারে নড়ান দুষ্কর;
তাই তারে জোর ক'রে করিব বাহির।
জান না কি, ননী মোর বড় আপনার!'
কহিল উৎফুল্ল অমা, 'তবে লিখে দাও,
কাজ নাই এসে তার। ছোট বাসাবাড়ী,
তায় আমি একা প্রাণী। ভাল ক'রে তাঁর
হ'বে না আদর যত্ন! আজি—এই দণ্ডে
মাথা খাও, লিখে দাও,—চুকে গেছে কাজ!'
কহিলা প্রকাশচন্দ্র, 'সাধে কি গো বলি,
স্ত্রীলোকের ঝুটা মন! ভদ্রতার ঘটা,
সে কি আত্মীয়ের তরে? হোক্ তা নির্দোষ,
ক্রটীভরা আত্মীয়তা কত উচ্চে তার!
ননী কি মোদের পর? তাই তারে এবে
ব্যথিয়া তুলিতে হ'বে আতিথ্যের ভারে?'
পতির দৃঢ়তা দেখি' ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণমনে
নীরবে নিশ্বাসি' অমা চলে গেল কাজে।
কি যেন অজ্ঞাত শঙ্কা সেইক্ষণ হ'তে
চাপিয়া বসিল বুকে; মনে হ'তেছিল,
তাহাদের শান্তিস্তব্ধ এই সুখনীড়
কে যেন শ্যেনের মত আসিছে ভাঙ্গিতে!
যথাকালে ননী পেয়ে প্রকাশের লিপি
উঠিল ব্যাকুল হ'য়ে। 'বাড়িয়াছে পীড়া?'
বার বার এই কথা আপনার মনে
করিল আবৃত্তি। আঁকা-বাঁকা লেখাগুলি
পড়িল সে বহুবার চিন্তাভিভূতমনে।
সেদিন গুছায়ে সব, মক্কেলের কাজ

অন্ত উকীলের কাছে গছায়ে, হইল
প্রস্তুত যাত্রার তরে। মুহুরী তখন
ধরিল, 'মাম্‌লা এক, লক্ষ টাকা দাবী,
এইমাত্র আসিয়াছে, ছেড়ে দিতে হয়!'
লক্ষ হোক্, কোটি হোক্, কে ভাবিছে তাহা?
আমি ভাবি' কতক্ষণে পৌঁছিব কটকে!

যথাকালে বাষ্পরথ বহিয়া ননীরে
আসিল কটকে। নামিয়া পড়িল ননী;
সহসা প্রকাশচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে
ধরিলা ননীর কর। ফিরে চেয়ে ননী
বিস্ময়ে রহিল স্তব্ধ! দুই বন্ধু শেষে
ক্ষণেক লইলা হাসি'; আলাপে আলাপে
চলিলা গৃহের পানে আনন্দে কৌতুকে।

এক মাস গেছে চলি'। সেদিন পূর্ণিমা;
মেঘমুক্ত নীলাকাশে জ্যোৎস্না হাসিতেছে,
অঙ্গনে বিছায়ে পাটি, বন্ধু দুই জন
চাহিয়া আকাশ পানে। গৃহকর্ম্ম সারি'
অমাও একান্তে আসি' বসিল সেথায়।
আর এক পূর্ণিমায় এসেছিল ননী;
দু' দিন না যেতে, হয়েছিল উৎকণ্ঠিত
গৃহে ফিরিবার তরে! কবে, কোথা দিয়ে
চলে গেছে দুটি পক্ষ অজ্ঞাত নেশায়!
বড় দ্রুত গেছে বুঝি এ কয়টি দিন?
হায় ননী! হায় বন্ধু! এই তব কাজ?
কোথা গৃহ, গৃহশ্রী? ফিরিবার কথা
ভুলে গেছ একেবারে? অভাগিনী অমা!
অয়ি আতঙ্কভীতা, আজ তব জয়,—
অতিথি কখন যাবে সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে!
এ কি? এ কি?—কে গাহিছে?—ধন্য ননীলাল!
কি নিপুণ সুরজ্ঞানী, কি মধুর স্বর!

জানিছ কি, পাশে বসি' আত্মহারা অন্য
তোমার ও কণ্ঠসুধা করিতেছে পান
আকণ্ঠ তৃষ্ণায়!—পড়িল নিশ্বাস কার!
চোখে জল গান শুনে'?—আর তুমি, নবী!
বহু স্থানে বহুবার গাহিয়াছ গান,
এমন ত গাহ নাই! রাগিণীর সাথে
মিলে নি এমন ক'রে তোমার হৃদয়!
কণ্ঠ কেন কাঁপিতেছে? ভুলিতেছ লয়?
থাক্ থাক্ ওই গীত—প্রেমের কাকুতি!
অন্য গান ধর কোনো! কিংবা গাহিও না!
লজ্জাহীনা হে পূর্ণিমা, হে মিলনদূতী,
অত হাসি বহুদিন হাস নাই তুমি!
এ কি ফাঁদ, এ কি হাসি করেছ বিস্তার!
কুহকিনী, দেখ চেয়ে, খোকা শ্রান্তিভরে
ঘুমায়ে পড়েছে ওই শয্যা আলো করি';
এমন সুন্দর শিশু! এমন সংসার
সুখশান্তিভরা! মনে রেখো যাদুকরী!
সহসা থামিল গীত; মৌনে উঠি' অন্য
পশিল শয়নকক্ষে। সুপ্ত শিশু পানে
ক্ষণেক চহিয়া মুগ্ধা কহিল আবেগে,—
অশান্ত দুরন্ত মোর, সন্ধ্যাটি না হ'তে
ঢুলে' এসেছিল আঁখি না জানি কখন,
দেখে নাই মা তোমার; নেয় নি সে খোঁজ!
হয় ত বা অভিমানে একা গিয়ে যাদু,
শয্যাখানি বিছাইয়ে পড়েছ ঘুমায়ে!
ক্ষমিও এ কুমাতারে। মরি মরি রূপ!
এর কাছে আছে কিছু? এমন নির্মল,
এমন পাগলকরা আছে কিছু আর?—
সেইক্ষণে শয্যা'পরে পড়িল লুটিয়া;
টানিয়া কোলের কাছে ঘুমন্ত শিশুরে

চাপিতে লাগিল বুকে কি যেন ব্যথায়!
আহারের আয়োজন করি' ভৃত্য যবে
ডাকিতে আসিল তারে, ব'লে দিল অমা,—
অসুখ হয়েছে তার।—দু'বন্ধু সে রাতে
ভোজনে বসিলা মৌনে! দেখিল প্রকাশ,
সদানন্দ রঙ্গপ্রিয় ননী যেন আজ
নিতান্ত বিষণ্ণ শুষ্ক। কহিল প্রকাশ,
'জানি ও গো জানি তাহা, ফাঁকি দিবে ঠিক,
দেখিবার লোক যবে নাই আজ কাছে!'
'না না, না না! সে কি কথা?' বলি ননীলাল
ভাঙ্গা সুরে ম্লান হাসি হাসিল কেবল।
চমকি' প্রকাশচন্দ্র কহিলা ননীরে,
'হয়েছে অসুখ কোনো?' শশব্যস্তে ননী
কহিল বিকৃতকণ্ঠে, 'না না, কিছু নয়;
বহুদিন গৃহছাড়া; ছুটি চাই এবে।'
প্রকাশ কহিলা হাসি, 'মোরে বলা বৃথা,
যথাস্থানে আবেদন পাঠাইও কা'ল!'
পরদিন ব্যস্ত হয়ে প্রকাশ অমারে
ডাকিল শয়নকক্ষে, কহিল, 'এখনি
পাইলাম এই 'তার' কলিকাতা হ'তে;
গুরুতর কার্য্যতরে যেতে হ'বে সেথা;
বিলম্বে হইবে হানি! যেতে হ'বে আজি,
শীঘ্র শীঘ্র ক'রে দাও যাত্রার উদ্যোগ।'
ধরিয়া স্বামীর কর অকস্মাৎ অমা
রহিল আনতমুখে ক্ষণেক নীরব;
কহিল কাতরকণ্ঠে, 'প্রভু, প্রাণাধিক,
থাক থাক মোর কাছে! বড় একা আমি!
বড় একা! অসহায়! যেও না, যেও না!
যাবে যদি, একসঙ্গে চল ফিরি ঘরে।'
কহিলা প্রকাশচন্দ্র, 'বহুবার ফেলে

হয়েছে ত ছাড়াছাড়ি, দেখি নাই কভু
এত বাড়াবাড়ি তব! বুঝি উপন্যাস
অবিশ্রান্ত পড়িয়াছ এই কয়দিন;
সেই মিথ্যা মাদকতা ঘুরিছে মাথায়!
প্রত্যক্ষ সংসার এ যে; হেথা নাহি সাজে
সুরঙ্গিন কল্পনার মিষ্ট অভিনয়!
পক্ষকাল মধ্যে আমি ফিরিব নিশ্চিত;
ননী র'য়ে গেল হেথা; ভাবনা কিসের ?'
ক্ষুব্ধার হৃদয় হ'তে কি একটি কথা
উঠিয়া মিলায়ে গেল গভীর নিশ্বাসে!
অনেক সাধিল সীতা, অনেক কাঁদিল,
অটল প্রকাশচন্দ্র, শুনিল না কিছু।
এ দিকে হরিশচন্দ্র খেলা ছেড়ে এসে
ধরিল পিতার হাত; কহিল 'বাবা গো,
আমিও কোলকাতা যাব।' বহু প্রলোভন
খেল্না-বাজ্না আর আঙ্গুর-বেদানা
হ'ল যবে প্রতিশ্রুত, সুবোধ হরিশ
অগত্যা করিল সন্ধি। বিরহবিধুর
বহুক্ষণ দ্বার দিয়া কাঁদিল বিরলে।
যাত্রার সময় এল, এবার প্রকাশ
বুঝিল, হৃদয়ব্যথা নহে সে ক্ষণিক,
নিদারুণ সত্য তাহা; [illegible] নিশ্বাস
আঁকিয়া রোরুদ্যমান [illegible] ছবি
শিশুর মলিনমুখ নিভৃত অন্তরে
ধীরে ধীরে অশ্রু মুছি' লইল বিদায়।
অধীর বাষ্পীয় রথ দৌড়িল যখন
বঙ্গরাজধানীমুখে, ফিরে এল ননী,
কিন্তু গেল না বাসায়। ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল,
চাঁদ উঠে এল ধীরে, কাঠজুড়ীতীরে
ননী বেড়াইতেছিল একাকী সে রাতে

অধীর উদ্বেগহীন চঞ্চলচরণে।
আপন অধীর বক্ষ দুই হাতে চাপি'
যাতনাকাতরকণ্ঠে চাহি' ঊর্দ্ধ পানে
কহিল,—অনাথনাথ, বল দাও মোরে!
এই সুখী-পরিবার, সোনার সংসার,
ছারখার হ'য়ে যাবে! হায়, বন্ধু আজ
করিবে বন্ধুর শিরে গোপন আঘাত?
সরল প্রকাশচন্দ্র! এমন লোকের
সর্ব্বনাশ করে কেহ; ভাবে কেহ তাহা।—
সেই স্তব্ধ রজনীতে ব্যাকুল প্রার্থনা
যেন ঊর্দ্ধে কারো কাছে পৌঁছিল বারেক!
স্বর্গ-আশীর্ব্বাদ সম, স্নিগ্ধ সমীরণ
সর্ব্বাঙ্গে লাগিল এসে সান্ত্বনার মত।
নিঃশব্দে চোরের মত সেই রাতে ননী
বাসায় আসিল ফিরি'। জানাল ভৃত্যেরে,—
আহারের ইচ্ছা নাই।—চুপে শয্যা ল'য়ে
মুহূর্ত্তে নিদ্রার ক্রোড়ে পড়িল ঢলিয়া।

হেথা বিরহিণী অমা তপস্বিনী সম
কাটাতে লাগিল দিন; রূপের মাঝারে
পড়িল মলিন ছায়া; হাসি-রঙ্গ ছাড়ি'
যৌবনের চপলতা কি যেন সংযমে
ধরিল কঠোর মূর্ত্তি!—অমা আর ননী
দূরে দূরে থাকে দোঁহে অতি সাবধানে।
কথা নাহি হয় আর; বুঝি প্রতিদিন
দেখাও হয় না দোঁহে; যেন দুই জনে
পরিচয় নাই কভু! মাতা রোজ রাতে
পুত্রেরে টানিয়া কোলে ঊর্দ্ধপানে চাহি'
কহে,—প্রভু, কতদিন—আর কত দিন
তাঁর ফিরিবার বাকী! হয় নাই কাজ?
এই ক'টি দিন রাখ এই দুর্ব্বলারে

দুই হাতে আগুলিয়া! হে স্বামীর স্বামী,
যাবৎ না পাই সেই অনন্ত-নির্ভর,
তাবৎ করিও রক্ষা এই অনাথারে!
তাঁর কথা, তাঁর গুণ মোর স্মৃতিপটে
রাখ জাগাইয়া নিত্য! দাও মোরে বল,
কায়মনে নাহি হই বিশ্বাসঘাতিনী!
এক পক্ষ গেল চলে। এল না প্রকাশ;
অমা গণিতেছে দিন। আরেক সপ্তাহ
যেদিন হইবে পার, এল এক চিঠি।
চিনি' সেই হস্তাক্ষর কম্পমানকরে
খুলি' অমা পড়ে গেল একটি নিশ্বাসে।
লিখেছেন স্বামী—কাল পৌঁছিবেন আসি'।—
বার বার সেই লিপি লাগিল চুমিতে!
পাছে কেহ দেয় বাধা আনন্দ-আবেগে,
অধীরা একান্তে তাই বাহিরের ঘরে
একেবারে ছুটে এসে রুধি' দিল দ্বার।
সে ঘরে থাকিত ননী। কিন্তু অমা জানে,
বাহিরে বাহিরে ঘুরি রোজ ননীবাবু
নিশীথে সে ঘরে আসে।—প্রত্যহের মত
সেদিনো থাকিত ননী তখনো বাহিরে
যদি না ডাকের চিঠি পাইত সে পথে।
চিনি' কারো হস্তাক্ষর, দ্রুতহস্তে খুলি'
সে চিঠি পড়িল ননী। উঠিল চীৎকারি,'—
মুক্তি! মুক্তি!—আর নয়; এই কয় দিন
যা সয়েছি,—হৃদয়েরে কি বিশ্বাস আর?
পলায়ন! পলায়ন! এই কারা ভাঙ্গি'
কারেও কিছু না বলি' চলে যাব কা'ল!—
ফিরিল বাসায় ননী আপনার ঘরে।
পশি' একা, চুপে চুপে শয্যায় পড়িয়া
আঁধারে ভাবিতেছিল।—ঠিক সেইক্ষণে

প্রকাশের লিপিহস্তে অমাবস্যে ঘরে
পশি', সশব্দে রুধিল দ্বার। —চমকিয়া
উঠিল ডাকিয়া ননী, – কে ও?—অন্ধকারে
দাঁড়ায়ে কাঁপিতেছিল স্তব্ধ অমা যেথা,
ননী উঠে গেল সেথা; চকিতে কাহারে
চিনি' ভয়ার্ত্তের মত সরিল পশ্চাতে!
তার পরে—তার পরে—একটি নিমেষ
এক ক্ষুদ্র ক্ষিপ্র ক্ষিপ্ত চপল পলক
ভাঙ্গি' চির প্রাণপণ সংযম—সংগ্রাম
সেই ক্ষুদ্র ক্ষণলগ্ন অন্ধকার হ'তে
ফেলিল গভীরতর আঁধারে দোঁহারে।
চমক ভাঙ্গিল যবে, ত্রস্তে দ্বার খুলি'
দুই জন দু'ই দিকে বেগে গেল চলি'।
অমা পড়ি' শয্যাপরে লাগিল লুটিতে
যে ব্যথায়, যে জ্বালায়, ভাষার অতীত!
ক্ষিপ্ত ননী সেইক্ষণে হ'ল নিরুদ্দেশ।
এক বর্ষ গেল ঘুরে। মুঙ্গের সহরে
একটি সুপরিচ্ছন্ন গৃহের অঙ্গনে
হাত-ধরাধরি করি' যুবক যুবতী
নীরবে ঘুরিতেছিল। ফুলগাছগুলি
সুঘ্রাণ উড়াতেছিল; অদূরে জাহ্নবী
কল্লোল তুলিতেছিল। তরুণীর বেশ,
আড়ম্বরবিবর্জ্জিত, তবু কি সুন্দর!
বাসন্তী রঙ্গের শাটী গুর্জ্জরী ধরণে
পরেছেন কুঁচাইয়া, অনবগুণ্ঠিত কেশ
আধেক ললাট ঢাকি বঙ্কিম রেখায়
জ্যাকেট-মণ্ডিত পৃষ্ঠে পড়েছে এলায়ে।
সুমসৃণ চর্ম্মাবৃত করবেষ্টী ঘড়ি
লতায় কাঁকন সম পেতেছিল শোভা।
চর্ম্মের পাদুকা দুটি পাদপদ্ম চুমি'

দলবদ্ধ ভৃঙ্গ সম রয়েছে মূৰ্চ্ছিয়া
কালো রূপ মিশাইয়া কনক বরণে !
গাহিতেছিলেন নারী অস্ফুট গুঞ্জনে।
তাম্বুলের রাগহীন স্মিতাধর হ'তে
শুক্তিশুভ্র দন্তপাঁতি দিতেছিল উঁকি !
বাঙ্গালা পুঁথির সম অধীত পাতায়
তর্জ্জনী রাখিয়া ক্ষুদ্র মুঠিতে চাপিয়া
সে গ্রন্থ, তরুণী স্বচ্ছন্দে ঘুরিতেছিলা !
পড়িল সন্ধ্যার ছায়া ; অদূরে বাহিরে
উঠিল সহসা গোল। যুবক তা শুনি'
দেখিলা বাহিরে আসি, একপাল ছেলে
ঐ পাগ্‌লী ! ঐ পাগ্‌লী !—এই ধূয়া তুলি'
খেদায়ে আসিছে এক দীনা রমণীরে।
অশিষ্ট বালকদের হস্ত হ'তে যুবা
উদ্ধারিয়া বিব্রতারে সম্ভ্রমে সাদরে
আনিলেন ডাকি' তারে আপনার গৃহে।
মুখোমুখী তিন জন সন্ধ্যার আঁধারে
ব'সিলেন আঙ্গিনায়। কহিল রমণী,
'পাগল ?—পাগল হয় কি পুণ্য করিলে ?
আমি ত পাগল নই ; মাঝে মাঝে শুধু
কি এক আবেশ মাঝে সমস্ত চেতনা
ডুবে থাকে ক্ষণকাল ; তার পরে সেই
পুরাতন পরিচিত স্মৃতির দংশন !'
এত বলি' পাগলিনী আপনার হাতে
ছিঁড়িতে লাগিল কেশ ! সস্নেহে প্রকাশ
কহিলেন, 'অভাগিনী, কি দুঃখ তোমার,
প্রকাশের হয় যদি, বল খুলে সব।'
'কি দুঃখ ?—শুনিবে তুমি ?—ওই কণ্ঠস্বরে
কি যেন কি আকর্ষণ, লইতেছে টানি
গোপন অন্তর ! করিও না ঘৃণা তবে !'

এত বলি' ভিখারিণী মর্ম্মস্পৃক স্বরে
বলে' গেল আত্মকথা একটি নিশ্বাসে।
অধীর আকুল কণ্ঠে কহিলা যুবক,
'মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! তুমি—তুমি অমা?'
প্রগল্‌ভা না শুনি' তাহা কহিতে লাগিল
আত্মভাবে ভোর হয়ে।—'কলিকাতা হ'তে
যেদিন ফিরিলা স্বামী, মুমূর্ষুর মত
শয্যায় ছিলাম লীন। কাছে বসি' মোর
সযত্নে সোহাগে স্নেহে হাতখানি তুলে'
আপন কোলের কাছে, ছোঁয়াইলা ঠোঁটে;
কহিলা,—আছ ত ভাল?—সে আদরে মোর
সংযম ভাসিয়া গেল, পা দুখানি তাঁর
মাথায় নিলাম তুলে; কহিলাম তাঁরে
খুলিয়া সকল কথা। হ'ল না ভরসা
মার্জ্জনা ভিক্ষার! শুনিলেন স্বামী সব;
সাগরের মত সেই গভীর হৃদয়
[illegible] স্তম্ভিত হ'ল; শেষে ধীরে ধীরে
সেই পুরাতন প্রেমে আশীর্ব্বাদছলে
লাগিলা [illegible] শিরে কম্পমান কর।
কহিলে[illegible] স্বরে,—অমা, অমা মোর!
তোমারে [illegible]েছি ক্ষমা। এই যে ধরণী
প্রকাণ্ড ভুলের স্থান! কে না ভুল করে?—
তার পরে দুই দিন দুঃখে সুখে মোহে
[illegible]ত কেটে গেল। যা ছিল তা যেন
কিছুতে হয় না আর!—বুঝিলাম তাহা;
তিনিও তা বুঝিলেন। তৃতীয় দিবসে
কারেও কিছু না বলি' অকস্মাৎ স্বামী
হইলেন নিরুদ্দেশ। সেইদিন হ'তে
খোকারো বাড়িল জ্বর; দুদিনের দিন,
সোনার হরিণ মোরে গেল ফাঁকি দিয়ে!

বাবা বাবা ক'রে আহা, প্রাণ দিল বাছা !
প্রায়শ্চিত্ত হ'ল মোর ! হায় প্রাণাধিক,
হৃদয়দুলাল মোর, নিষ্পাপ নির্ম্মল,
নরকের কীট আমি দংশিলাম তোরে ;
তাই ত ফুলের মত পড়িলি ঝরিয়া
কোরকজীবনে, যাদু !'—থামিল বিবশা ।
যুবক ক্ষিপ্তের মত উঠিল চীৎকারি',
আমি—আমি পুত্রহন্তা ! আকাশের বজ্র,
হও যদি দেবতার ন্যায়দণ্ড তুমি,
ভেঙ্গে পড় মোর শিরে ! আমিই প্রকাশ !
আমি সেই শিশুঘাতী নির্ম্মম পাষাণ !'
কহিল উন্মত্তা, 'তুমি ?—তুমি সে দেবতা ?
ওই কণ্ঠস্বর শুনি' বার বার মন
হয়েছিল উচাটন, কিন্তু দুরাশারে
পারি নাই স্থান দিতে । তুমি—তুমি সেই ?'
'আমি সেই কাপুরুষ, আমি সেই পাপী !
অনাথ শিশুরে আর কাতর পত্নীরে
চোরের মতন ফেলি' আসিনু পালায়ে !—
হায় অসহায় শিশু, প্রাণের পুতলি,
যবে তোর শিরে আসি' মৃত্যুর নিশ্বাস
পরশ করিতেছিল, হয় ত বিভ্রমে
বাবা বলে ডেকেছিলি এই নরাধমে !
খুঁজেছিলি বৃথা কারে ! ঘুমাও ঘুমাও
বিশ্বপিতা কোলে, বৎস । ঘুম যাও যাদু,
ভাঙ্গে না বিশ্বাস যেথা, ঘুচে না অভয় !
আর তুমি অভাগিনী, শোক-উন্মাদিনী,
এস পতিপুত্রহারা, এস পরিত্যক্তা,
এস অনুতাপদগ্ধা নিষ্পাপ পতিতা,
চল মোরা তিন জন সংসারের প্রান্তে
অভিনব গৃহস্থালী করি গে রচনা ।—

হায় যদি ননীলাল ফিরিত এখন,
পুরাতন নিঃসঙ্কোচে এই আলিঙ্গনে
যদি সে আসিত ফিরে।—হায় তা কি হ'বে!—
চাহিয়া যুবতী পানে, ধরি' তার হাত
কহিতে লাগিল,—করিবে কি ক্ষমা, ননী?
দাঁড়ায়ে পিতারে তব, বিপত্নীক বলি',
পূর্ব্বপরিচয়-বলে ধর্ম্মান্তর ল'য়ে
বিধবা, তোমারে যবে বিবাহবন্ধনে
বাঁধিয়াছি, ছলে হোক, তবু সে বন্ধন
প্রেমের কুহকে আর ধর্ম্মের আলোকে
শুভ্র শুদ্ধ হয় নাই;—এবে শুধু বলি,
শৈশবের প্রেম স্মরি' ক্ষমা কর মোরে।—
সহসা উন্মত্তা উঠি' দাঁড়াল তখন,
কহিল কম্পিতকণ্ঠে চাহি দোঁহা পানে,—
'চিরসুখী হও দোঁহে। আজিকার কথা
ভুলিও দুঃস্বপ্ন সম।'—প্রকাশে চাহিয়া
কহিল গদ্গদকণ্ঠে,—'স্বামী! প্রাণাধিক!
ক্ষমা করেছিলে আগে; কিন্তু আজ দিলে
যাহা মোরে, তা যে মোর আশার অতীত।
যতদিন আছি বেঁচে, সেই স্মৃতি লয়ে
জীবন কাটায়ে দিব। এই ভালো, প্রভু!
আর বেশী কাজ নাই।—বিদায়! বিদায়'!
এত বলি' অন্ধকারে গেল মিশাইয়া!
আঁধার চিরিয়া কোনে চতুর্থীর চাঁদ
উঠে এল ধীরে ধীরে। যুবক-যুবতী
সেইখানে, কারো মুখে নাই কোন কথা।
রজনী গভীর হ'ল, ক্ষীণ কোলাহল
ক্ষীণতর হ'তেছিল; একটি কোকিল
অদূরে গাহিতেছিল; শীতল সমীরে
সদ্যঃস্ফুট ফুলবাস লাগিল উড়িতে;

সেইখানে একাসনে অভুক্ত দম্পতি
কাষ্ঠপুত্তলীর প্রায় রহিল বসিয়া।

জামাই বাবু।

১

সারদাচরণ বাগচী ও তস্য ভ্রাতা বরদাচরণ বাগচী কুসুমপুর গ্রামে ভ্রাতৃ-বাৎসল্যের আদর্শ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পল্লীরমণীগণ অনেক সময়ই বলিতেন, "আহা! দুটি ভাই নয় ত, যেন রাম লক্ষ্মণ, কলিতে ত এমন দেখা যায় না।" বড় ভাই সারদাচরণ রামজীবনপুরের জমীদার মজুমদার বাবুদের সদরনায়েব ছিলেন; ছোট বরদাচরণ বাড়ীতে বসিয়া সংসারের কর্তৃত্ব করিতেন; বাড়ী, বাগান ও চাষবাস দেখিতেন। সংসারের সকল ভার স্নেহময় কনিষ্ঠ সহোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়া, সারদাচরণ নিশ্চিন্তমনে বিদেশে অর্থোপার্জনে রত থাকিতেন। বরদাচরণের এক এক সময়ে চাকরী করিবার সাধ হইত। কিন্তু দাদা বলিতেন, "চাকরীতে আর তোর দরকার কি? পরের গোলামী আমি করচি, করি; মিছামিছি কেন তুই দশ বিশ টাকার জন্য দাসত্ব করতে যাবি?" বরদাচরণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিতেন, "চিরদিন বাড়ীতে বসে বসে তোমার অন্নধ্বংস করবো? সেটা কি ভাল দেখায় দাদা?" দাদা বলিতেন, "ও সব সৌখীন শিষ্টাচার রেখে দে! আমার খাবি নে ত কি ও পাড়ার মুখুজ্যেদের খেতে যাবি?" বরদাচরণকে অগত্যা নিরুত্তর হইতে হইত।

সারদাচরণ বড় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। অবৈধরূপে অর্থোপার্জ্জনের প্রবৃত্তি থাকিলে কুসুমপুরের মধ্যে তিনি একজন সম্পত্তিশালী লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সে প্রবৃত্তি ছিল না। সে জন্য অনেকে তাঁহাকে সংসার-জ্ঞানহীন বলিয়া মনে করিতেন। তিনি যে টাকা বেতন পাইতেন তাহা যথেষ্ট হইলেও, তিনি একটি স্থাবর অট্টালিকা ও উৎসবাদিতে ব্যবহারোপযোগী কতকগুলি অস্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন আর কিছুই

করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক টাকা দীনদুঃখীর দুঃখমোচনেই ব্যয়িত হইত।

বরদাচরণের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে স্বগ্রামে অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। অস্থাবর সম্পত্তিগুলিও বরদাচরণের হেফাজতেই থাকিত। কারণ, তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা। সারদাচরণের স্ত্রী তাঁহার শিশুপুত্রটিকে লইয়া বাড়ীতেই থাকিতেন। বাসগ্রামের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক প্রবাসী হওয়া সারদাচরণ পাপ মনে করিতেন।

বাড়ীর অট্টালিকা-নির্ম্মাণেও সারদাচরণ অধিক অর্থ ব্যয় করিতে পারেন নাই; সেই জন্য অট্টালিকাটি তেমন প্রশস্ত হয় নাই। অন্দরের দুই অংশে দুই ভাইয়ের বাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বাহিরে সারদাচরণের অন্দর-সংলগ্ন একটি ছোট বৈঠকখানা। সারদার একমাত্র পুত্র শিবচরণ সেখানে বসিয়া পড়াশুনা করিত। বরদাচরণের বন্ধুগণ কদাচিৎ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে, সেখানে বসিয়াই তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হইত। সারদাচরণের স্ত্রী হেমাঙ্গিনীর সহিত বরদাচরণের স্ত্রী মধুমালতীর মনের অমিল ছিল না। হেমাঙ্গিনী মধুমালতীকে ছোট ভগিনীর মত স্নেহ করিতেন, মধুমালতীও তাঁহাকে দিদির মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন; কখন কোনও বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইতেন না। অলঙ্কারপত্র কিছু গড়াইতে হইলে সারদাচরণ দুই বৌ'র জন্য সমানভাবে তাহা নির্ম্মাণ করাইতেন। বরদাচরণের কন্যা সরোজিনীর অন্ন-প্রাশনে সারদাচরণ যেরূপ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, পুত্র শিবচরণের অন্ন-প্রাশনেও তাঁহার তত টাকা ব্যয় হয় নাই। বরদাচরণ বলিয়াছিলেন, "দাদা, মেয়ের 'ভাতে' এত ব্যয়বাহুল্যের দরকার কি?" সারদা বলিয়াছিলেন, "মেয়ে কি এতই তুচ্ছ? মেয়ে যদি সুপাত্রে পড়ে, তাহা হইলে জামাইকে দিয়ে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়।"

ভ্রাতৃবৎসল সারদাচরণের এই কথা শুনিয়া, সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতাপুরুষ অলক্ষ্যে থাকিয়া একটু হাসিয়াছিলেন কি না, কে বলিতে পারে?

২

দশ বৎসরের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। দেখিতে দেখিতে সরোজিনী দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। তাহার বিবাহের জন্য সারদাচরণ বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মেয়ের বিবাহ আর ত না দিলেই নয়! পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়া সারদাচরণ সরোজিনীর বিবাহের কথা তুলিলেন। বরদা

নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "আরও দু' এক বছর যাক্ না দাদা! এরই মধ্যে এত তাড়াতাড়ি কি ?" সারদাচরণ বিচলিতভাবে বলিলেন, "কি যে তুই বলিস হিন্দুর ঘরের মেয়ে ধেড়ে বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়ো রাখ্‌তে হ'বে নাকি ? একটা মেয়ে, তার বিয়ে দিয়ে বাড়ীর ওরাও ত সাধ আহ্লাদ কর্ত্তে চায়। একটি ভাল পাত্র পাওয়া গেলে আমি আজ ছেড়ে কাল চাই নে।" বরদাচরণ হতাশভাবে বলিলেন, "যা ভাল বোঝ কর দাদা! আমাকে দিয়ে বিয়ে টিয়ের যোগাড় হ'য়ে উঠবে না।"

সংসারে সারদাচরণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল; অর্থব্যয়েরও শক্তি ছিল। নানা স্থানে কথা চলিতে লাগিল। ছেলেটি শিক্ষিত হয়, অথচ ঘরে ভাত আছে, এইরূপ পাত্রেরই তিনি সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টার পর, মেডিকেল কলেজের তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ফকীরচন্দ্রকে নগদ তিন সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়া, সারদাচরণ তাহারই হস্তে স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে সমর্পণ করিলেন। ফকীরচন্দ্রের মামা বীরভদ্র ঘটক বিবাহের রাত্রে সারদাচরণের সহিত আলিঙ্গন করিবার সময় সহাস্যে বলিল, "বেয়াই মশাই। 'রাজ-জামাই' লাভ কল্লেন, এ বাজারে বড় সস্তায় সওদা কল্লেন, পরে দেখে নেবেন, লাভটা কি রকম হ'ল।" কিন্তু এ বিবাহে বরদাচরণ বড় খুসী হইলেন না। বিবাহের পরদিন নবকন্যে বিদায় করিয়া কন্যাবিচ্ছেদবেদনায় উভয় ভ্রাতার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। বরদাচরণ মনের ভাব চাপা দিয়া বলিলেন, "এতকগুলো টাকা খরচ কল্লে, কাজটা কিন্তু বড় ভাল হ'লো না দাদা!" সারদাচরণ বলিলেন, "তোর ত কিছুতেই মন উঠে না; কেন, মন্দটা কি দেখ্‌লি ?" বরদাচরণ বলিলেন, "রুদ্রপুরের তলাপাত্র গুষ্টির মেয়ে মর্দ্দ সকলেই শুনেছি পাকা ইঞ্জিনিয়ার, ঘর ভাঙ্গবার ভারি ওস্তাদ! ও ঘরে কাজ করিবার আমার আদতেই ইচ্ছা ছিল না।" সারদাচরণ বলিলেন, "তোর মনটা ভারি গোলমেলে; মেয়ে সুখে থাকবে ব'লে পাঁচ হাজার টাকা খরচ কল্লেম; এখন বলছিস্, কাজ ভাল হ'লো না। এমন কার্ত্তিকের মত রূপবান ছেলে, আজ বাদে কাল মস্ত ডাক্তার হবে, বাপের অত বিষয়সম্পত্তি,— রাজার হাল! এমন ছেলে কি হাতছাড়া কর্‌তে আছে ? তুই যে বল্‌ছিস ও বাড়ীর মেয়ে মর্দ্দে ঘর ভাঙ্গে, তা আমি মেয়ে দিয়েছি বৈ মেয়ে আন্‌তে যাইনি, আর মেয়ে আন্‌তামই যদি—তাতেই বা কি ভয় ? ঘর আমাদের, পরে সে ঘর ভাঙবে কি ? এ কি বারোয়ারীর তহবিল যে, ভাঙলেই হ'ল!"

বরদাচরণ গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি দাদা পৃথিবীতে কারও দোষ দেখ না, সকলে যদি তোমার মত হ'ত!"

সারদাচরণ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, তা হ'লে পৃথিবী একেবারে বৈকুণ্ঠে গিয়ে ঠেক্‌তো! যেতে দে ও সকল কথা। চ'দেখি মাথায় একটু জলটল দেওয়া যাক্‌গে, বেলা অনেক হয়েছে।"

৩

ফকীরচন্দ্র জমীদারের ছেলে হইলেও বড় মেধাবী। সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার জন্য যে সকল শক্তির আবশ্যক, তাহা হইতে বিধাতা তাহাকে বঞ্চিত করেন নাই। ফকীরচন্দ্রের বংশমর্যাদার কথা পাবনা জেলার কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু ফকীরচন্দ্রের পিতা নীলমণি তলাপাত্র, ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা চালচলন অনেক বেশী মাত্রায় বাড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন; তিনি যে বড়লোক, ইহা দেখাইবার জন্য তিনি সফর-নিরত ম্যাজিষ্ট্রেটের ভোগে ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল ফণ্ডে সমান উৎসাহে চাঁদা ঢালিতেন, এবং কেহ যদি তাঁহাকে বলিতেন, "এবার নববর্ষ গেজেটে আপনি নিশ্চয়ই রায়বাহাদুর হইবেন,"—তাহা হইলে সেই সৌভাগ্যবান চাটুকারটিকে সে দিন বিলক্ষণ আহারের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হইত। কিন্তু উপায় নাই, বড়মানুষীর লক্ষণই এই রকম।

বাড়ীতে দোল, দুর্গোৎসব, ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতিতে সমারোহ করিতে গিয়া নীলমণির তহবিলটি গজভুক্ত কপিত্থবৎ সারহীন হইয়া উঠিয়াছিল। সময়ে সাবধান হইলে হয় ত কতক রক্ষা পাইত, কিন্তু তিনি মা লক্ষ্মীকে বিদায় দিয়াও চাল বজায় রাখিলেন। ফলে, সমস্ত সম্পত্তি রেহানে আবদ্ধ হইল। চক্রবৃদ্ধি-হারে সুদ আরব্যোপন্যাসের আলাদীনের দৈত্য-বাহিত প্রাসাদের ন্যায় দেখিতে দেখিতে আকাশস্পর্শী হইয়া উঠিল। সংসারের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময় নীলমণি বাবু হঠাৎ এক দিন রাত্রে ভবের খেলা সাঙ্গ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট লোকে যাত্রা করিলেন। তখন চারি দিক হইতে শবভোজী গৃধ্রের ন্যায় মহাজনেরা তাঁহার সম্পত্তিটুকু গ্রাস করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল; এবং ডিক্রী জারী করিয়া জলের দামে বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত নিলাম করিয়া লইল। পাঁচ জনে দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিল, "আহা! এত বড় ঘরটা একেবারে ফেরার হ'ল!" কিন্তু ফকীরচন্দ্রকে কেহই কোনরূপ সাহায্য করিল না। এমন কি, তাহার মাতুল বীরভদ্র ঘটক পর্য্যন্ত ভাগিনেয়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ

করিয়া গা ঢাকা দিল। এতদিন পর্য্যন্ত কিন্তু বীরভদ্র ভগিনীপতির গৃহে দোল-দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকাণ্ডে ম্যানেজারি করিয়া আসিয়াছে। ভগিনীপতি ও ভাগিনেয়ের উপর তখন তাহার বড় 'দরদ' ছিল।

ফকীরচন্দ্র দেখিলেন, শ্বশুরের নিকট সাহায্যপ্রার্থী না হইলে আর কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া চালান অসম্ভব। তিনি বরদাচরণকে একখানি পত্র লিখিলেন। বরদাচরণ সেই পত্রখানি তাঁহার দাদার নিকট পাঠাইলেন, নিজে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। সারদাচরণ ফকীরচন্দ্রকে লিখিলেন, "তোমার বর্ত্তমান বিপদে আমি দুঃখিত হইয়াছি; এত শীঘ্র তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা কে জানিত? ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। যাহা হউক, তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে। পরমেশ্বরের বিধানের উপর আমাদের কোনও হাত নাই। তুমি ও শিবচরণ দু' জনেই আমার সমান স্নেহের পাত্র; অর্থাভাবে তুমি যে এখন কলেজ ছাড়িয়া দিবে, তাহা কোন মতেই হইবে না। তোমার কলিকাতায় ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য আমি তোমাকে এখন হইতে প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা করিয়া পাঠাইব।" সারদাচরণ বাড়ীতে বরদাকে লিখিলেন, "ফকীরকে কি পরিমাণে মাসিক সাহায্য করিলে চলে, তাহা তুমি কিছুই লেখ নাই; আমি মনে করিতেছি, তাহাকে মাসিক পঁচিশ টাকা সাহায্য পাঠাইব। বোধ করি, এ টাকায় তাহার কষ্টে-সৃষ্টে চলিতে পারে। তাহার শেষ পরীক্ষার আর অধিক বিলম্ব নাই। অর্থাভাবে হঠাৎ এখন কলেজ ছাড়িয়া দিলে এত দিনের অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সমস্ত পণ্ড হইবে। জামাইটি মানুষ না হইলে মেয়েটা ভবিষ্যতে কষ্ট পাইবে।"

দুই বৎসর পরে ফকীর মেডিকেল কলেজের শেষ এল্. এম্. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই সারদাচরণের সোনার সংসারে আগুন লাগিল। সারদাচরণ হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তিন মাস অতীত না হইতেই ভ্রাতৃবিয়োগশোকাতুর সরলহৃদয় বরদাচরণের জীবন-নাটকের মধ্যপথে যবনিকা পতিত হইল। শান্তিপূর্ণ সুখময় আনন্দময় পল্লীভবনে শোকের হাহাধ্বনি উত্থিত হইল, বিধবাদ্বয় সংসার অন্ধকার দেখিলেন। হেমাঙ্গিনী এই মহাশোকে আচ্ছন্ন হইয়াও বিংশবর্ষীয় পুত্র শিবচরণের মুখ চাহিয়া জীবনের শান্তিহীন বিরস দিনগুলি কাটাইতে লাগিলেন; মধুমালতীর পুত্র-সন্তান ছিল না, ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা সরোজিনীই তাঁহার জীবনের একমাত্র

অবলম্বনস্বরূপ হইয়া রহিল। দুইটি বিধবা একপরামর্শ হইয়া পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

৪

পিতার মৃত্যুর পর ফকীরচন্দ্রের সংসারে স্ত্রী সরোজিনী ভিন্ন দ্বিতীয় বন্ধন রহিল না। শৈশবেই তিনি মাতৃহীন; গৃহদ্বার বিষয়সম্পত্তি সমস্তই পরহস্তগত। ফকীরচন্দ্র ভাবিলেন, আর কেন, রুদ্রপুরের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে, নূতন করিয়া যখন সংসার পাতিতে হইবে, তখন শ্বশুরবাড়ী গিয়া বসাই ঠিক, শাশুড়ীরও কোন অভিভাবক নাই, বিশেষতঃ স্থানটি ভদ্রবাস। ব্যবসায় আরম্ভ করিলে প্রাকৃটিসেরও বেশ সুবিধা হইবে।—এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি শাশুড়ীকে এক পত্র লিখিলেন। পত্র পাইয়া মধুমালতীর মনে আনন্দ হইল, কথাটা তিনি হেমাঙ্গিনীকে বলিলেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "তা বেশ ত, ফকীর যখন আস্‌তে চাচ্চে, তখন এখানেই আসুক, এখানে ডাক্তারী করবে; ছেলেও যা, জামাইও তাই, মেয়ে দিয়ে ছেলে পাওয়া। আমাদের এখানে রক্ষক কেউ নেই, বিপদে আপদে চেয়ে দেখবার মানুষটি নেই; শিবু ত দুধের ছেলে, তারও এক জন অভিভাবক চাই।"

সুতরাং অনতিবিলম্বেই কুসুমপুর গ্রামে ডাক্তার ফকীরচন্দ্র তলাপাত্র এল্. এম্. এস্. মহাশয়ের আভ্যুদয় হইল। ফকীরচন্দ্র কয়েক মাসের মধ্যেই কুসুমপুরে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। লোকের মনোরঞ্জনে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল, গ্রামের জনসাধারণ তাঁহার অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়া গেল; তিনি "ভিজিট' না লইয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ফকীরচন্দ্র খুব 'মিশুক' লোক, মহকুমার জয়েণ্টম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গেও তিনি মধ্যে মধ্যে দেখা করিতেন, তাঁহার স্বাক্ষরিত ম্যাজিষ্ট্রেটের গুণবর্ণনা-পূর্ণ পত্র মধ্যে মধ্যে ইংরাজী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গুণগ্রাহী ও কৃতজ্ঞ, তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই ফকীরচন্দ্র অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনর ও লোকালবোর্ডের সভ্য-পদে নিযুক্ত হইলেন; ফকীরচন্দ্রের সুযশে কুসুমপুর গ্রাম পূর্ণ হইয়া উঠিল; সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিবার জন্য ফকীরচন্দ্রের নামে চারি দিক হইতে পত্র আসিতে লাগিল; এমন কি, কংগ্রেসে মিশিয়া স্বদেশহিতৈষী সাজিবার লোভটিও তিনি সংবরণ করিতে পারিলেন না।

কুসুমপুরের রমণীসমাজ বলাবলি করিতে লাগিল, "সাত পুত্র সম কন্যা,

যদি কন্যা সুপাত্রে পড়ে।'—জামাই হ'তেই বাগচীদের সংসারটা বজায় থাকবে। বরদা ঠাকুরের পুণ্যির জোর ছিল—তাই এমন জামাই পেয়েছে।"

ফকীরচন্দ্রের এই সুসময়ে তাঁহার মাতুল বীরভদ্র ঘটক মহাশয়ের হঠাৎ এক দিন ভাগিনেয়ের কথা মনে পড়িল। মাতুল এক দিন আসিয়া ভাগিনেয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিল; ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই পূর্ব্ববৎ পাকিয়া উঠিতে লাগিল।

৫

ফকীরচন্দ্র শ্বশুরবাড়ীতে আশ্রয় লইবার অল্প দিন পরেই কৌশলক্রমে তিনি শাশুড়ীকে হেমাঙ্গিনীর অনুগ্রহপাশ হইতে ছিন্ন করিয়াছিলেন, সুতরাং হাঁড়ী পৃথক হইয়াছিল। তাঁহার যুক্তি এই ছিল যে, তাঁহার জ্যেঠশাশুড়ীর এখন এমন অবস্থা নয় যে, এক জন বাহিরের লোকের ভার বহিতে পারেন। ফকীরচন্দ্র উপার্জ্জক্ষম পুরুষ মানুষ, তাঁহারই বা ভার হইবেন কেন? তবে শাশুড়ীকে ত আর ছাড়া যায় না, কাজেই হাঁড়ী ভাগ। কেহ কেহ বলিতেন, বাড়ী ভাগ করিয়া লইবার জন্যও ফকীরচন্দ্রের আগ্রহ আছে, কিন্তু হেমাঙ্গিনী তাহা দুষ্ট লোকের কল্পনামাত্র মনে করিতেন।

দুই এক টাকা ভিজিট লইয়া ডাক্তারী করিয়া মফস্বলে সংসার প্রতিপালন করা কঠিন। তাহার উপর যাহারা ভিজিট দিতে পারেন— তাঁহাদের সহিত আনুগত্য রাখিবার জন্য ফকীরচন্দ্র তাঁহাদের কাছে প্রায়ই ভিজিট লইতেন না; সুতরাং তাঁহার আয়ে সংসার চলিত না। ভাগ্যে মধুমালতী দেবীর হাতে দু' পয়সা ছিল, তাহাই বাহির করিয়া তিনি জামাতার জন্য রসগোল্লা, দুধের সর ও মাছের মুড়ো সংগ্রহ করিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "জামাই-ই সংসার চালাচ্ছেন, আমার হাতে টাকাকড়ি কি কিছু আছে?"

কিন্তু এ ভাবে ত দীর্ঘকাল চলিতে পারে না; তাই মাতুল বীরভদ্র ভাগিনেয়কে একটি ডিস্‌পেন্সারী খুলিবার পরামর্শ দিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির হইয়া গেল যে, বীরভদ্রই সেই ডিস্‌পেন্সারীর ম্যানেজার, মুহুরী ও কম্পাউণ্ডারের কাজ করিবে।

কিন্তু ডিস্‌পেন্সারী খুলিতে প্রথমেই কিছু টাকার দরকার। ঔষধবিক্রেতা নরসিং দত্ত বা বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানী যে প্রথম চালানেই হাজার দেড় হাজার টাকার ঔষধ ধারে দিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। ডিস্‌পেন্সারী

করিতে হইলে আরও নানাপ্রকার খরচ আছে, কিন্তু টাকা কৈ?—ফকীরচন্দ্র এক দিন আহার করিতে বসিয়া কথায় কথায় শাশুড়ীর কাছে টাকার কথা তুলিলেন। মধুমালতী বলিলেন, "টাকাকড়ি ত বেশী কিছু আমার হাতে ছিল না বাবা। এখন একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়েছি, তবে দুই একখানা গহনা আছে বটে: তা আমার যা আছে, তা তোমাদেরই; সেই গহনা বন্ধক দিয়া কিছু টাকা কর্জ্জ করা উচিত বোধ কর ত কর। তোমাদের যাতে হিত হয়, তা করতে আমার কি অসাধ বাবা?" পরমপরিতৃপ্তচিত্তে দশটি রসগোল্লা উদরস্থ করিয়া ফকীরচন্দ্র জলযোগ শেষ করিলেন।

৬

গহনা বন্ধক রাখিয়া ফকীরচন্দ্র পরদিনই নগদ দেড় হাজার টাকা লইয়া আসিলেন। স্থির হইল, এই টাকাতেই শিশিপত্র, ঔষধ, যন্ত্রাদি ও আলমারী সংগৃহীত হইবে। কিন্তু ডিস্‌পেন্সারী কোথায় স্থাপন করা যায়?

অপরাহ্নে জলযোগের পর সারদাচরণের অর্থে ক্রীত রূপার ফরসীতে তামাক টানিতে টানিতে ফকীরচন্দ্র শাশুড়ীকে বলিলেন, "পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই ত ঔষধ আনিতে কলিকাতায় যাইব; কিন্তু ডাক্তারখানা খোলা যায় কোথায়? বাজারে এক আধটা দোকান ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সন্ধানে জানিয়াছি, পনের টাকার কম ভাড়ায় দোকান মিলিবে না। ব্যবসায়ের আরম্ভেই মাসে পনের টাকা দোকান ভাড়া দেব?—তা, ঐ বাহিরের ঘরটা ত পড়েই থাকে, ওখানে ঔষধ রাখিলে ক্ষতি কি?"

মধুমালতী বলিলেন, "এ ত বেশ ভাল কথা। ও ঘরটা ত খালি পড়েই থাকে, সকালে শিবু যা এক আধটু পড়ে। সন্ধ্যার পর ঘরখানিতে আলো পড়ে না, মেঝেতে এক হাঁটু ধুলো। আহা! তোমার শ্বশুর যখন বেঁচে ছিলেন, রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত তিনি ইয়ার বন্ধু নিয়ে ঐ ঘরে কত গল্প গুজব করিতেন, বলতে গেলে ও ঘরটা ত তাঁরই বৈঠকখানা ছিল।" পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া মধুমালতী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

জামাই বাবুর চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি সকরুণভাবে বলিলেন, "আপনার একটা ছেলে থাকিলে আর ভাবনা কি ছিল? তা আমি পর হইলেও এখন আমাকেই ত সব দেখিয়া শুনিয়া লইতে হইবে; আপনার আর কে অভিভাবক আছে? যা হোক, জেঠীমার কাছে ঘরটার চাবি আছে, তিনি খোলেন ন কুন। তাঁকে একবার কথাটা বলিয়া দেখিবেন।"

পরদিন সন্ধ্যাকালে খোলা বারান্দায় বসিয়া হরিনামের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে মধুমালতী বড় জা হেমাঙ্গিনীকে বলিলেন, "দিদি, ফকীর বাহিরের ঘরটাতে ওষুদ টোষুদ রাখ্‌তে চাচ্ছে। তা চারিখানি শিশি রাখবার জন্য কোথায় আবার ঘর ভাড়া কর্ত্তে যাবে ? আমি বলেছি, দিদির অমত হবে না, তিনি ঘর খুলে দেবেন।"

হেমাঙ্গিনী স্পষ্ট কোন উত্তর দিলেন না, জপবন্ধ করিয়া হরিনামের ঝুলিটি ললাটে স্পর্শ করিয়া তিনি বলিলেন, "ফকীর ত আমার পর নয়, তবে কি না জানিস্ ছোট বৌ! জামাই আদরের পাত্র, তাকে আদর যত্ন করা ভাল, ঘোল আনার কর্ত্তা করা কিছু নয়।"

প্রতিবেশিনী দত্তগিন্নী নিকটে বসিয়া ছিলেন, "তিনি চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, "তা বড় বৌ ঠাকুরুণ ঠিক কথাই বলেছেন, কথায় বলে,

যম, জামাই, ভাগ্‌না,
তিন নয় আপনা'।"

হেমাঙ্গিনী একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওষুদ টষুদ ও ঘরে এনে রাখ্‌বে, বিক্রী করবে না ?—ওষুদ বিক্রী আরম্ভ হ'লেই ছত্রিশ জাতের পাঁচ শ' রকমের রোগী আমাদের বাহিরেব ঘরে ওষুদের জন্যে ধন্না দেবে। সেটা কি ভাল ? গেরস্তর কল্যাণ আগে দেখ্‌তে হয়।"

মধুমালতী বলিল, "তা দিদি, তোমাকে মত দিতে হচ্চে! বাজারে দোকান নিলে মাসে পনের টাকা ভাড়া যোগাতে হবে, আমার গহনাগুলো বন্ধক দিয়ে দোকানের পুঁজি করে দিয়েছি, তা ভেঙ্গে দোকান ভাড়া দিলে কি আর চলে ?"

হেমাঙ্গিনী সহজ স্বরে বলিলেন, "তা কি করা যাবে বোন ? আর দু দিন পরে ছেলেটির বিয়ে দেব, বৌটি ঘরে আস্‌বে, বাহিরের ঘরটা আমাদের বসত ঘরের লাগাও, ও ঘরে দশ জন বাহিরের লোক উঠাবসা করে কি মান ইজ্জৎ থাকে, না ঘরে বসবাস করা যায় ?"

মধুমালতী বিরক্তিদমনের চেষ্টা না করিয়াই বলিলেন, "নিজের জামাই হ'লে আর দিদির মুখ থেকে এমন কথা বেরুত না।"

হেমাঙ্গিনী ঈষৎ ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "দেখ্ মধু, আজ তোর মুখে এ কথাটা মানাচ্ছে না; তোর জামাই আর আমার জামাই এ দু'য়ে যদি ভিন্ন ভেদ থাকৃতো, তবে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় ক'রে তিনি মেয়ের বিয়ে দিতেন

না ; আমার যদি জামাই থাক্‌তো, আর তার যদি আকেল না থাক্‌তো, তা হ'লেও তাকে আমি এ কথা বলতে ছাড়তাম না।"

রাত্রে আহার করিতে বসিয়া রুক্মীবচন্দ্র সকল কথা শুনিলেন। সুরাদেবীর অনুগ্রহে তাঁহার মানসিক অবস্থা কিঞ্চিৎ তরল ছিল ; সুতরাং অল্পেই মেজাজ গরম হইয়া উঠিল! তিনি তখন একটা মাছের মুড়া ভাজিয়া মুখে পুরিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই বলিলেন, "কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! বড়গিন্নী যদি কালই বাহিরের ঘর ছেড়ে না দেয় ত পরশু 'পার্টিসন' সুট আরম্ভ করব ; যা কিছু আছে, চুল চিরে ভাগ নেব ; ভেবেছিলাম, আপনি একটা নিষ্পত্তি টিষ্পত্তি ক'রে নেওয়া যাবে, তা সে 'লাইনে' আর আমি যাচ্ছিনে।" মানসিক উত্তেজনায় জামাই বাবু ভাতের থালে সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াই "উহু গেছি গেছি!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

অর্দ্ধভুক্ত রুই মাছের মুড়োর হাড় জামাই বাবুর হাতে প্রবেশ করিয়া রক্তপাত করিল।

৭

পরদিন বাগচীদের প্রতিবেশিনী গিরির মা দূতী হইয়া হেমাঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। নানা কথার পর সে তাঁহার নিকট মধুমালতীর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "তুই মাগী আমাদের দুয়োর ঝাঁটিয়ে খাস্, তুই আমাদের ঘরের কথা মুখে আনিস্ কেন? ছোট বৌ মামলা করবে? ভয় দেখান হচ্ছে? বলিস্, দেশের সকলেই জানে, এ বাড়ী কে রোজগারের টাকা ভেঙ্গে তৈয়ারি করেছিল। পাঁচ বিঘে জমী চাষ ক'রে আর একালে পাকা ইমারত হয় না।"

গিরির মাকে বড় বৌর ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই ছোট বৌ দরজার আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মিহি সুরে বলিলেন, "তোমার স্বামী ত কেবল পাকী চড়ে বাবুগিরি ক'রেই কাটিয়ে গিয়েছেন, আর আমাদের উনি কুড়ুলে মনে ধুলো মাটী মেখে বাড়ীর জন্যে খেটেছেন, সংসারে কেউ দু' পয়সা বেশী দেয়, কেউ দু' পয়সা কম দেয়। বৈঠকখানাটা ত বল্‌তে গেলে উনিই দিলেন। তা বলে তবু যদি বলে, বাড়ীতে আমার অংশ নেই—"

হেমাঙ্গিনী বাধা দিয়া বলিলেন, "কে বলচে তোমার অংশ নেই, অংশ আছে বলে ত আর কেউ বুকের উপর বসে দাড়ি উপড়োতে পারে না।"

মধুমালতী বাধা দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সহজে না দাও, আদালত খোলা আছে।"

গিরির মার গিরিধর জামাই বাবুর ভৃত্য; গিরির মা জামাই বাবুর এক জন প্রধান পৃষ্ঠপোষক; সে এতক্ষণ পরে কথা কহিল; বলিল, "ঠিক কথাই ত ছোট বৌ ঠাক্‌রুণ, আমি হক্ কথার মানুষ। আদালতে এর বিচের হবে। মাজেষ্টক সায়েবের সঙ্গে জামাই বাবুর ভাব কত, সায়েব এক কলম লিকে দিলে, বাড়ী ছেড়ে পালাবার পথ পাবেন না।"

সেই দিন অপরাহ্ণে উকীল ঘনশ্যাম বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া ফকীর শাশুড়ীকে বলিলেন, "উকীলেরা বলিতেছে, একান্নভুক্ত পরিবারের সম্পত্তি—দুই অংশ সমান হইবে। মামলা করিলেই আমাদের জিৎ।"

গৃহবিবাদ সহজে মিটিল না। মামলা করাই স্থির হইল। ফকীরচন্দ্র ডাক্তারী শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া আইন শাস্ত্রের আলোচনায় মগ্ন হইলেন। ঘনশ্যাম বাবুর বাড়ীতে ঘন ঘন আড্ডা ও মদ চলিতে লাগিল। শাশুড়ীর গহনাবন্ধকের টাকা তখনও সব উড়িয়া যায় নাই।

শুভানুধ্যায়িগণ হেমাঙ্গিনীকে পরামর্শ দিলেন, যাহা কিছু আছে, আপোষে ভাগ করিয়া লও, মামলায় সব নষ্ট হইবে।

দুই এক দিন চিন্তা করিয়া হেমাঙ্গিনী আপোষে সম্মত হইলেন। কিন্তু বলিলেন, "আমার ছেলের বাহিরের ঘর ছাড়িব না, আর আমার স্বামী যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি করেছিলেন, তা তাঁর ভায়ার কাছে ছিল, তাঁর মৃত্যুর পরও ভায়া আমার হাতে চাবি দিলেন না; তার পর ছোট বৌর হাতে সে চাবি পড়ে,—সম্পত্তি তার জিম্মাতেই আছে—আমি তার ভাগ চাই।"

মধুমালতী বলিলেন, "তোমার স্বামী সে সব মেয়ের বিয়ের সময় বেচে ফেলেছেন; আমার কাছে কোনও জিনিস নেই।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "তা দেখে নেব। সে ত আর চোরা মাল নয়।"

৮

দুই দিন পরে ফকীরচন্দ্রের মাতুল বীরভদ্র ঘটক ভাগিনেয়ের কুশলজিজ্ঞাসা করিবার জন্ত কুসুমপুরে উপস্থিত!—কয়েক দিন পরে এক দিন মাতুল রাত্রিকালে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু গ্রামে জনরব উঠিল, বাগচী-বাড়ী হইতে তিনি দুই গাড়ী অস্থাবর মাল লইয়া গিয়াছেন।

চোর পলাইলে হেমাঙ্গিনীর বুদ্ধি বাড়িল, পরদিন তিন চারি জন লোকের

সম্মুখে কাঠের বড় বড় সিন্দুকগুলি খোলান হইল; সকলেই দেখিল, সব সিন্দুক খালি।—কোনটিতে একবিন্দু ধূলাও পড়িয়া নাই।

এক জন দর্শক আর এক জনের কানে কানে বলিল, "এ ত ভাই দু' গাড়ীর কর্ম্ম নয়!"

এবার মধুমালতীর পথ খোলা। তিনি বাড়ী ভাগের জন্য এবার বেশী জিদ করিতে লাগিলেন। হেমাঙ্গিনী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কেবলই ভাবেন, "আমার স্বামীর এত কষ্টের টাকার বাড়ী—একটা পর এসে ঠকিয়ে নেবে! হা ভগবান, এই কি তোমার বিচার!"

এক সপ্তাহ পরে হেমাঙ্গিনী একখানি নোটীস পাইলেন। নোটীস পাঠাইতেছেন শ্রীমতী মধুমালতী দেবী! নোটীসে লেখা আছে, এক সপ্তাহের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া না দিলে সম্পত্তিবিভাগের জন্য আদালতের আশ্রয় লওয়া হইবে, আর তাহাকে মামলার সমস্ত খরচার জন্য দায়ী করা যাইবে।

এইবার হেমাঙ্গিনী অঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন। পুত্র শিবচরণ নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা?"—মায়ের হাত হইতে সে নোটীসখানি টানিয়া লইল।

শিবচরণ বাপের বড় আদরের ছেলে, দেহে বেশ শক্তি ছিল, আর কাহাকেও সে ভয় করিত না, এ শিক্ষা সে পিতার কাছে পাইয়াছিল।—সে সকলই বুঝিত, তাহার পিতার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে যে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধাংশ ও বৈঠকখানা ছাড়িয়া দিতে সে অসম্মত হইল। চক্ষুলজ্জায় এত দিন সে চুপ করিয়া ছিল, মায়ের অপমানে আজ সে আহত সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু তখনও সে চুপ করিয়া সরিয়া গেল।

শিবচরণ অপরাহ্ণে স্কুল হইতে আসিতেছে, প্রাঙ্গনে পা দিয়াই দেখিতে পাইল ফকীরচন্দ্র ভুঁড়িটি পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া দাদ চুলকাইতে চুলকাইতে তাহার মাতাকে কি স্পর্দ্ধাসূচক কথা বলিতেছে। শিবচরণ হঠাৎ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইল, কর্কশস্বরে বলিল, "ফের যদি তুমি আমার বাড়ীর ভেতর দাঁড়িয়ে দাদ চুলকোবে, কি মার সঙ্গে সমান উত্তর করবে, তা হ'লে কান ধ'রে তোমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব।"

ফকীরচন্দ্র বলিলেন, "ইঃ—তোমার একার বাড়ী কি না!"

শিবচরণের ঘাড়ে দুষ্টসরস্বতী চাপিয়াছিল; সে বলিল, "না, তোমার বাবার জমীদারী বন্ধক দিয়ে টাকা এনে এ বাড়ী তৈয়ের করেছিলেন। নিজের সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে এখন পরের ধনে পোদ্দারীগিরি কর্ত্তে এসেছেন, লজ্জাও করে না!"

"পরের মেয়ে নিয়ে সাধু হ'বার চেষ্টা!" বলিয়া ফকীরচন্দ্র অদৃশ্য হইলেন, এবং ঘনশ্যাম উকীলের বৈঠকখানায় গিয়া একান্তমনে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।

৯

দিন দুই পরে ফকীরচন্দ্র শাশুড়ীকে বলিলেন, "মা, শীঘ্র শীঘ্র নালিশ রুজু করিবার জন্য উকীলেরা পরামর্শ দিতেছেন; এত দিন ত কবে নালিশ রুজু হইত, এ দিকে হাতে যে টাকা আছে, তা তো আর এই মামলায় ব্যয় করা যায় না। হাজার দুই টাকার জোগাড় কি রকম করিয়া হয়? টাকাটা ধার করিয়া মামলা চালাইতে চাই, মামলা করিলেই ত আমাদের জিৎ। মামলা জিতিলেই বড় তরফের ঘাড় ভাঙ্গিয়া সব টাকা আদায় করিয়া লইব। খরচার দায়ে বাড়ী বিক্রয় করিয়া লইয়া শিবেটাকে পথে বসাব। তার মাকে হাতে খোলা দিব। তোমার মার কাছ থেকে হাজার দুই টাকা এনে দাও না, আমি টাকায় এক আনা হিসাবে সুদ দিব। তিনিও ত মহাজনী করেন, আমারও মহাজন হলেনই বা।"

মধুমালতী বলিলেন, "হাঁ বাবা, মাকে বলব। বাবা কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন বটে, তা মা এতকাল খেলেন, আর আমাদের খাওয়ালেন, কি আর বেশী থাকবে? তোমার কথা তাঁকে বলব।"

মধুমালতীর উপায়হীনা বৃদ্ধা মাতা নাতজামাইয়ের জন্য টাকা লইয়া মেয়ের বাড়ী আসিলেন। ফকীরচন্দ্র এক আনা হিসাবে সুদের টাকা আগাম গণিয়া দিয়া ১২৮০৲ টাকা পাইলেন। শত্রুঞ্চ গৃহমাগতম্।

প্রায় চারি হাজার টাকা হস্তগত করিয়া ফকীরচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, অতঃপর তিনি শ্যাম ও কুল কি রাখেন!

সহসা বিধাতা তাঁহার কুলরক্ষা করিলেন!

ফকীরচন্দ্রের স্ত্রী সরোজিনীর স্বাস্থ্য কখনই ভাল ছিল না। ম্যালেরিয়ায় তাহার দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিল; এই অবস্থায় একটি কন্যা প্রসব করিয়া সরোজিনীর পনের বৎসরের সংসারলীলার অবসান হইল। একদিনমাত্র জীবিত থাকিয়া কন্যাটিও মায়ের অনুসরণ করিল।

মধুমালতী মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; তাঁহার হৃদয়ভেদী রোদনে পাষাণও গলিয়া গেল। মেয়েটিই তাঁহার সংসারে একমাত্র অবলম্বন ছিল, এবং এই মেয়ের জন্যই তিনি আজন্মের হিতৈষিণী বড়দিদির সঙ্গে 'বিষয়' লইয়া মামলা করিয়াছেন। তিনি বিদীর্ণহৃদয়ে বলিলেন, "মা! তুই আমাকেও সঙ্গে নিলিনে কেন?"

বিস্ময়ের কথা এই যে, সেই রাত্রেই ফকীরচন্দ্র মামলার তদ্বির করিবার জন্য জেলায় চলিলেন!—কিন্তু আজও গেলেন, কালও গেলেন। মধুমালতী মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিলেন; ঘর শূন্য,—কোনও দিকে সাড়াশব্দ নাই; কেবল একটা টিকটিকি কড়িকাঠের কাছে এক-একবার টিক্ টিক্ করিতেছে।

এমন সময় দরজা ঠেলিয়া সেই কক্ষে শিবচরণ প্রবেশ করিল, বলিল, "কাকীমা, উঠে এস, মা তোমার জন্যে ভাত বেড়ে বসে আছেন, কেঁদে কেঁদে শরীর নষ্ট ক'রে ত কোনও লাভ নেই।"

এক মাস চলিয়া গিয়াছে, ফকীরচন্দ্রের কোনও সংবাদ নাই। ঘনশ্যামবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাই ত, লোকটা যে এত পাজী, তা ত তখন মনে হয় নাই।"—ফকীরচন্দ্রকে পত্র লেখা হইল,—"তোমার শাশুড়ী আর মামলা করিতে ইচ্ছুক নহেন, তুমি বাড়ী ফিরিয়া এস।"

কেহ বাড়ী ফিরিল না। উৎকণ্ঠায় মধুমালতীর দারুণ কন্যাশোকও ঢাকিয়া গেল। তিনি লিখিলেন, "তুমি না আসিলে আমি অনাহারে মরিব; শিবু নাবালক, কতদিন আমি তাহার খাইব?"

এবার এক পত্র আসিল। একখানি চৌকা গোলাপী রঙের খামে মোড়া। মধুমালতী নিজে লেখাপড়া জানিতেন না, শ্বশুরের বটকৃষ্ণ তাঁহার পত্রাদি লিখিত। মধুমালতী বটকৃষ্ণকে ডাকাইয়া পত্রখানি তাহাকে পড়িতে দিলেন। পত্রে যাহা লেখা ছিল, তাহার তাৎপর্য্য এই,—বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসের ২৯এ তারিখে দয়ানন্দপুরের জমীদার স্বর্গীয় রামজয় পাকড়াশীর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবীর সহিত ডাক্তার ফকীরচন্দ্রের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইবে। অতএব তিনি যেন এই উপলক্ষে কলিকাতার নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করেন।—পথখরচ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে।—পত্রের নীচে মাতুল বীরভদ্র বটকের নামস্বাক্ষর।

মধুমালতী হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন; নূতন করিয়া সংসার অন্ধকার দেখিলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার আক্ষেপ করিবার শক্তি পর্য্যন্ত রহিল না। তাহার

পর তিনি ভগ্নস্বরে চীৎকার করিয়া মাটীতে লুটাইতে লুটাইতে বলিলেন, "হায়, হায়, কোথাকার এক হতভাগার হাতে আমার, আমার মার সর্ব্বস্ব সঁপে দিয়ে সব খোয়ালেম !"

হেমাঙ্গিনী ব্যস্তভাবে মধুমালতীর কক্ষে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ছোট বৌ ! —হঠাৎ এ কি !"

মধুমালতী পত্রখানি দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ, আমার মাথা আর মুণ্ডু !" হেমাঙ্গিনী লেখাপড়া জানিতেন, পত্রখানি পড়িয়া মুখ তুলিলেন। মধুমালতী তখন নিতান্ত বিকলভাবে হেমাঙ্গিনীর পায়ের গাছে গড়াইয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার গতি কি হ'বে দিদি !—এখন আমি কার দুয়োরে দাঁড়াব ?"

হেমাঙ্গিনী ধীরে ধীরে বসিলেন, ধীরে ধীরে অতি যত্নে ও সাবধানে সেই ধূল্যবলুণ্ঠিতা, সর্ব্বস্ববঞ্চিতা অভাগিনীকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন ; এবং অঞ্চলে তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন,—

"কাঁদিস্‌নে বোন। যা অদৃষ্টে ছিল, হয়েছে। তোর যত আপনার লোক পর হোক না কেন, তুই কখন আমার পর হ'বি নে। ষষ্ঠীর দয়ায় শিবু আমার এক শ' বছরের হ'য়ে বেঁচে থাক, তোকে কখনও এক মুঠো ভাতের জন্য পরের দুয়ারে যেতে হ'বে না। আমি দুটো খেতে পাই ত তুইও পাবি।"

ফকীরচন্দ্র এখন কলিকাতার সেই ঐশ্বর্য্যবান পাকড়াশী ভূম্যধিকারীর জামাই। কর্ত্তা বাঁচিয়া নাই, মেয়েটি ও জামাইটি লইয়া কর্ত্রী কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন। তুচ্ছ সামগ্রীতে আর এখন ফকীরচন্দ্রের লোভ নাই ; সুতরাং শিবচরণ নিষ্কণ্টক হইয়াছে। ফকীরচন্দ্র কুসুমপুরের অনাথা শাশুড়ীকে ঋণের সামান্য কয়েকটা টাকা প্রত্যর্পণ করাও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ মনে করিলেন।

ফকীরচন্দ্র বঙ্গচ্ছেদে বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের অনুকূলে মত দিয়াছিলেন, গোপনে লিখিয়াছিলেন, ইহাতে বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালী জাতির মঙ্গল হইবে।

বিধাতার যাহা সাধ্য, ফকীরচন্দ্রকে একাল পর্য্যন্ত তাহা তিনি দিয়া আসিয়াছেন। সরকার বাহাদুর এবার তাঁহাকে কি উপাধি দান করিতে পারেন, রায় বাহাদুর, না একদম্ সি. আই. ই., তাহাই আমরা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি।

দুরাশা

১

যখন দারিদ্র্যও মানবের উচ্চ আশার বিস্তার রোধ করিতে পারে না, তখন মধ্যবিত্ত হচিন্স দম্পতির পক্ষে একমাত্র সন্তান জর্জ্জকে সুশিক্ষিত করিয়া তাহার সম্পদ ও সম্মানলাভের পথ মুক্ত প্রসারিত ও সুগম করিবার চেষ্টা নিন্দনীয় বলা যায় না। জর্জ্জের পিতা মফঃস্বল সহরে ব্যাঙ্কে চাকরী করিতেন; যে বেতন পাইতেন, তাহাতে সংসারে কখনও অভাব অনুভূত হয় নাই। তাঁহার মাতা ব্যাঙ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী ম্যানেজারের দুহিতা। যৌবনে তিনি রূপলাবণ্য হেতু সহরের সমাজে সুপরিচিতা ছিলেন। জর্জ্জের পিতা রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। পিতার মৃত্যুশয্যায় কন্যার অকাতর শুশ্রূষায় বিস্মিত হইয়া তিনি তাঁহাকে দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন। সেই শ্রদ্ধা তাঁহাকে জর্জ্জের ভাবী জননীর প্রতি আকৃষ্ট করে। তাহার ফলে উভয়ের পরিণয়।

সহরের বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়া জর্জ্জ দূরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিল। জর্জ্জ যে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রা করিল, সে দিন তাহার পিতা-মাতা ও তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবাদি তাহাকে বিদায় দিতে রেলওয়ে-ষ্টেশনে আসিলেন। যখন গাড়ী ছাড়িয়া দিল, তখন দুই জন রমণী ছলছলনেত্রে যত দূর দেখা গেল, সেই গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। জর্জ্জ গাড়ীর বাতায়নপথে রুমাল নাড়িতেছে, দেখিতে লাগিলেন। গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেলে উভয়েই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এক জন জর্জ্জের স্নেহময়ী জননী, অন্য জন তাহার প্রতিবেশি-কন্যা হেলেন।

পরিচিত সহরের পরিচিত ষ্টেশন যখন অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন জর্জ্জ গাড়ীতে স্থির হইয়া বসিল। যুবক প্রবীণত্ব-প্রাপ্তির ভান করে। তাই এতক্ষণ জর্জ্জ সংসারসংগ্রামে অপগতযৌবনমনোবেগ স্থির প্রবীণ বয়স্কের গাম্ভীর্য্যের অনুকরণ করিয়াছিল। আর পারিল না। উদ্বেলিত হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাহার নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। জননীর কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আর হেলেনের মুখ মনে পড়িতে লাগিল। বিদায়কালে তাহার কাতর মুখচ্ছবি, অশ্রুসজল নয়নের করুণভাব, সে কি ভুলিবার? যৌবনে—যখন

মনোবৃত্তির প্রথম উন্মেষ, পরিস্ফুটকুসুমগন্ধামোদিত হৃদয়নন্দনে যখন নবাগত বসন্তের প্রথম বিহগকূজন, তখন অনাবিল প্রেম শৈশবসহচরীর ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ প্রীতিস্নিগ্ধ আয়ত লোচনে যে দিব্যদীপ্তি দর্শন করে, তাহা জীবনে আর কখনও দর্শন করা যায় না। তখন প্রেম অবলম্বনের সন্ধান করে, এবং প্রথমপ্রাপ্ত অবলম্বনকে বেষ্টন করিয়া আপনার সৌন্দর্য্যে তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলে, এবং সেই সৌন্দর্য্যে আপনি মুগ্ধ হয়।

হেলেন বয়সে জর্জ্জ অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। শৈশব হইতে উভয়ে একত্র খেলা করিয়াছে। জর্জ্জ যখন কণ্টকতরু হইতে ফুল তুলিয়া রক্তাক্তহস্তে হেলেনকে তাহা দিয়াছে, তখন হেলেন জল আনিয়া সে হস্ত ধৌত করিয়াছে; সে যখন পুষ্পমধুপানমত্ত প্রজাপতির পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে, তখন হেলেন তাহার বল দেখিয়া বিস্মিতা হইয়াছে। সে যখন নদীসৈকতে বসিয়া হেলেনকে নদী, পর্ব্বত, তারকা প্রভৃতির সম্বন্ধে তাহার নবলব্ধ জ্ঞানের কথা বলিত, তখন হেলেন তাহার বিদ্যার গভীরতায় মুগ্ধা হইত। এমনই ভাবে এত দিন কাটিয়াছে। ইহার মধ্যে কবে হেলেনের কোমল হৃদয়ে অজ্ঞাতে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সে জানিতে পারে নাই। আজ তাহার যোড়শবর্ষ বয়সে—যখন তাহার বাল্যকাল কেবল যৌবনে আসিয়া বিকশিত হইয়াছে, অথচ যৌবন এখনও তাহার বিকাশ অনুভব করিতে পারিতেছে না, সেই সময়, এই বিচ্ছেদবেদনা বর্ষাবারিপাতে ধরণীর স্নিগ্ধ শান্তি ও শ্যাম শোভার মত তাহার যৌবন ও প্রেম উভয়েই আত্মপ্রকাশ করিল।

জর্জ্জের হৃদয়েও সে প্রেমের ছায়া পড়িয়াছিল; নহিলে আজ যাইবার সময় হেলেনের কাতর মুখচ্ছবি কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল কেন?

২

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া প্রথম প্রথম জর্জ্জের মন তাহার সেই দূরগৃহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। যুবকদলসংসর্গে সে ভাব শীঘ্রই দূর হইয়া গেল। তাহার পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইল। গৃহে শাসন ও সংযম,—এখানে স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার। গৃহে পিতামাতার স্নেহসতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদাই তাহাকে লক্ষ্য করিত, এখানে কতকগুলি বাঁধা নিয়ম মানিয়া চলা ব্যতীত সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। বরং যুবকদলে সেই সকল নিয়মের ব্যতিক্রমও প্রশংসিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন কতিপয় যুবক

আপনারা একটি স্বতন্ত্র দল গঠিত করিয়া লইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ তাহাদিগের উপযোগী ছিল না; সাহিত্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগে খ্যাতি-অর্জ্জন ও কীর্ত্তিসংস্থাপন তাহাদের নিয়তি। তাহারা সাধারণ ছাত্রদল হইতে বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। জর্জ্জ সেই দলে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ঋষির আদর্শ সমুন্নত; কিন্তু অবস্থা না বুঝিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহারই অনুকরণ সংসারীর পক্ষে সকল সময় সুখের কারণ হয় না। এই ছাত্রদলের অনুকরণ জর্জ্জের পক্ষে সেইরূপ হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠে তাহার আর মন বসিল না। সে সাহিত্যচর্চ্চা করিতে লাগিল,—গদ্য ও পদ্য রচনায় তাহার ডেস্ক পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, কোনও মাসিকপত্র-সম্পাদকই তাহার স্বহস্তে ডাকবাক্সে প্রদত্ত সেই সকল অমূল্য রচনা প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করিলেন না। আহত অভিমানে অনাদৃত কবি ও ঔপন্যাসিক সমালোচক হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। চারি বৎসরে এই হইল।

এই সময়ের মধ্যে জর্জ্জ ছুটীতে কয়বার বাটীতে গিয়াছে। কিন্তু তখন তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যচর্চ্চাশূন্য ও সাহিত্য-সঙ্গিবিবর্জ্জিত গৃহে তখন তাহার আর পূর্ব্বের আকর্ষণ নাই। সে গৃহে আসিলে বিদ্যালয়ে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইত। গৃহে তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। তাহার জননী তাহাকে ব্যথিতা হইতেন; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেন না।

জর্জ্জের এই ব্যবহারে আর এক জন অন্তরে বিষম ব্যথা পাইত—সে হেলেন। হেলেনের প্রেম জর্জ্জকে বেষ্টন করিয়া স্বপ্নস্বর্গ রচনা করিয়াছিল। সে দেখিতে লাগিল, জর্জ্জ ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে; তাহার আবেগ ক্রমে ঔদাস্যে পরিণত হইতেছে। সে অনাদর তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, জর্জ্জ সহরে বাস করে; সে গুণহীনা শৈশব-সহচরীকে বিস্মৃত হইয়াছে। তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? দীপ্তদিবাকর-দ্যুতির নিকট খদ্যোতের ক্ষীণ জ্যোতিঃ কে লক্ষ্য করে? কিন্তু হায়!—যাহারা গর্ব্বরক্ত গোলাপ পাইবে, তাহারা ভুলিয়া পত্রান্তরালবর্ত্তী কুন্দকলিকে আদর করে কেন? বিজন বনবাসে- পত্রচ্ছায়াই কুন্দকুসুমের উপযুক্ত আবাস। সে কি তাহা জানে না? কিন্তু—কে তাহার আশা বাড়াইয়াছিল? হেলেন মনের দুঃখ মনেই রাখিত, প্রকাশ করিত না। কিন্তু কুসুমহৃদয়বদ্ধ কীট যেমন ফুলের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে, সেই মর্ম্মবেদনা তেমনই তাহার নবস্ফুট

সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে লাগিল। তাহার নয়নে আর যৌবনচাঞ্চল্য নাই,—তাহাতে কাতরতা স্বপ্রকাশ। তাহার আননে অকালগাম্ভীর্য্য প্রফুল্লতাকে দূর করিল—যেন অকালজলদোদয়ে কমলকুলানন্দ রবিকর নিবারণ করিল।

জর্জ্জ গৃহে আসিলে হেলেনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত। কিন্তু সে হেলেনের কাতর মুখভাবে তাহার যাতনার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারিত না। সে তখন এমনই অন্ধ!

জর্জ্জ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া হেলেনকে বিবাহ করিবে, ইহাই জর্জ্জের পিতামাতার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, জর্জ্জ তাহার শৈশবসঙ্গিনীকে সত্য সত্যই ভালবাসে; কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলে সে আপনিই তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিবে; তাঁহাদের আর সে কথা বলিতে হইবে না।

৩

বলিয়াছি, অনাদৃত কবি ও ঔপন্যাসিক জর্জ্জ সমালোচক হইবার কল্পনা করিতেছিল। সে বাসনা কার্য্যে পরিণত হইল না। পঞ্চমবর্ষের প্রারম্ভেই তাহার পিতার মৃত্যু হইল। সংসারের ভার জর্জ্জের স্কন্ধে পড়িল। সাহিত্য-সেবায় ব্যয় যথেষ্ট হইয়াছে, আয়ের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। কাযেই জর্জ্জকে অন্য চেষ্টা করিতে হইল। চাকরীর চেষ্টায় জর্জ্জ কর্ম্মকেন্দ্র রাজধানীতে ভাগ্যপরীক্ষা করিতে আসিল।

নিদাঘে যখন দারুণ তাপে প্রকৃতি কাতরা হইয়া উঠে, তখন চাতকের আহ্বান সত্ত্বেও জলদ বিন্দুবর্ষণ করে না; কিন্তু সময়ে সেই নীরদ আপনি হৃদয়-রস-দানে ধরা প্লাবিত করিয়া দেয়। ভাগ্য কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাতও করেন না, আবার কখনও স্বেচ্ছায় অপ্রত্যাশিত সাফল্যদান করেন। এত দিনে ভাগ্যদেবী জর্জ্জের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দুই তিন দিনের চেষ্টায় তাহার একটি চাকরী জুটিল। তাহার এক জন সতীর্থ সাহিত্যিক-দলে না মিশিয়া সাধারণ ছাত্রদলে সাধারণ ছাত্রপাঠ্য পাঠে মনোযোগ দিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি গভর্মেণ্টের কোনও আফিসে প্রধান সহকারীর কার্য্য করিতেন। তাঁহার কৃপায় জর্জ্জের চাকরী হইল,—বেতনও নিতান্ত সামান্য নহে। জর্জ্জের চাকরী হইবার দশ দিন পরে তাহার একখানি পত্র তাহার কলেজ ও বাড়ী ঘুরিয়া তাহার হস্তগত হইল। "নব-মাসিক" পত্রে তাহার একটি গল্প গৃহীত হইয়াছে;—সম্পাদিকা কুমারী মেরী ব্রাউন

তাহাকে এই সংবাদ জানাইয়াছেন, এবং তাহাকে, সম্ভব হইলে, আরও গল্প দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

পত্রপাঠ করিয়া জর্জ্জ আনন্দমত্ততায় বিহ্বল হইল। সে দুইবার—তিনবার পত্রখানি পাঠ করিল। কি অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য,—কি আনন্দের সংবাদ! সৌভাগ্যের অরুণ কিরণের বিকাশ কি মধুময়! সে আবার পত্রখানি পাঠ করিল;—সম্পাদিকার হস্তাক্ষর স্পষ্ট, শোভন; পত্রের কথাগুলি সুসংবদ্ধ—সযত্নরচিত। সে আবার পত্রখানি পাঠ করিল; তাহার পর পোর্টমেণ্ট খুলিয়া রচনার খাতাগুলি বাহির করিল।

প্রত্যেক গল্পের সহিত, প্রত্যেক কবিতার সহিত কত স্মৃতি জড়িত! জর্জ্জ আবার সেগুলি পড়িতে লাগিল। তাহার অজ্ঞাতে কখন্ দিনান্ত-তপন পশ্চিমমেঘে অন্তর্হিত হইতেছিল, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। অস্পষ্ট আলোকে আর অক্ষর দৃষ্টিগোচর হয় না। জর্জ্জ খাতা রাখিয়া উঠিল। আফিস হইতে ফিরিয়াই সে পত্র পাইয়াছিল,—সে বেশপরিবর্ত্তনও করে নাই।

সন্ধ্যায় সে আলোক জ্বালিয়া আবার রচনার খাতা লইয়া বসিল; বাছিয়া বাছিয়া দুইটি গল্প ও দুইটি কবিতা নকল করিল। যখন সে কলম রাখিয়া উঠিল, তখন রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। সে আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া শয়ন করিল; দারুণ শ্রমের পর অল্পক্ষণেই প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।

প্রভাতে যখন জর্জ্জের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বেলা আটটা। সে ঘড়ী দেখিয়া এক লম্ফে শয্যাত্যাগ করিল।

আফিসে যাইবার সময় জর্জ্জ পূর্ব্বরাত্রে নকল করা গল্প ও কবিতা সঙ্গে লইয়া গেল।

৪

কোনও অছিলায় আফিস হইতে একটু সকালে বিদায় লইয়া জর্জ্জ 'নব-মাসিক' আফিসে যাত্রা করিল।

আফিসে সে শ্বেতশ্মশ্রু, বিরলকেশ কার্য্যাধ্যক্ষের সমীপে নীত হইল। কার্য্যাধ্যক্ষ কি লিখিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া চশমার মধ্য দিয়া তীব্র দৃষ্টিতে জর্জ্জকে দেখিয়া লইলেন। সে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় জর্জ্জের বিকাশোন্মুখ গর্ব্ব-শতদল যেন শুকাইয়া উঠিল। কার্য্যাধ্যক্ষ জর্জ্জকে বসিতে বলিয়া, তাহার আবশ্যক কি, জিজ্ঞাসা করিলেন।

জর্জ্জ তাহার প্রয়োজন বিবৃত করিল।

এইরূপ নূতন লেখকের অত্যাচার কার্য্যাধ্যক্ষকে সর্ব্বদাই সহ্য করিতে হইত। তিনি জর্জ্জের পাণ্ডুলিপি ও পত্র সম্পাদিকাকে পাঠাইয়া দিবেন, বলিলেন।

সেই দিন জর্জ্জ জানিয়া আসিল, সম্পাদিকা কুমারী ব্রাউন বিচারক সার্ রবার্ট ব্রাউনের বিদুষী কন্যা।

সাত দিন পরে জর্জ্জ সংবাদ পাইল, তাহার গল্প ও কবিতা গৃহীত হইয়াছে। ইহার পর রাত্রিজাগরণ করিয়া গল্প ও কবিতা-রচনা জর্জ্জের নিত্য কর্ম্ম হইয়া উঠিল। সব রচনা 'নব-মাসিক' আফিসে জমা হইতে লাগিল। সম্পাদিকার সহিত লেখকের পত্রব্যবহার ক্রমে আর বিরল রহিল না। এই ভাবে দুই মাস কাটিল।

তাহার পর 'নব-মাসিকে'র জন্মদিনের বার্ষিক উৎসবে জর্জ্জ নিমন্ত্রিত হইল। আফিসে স্থানাভাব; লেখকলেখিকাগণ সম্পাদিকার গৃহে সমবেত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই সমাগমে, বহু লেখক লেখিকার মধ্যে—কৃষ্ণ পরিচ্ছদ ও সমুজ্জ্বল অলঙ্কারের সমাবেশে—উজ্জ্বল বিদ্যুদালোকে রত্নদীপ্তি ও দীপ্ত দৃষ্টির মধ্যে, জর্জ্জের সহিত কুমারী ব্রাউনের পরিচয় হইল।

সান্ধ্যসমিতি হইতে জর্জ্জ গৃহে ফিরিল। তাহার জীবন-নাটকে নূতন অঙ্কের অভিনয় আরব্ধ হইল—আবার পরিবর্ত্তন সূচিত হইল। সমস্ত রাত্রি সে সুখস্বপ্ন রচনা করিতে লাগিল—অতীত অন্ধকার—ভবিষ্যৎ সুখ-সমুজ্জ্বল—যশ, সম্মান,—আর—প্রেম! জগতে কিছুই অসম্ভব নহে। দ্বাবিংশবর্ষবয়স্কের সুখস্বপ্ন!

৫

'নব-মাসিকে'র প্রতি জর্জ্জের অসাধারণ যত্নে সম্পাদিকার সহিত অল্প দিনেই তাহার কিছু ঘনিষ্ঠ ভাব জন্মিল। সে প্রথমতঃ দীর্ঘকাল নিষ্ফল চেষ্টার পর এই পত্রে যশের দ্বার মুক্ত দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল; ক্রমে সে আকর্ষণ পত্রকে ছাড়াইয়া সম্পাদিকাকেও স্পর্শ করিল। যৌবনকে বিশ্বাস করিতে নাই।

বিদুষী রমণীর সহিত পূর্ব্বে কখনও জর্জ্জের পরিচয় হয় নাই। কুমারী ব্রাউনের ব্যবহার ও কথোপকথন তাহার নিকট যেমন নূতন, তেমনই মধুর

বোধ হইতে লাগিল। সে যেন স্বপ্নাবেশবিহ্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এই-রূপ স্বপ্নে বর্ষাধিককাল কাটিয়া গেল।

এই সময় জর্জ্জ একবার গৃহে গমন করিল। তাহার জননী তাহার চাকরীতে আহ্লাদিতা ও তাহার সাহিত্যিক সাফল্যে গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন। আর এক জন রমণী তাঁহার আহ্লাদের ও গর্ব্বের অংশ লইয়াছিল—সে হেলেন। জর্জ্জের বিধবা জননীর নিঃসঙ্গবাসে সে-ই তাঁহার কাছে থাকিয়া তাঁহার নিঃসঙ্গবাসযাতনা দূর করিত। জর্জ্জের জননী পুত্রের আগমনপথ চাহিয়া ছিলেন,—আশা করিয়াছিলেন, উপার্জ্জনক্ষম পুত্র এইবার আসিলে তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে। এই সময়ের মধ্যে হেলেন তাঁহার কত আপনার, কত অত্যাবশ্যক হইয়াছে, তাহা দেখিলে, সে হেলেনকে তাঁহার দুহিতা করিবে। তেমন গুণবতী বধূ তিনি আর কোথায় পাইবেন?

জর্জ্জ গৃহে আসিল। সে জননীর প্রতি হেলেনের ব্যবহার লক্ষ্য করিল। কিন্তু তাহাতে সে আকৃষ্ট হইল না। তাহার জননী পুত্রের ভাব লক্ষ্য করিলেন; পুত্রকে উদাসীন দেখিয়া মনের কথা স্বয়ং পুত্রকে বলিলেন। জর্জ্জ সে কথা মনেই করে নাই। সে বিপদ গণিল;—আরও দিন কতক পরে,—পুনরায় ছুটীতে গৃহে আসিয়া সে সঙ্কল্প স্থির করিবে—জননীকে এরূপ বুঝাইল। জননী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মাতৃহৃদয়ে বিষাদের ও সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

সরলা হেলেনের কথায় জর্জ্জের বিদুষী কুমারী ব্রাউনকে মনে পড়িল। উভয়ে কি প্রভেদ! সে সরল বাঁশের বাঁশীতে বীণার ঝঙ্কার পাইবে কিরূপে? হায়, সরল বাঁশের বাঁশী, তুমিও হৃদয়োত্থিত মধুর স্বরে মুগ্ধ করিতে পার সত্য, কিন্তু সে যখন কেহ তোমার হৃদয়ে হৃদয়াবেগ ঢালিয়া দেয়। তোমার হৃদয়তন্ত্রী মর্ম্মাবেগস্পর্শ ব্যতীত—সামান্য অঙ্গুলীকম্পনে কাঁপিয়া উঠে না। সকলে তোমার মূল্য বুঝে না।

জর্জ্জ কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেল।

৬

প্রণয়ে প্রথম পথ দ্রুত অতিক্রান্ত হয়। জর্জ্জের তাহাই হইয়াছিল। কোনও বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলে, যদি তাহাতে বাধা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, তবে মানুষ যত সত্বর সম্ভব, তাহা শেষ করিতে চাহে। গৃহ হইতে ফিরিয়া জর্জ্জ কুমারী ব্রাউনকে পাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইল। মন সঙ্কল্পের দাস; সঙ্কল্প

যাহা দেখায়, মন তাহাই দেখে। তাই জর্জ্জের মন কুমারী ব্রাউনের ব্যবহারে তাহার প্রতি কুমারীর প্রেমের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে লাগিল। বিশেষতঃ পুংবৎপ্রগল্‌ভা বলিয়া কুমারী ব্রাউনের খ্যাতি ছিল। অন্য রমণী যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে সঙ্কুচিতা হয়েন, কুমারী ব্রাউন নিঃসঙ্কোচে সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন। জর্জ্জের মন জর্জ্জকে বুঝাইল,—প্রেম যুবক যুবতীকে পরস্পরের সন্নিহিত করিতে চাহে, যুবককে যুবতীর লজ্জা ও যুবতীকে যুবকের সাহস প্রদান করে; এ সকল আলোচনা সেই প্রণয়-প্রদত্ত সাহসের ফল। জর্জ্জের আশা বাড়িয়া গেল।

জর্জ্জ কয় দিন চেষ্টার পর, অনেকগুলি কাগজ নষ্ট করিয়া কুমারী ব্রাউনকে আপনার প্রস্তাব জ্ঞাপন করিল। কবিজনোচিত যুক্তিতে ও ভাষায় সে পত্র পূর্ণ। সে লিখিল, সে কুমারী ব্রাউনের অনুপযুক্ত, কিন্তু প্রেম-সূর্য্য শতদল-দলেও যেমন, তৃণ-কুসুমেও তেমনই কিরণ দান করে। তাঁহারই প্রেমের কিরণে তাহার এ প্রেমপ্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন কি? সে বর্ষাধিককাল হৃদয়ে এই বাসনা লইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছে,—বুঝিয়াছে, সে অযোগ্য হইলেও, তিনি অন্যকে যে অনুগ্রহ করেন, তদপেক্ষা তাহাকে অধিক অনুগ্রহ করেন। তাহাতেই সাহসী হইয়া সে এই প্রস্তাব করিল।

সে দিন কুমারী ব্রাউনের গৃহে সান্ধ্যসমিতিতে তাহার নিমন্ত্রণ ছিল। সে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গেল। তাহার হৃদয় উদ্বেগকম্পিত, আশঙ্কায় তাহার মুখ পাণ্ডুর, তাহার নয়নে আশার উজ্জ্বল দীপ্তি।

৭

সান্ধ্যসমিতিতে জর্জ্জের প্রতি কুমারী ব্রাউনের ব্যবহার যদি বিরক্তিব্যঞ্জক না হইয়া থাকে, সে কেবল ভদ্রতার্থ। কারণ, শিক্ষিত রমণীকে আর শিখাইতে হয় না যে, অতিথির প্রতি বিরক্তি-প্রকাশ ভদ্রতার নিয়মবিরুদ্ধ। জর্জ্জ তাঁহার ব্যবহার লক্ষ্য করিল। কিন্তু সহজে কেহ আশা ত্যাগ করে না। সে ভাবিল, ইহা লজ্জার বিকাশমাত্র।

গৃহে ফিরিয়া জর্জ্জ দেখিল, কুমারী ব্রাউনের পত্র আসিয়াছে। তাহার হৃদয় বেগে আঘাত করিতে লাগিল। সে খামখানি চুম্বন করিল; তাহার পর সযত্নে ধীরে ধীরে খুলিয়া পত্রখানি পাঠ করিল। পত্রখানি কুমারী ব্রাউনের বিশেষত্বব্যঞ্জক—পুরুষোচিত কঠোরতার পরিচায়ক। জর্জ্জের

পত্রে তিনি বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়াছেন। পুরুষ ও মহিলার পরিচয়কে যাহারা অনুরাগের নামান্তরমাত্র বিবেচনা করে, তাহারা সমাজের পক্ষে ত্যজ্য। জর্জ্জ সামাজিক ও অন্যবিধ সমস্ত ব্যবধান অসাধারণ সাহসে অবহেলা করিয়াছেন। কুমারী ব্রাউনের অনুরাগ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কবিজনোচিত হইতে পারে, কিন্তু সেই ধারণার বিষয় অবগত হইবার পর কুমারী ব্রাউন আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ বা পত্রব্যবহার করা সঙ্গত মনে করেন না।

জর্জ্জের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; আকাশকুসুম আকাশেই ঝরিয়া গেল। পত্রের প্রত্যেক কথা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে দরিদ্র,—সে হীন!

জর্জ্জ আবার পত্রখানি পাঠ করিবার চেষ্টা করিল—পারিল না। সে কি ভ্রান্ত!—সে কি ভ্রান্ত!

জর্জ্জ উন্মাদের মত কক্ষমধ্যে পরিক্রম করিতে লাগিল। সে যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। হৃদয়ে যন্ত্রণা যেন ক্রমেই তীব্রতর হইতে লাগিল। সহসা টেবলের উপর একটা পাত্র তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কয় দিন পূর্ব্বে তাহার গ্রীবায় বেদনা অনুভূত হইলে চিকিৎসক এই ঔষধলেপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জর্জ্জের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া গিয়া পাত্র তুলিয়া লইল।

৮

চেতনাসঞ্চার হইলে জর্জ্জ দেখিল, মধ্যাহ্ন;—সে হাঁসপাতালে;—তাহার সতীর্থ—আফিসের সহকারী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন। একে একে সকল কথা তাহার মনে পড়িল।

তাহার সহপাঠী বন্ধু অপরাহ্নে আবার আসিলেন। জর্জ্জের পকেটে তাঁহার একখানি পত্র পাইয়া হাঁসপাতালের কর্ম্মচারীরা প্রথমে তাঁহাকেই সংবাদ দিয়াছিল। জিজ্ঞাসিত হইয়া জর্জ্জ তাঁহার নিকট সকল কথা বলিল। তিনি তিরস্কার করিলেন না, সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, বুঝাইলেন।

রাত্রিকালে জর্জ্জ বহুক্ষণ ভাবিল। তাহার গৃহ ও গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জননীকে মনে পড়িল; আর সঙ্গে সঙ্গে আজ হেলেনের বিষাদমলিন মুখচ্ছবি স্মৃতিপটে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে যে তাহারই পথ চাহিয়া আছে! অসার কাচের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া সে মহার্ঘ রত্ন হেলায় হারাইতে বসিয়া-

ছিল। তুলনায় আজ সরলা হেলেনকে কত উন্নত, কত মধুর বোধ হইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার পর জর্জ্জের নামে আত্মহত্যার চেষ্টার জন্য নালিশ হইল। বিচারক - সার্ রবার্ট ব্রাউন। জর্জ্জের পক্ষে তাহার সেই বন্ধু মকদ্দমার তদ্বির করিতেছিলেন। তিনি আফিসে জর্জ্জকে এক পক্ষের অবকাশ দিলেন; সে মকর্দ্দমার জন্য প্রস্তুত হইবে।

বন্ধু আশা করিয়াছিলেন, সার্ রবার্ট জর্জ্জকে চেনেন; অবস্থাবিবেচনায় তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। কন্যার সাহিত্যানুরাগের ফলে তাঁহাকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইত; তাই তিনি সুযোগ পাইলেই সাহিত্যের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। জর্জ্জের সমর্থক ব্যারিষ্টার কবিজনের মানসিক অবস্থা, চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তনশীলতা প্রভৃতি নানা কথা বলিলেন। উত্তরে সার্ রবার্ট বলিলেন, সাধারণ অপরাধী অপেক্ষা এইরূপ অপরাধীকে গুরুতর শাস্তিদান করা কর্ত্তব্য। ইহারা শিক্ষার অপব্যবহার করে, কেবল আপনারা নষ্ট হইয়াই নিরস্ত হয় না; সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা বালিকাদিগকে দেবী[illegible] সমাসীনা করিয়া সংসারের অনুপযোগিনী করে। তিনি জর্জ্জের তিন শত টাকা অর্থদণ্ড করিলেন। জর্জ্জের বন্ধু আদালতে উপস্থিত ছিলেন; তিনি জরিমানার টাকা দিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেলেন।

বন্ধুগৃহে কিছুক্ষণ কাটাইয়া জর্জ্জ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার আর কয় দিন ছুটী আছে?'

বন্ধু বলিলেন, 'আর সাত দিন। কেন?'

'আমি বাড়ী যাইব।'

জর্জ্জ বন্ধুগৃহ হইতে আপনার বাসায় আসিল।

বাসায় আসিয়া জর্জ্জ দেখিল, 'নব-মাসিক' আফিসের লোক কুমারী ব্রাউনের পত্র লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। পত্রখানি লইতে প্রথমতঃ তাহার প্রবৃত্তি হইল না। শেষে সে পত্রখানি লইল। কক্ষমধ্যে যাইয়া সে দীপালোকে সেখানি পাঠ করিল। কুমারী ব্রাউন তাহার দণ্ডের কথা শুনিয়াছেন। সে তাহার অবিবেচনার ফলে কষ্ট পাইয়াছে, সে জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন, এবং 'নব-মাসিকের' সম্পাদিকারূপে 'নব মাসিকে'র লেখকের সাহায্যার্থ তিন শত টাকা পাঠাইয়াছেন।

জর্জ্জ পত্র ও নোট কয়খানি হর্ম্ম্যতলে ফেলিয়া দিল। তাহার পর সে ভাবিতে লাগিল। কি উপহাস! তাহার অবস্থায়, সামাজিক সম্মানে, ক্ষমতায় কি বিদ্রূপ! কি দুরাশায় চালিত হইয়া সে এই গর্ব্বিতাকে মানস-কল্পিতা দেবীকে দেখিয়াছিল? সে মধ্যবিত্তের গৌরব বিস্মৃত হইয়াছিল,—সে তাহার ফল পাইয়াছে। তখন আবার হেলেনকে মনে পড়িল। অভ্রভেদী প্রাণিমাত্রহীন গিরিশৃঙ্গের গর্ব্বোদ্ধত গাম্ভীর্য্যের তুলনায় শ্যামশোভাসম্পন্ন, নির্ঝরকলনাদমুখরিত, তরুমর্ম্মরধ্বনিত, জীবকুলাশ্রয় প্রান্তরের শোভা কত মধুর!

জর্জ্জ উঠিল। পত্র না লিখিয়া একখানি খামে কুমারী ব্রাউনের প্রেরিত নোট কয়খানি পুরিয়া সেই লোকের নিকট প্রত্যর্পণ করিল। সে এ পর্য্যন্ত কুমারী ব্রাউনের নিকট আর যত পত্র পাইয়াছিল, সে সব একটি সুদৃশ্য বাক্সে বদ্ধ ছিল। সেগুলি বাহির করিয়া সে সব পত্রগুলি ভস্মীভূত করিল। তাহার পর ব্যাগ লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল

বীর।

[১]

১

নাহি সে অতীত সম্পদরাশি, সে বিপুল জনবল;
জীর্ণ তোরণ,—দুর্গপ্রাচীর; শুষ্ক পরিখাজল।
সম্পদ-রবি অস্ত-অচলে, ভাগ্য-লক্ষ্মী বাম,—
শুধু গৌরব-স্মৃতি ঘিরি' আছে বিজয়দুর্গ-নাম।
খণ্ডরাজ্য উঠেছে তাহার হৃত সম্পদ 'পরে,
নিবিলে তপন, চন্দ্র যেমন উজ্জ্বল তা'র করে।

২

কৃষ্ণনগড়ের তরুণ নৃপতি, ভাগ্য সদয় তাঁ'রে;
বর্ষাপুষ্ট প্রবাহের মত যশ আসে শতধারে।
ভাগ্য-গরবে মত্ত নৃপতি করে না কাহারে ডর,
বিজয়দুর্গে পাঠাইয়া দূত যাচিলা কন্যা-কর।

তুলিলা তরুণ উদ্ধত ভূপ,—পূর্ব্বপুরুষ তাঁ'র,
বিজয়দুর্গে সেনাপতি-রূপে রাখিতা দুর্গদ্বার।

৩

বিজয়দুর্গে শুনিলা নৃপতি ;—তখন পড়িল মনে,—
কালিমাবিহীন কুলের কাহিনী, গাহে যা' চারণ-গণে।
তুলিলা নৃপতি হৃত সম্পদ,—ক্রোধে আঁখিযুগ জ্বলে,—
কহিলা, "কহিও প্রভুরে তোমার, আমারি পতাকাতলে
যুঝিলা তাহার পূর্ব্বপুরুষ, যাচে সে কন্যা-করে!
লুটা'বে হে দূত, এ পাপ দম্ভ পথের ধূলির 'পরে।

[২]

১

কুসুমগড়ের তরুণ নৃপতি শুনিলা দূতের কথা,
বিজয়পুষ্ট দম্ভে তাহার বাজিল বিষম ব্যথা।
যাচিলা কন্যা যে পুরাণ কথা করিবারে নিরবাণ ;
বিজয়দুর্গে হয়েছে তাহার নবীন-জীবন-দান ;
যে ধূলি পতিত ছিল ধরা 'পরে, উঠিল ঝটিকা-বুকে,
বিস্মৃতপ্রায় পুরাতন কথা ঘুরিবে লোকের মুখে।

২

কুসুমগড়ের নবীন নৃপতি সাজিলা সৈন্যবলে,—
বিজয়দুর্গ প্রাচীন—জীর্ণ, লুটাবে ধরণীতলে।
রাজ্যে তাহার প্রতি গ্রামে গ্রামে বাজি' উঠে ভেরীরব,
কাড়া দিল সাড়া নগরে নগরে,—'কর সাজ সেনা সব!'
গিরিগহ্বরে জাগি' উঠে ধ্বনি, নদীকূলে কোলাহল,
কুঞ্জকাননে অসি ঝন্ ঝন্ ; সাজে সৈনিকদল।

৩

কুসুমগড়ের উদ্ধত ভূপ সাজিয়া চলিল রণে ;
চলে দলে দলে সেনা তা'র সাথে, কোষে অসি ঝন্‌ঝনে ;
চলে ধনুক—তূণে খর শর, গর্ব্ব নাহিক করে—
শব্দবিহীন দংশনে শুধু শত্রু-জীবন হরে ;

বিজয়বাস্ত উছলে গগনে আকুল মত্ত স্বরে ;
পথে পথে উড়ে ঘনাকারে ধূলি সঘনে অশ্বখুরে।

[৩]

১

ক্রমে লোকমুখে বিপদবার্ত্তা বিজয়দুর্গে আসে ;
শুনি' পুরজন চমকি' উঠিল, শিহরিল সবে ত্রাসে।
আসিল সকলে রাজার সদনে—হৃদয়ে চিন্তাভার ;
শুষ্ক পরিখা, জীর্ণ ফটক, উপায় নাহিক আর।
উপায় কেবল নগর-পূর্ব্বে খরপ্রবাহিনী নদী—
পরিখার মাঝে সলিল তাহার কোনরূপে পশে যদি।

২

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অবধি যদি পুরবাসীদল—
পথ খুঁড়ি' আনে, তবে পরিখায় আসে তটিনীর জল।
নিবিল আশার ক্ষীণ দীপশিখা, উপায় নাহিক আর—
নিশি না পোহাতে অরাতির করে পড়িবে দুর্গদ্বার।
কহিলা তখন বৃদ্ধ নৃপতি—"কে আছ এ পুরমাঝে,
অরাতিরে দ্বারে আসিতে না দিবে, তারা না ফুটিলে সাঁঝে ?"

৩

নীরব জনতা-সম্মুখে আসে অমরসিংহ বীর—
পশ্চাতে তা'র বিংশ যুবক,—উন্নত দৃঢ় শির।
"জননী, ভগিনী, পত্নীর তরে মরিতে করি না ভয় ;—
দেবের কৃপায় বিজয়দুর্গ রক্ষিব",— বীর কয়,—
"রাজ-অনুমতি যাচি প্রাণ দিতে।" ধ্বনিল আকাশময়—
"দেব-রক্ষিত বিজয়দুর্গ ; জয়, শঙ্কর জয়!"

[৪]

১

আসন ত্যজিয়া উঠিলা নৃপতি, যত্নে আপন করে
আত্মসবর্ম্ম দিলা পরাইয়া বীরগণ-দেহ'পরে।
অস্ত রবির কিরণে তখন নীরদে স্বর্ণ গলে,—
শিথিলবৃন্ত চম্পকফুল ঝরি' পড়ে তরুতলে,—

রাজপথে উড়ে বায়ু'পরে ধূলি, গাভীরা ফিরেছে ঘরে,—
নীরবে গগনে ফুটিছে তারকা স্নিগ্ধ কোমল করে।

২

আসন ত্যজিয়া উঠিলা নৃপতি, যত্নে আপন করে,
আয়সবর্ম্ম দিলা পরাইয়া বীরগণ, দেহ 'পরে;
মস্তকে বাঁধি' দিলা উষ্ণীষ; দিলা অসি খরধার;
গোধূলি-আলোকে ঝলিল বর্শা; তূণে শর-শর-ভার।
মুগ্ধ জনতা উল্লাসভরে উচ্চারি' উঠে—"জয়!"
তারায় তারায় জয়-রব যেন ধ্বনিল আকাশময়।

৩

বাতায়নপথে পুরনারীদল মুগ্ধনয়নে চাহি';—
দৃঢ়পদে চলি' গেলা বীরগণ নগরের পথ বাহি';
কেহ বা বরষে ফুলসম্ভার, কেহ ডাকে দেবতায়।
দৃঢ়পদে চলে বীর কয় জন। আঁধার ধরণী ছায়।
নগরসীমায় আসে বীরগণ, খুলিল জীর্ণ দ্বার;
হরষে আশায় গর্জ্জে জনতা, পরিখা হইলা পার।

[৫]

১

ক্রমে বীরগণ আসি উপনীত যেথায় প্রহরী-ঘর,
ব্যবহারহীন রয়েছে এখনো দাঁড়ায়ে পথের 'পর;
বন্ধ করিলা জীর্ণ কপাট, অর্গল দিলা টানি'।
তখন ধরণী ঘিরেছে নিশার আঁধার আঁচলখানি;
নৈশ আঁধারে চারি দিকে মাঠে উঠে শিবা-কলরব;
গম্ভীরে ডাকি' আহার খুঁজিয়া উড়িছে পেচক সব।

২

রজনীর তারা না নিবিতে প্রাতে আসিল অরাতিদল;
চমকিল প্রভাত-বিহগ-কূজন সৈনিক-কোলাহল।
কুসুমগড়ের নৃপতি কহিল,—"দেহ ত্বরা দ্বার খুলি',
নহিলে মরিবে।" অমরসিংহ কহিল কণ্ঠ তুলি'—

"বিজয়দুর্গ-সেনাপতি-সুত! অন্তরে নাহি লাজ,
পিতৃপ্রভুর পুর লুণ্ঠিতে সাজিয়া এসেছ আজ?"

৩

ক্রোধে জ্বলি' উঠে তরুণ নৃপতি, কহে ডাকি' সেনাদলে,—
"বৃথা বিলম্বে নাহি কায আর প্রবেশ এ গৃহ বলে।"
পড়ে সশব্দে জীর্ণ কপাট শত্রু-চরণ-ভরে;
আসে সেনাদল—ঝটিকাক্ষুব্ধ বারিনিধি বেলা'পরে।
লুণ্ঠিত দ্বারে শত্রুপ্রবাহ রোধে এক জন বীর;
—পর্ব্বত যেন সিন্ধুরে রোধে—যুদ্ধে অটল স্থির।

[৬]

১

দশ সহস্র সেনা সম্মুখে এক জন করে রণ;
সে জন ধরায় না পড়িতে ত্বরা আসে বীর আর জন।
ক্রমে একে একে পড়িল ধরায় দশ জন সহচর,—
অমরসিংহ দেখিলা, সূর্য্য এসেছে মাথার 'পর।
দিনশেষে যবে রক্ত তপন পশ্চিমে পড়ে ঢলি',—
একা রাখে দ্বার সহচরহীন অমরসিংহ বলী।

২

উঠিল গর্জ্জি' অরাতি-বাহিনী,—একা বীর রাখে দ্বার;
আয়সবর্ম্ম করে জর্জ্জর শত অসি খরধার।
পড়িছে অরাতি, সে বিপুল বল নাহি জানে যেন ক্ষয়;
নিস্তেজ হয়ে আসে বীরদেহ, বর্ম্ম শোণিতময়।
শিথিল মুষ্টি ত্যজে তরবার, ভূমিতলে পড়ে বীর;
ধরণীর কোলে লুটায়ে পড়িল উন্নত—দৃঢ় শির।

৩

মরণ-আঁধারে ঢাকিছে দৃষ্টি—ঊর্দ্ধে চাহিলা বীর—
আঁধার গগনে ফুটিয়া রয়েছে তারকার আঁখি, স্থির।
সহসা কর্ণে প্রবেশিল দূর উল্লাস-কোলাহল—
জয়ের তূর্য, পুর-পরিখায় এসেছে তটিনীজল!

মরণ-শয়নে ফুটে উঠে হাসি বীরের অধর 'পরে ;—
জীবনের চেয়ে মরণ সুখের জন্মভূমির তরে !

স্নেহের জয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গিন্নি। শুনলুম আজ জামাই এসেছিল নাকি, বাড়ীর ভিতর দেখা না করে' গেল যে ?

কর্ত্তা। তার নাম আর মুখে এনো না! অকালকুষ্মাণ্ড ছোঁড়াটার অহঙ্কারে মাটীতে আর পা পড়ে না!—আমি এত করে' বল্লুম, অবস্থা যখন ভাল নয়, তখন এইখানেই এসে বরাবর থাকুক—বেটা কোন মতেই রাজী হ'ল না, বল্লে কি না, এক মাসের মধ্যে যদি মেয়েকে না পাঠান হয়, তবে আর একটা বিয়ে করবো।—আমি বলে' দিয়েছি, তার যটা ইচ্ছে বিয়ে করুক গে, আমি মেয়েকে কোন মতেই পাঠাব না। হারামজাদা!

গিন্নি। শ্বশুর জামাইয়ে ঝগড়া, এ দিকে মেয়েটা যে মারা গেল।

কর্ত্তা। তা' আমি কি করব। বেটার নিজের পেটের ভাত জোটে না—মেয়েকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে কি ?

গিন্নি। তাদের অবস্থা মন্দ হ'লেও মোটা ভাত কাপড় দিয়ে মেয়েকে পুষতে পারে, এমন সঙ্গতি আছে গো। তার যখন ঘরজামাই থাকতে এতই অমিচ্ছে, তখন তুমি না হয় মেয়ের নামে দশ বিশ হাজার টাকা ও একখানা ভাল বাড়ী করে' দাও না,—শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে তোমার ত অভাব নেই। মেয়ের মুখের দিকেও ত একবার তাকাতে হয়—স্বামী নিয়ে তাকেও ত ঘর করতে হ'বে।

কর্ত্তা। সবই বুঝি। তোমার জন্যে আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু ও বেটার জেদ যে বজায় থাকবে, এ আমি কোন মতেই সহ্য করতে পারব না। এ পর্য্যন্ত আমার মতের বিরুদ্ধে কেউ একটি কথাও কইতে সাহস করে নি—এইটুকু ছোঁড়ার এত বড় সাহস। কখনই মেয়েকে পাঠাব না! তাকে

এখানে আনব, তবে ছাড়ব! তোমরা মেয়েমানুষ, এ সব বিষয়ে কোন কথা বোলো না।

"শেষকালে পস্তাতে হবে, এই বলে' রাখলুম"—এই বলিয়া গৃহিণী ক্রোধ-ভয়ে বিষণ্ণমনে চলিয়া গেলেন।

তখন বেলা প্রায় দশটা। বৃদ্ধ জমীদার গোপাল রায় উপরে বৈঠকখানায় বসিয়া খবরের কাগজখানির আদ্যোপান্ত পাঠ শেষ করিয়া জমীদারী কাগজ-পত্রে মনোনিবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন—এমন সময়ে প্রথমে জামাতা এবং তৎপরে গৃহিণী আসিয়া উক্ত ভাবে তাঁহার মনকে উত্ত্যক্ত করিয়া গেল। গোপাল রায় তামাক টানিতে টানিতে পঠিত খবরের কাগজখানা পুনরায় নাসিকাগ্রভাগে তুলিয়া ধরিলেন। যে কেহ তাঁহার তখনকার মুখের ভাব দেখিলেই বুঝিতে পারিত যে তাঁহার দৃষ্টি খবরের কাগজের দিকে সরল রেখায় থাকিলেও, তাঁহার মন কিন্তু অন্য দিকে ছিল।

গোপাল রায় শাঁখালির মস্ত জমীদার। তাঁহার জমীদারী যেমন সুবিস্তৃত ছিল, তাঁহার ক্ষমতারও তেমনি সীমা ছিল না। প্রজাবৃন্দ ও গ্রামস্থ অন্যান্য সকলেই তাঁহাকে ভয় ও মান্য করিয়া চলিত,—ইহার কারণ, বিষয়কার্য্যে রায় মহাশয় যেমন কড়া ছিলেন—নিক্তির ওজনে কড়ায় গণ্ডায় সমস্ত পাওনা বুঝিয়া লইতেন, তেমনি আবার লোকের বিপদ আপদে মুক্তহস্তে প্রাণপণে সাহায্য করিতেন। রায় মহাশয়ের একটি প্রধান দোষ ছিল যে, তিনি তাঁহার মতের বিরুদ্ধতা কোনও মতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ তাঁহার বিরুদ্ধতা করিলে তাহার ভিটা পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না।

বৃদ্ধের এই স্বেচ্ছাচারী গর্ব্বিত মন জামাতার নিকটে আজ প্রথম বাধা প্রাপ্ত হইয়া রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জিতে লাগিল। দরিদ্রতনয় বিধুভূষণের সঙ্গে যখন প্রাণাধিকা একমাত্র কন্যা রাণীর বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন বৃদ্ধ মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বিবাহের পরেই জামাতাকে ঘরে আনিয়া রাখিবেন,—স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, গরীবের ছেলের এতটা স্পর্দ্ধা হইবে যে, তাঁহার বাটীতে থাকিতে অসম্মতি প্রকাশ করিবে। এই জন্য বিবাহের পূর্ব্বে বৃদ্ধ এ বিষয়ে কোন কথাই উত্থাপন করা একেবারে অনাবশ্যক মনে করিয়া-ছিলেন। এক্ষণে বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন, মনের গতি সর্ব্বত্র অবাধ নহে—বুঝি বা এত দিনের পর নব্যযুবক জামাতার নিকটে তাঁহাকে অপদস্থ, পরাস্ত হইতে হয়—বিদ্রোহী জামাতাকে দমন করিবার জন্য তাঁহার শরীরের

সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। অন্য দিকে কিন্তু মন আবার জীবনের একমাত্র বন্ধন স্নেহময়ী বালিকা কন্যার দিকে টানিতে লাগিল। বৃদ্ধ কন্যাকে যেরূপ ভালবাসিতেন, সচরাচর পিতা কন্যাকে এরূপ ভালবাসেন না। রাণী যে তাঁহার কি ছিল, বলা কঠিন। তাহার কষ্ট হইবে ভাবিয়াই ত দরিদ্র স্বামীর গৃহে তাহাকে পাঠাইতে বৃদ্ধের এত অনিচ্ছা,—কিন্তু এক্ষণে যদিও মনে মনে বুঝিলেন, স্বামী হইতে পৃথক হইয়া থাকা অপেক্ষা দরিদ্র স্বামীর গৃহে বাস করাই কন্যার পক্ষে ভাল, তবুও চিরাভ্যস্ত জেদ বজায় রাখিতে গিয়া বৃদ্ধ আর সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এক মাস পরে একদিন অপরাহ্নে ঝি দোকান হইতে ফিরিয়া রাণীর হাতে একখানি চিঠি দিল। রাণী তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। লেখা ছিল, "রাণি, তুমি যদি আমাকে চাও ত পত্রপাঠ এখানে আসিবে। তোমাদের বাড়ীর চারি পাঁচখানা বাড়ী পরে আমার বন্ধু যোগেনদের বাড়ীতে আমি আছি। ঝিকে বলিলেই সে বাড়ী চিনাইয়া দেবে। যদি না এস, জানিব, তুমি আমাতে আসক্ত নও। আমি আর তোমাদের বাড়ী যাইতেছি না। ইতি বিধুভূষণ।"

রাণী তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে ছুটিয়া গিয়া চিঠির কথা বলিল। মাতা স্নেহবিগলিতস্বরে ছলছলনেত্রে কহিলেন, "আমি কি করব বল্ মা, তোর বাবার মত না হ'লে ত আর কিছু হ'বে না,—তিনি যে জেদ ধরেছেন।—"

"বাবার মত না হ'লে হবে না? আচ্ছা।"—এই বলিয়া রাণী তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল। তাহার শয়নকক্ষে ঢুকিয়া আলমারী হইতে গহনাপত্র বাহির করিয়া একে একে সবগুলি পরিল,—বিবাহে শ্বশুরবাটী হইতে প্রাপ্ত ঢাকাই শাড়ীখানা অঙ্গে জড়াইল, এবং অবশিষ্ট কাপড় জিনিসপত্র ইত্যাদি গুছাইয়া বাক্সে ভরিল। সব ঠিক করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে বাহিরে পিতার সমক্ষে গিয়া ঢিপ্ করিয়া একটি প্রণাম করিল। বৃদ্ধ তখন আফিঙ্গের ঝোঁকে ঢুলিতেছিলেন। চমক ভাঙ্গিয়া উঠিয়া সুসজ্জিত-বেশে কন্যাকে সম্মুখে দেখিয়া হতবুদ্ধিভাবে কহিলেন, "অঁ্যা! এ কি! কোথায় যাস্?"

রাণী কহিল, "শ্বশুরবাড়ী যাব বাবা।"

বৃদ্ধ। শ্বশুরবাড়ী? কি বল্‌চিস্‌?

রাণী আস্তে আস্তে কহিল, "তিনি আমাদের বাড়ীর কাছে ঘোষেদের বাড়ীতে আছেন। আমাকে যাবার জন্ম চিঠি দিয়াছেন। আমাকে লইয়া আমার শ্বশুরবাড়ীতে রাখিয়া আসিবেন।—"

বৃদ্ধ উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "দূর হ! দূর হ! আমার সম্মুখ হইতে দূর হ!—আমার সমস্ত গহনাপত্র রাখিয়া তোর যেখানে ইচ্ছা যা!"—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

রাণী সাশ্রুনয়নে পুনর্ব্বার পিতাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে গিয়া গা হইতে সমস্ত গহনাপত্র খুলিয়া আলমারীতে তুলিয়া রাখিল,—হাতে কেবলমাত্র একগাছি কাঁচের চুড়ি রহিল। বাক্স বোঝাই কাপড় জিনিসপত্র যাহা লইয়াছিল, সব রাখিয়া দিল। তাহার পর দীনবেশে কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, আমি চল্‌লুম।"

মা বলিলেন, "এ কি বেশে শ্বশুরবাড়ী যাচ্চিস্‌ রাণু, চল্‌ মা, গহনাপত্র দিয়ে ভাল করে' সাজিয়ে দিই।"

রাণী কহিল, "না মা, তুমি জান না, বেশী সাজগোজ বড়মানুষী দেখে হয় ত তিনি আবার রেগে যাবেন - গরীব বেশেই যাওয়াই ভাল।"—আসল কথা মাকে জানিতে দিল না।

মাতা বুঝিলেন, কন্যা বুঝি অনেক কষ্টে পিতার মত করিতে পারিয়াছে—এই কারণে বিচ্ছেদের অতি তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিলেন, বুক কাটিয়া যাইলেও আপনাকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া কন্যাকে বুকের মধ্যে টানিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক স্নেহাশীর্ব্বাদে সিঞ্চিত করিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই রাণী পাল্কীর বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল; কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কীতে গিয়া উঠিল। দাসী সঙ্গে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিধুভূষণ রাণীকে সঙ্গে লইয়া জয়নগরে দেশের বাটীতে পৌছিলে তাহার মাতাঠাকুরাণী বউকে নিরাভরণা দেখিয়া সপ্তমে গলার আওয়াজ চড়াইয়া কহিলেন, "ও মা কি হ'বে! জমীদারের ঝির এই সাজ! আমরা চোর না

ডাকাত যে, গয়না কেড়ে নেব!—গরীব বলে' এত তাচ্ছীল্য!—ওগো! আমাদেরও এককালে সব ছিল—সব ছিল!"—

বিধুভূষণ মাতাকে থামাইয়া কহিল, "মা, তুমি চুপ্ কর, বউ ইচ্ছে করে' গহনাপত্র সব রেখে এসেছে—আমি যখন দিতে পারব, তখন পরবে। এখন বউকে কিছু খেতে দাও, পথে বড় কষ্ট হয়েচে।"

"বউ না হয় ছেলেমানুষ, বুড়ো মাগী নিজেরও কি আক্কেল নাই—মেয়েকে এই রকম করে' শ্বশুরবাড়ী পাঠায়—লজ্জায় মরে' যাই যে—কি হ'বে গো! একালের ছেলেরা আবার বউয়ের দিকে টানে!"—বলিতে বলিতে মাতাঠাকুরাণী রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।

পথশ্রমে বিধুভূষণ রাণী উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—আহারাদির পরই শয়ন করিল। ইহার নিমিত্তও পরদিন প্রাতে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট হইতে রাণীকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

বিধুভূষণের সংসারে বৃদ্ধা মাতা ও এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া অন্য কেহ ছিল না। অনেকদিন পূর্ব্বে বিধুভূষণের পিতার কাল হয়। পিতা পৌরোহিত্য কাজ করিয়া সংসার চালাইতেন। অল্প স্বল্প জায়গা জমী ভিন্ন আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই—দুই চারি ঘর প্রজাবিলি ও ছিল। পিতার মৃত্যুর পর বিধুভূষণের যজমানগৃহ হইতে পাওনা ছিল—সর্ব্বশুদ্ধ মাসিক প্রায় ত্রিশ চল্লিশ টাকা আয়ের সংস্থান দাঁড়াইয়াছিল। ইহা ছাড়া পুষ্করিণীতে মাছ, ক্ষেতে ধান, ঘরে চারি পাঁচটা গরু ছিল—সংসার একপ্রকারে চলিয়া যাইত।

রাণী শ্বশুরবাড়ী আসিয়া সমস্ত গুছাইতে লাগিল। শাশুড়ীর গঞ্জনায় সে প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট বোধ করিত—কাজ করিতে গিয়া ভয়ে কিরূপ থতমত খাইত। একে সংসারের কাজ করা কখন অভ্যাস নাই, তাহার উপর পদে পদে টিট্‌কারী—সে একটুতেই কাঁদিয়া ফেলিত। কিন্তু ক্রমে সকলই অভ্যস্ত হইয়া আসিল। ঐশ্বর্য্যপালিতা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা অল্পদিনের মধ্যেই গৃহস্থালীর সমস্ত কাজকর্ম্ম শিখিয়া লইল, এবং স্নেহ সেবা যত্নে সকলকে বশীভূত করিল। অমন যে শাশুড়ী, তাঁহাকেও একদিন বলিতে শুনা গিয়াছিল—"বিধু বেশ বউ এনেছে, বড় ঘরে এমন মেয়ে দেখা যায় না।"

রাণী নূতন সংসারের সহিত বনিবনাও করিয়া লইল, কিন্তু যে সংসারে তাহার জন্ম, সেই সংসারের নিকট যে নিরানন্দময় বিদায় লইয়া আসিয়াছে তাহা তাহার মনে সদা সর্ব্বদা জাগরূক রহিল। পিতার উপর তাহার রাগ

নাই, বাধ্য হইয়া তাহাকে যে পিতার কষ্টের কারণ হইতে হইয়াছে, ইহাই তাহার অন্তরে শেলসম বিঁধিতে লাগিল। রাণী পিতাকে চিঠি লিখিল ;—

"বাবা, আমি তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি—ক্ষমা করিও। তুমি ইচ্ছাসুখে আমার হাতে যে ভার তুলিয়া দিয়াছ, সেই ভার বহিতে গিয়া তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি, এই জন্য আমি বড় অসুখে আছি—তোমার পায়ে ধরিয়া আবার ক্ষমা চাহিতেছি। তুমি আমাকে বড় ভালবাস জানি,—তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে না জানিলে আমি প্রাণে বাঁচিব না। শীঘ্র পত্রের উত্তর দিও। মাকে আমার প্রণাম জানাইও—তুমিও গ্রহণ করিও। তোমাদের কুশলসংবাদ চাই। ইতি। তোমার স্নেহের রাণী।"

কন্যাকে নির্দ্দয় ভর্ৎসনা করিবার পর হইতে বৃদ্ধ একেবারে নিতান্ত অবসন্ন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিকার-রোগী যেরূপ মস্তিষ্কের তীব্র উত্তেজনায় কিয়ৎক্ষণ ভীষণ অঙ্গ আস্ফালন করিয়া আবার দ্বিগুণ অবসন্ন হইয়া পড়ে, বৃদ্ধের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল। কন্যা চলিয়া যাইবার পর হইতে তাঁহার আহারে স্পৃহা ছিল না, কাজ কর্ম্মে মন ছিল না। কেমন এক রকম হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার উপর গৃহিণী যখন জানিতে পারিলেন, কন্যা কিরূপ ভাবে বিদায় লইয়া গিয়াছে, তখন বৃদ্ধের লাঞ্ছনা গঞ্জনার আর সীমা রহিল না। এইরূপ অবস্থায় রাণীর চিঠি পাইয়া বৃদ্ধ শোকে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। উন্মত্ত যেরূপ আপনার ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে না, বৃদ্ধ সেইরূপ অশ্রুবিগলিতনয়নে বারবার চিঠিখানি পড়িলেন ; ইচ্ছা হইল, চিঠির উত্তর দেন, কিন্তু উত্তর দিতে পারিলেন না।

এইরূপে সাত আট মাস কাটিয়া গেল। রাণী অন্তঃস্বত্বা ছিল—অসময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ অবস্থা খারাপ দাঁড়াইতে লাগিল। রাণী নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিল—পিতা-মাতার সহিত বুঝি বা দেখা হইল না ভাবিয়া সে আরও কাতর হইয়া পড়িল। রোগশয্যা হইতে পিতাকে একখানি চিঠি দিল ;—

"বাবা, আমার একটি ছেলে হইয়াছে—সে ত তোমার কাছে কোন অপরাধ করে নাই, তাহাকে দেখিতে একবার তুমি এখানে এসো। আমি বড়ই পীড়িত, এ যাত্রা বুঝি আর বাঁচিব না। আর লিখিবার শক্তি নাই।"

চিঠি পাইবা বৃদ্ধ একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আজই জামাইবাড়ী যাব ; চিঠি দেখ, চিঠি দেখ—আর বুঝি

রাণীর সহিত দেখা হ'ল না!"—স্ত্রী ভূমিতলে আছাড় খাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। ভৃত্য কর্ম্মচারীরা আদেশ পাইয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত গুছাইয়া ফেলিল। দুই বড় বড় বাক্সভরা মহামূল্য গহনাপত্র সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ সস্ত্রীক যাত্রা করিলেন।

সন্ধ্যার পর সকলে জয়নগরে পৌছিলেন। ষ্টেশন হইতে বিধুভূষণের বাড়ী খুব নিকটে ছিল। বাড়ীতে পৌছিয়াই বৃদ্ধের জামাতার সহিত দেখা হইল—তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বৃদ্ধ গদগদস্বরে কহিলেন, "বাবাজী, কিছু মনে করিও না, বুড়ো মানুষের সব সময়ে মাথার ঠিক থাকে না—রাণু কোথায়? রাণু কোথায়? একটু ভাল আছে ত?" জামাতা শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে সঙ্গে লইয়া রাণীর ঘরে গেল। চৌকাঠ হইতে বৃদ্ধ দেখিলেন, রোগক্লিষ্টা শীর্ণকায়া কন্যা সন্তানকে পার্শ্বে লইয়া শয়ন করিয়া আছে। বৃদ্ধের ক্ষীণ দুটি চক্ষু বাষ্পে ভরিয়া গেল; ছুটিয়া গিয়া কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "মা, চেয়ে দেখ, আমি এসেছি, মা, আমি এসেছি!"—কন্যা কষ্টে উঠিয়া পিতামাতার পদধূলি গ্রহণ করিল, এবং পিতার দুই পা সবলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "বল, আমাকে ক্ষমা করিয়াছ, বল, আমাকে ক্ষমা করিয়াছ!" বৃদ্ধ আস্তে আস্তে পা ছাড়াইয়া লইয়া কন্যার মস্তকে হাত রাখিয়া কহিলেন, "মা, আমার কিছু মনে নাই,—সব ভুলে গেছি, সব ভুলে গেছি,—এখন তোকে আরাম হইতে দেখিলেই আমি বাচি। —তৎপরে গহনাভরা বাক্স দুইটি আনিয়া কন্যার কাছে রাখিয়া কহিলেন, "মা, তুই রাগ করে' সব ফেলে এসেছিলি; এই নে, তোর জিনিস তোরই রহিল, আরাম হ'য়ে যখন এই গহনাগুলি পরবি, তখন আমার সব দুঃখ যাবে।" বাক্স হইতে একটি ছোট হার বাহির করিয়া নবকুমারের গলায় পরাইয়া দিয়া বৃদ্ধ তাহার মুখচুম্বন করিলেন। সে মুদ্রিতচক্ষে একটুখানি হাসিল। সে হাসিয়া যেন বলিল, "কেমন দাদা, এখন জারিজুরি কোথায় রহিল? তৎপরে বৃদ্ধ জামাতাকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন, "তোমরা চলিয়া আসিলে আমি দানপত্র দ্বারা আমার বাড়ীখানা রাণীর নামে লিখিয়া দিয়াছি, এবং বিষয়সম্পত্তি সমস্ত তোমাদের উভয়ের নামে উইল করিয়াছি।" এই বলিয়া উইল ও দানপত্র বিধুভূষণকে দেখাইলেন,—"এক্ষণে তোমাদের বাটীতে তোমাদের থাকিতে কোনও লজ্জা নাই। রাণী ভাল হইলে তোমরা আসিয়া থাক, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।" বিধুভূষণ পূর্ব্বঘটনা স্মরণ করিয়া নিতান্ত লজ্জিত ও

অপ্রতিভ হইল, এবং একটিও কথা না কহিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

পিতামাতাকে দেখিয়া এবং তাঁহাদের যত্নে রাণী শীঘ্র সারিয়া উঠিল। বৃদ্ধ যখন সকলকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন, তখন সেই শূন্য গৃহ [illegible] আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। স্নেহে পরাজিত হইয়া বৃদ্ধের সুখের আর সীমা রহিল না।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যযাতি ও দেবযানী।

[শ্রীমদ্ভাগবত।]

যযাতি।

আজিকে বিদায় তবে দেহ, দেবযানী,
ত্যাগ করি' আজন্মের রাজ্য রাজধানী
চলিয়াছি বনাশ্রমে।

দেবযানী।

এখনি বিদায়!
কোন অপরাধ দাসী করিয়াছে পায়?
এখনি সহস্র বর্ষ হয়েছে কি শেষ,
ভেঙ্গেছে কি যৌবনের প্রমত্ত আবেশ,
নিত্য নবসুধা মোর কিছু নাই আর,—
প্রিয়তম, ভোগতৃষ্ণা মিটেছে তোমার?

যযাতি।

মিটে নাই; মিটিবার নহে ত বাসনা,
ঘৃতাহুতি যত পায়—অনল-রসনা
তত বেশী জ্বলি' উঠে। এ কি ভ্রান্তি, হায়,
ভোগানল নিবাইতে চাহি বাসনায়!
যৌবনমদিরা পান করি' প্রতিদিন
জানি নাই বর্ষ মাস কেমনে বিলীন
হয়েছে গগনে সব; ভোগ-অভিলাষ
তবুও বাড়িছে নিত্য, বাড়িছে [illegible];
তবুও জাগিছে চিত্তে অতৃপ্ত পিপাসা।
এত দিন পরে বুঝি আঁধার নিশা
হয়েছে প্রভাত, তাই মেলি' দুটি চোখ
দেখিতে পেয়েছি শুভ্র জ্ঞানের আলোক।
অলস মণ্ডূক যথা অবরুদ্ধ কূপে,
মুগ্ধ হয়ে ছিনু আমি রমণীর রূপে।
আজি আসিয়াছি উঠি' মাগিতে বিদায়,
বদ্ধ হ'য়ে মোহ-জালে সংসার-কারায়
আর থাকিব না বন্দী, হইব স্বাধীন।
বুঝিয়াছি, অয়ি প্রিয়ে, বৃথা এত দিন
অনুসরি' মরীচিকা মিটাতে তিয়াষ
আজি লভিয়াছি মহা সত্যের আভাস;
ভোগ নহে, ত্যাগ মাঝে অসীম অক্ষয়
পরিপূর্ণ শান্তি, তাই খুঁজিছে হৃদয়।

দেবযানী।

চল তবে, প্রিয়তম, ছাড়ি' লোকালয়
শান্তিপূর্ণ তপোবনে লভিতে আশ্রয়।
যেখানে যাইবে তুমি—ছায়ার মতন
দাসীও যাইবে সাথে।

যযাতি।

আবার বন্ধন!
রমণীর প্রেমে ভুলি' ছিলাম সংসারে,
আজি যাব বনবাসে, সেথাও কি তারে
লয়ে যাব সাথে করি'!

অয়ি দেবযানী,
পরিপূর্ণ ছিল মোর এ হৃদয়খানি
তোমার অনিন্দ্য রূপে, কখনো বাহিরে
অনন্ত বিশ্বের পানে চাহি নাই ফিরে।
আজি এই মায়ামোহ সোনার শৃঙ্খল
সবলে ছিঁড়িয়া শুধু আত্মার মঙ্গল
খুঁজিতে করেছি পণ। থাক তুমি প্রিয়া,
একা আমি যাব আজি; কাননে পশিয়া
করিব দুশ্চর তপ।—বিদায় এখন।

দেবযানী।

হায় নাথ, নারী শুধু বিলাসের ধন!
যৌবনের কাম্য বস্তু, ক্ষণিক অসার
খেলনা পুরুষ-হস্তে। নাহি কিছু আর
প্রয়োজন তার, খেলা হ'লে সমাপন,
ছিন্নদল পুষ্পসম হেলায় তখন
দূরে ফেলে দিবে তারে!—বিলাস-রঙ্গিণী
নারী শুধু! সুখের হইতে সঙ্গিনী
নাহি কোন অধিকার? ধিক্ নারী-প্রাণ,
নীরবে কেমনে সহে এত অপমান
নিশিদিন!—শুন আজ কহিব সে কথা,
[illegible] ছিল [illegible]
এক দিন। [illegible] পুত্রে দিয়ে [illegible]
[illegible] যৌবন মাগি' লইলে আবার
ভুঞ্জিতে বিষয়-সুখ—[illegible] রমণীর,
আসিলে আমার পাশে, [illegible]
[illegible] আদরে,—
[illegible]

জাগিল কি পুনঃ মনে! [illegible]
এ রূপ লাবণ্যে—[illegible]
হেরি' তব প্রত্যাগত নবীন যৌবনে
শুধু বাসনায় [illegible] হ'নয়নে,
মোর প্রতি তোমার সে অজস্র উচ্ছ্বাস
আদরের, [illegible] পরিহাস!
নীরবে আপনি সেই বিষ করি' পান,
তবুও তোমার সুধা করিয়াছি দান।
আজি নাথ শুভদিন; এস ব্রত ধরি'
হও তুমি ব্রহ্মচারী, আমি সহচরী
তপস্বিনী; মহারাজ, মোরা দুই জনে
ত্যজি' রাজ্যভোগ, বাহ্য জীবন [illegible],
পবিত্র প্রেমের ব্রত করি' উদযাপন
নিভে যে বাসনা-বহ্নি [illegible]
তপস্যার শান্তি-বারি ক'রো করিয়া সেচন
নির্বাপিত কর তারে। ক'রো না বর্জ্জন
পুণ্য-পথে এ দাসীরে।

যযাতি।

অয়ি সুচরিতা,
কুসুমকোমলা তুমি, বিলাস-লালিতা;
কঠোর তপস্যা কভু সাজে কি তোমার?
প্রিয় পুষ্পশয়ন ভুলি' পরিহার
কেমনে কাটাবে কাল অরণ্য আশ্রমে
অনাসক্ত পতি সনে? অয়ি নিরুপমে,
ভাল করে' ভেবে দেখ!

দেবযানী।

ভুলো না, রাজন,
ঋষিকন্যা আমি, ভালবাসি তপোবন।
শিখিয়াছি নারীধর্ম্ম। সে নির্জ্জন বনে
প্রতিদিন ফুল তুলি' আনিব যতনে
পূজিতে দেবাদিদেবে। প্রভাতে প্রদোষে
গাহিব বন্দনাগীতি পরম সন্তোষে

কলকণ্ঠ কণ্ঠে[illegible] মিলাইয়া যথা।
হৃদয়ে বহিবে সদা তৃপ্তির নির্ঝর।
বিষয়-বাসনা ক্ষুধা, দুঃখ, অবসাদ
স্পর্শিবে না কভু প্রাণ। দেব-আশীর্ব্বাদ
যোড়করে যাচি[illegible] মাথার শিরে
ভক্তিভরে।

যযাতি।
ধন্য আমি, সহধর্ম্মিণীরে
চিনিতে পারিনু আজি।
তাই হোক্, প্রিয়া,
ভঙ্গুর বিষয়ভোগস্পৃহা বিসর্জ্জিয়া
চল তবে যাই মোরা শান্ত তপোবনে।
আত্মার অক্ষয় ধন শান্তি অন্বেষণে।

ভক্তি না ধর্ম্ম?

১

শ্যামাচরণ বেদান্তবাগীশ প্রাত্যহিক দেবপূজা সমাপ্ত করিয়া বহির্বাটীতে আসিলেন। ভৃত্য প্রভুর জন্য তামাক সাজিয়া আনিল। স্নান ও পূজা আহ্নিক সমাপ্ত না করিয়া বেদান্তবাগীশ কখনও তাম্রকূট-ধূম পর্য্যন্ত সেবন করিতেন না।

তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। অদূরে গ্রামের হরকরার মূর্ত্তি দেখা দিল। সে নিকটে আসিলে বেদান্তবাগীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পরাণ, আমাদের চিঠিপত্র কিছু আছে নাকি?"

দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে গ্রামের সকলেই প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। পরাণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে একখানি পত্র অর্পণ করিল।

পুত্র জ্ঞানচন্দ্র দুই বৎসর প্রবাসবাসী। সপ্তাহ অন্তর এক একখানি পত্র পাইলেও স্নেহশীল পিতার হৃদয় পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইত। বাইশ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার পর জ্ঞানচন্দ্র লাহোর কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করে। অবকাশের অভাব ও তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি নূতন পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকায় দুই বৎসরের মধ্যে সে জনকজননীর চরণদর্শন করিতে পারে নাই। গর্ব্ব ও আশার অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, বংশের কুলপ্রদীপ পুত্রকে বিদেশে পাঠাইয়া পিতা অধিকাংশ রজনী অনিদ্রায় অতিবাহন করিতেন; কি[illegible] তাঁহার গৃহিণী পর্য্যন্ত জানিতেন না।

গ্রামের কেহ কোনও বিষয়ে কখনও বেদান্তবাগীশকে বিচলিত হইতে দেখে নাই।

ব্রাহ্মণ পত্রখানি খুলিলেন। লেখা দেখিয়া বুঝিলেন, বনগ্রাম হইতে শ্যালক রামতারণ স্মৃতিভূষণ লিখিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মথুরা ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তথা হইতে ভাগিনেয়কে দেখিবার জন্য লাহোর পর্য্যন্ত ছুটিয়াছিলেন। তার পর,—

ব্রাহ্মণ দক্ষিণ হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া চোখের কাছে পত্রখানি ধরিয়া আবার পাঠ করিলেন। না না! তাঁহার দৃষ্টির বিন্দুমাত্র ভুল নহে। পরিস্ফুট ভাবে প্রাণান্তকর ভীষণ সংবাদ পত্রে লিখিত রহিয়াছে।

বেদান্তবাগীশের সন্দেহ টলিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। দেওয়াল ধরিয়া ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে প্রথম তীব্র আঘাতের বেগ সংবরণ করিলেন। তার পর ধীরে ধীরে চৌকীর উপর বসিয়া পড়িলেন।

পতন! সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপ্রাণ, আদর্শ-চরিত্র পুত্র, যাহাকে তিনি হিমালয়ের ন্যায় অটল, ভাগীরথীর ন্যায় পুণ্যশীল, [illegible] ন্যায় শুভ্র তীব্র দীপ্তিশালী ভাবিয়া এত দিন অপূর্ব্ব আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছিলেন, আজ সেই পুত্রের এমন শোচনীয় অধঃপতন! বাদশ বৎসরের শিক্ষা, যুক্তির তলে নিশ্চিহ্ন [illegible] জ্ঞানের সুদৃঢ় [illegible], অদৃষ্টকে সংশয় রাখিতে পারিল না? [illegible] অবসানে এত কালের দীপ নাশ হইয়া গেল? বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় [illegible] তিনি ধীরে ধীরে যে ছবিটিকে শুভ্র [illegible] উজ্জ্বল প্রভায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আজ তাহা [illegible] অপেক্ষাও কলঙ্কমলিন!

শ্যালক লিখিয়াছেন, হতভাগ্যের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে এখন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। দেশে আর [illegible] ফিরিয়া যাইবে, সে সম্ভাবনা নাই। নবধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্য হইতে পাত্রী মনোনীত করিয়া বিবাহাদি করিবে। এই ব্যাপার লইয়া লাহোরপ্রবাসী বাঙ্গালী মহলে বেশ আন্দোলন হইতেছে। কোন পরিচিত বাঙ্গালীর নিকট এই সংবাদ পাইয়া স্মৃতিভূষণ ভাগিনেয়ের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই দারুণ মনঃপীড়া লইয়া সেই রজনীতেই লাহোর ত্যাগ করেন।

অগ্নিগর্ভ গিরির ন্যায় ব্রাহ্মণ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। জীবনে তিনি এমন প্রতারিত কখনও হয়েন নাই— এরূপ আঘাত এই তাঁহার প্রথম।

প্রবাস-গমনের পূর্ব্বে যে দিবস পুত্র আশৈশবের অভ্যাস-অনুসারে চন্দন-[illegible] জনক-জননীর চরণবন্দনা করিয়াছিল, সেই সুপবিত্র দিনের [illegible] বেদান্তবাগীশের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। জ্ঞানচন্দ্র যে এক দিনও পিতা-[illegible] পাদ্য-অর্ঘ্য পান না করিয়া আহার্য্য স্পর্শ করিত না! প্রতি দিন প্রত্যূষে [illegible] গায়ত্রী-জপ ও বেদপাঠ না করিয়া কোনও কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিত [illegible] পুনশ্চ তাশিক্ষা তাহার হৃদয়কে স্বধর্ম্মে আরও অনুরক্ত করিয়া তুলিয়া[illegible] ব্রাহ্মণ আশৈশব পুত্রকে স্বয়ং ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক [illegible]নের কার্য্যকলাপ তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ [illegible] দেখিয়াছেন; কিন্তু কই, তাহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতার চিহ্ন কোনও দিন ত তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই! তবে আজ অকস্মাৎ হিমাচলের উন্নত চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল কেন?

ভৃত্য আসিয়া দুইবার সংবাদ দিল, আহার্য্য প্রস্তুত; মাঠাকুরাণী তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ তখনও নিশ্চল প্রতিমার মত বসিয়া রহিলেন।

সূর্য্য ক্রমে মধ্যাহ্ন গগন অতিক্রম করিল। ব্রাহ্মণের অকারণ বিলম্বে বাড়ীর লোক চঞ্চল হইয়া উঠিল। গৃহিণী প্রমাদ গণিয়া স্বয়ং বাহিরবাটীতে আসিলেন।

বেদান্তবাগীশ তখন একখানি পত্র লেখা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

স্বামীর আরক্ত নয়ন, মেঘাচ্ছন্ন গগনের ন্যায় গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া, অনিশ্চিত আশঙ্কায় পত্নীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভীতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ভাত খাবে না? আজ তোমার কি হয়েছে?"

ব্রাহ্মণ সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না।

গৃহতলে স্মৃতিভূষণের পত্রখানি পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণী সেখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "কে লিখিয়াছে?"

"পড়িয়া দেখ।"

পত্রপাঠান্তে বেদনাবিদীর্ণহৃদয়ে শ্যামাচরণের [illegible] ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। বর্ষাপ্লাবিতা নদীর স্রোতের ন্যায় তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

"তখন তোমায় বলিয়াছিলাম, বিদেশে আমার জ্ঞানকে—"

তর্জ্জনী তুলিয়া তীব্রস্বরে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "চুপ, আর না। আজ হইতে

ও নাম আমার বাড়ীতে কেহ উচ্চারণ করিতে পারিবে না।"

স্বামীর কঠোর বচনে পত্নীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বেদান্তবাদীদের প্রকৃতি তিনি বিলক্ষণ চিনিতেন। অশ্রুসিক্তনয়নে, সকাতরে তিনি স্বামীর পানে চাহিলেন।

মুহূর্ত্তের জন্য ব্রাহ্মণের ওষ্ঠপ্রান্তে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। হস্তস্থিত পত্রখানি তুলিয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন, "কি লিখিয়াছি, শুনিয়া যাও।"

পত্রে লেখা ছিল, "শুনিলাম, তুমি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছ। উত্তম। যদি তুমি মূর্খ অশিক্ষিত হইতে, আমি সস্নেহে তোমাকে তিরস্কার করিতাম, অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া তোমাকে বক্ষে তুলিয়া লইতাম। কিন্তু তুমি মূর্খ নহ। আমার উপার্জ্জিত সমস্ত বিদ্যা তোমাকে দান করিয়াছি, সহস্র যুগের সঞ্চিত অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে বহুল রত্ন তুমি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়াছ, বিশ্ববিদ্যালয়ও তোমাকে জ্ঞান দান করিতে কৃপণতা করে নাই। সুতরাং তুমি তিরস্কারের অযোগ্য, এক বিন্দু ক্ষমাও তোমার প্রাপ্য নহে। জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে যাহার হৃদয় প্রদীপ্ত, সত্যানুসন্ধানের জন্য তাহার ঘৃণ্য ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ, আমার মতে গুরুতর পাপ। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কোনও ক্রমে সে ক্ষমা পাইবার অধিকারী নহে। পুত্র হইলেও সে ত্যাজ্য। এত দিন যাহাদের সহিত তোমার রক্ত মাংসের সম্বন্ধ ছিল, আজ হইতে তাহাদের সহিত তোমার কোনও সংস্রব রহিল না। শিক্ষা ও জ্ঞানের এক কণিকাও যদি এখনও তোমাতে অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আত্মীয়সমাজে তোমার কলঙ্কিত মুখ দেখাইবার চেষ্টা করিও না। আজ হইতে আমাদের কাছে তুমি মৃত, তোমার সহিত আমাদের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। মর্ম্মাহত পিতার অভিশাপে যদি এতটুকু ভয় থাকে, তবে ভবিষ্যতে আত্মীয়বর্গের সহিত বাক্যে বা ব্যবহারে সম্বন্ধ-স্থাপনের প্রয়াস পাইও না।"

স্বামীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া পত্নী উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, এত নির্দ্দয় হইও না।"

বাহুপাশ হইতে চরণ মুক্ত করিয়া অকম্পিতপদে ব্রাহ্মণ আহারার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

২

দুই সপ্তাহ স্বামীর কোনও সংবাদ না পাইয়া বসন্তকুমারী পত্র লিখিতে বসিয়াছিলেন। পার্শ্বে চারি বৎসরের পুত্র কেলু বসিয়া বসিয়া তাসের ঘর

নির্ম্মাণ করিতেছিল।

মাতার বাক্সটি খোলা দেখিয়া শিশু তাসের ঘর রাখিয়া দিল। নূতন কিছু খেলার জিনিস পাইবার আশায়, সে বাক্সের অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। সহসা একখানি বাঁধান ফটো কাগজের অন্তরাল হইতে আত্মপ্রকাশ করিল। কেলু ছবিখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "মা, মা, দেখ্ কেমন ছবি!"

বসন্তকুমারীর চিঠি লেখা শেষ হইয়াছিল। সে ফিরিয়া চাহিয়া পুত্রের কীর্ত্তি দেখিল। তখন তাড়াতাড়ি সে ফটোখানি কাড়িয়া লইতে গেল। শিশু প্রাণপণ যত্নে ছায়াচিত্রখানি বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া হাসির লহর তুলিয়া বলিল, "না, আমি দেব না।"

মাতা বলিল, "ছিঃ বাবা, ছিঁড়ে যাবে। তোমার মামাবাবুর ছবি। লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, দাও আমি রাখিয়া দি, তুমি বড় হ'লে নিও।"

"মামাবাবু? মামাবাবু কে মা? কই আমি ত তাকে দেখি নি, সে কোথায়?"

বসন্তকুমারীর নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। আজ দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর দাদার স্নেহময় মূর্ত্তি সে দেখে নাই। কোথায় তিনি, কি অবস্থায় আছেন, তাহা সে জানে না। জানিবার অধিকার হইতেও সে বঞ্চিত। জাতিচ্যুত ভ্রাতার অনুসন্ধান কে করিবে? সমস্ত সংসার যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে! প্রবাস-গমনের পূর্ব্বে দাদা সকলের ছবি তুলাইয়া ছিলেন, সেই সঙ্গে তাঁহারও ছবি তোলা হইয়াছিল। সেই দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বের ফটোখানি দাদার একমাত্র স্মৃতি। বসন্ত সেখানি অতি গোপনে রক্ষা করিয়াছিল। পিত্রালয়ে বা স্বামীগৃহে সে ছবি প্রকাশ্যভাবে বাহির করিতে তাহার সাহস হইত না। যখন তাহার হৃদয় চঞ্চল হইত, সেই সময়ে গোপনে ছায়-চিত্রখানি বাহির করিয়া দেখিয়া লইত।

মাতাকে নীরব দেখিয়া শিশু আবার বলিল, "বল্ না মা, মামাবাবু কোথায়? সে কখনও এখানে আসে না কেন? দেখা পেলে আমি তাকে মারবো।"

কেনু অভিমানভরে তাহার ক্ষুদ্র মুষ্টি শূন্য পানে উদ্যত করিল।

বসন্ত নয়নে অঞ্চল চাপিয়া অশ্রুবেগ রুদ্ধ করিতে চাহিল।

এমন সময় কক্ষের বাহিরে পদশব্দ শব্দ হইল। বেহারাগণ কনার

কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার মুখ গম্ভীর। সেই গম্ভীর আননে বেদনার অস্ফুট রেখা তখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

শিশু দাদামহাশয়ের কাছে ছুটিয়া গেল। ফটোখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দাদামহাশয়, মা আমাকে মামাবাবুর ছবি দিয়েছে। দাদা, মামাবাবু কোথায় ? আমি তার কাছে যাব।"

কিন্তু অন্য দিনের মত দাদামহাশয়ের মুখে প্রসন্ন হাসিটি না দেখিয়া শিশু বিস্মিতভাবে থমকিয়া দাঁড়াইল। দাদামহাশয় আজ তাহাকে কোলে লইল না কেন ? অভিমানে ফেলুর হৃদয় পূর্ণ হইল। ম্লানমুখে, ছল-ছল-নেত্রে সে জননীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

পিতা ডাকিলেন,—"বসন্ত !"

সে আহ্বানে সহস্র তিরস্কারের তীব্র গর্জ্জন যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অপরাধিনীর ন্যায় নতমুখে বসন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল।

ফেলু বিস্ময়দীপ্ত নয়নযুগল তুলিয়া একবার জননী, আর বার মাতামহের পানে চাহিতে লাগিল। তাহার কুন্দশুভ্র অকলুষ হৃদয়ে কুটীল সংসারের তীব্র তাপ স্পর্শ করে নাই!

গম্ভীরকণ্ঠে বেদান্তবাগীশ বলিলেন, "পিতা হইয়াও যে পুত্রের আদর্শ-চরিত্রকে এক দিন মনে শ্রদ্ধা করিতাম, এখন তাহার অপবিত্র স্মৃতি হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছি। এই সরল সুন্দর শিশুর পবিত্র হৃদয়ে তাহার কলঙ্কিত স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া তুমি মহাপাতক করিয়াছ। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহার কলুষিত ছবিখানি এই মুহূর্ত্তে অগ্নিতে সমর্পণ কর।"

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বসন্ত বলিল, "বাবা, বাবা, অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

ব্রাহ্মণ তখন কক্ষ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

সেই রজনীতে ব্রাহ্মণ গৃহিণীকে বলিলেন, "অনেক দিন হইতে তুমি তীর্থ-ভ্রমণের কথা বলিয়া আসিতেছ। আমি সমস্ত ঠিক করিয়াছি, আগামী বুধবার পঞ্চমী তিথিতে যাত্রা করিব।"

৩

বেদান্তবাগীশ বারাণসীধামে আসিয়া যেখানে বাসা করিলেন, তাহার সংলগ্ন একটি প্রশস্ত ও প্রকাণ্ড অট্টালিকায় একটি দানছত্র। তথায় প্রত্যহ সহস্র সহস্র ক্ষুধিত অন্ধনারী পর্য্যাপ্তপরিমাণে আহার পাইত।

তীর্থে আসিয়া গঙ্গাস্নান ও দেবদর্শন ব্যতীত ব্রাহ্মণের অন্য বিশেষ কোন কার্য্য ছিল না। তিনি অবশিষ্ট সময় দানছত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক দরিদ্রদিগের ভোজন কার্য্য পরিতৃপ্তনয়নে দর্শন করিতেন। ব্রাহ্মণ নিজ গ্রামে পূজার সময় স্বয়ং শত শত দরিদ্রকে অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করিয়া থাকেন। বার্ষিক পঞ্চসহস্র মুদ্রা আয়ের ব্রহ্মোত্তর জমীর অধিকাংশই তিনি দীন দরিদ্রের সেবায় ব্যয় করিতেন। সুতরাং পবিত্র তীর্থস্থানে এরূপ সুন্দর কল্যাণকর অনুষ্ঠান দর্শনে বেদান্তবাগীশ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

ছত্রের তত্ত্বাবধানের ভার জনৈক পরিণতবয়স্ক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। কর্ম্মচারী এই তেজঃপুঞ্জকলেবর পরম পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সহিত আলাপে মুগ্ধ হইলেন। অল্প দিনের মধ্যে উভয়ের সৌহৃদ্য জন্মিল।

বেদান্তবাগীশ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এই অন্নছত্রের প্রতিষ্ঠাত্রী ব্রাহ্মণকন্যা চিরকুমারী। স্বর্গীয় পিতার দুই লক্ষ টাকা আয়ের জমীদারীর সমস্ত অর্থই তিনি অন্নছত্রের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন।

সেদিন আকাশে ঘোরঘটায় মেঘ করিয়াছিল। পূর্ব্বরজনীতে প্রবল বারিপাত হইয়া গিয়াছে। বেলা নয়টা বাজিয়া গেল। অন্নছত্রের পাচকেরা তখনও রন্ধনশালায় দেখা দিল না দেখিয়া কর্ম্মচারী প্রমাদ গণিলেন। বাতাস ক্রমে প্রবলতর হইল। বর্ষণ তখনও থামিল না।

বেদান্তবাগীশ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান ও পূজা আহ্নিক সারিয়া অন্নছত্রে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আজিকার মেঘমেদুর আকাশ দেখিয়া তিনি আর বিশ্বেশ্বর-দর্শনে গমন করেন নাই।

উদরের জ্বালা যাহাদের প্রবল, ঝড় বৃষ্টির বাধা তাহাদের নিকট তুচ্ছ। একে একে ভিক্ষুকগণ প্রাঙ্গণতলে সমবেত হইতে আরম্ভ করিল। কর্ম্মচারী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় আর্দ্রদেহ, সিক্তবসন ভিক্ষুকমণ্ডলী হইতে একটি আনন্দকোলাহল উঠিল, "মায়ীজী কি জয়!"

বেদান্তবাগীশ সবিস্ময়ে দেখিলেন, অন্নপূর্ণার ন্যায় মহিমমণ্ডিতা গৈরিকবসনধারিণী এক নারীমূর্ত্তি প্রাঙ্গণসীমা অতিক্রম পূর্ব্বক তাঁহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর সংযমে রমণীর যৌবন-শ্রী এক বিচিত্র সৌন্দর্য্যে ও মহিমায় উদ্দীপ্ত, কিন্তু তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল, দীপ্তিময় নয়নযুগলে, শান্ত সুন্দর করুণ মুখমণ্ডলে বিষাদরেখা অঙ্কিত। উজ্জ্বল প্রভাপূর্ণ রক্তের

অঙ্গে কেহ যেন একটি কাল রেখা টানিয়া দিয়াছে।

ব্রাহ্মণ এই সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, ইনিই অন্নছত্রের প্রতিষ্ঠাত্রী, জমীদার-নন্দিনী। সন্ন্যাসিনী মন্থরগতিতে কর্ম্মচারীর সম্মুখীন হইয়া স্নিগ্ধ করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "আজ আমার অতিথি-সেবা কি ব্যর্থ হইবে? এতদিনের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কি আজ এমনই ভাবে অসম্পূর্ণ থাকিবে? দেখিতেছেন না, এত বেলা হইল, এতগুলি ক্ষুধিত প্রাণী ব্যাকুলভাবে অন্নের প্রতীক্ষা করিতেছে?"

কর্ম্মচারী চঞ্চল হইলেন। নৈরাশ্যপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "কি করিব মা লক্ষ্মী, যে দুর্য্যোগ, একটি ব্রাহ্মণও আসিল না।"

"তবে কি আজ এতগুলি প্রাণী উপবাসী থাকিবে?"

বেদান্তবাগীশ বলিলেন, "না, যদি তোমার কোনও আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আজকার রন্ধনশালার ভার আমার উপর দাও। বৃদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু এখনও পাঁচ শত লোকের অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে বোধ হয় কাতর হইব না। এ শুভ কার্য্য হইতে আমায় বঞ্চিত করিও না মা।"

সন্ন্যাসিনীর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সজলনেত্রে, উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আপনি কে জানি না, কিন্তু সত্যই আজ আপনি আমার পিতার কাজ করিলেন। আজ মহাপাতক হইতে আপনিই আমায় উদ্ধার করিলেন।"

বেদান্তবাগীশ নামাবলী কটিদেশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রন্ধনশালার অভিমুখে গমন করিলেন।

৪

বাক্যে বা ব্যবহারে বেদান্তবাগীশের নিদারুণ মর্ম্মপীড়ার কথা কখনও ব্যক্ত হইত না। কিন্তু যাহারা নীরবে সহ্য করে, তাহারা গভীরতররূপে আহত হয়। পুত্রের প্রতারণায় ও নির্দ্দয় ব্যবহারে বেদান্তবাগীশের অন্তরতম প্রদেশে যে শেলাঘাত হইয়াছিল, দ্বাদশ বৎসরে তাহার ক্ষত বিলুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, আরও পরিপুষ্ট ও বিস্তৃত হইয়াছি[illegible] যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবার আশায় তিনি তীর্থবাসী হইয়াছিলেন। অন্নছত্রের কর্ম্মকোলাহলে ও দেবতা-অর্চ্চনায় দিবাভাগে তিনি আপনাকে নিমগ্ন রাখিয়া, স্মৃতির অঙ্কুশ-তাড়না হইতে বিমুক্ত হইতেন বটে, কিন্তু রজনীর নিস্তব্ধতায় অধিকাংশভাগ অনিদ্রায় কাটিত। তথাপি তিনি বারাণসীধামে আসিয়া হৃদয়ে কতকটা তৃপ্তি পাইয়াছিলেন।

এক মাস পরে একদিন সন্ধ্যার পর শ্যামাচরণ বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিয়া বাসায় ফিরিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়াছিল। নির্জ্জনে একটু কাঁদিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

জনত, কোলাহল আজ তাঁহার কাছে তিক্ত বোধ হইল। হৃদয়ের এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বেদান্তবাগীশ বিস্মিত হইলেন। এত কোমলতা, এত চঞ্চলতা হৃদয়ে কোথা হইতে আসিল!

কোনও প্রবাসী বাঙ্গালী পথিক ঝিঁঝিঁটস্বরে গাহিয়া উঠিল,

"বড় আশা ক'রে এসেছি গো কাছে ডেকে লও,
ফিরাও না জননী!"

ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে চলিলেন। পথিকের সকরুণ সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার বিচলিত হৃদয় স্পর্শ করিল।

একেবারে বাড়ীর দ্বারে আসিয়া বেদান্তবাগীশ নিশ্বাস ছাড়িলেন। অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠ হইতে দৌহিত্র ফেলুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ব্রাহ্মণ গঙ্গার তীরাভিমুখে চলিলেন। কিছুক্ষণ নির্জ্জনে না বসিলে তাঁহার চঞ্চল-হৃদয় প্রকৃতিস্থ হইবে না।

অন্নছত্রের সংলগ্ন ঘাটটি রাত্রিকালে জনশূন্য থাকে, বেদান্তবাগীশ ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ণশশাঙ্কের আলোক দীপ্তিতে নীল-অম্বরতল উদ্ভাসিত। ব্রাহ্মণ সোপানশ্রেণী অবতরণ করিতে লাগিলেন। জনশূন্য ঘাটে, সোপানগাত্রে তরঙ্গ প্রহত হইতেছিল।

বামপার্শ্বে একটি শিবমন্দির। মন্দিরের সম্মুখে একটি মর্ম্মর স্তম্ভ। সেখানে বসিলে সহসা কেহ দেখিতে পায় না। বেদান্তবাগীশ সেই দিকে চলিলেন। স্তম্ভের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি নারী মূর্ত্তি তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রমণীর সম্মুখে [illegible] গন্ধপুষ্প। ব্রাহ্মণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন [illegible] অন্নছত্রের প্রতিষ্ঠাত্রী। মৃদুপবনে তাঁহার গৈরিক বসন [illegible] অনাবৃত করিয়া ভূমিতলে লুটাইতেছিল।

রমণী যুক্তকরে [illegible] আনন আলোকপ্লাবিত গগনের পানে স্থাপিত করিলেন। বায়ুস্তর ও চন্দ্রকিরণদীপ্ত অম্বরতল বিদীর্ণ করিয়া সন্ন্যাসিনীর ব্যাকুল হৃদয়ের নীরব [illegible] যেন অলক্ষ্য দেবতার চরণতলে ছুটিয়া চলিল।

বেদান্তবাগীশ বিস্মিত, মুগ্ধ ও পুলকিত হইলেন। এমন সুন্দর, পবিত্র, মোহন দৃশ্য ব্রাহ্মণ বহুদিন দেখেন নাই। সাধিকার নীরব অর্চনা, একাগ্র আরাধনা তাঁহার অন্তরতম প্রদেশ আলোড়িত করিল। বহু - বহু পূর্ব্বে কেবল এক জন এমনি ভাবে নির্জ্জন প্রান্তরে, জনশূন্য জলাশয় তটে দাঁড়াইয়া এমনই ভক্তিভরে অনন্তের আরাধনা করিত। শত শত বার তিনি গোপনে সে দৃশ্য দেখিয়াছেন। কিন্তু সে ত অতীত যুগের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস। মিথ্যার কলঙ্ককালিমা সে অতীত কাহিনীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

শূন্য সাজি হস্তে তুলিয়া লইয়া রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা সোপানোপরি শুভ্রবসন পুরুষমূর্ত্তি দেখিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"কে ওখানে?"

"মা, ভয় নাই আমি।"

সন্ন্যাসিনী সে সস্নেহ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্তা হইয়া নিকটে সরিয়া আসিলেন। বেদান্তবাগীশকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "এমন সময়ে আপনি এখানে কেন?"

"ক্ষমা কর মা, তোমার নির্জ্জন আরাধনায় বাধা দিয়া আমি অপরাধ করিয়াছি।"

"সে কি, আপনি পিতৃতুল্য, ওরূপ কথা বলিবেন না।"

বেদান্তবাগীশ উচ্ছ্বসিতভাবে বলিলেন, "মা, তোমার আরাধনা দেখিয়া আজ এক জনের কথা মনে পড়িয়াছিল। সে তোমারই মত এমনই ভক্তিভরে ভগবানের আরাধনা করিত, কিন্তু -" বেদান্তবাগীশের কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হইল। বহু প্রয়াসেও তিনি অশ্রুস্রোত রুদ্ধ করিতে পারিলেন না।

বেদনা-বিজড়িত স্বরে সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "তিনি কি বাঁচিয়া নাই?"

"জানি না মা, জানিতে ইচ্ছাও নাই। মৃত্যুই তাহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। সে আমার বড় দাগা দিয়াছে। হায়, জ্ঞানের সুদৃঢ় বন্ধনও তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। সে এখন ভণ্ড, প্রতারক, বিধর্ম্মী।"

সন্ন্যাসিনী ভাগীরথীর পরপারস্থ সুদূরবিস্তৃত শূন্য প্রান্তর পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকে যাহার হৃদয় সমুজ্জ্বল, তুচ্ছ অনুষ্ঠানের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে কি? প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন; কিন্তু ইহাতে আমার বিশ্বাসস্থাপন করিতে আস্থা হয় না।"

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। বাতাস পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া আবার ছুটিয়া আসিল। ব্রাহ্মণ মন্দিরস্তম্ভের পাদমূলে, নিবেদিত পুষ্পস্তূপের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

বসন্ত বলিল, "বাবা, ফেলুর আজ তিন চার দিন হইতে [illegible] জর হইয়াছে। ছেলেটা কিছু খাইতে চায় না।"

বেদান্তবাগীশ কয় দিবস সংসারের কোন তত্ত্ব লয়েন নাই। তাঁহার হৃদয়ে একটু অভিমান বাধিয়াছিল। কিন্তু দৌহিত্রের পীড়ার সংবাদে ব্রাহ্মণের বিক্ষিপ্ত মনটা সংসারের দিকে আবার ফিরিয়া আসিল। তিনি ভাবিলেন, পরের ছেলেকে সঙ্গে আনিয়াছেন, সুতরাং তাহার শুভাশুভের জন্য তিনিই দায়ী। এত দিন অবহেলা করিয়া কাজটা ভাল করেন নাই।

বাড়ীওয়ালার নিকট তিনি সংবাদ পাইলেন,—শিকরোলে এক জন ভাল বাঙ্গালী ডাক্তার আছেন। এরূপ বিজ্ঞ চিকিৎসক বারাণসীধামের মধ্যে আর নাই। গরীব দুঃখীকে তিনি বিনা অর্থে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। শ্যামাচরণ তাঁহাকেই ডাকা স্থির করিলেন। প্রথম হইতেই ভাল চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করানই সঙ্গত। উত্তরীয় স্কন্ধে [illegible] স্বয়ং বহির্গত হইলেন।

তখন সন্ধ্যার শান্তিচ্ছায়া চারি দিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে। দেবালয়-সমূহে আরতির শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছিল।

শিকরোলের ডাক্তার মুখার্জ্জির নাতিবৃহৎ আলোকিত একতল অট্টালিকা বেদান্তবাগীশের চক্ষে পতিত হইল। বেলা, জবা, গোলাপ ও মল্লিকা-কুঞ্জবহুল পুষ্পোদ্যানের মধ্য দিয়া বিসর্পিত, কঙ্করাকীর্ণ সুদৃশ্য পথ অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ ডাক্তার বাবুর বসিবার কক্ষে পৌঁছিলেন। কক্ষে কক্ষে আলোক জ্বলিতেছিল। এক জন ভৃত্য সম্মুখে বসিয়া ছিল। ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় শুনিয়া সে তাঁহাকে কক্ষমধ্যে বসিতে অনুরোধ করিল। ডাক্তার বাবু তখনও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, শীঘ্রই আসিবার সম্ভাবনা। ভৃত্য তামাক সাজিতে গেল। শ্যামাচরণ ডাক্তারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ধূমপান করিতে করিতে বেদান্তবাগীশ কক্ষটির চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, দেওয়ালে নানাবিধ হিন্দু দেবদেবীর সুদৃশ্য চিত্র। গৃহের সর্ব্বত্রই গৃহস্বামীর সুরুচি ও সৌন্দর্য্যানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ ডাক্তারের সুরুচির নিদর্শন দেখিয়া অন্তরে তৃপ্তি লাভ করিলেন।

বাড়ীতে এক জন পাচক ও একটি ভৃত্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না। ডাক্তার বাবু তথায় একাকীই থাকিতেন।

পার্শ্বস্থ একটি কক্ষ হইতে ঘন-সুগন্ধ বহির্গত হইতেছিল। সে সুগন্ধে ব্রাহ্মণের অন্তর যেন পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিল।